• চয়ন •

দেবদত্ত। জয় হোক!
সুমিত্রা। ঠাকুর, কিসের কোলাহল?
দেবদত্ত। রোষ কেন, মাতঃ! শুনিলেই কোলাহল!
সুখে থাক, রুদ্ধ কর কান। অন্তঃপুরে,
সেথাও কি পশে কোলাহল? শান্তি নেই
সেখানেও? বল ত এখনি সৈন্য লয়ে
তাড়া ক'রে নিয়ে যাই পথ হ'তে পথে
জীর্ণচীর ক্ষুধিত তৃষিত কোলাহল!
সুমিত্রা। বল শীঘ্র কি হয়েছে!
দেবদত্ত। কিছু না—কিছু না।
শুধু ক্ষুধা, হীন ক্ষুধা, দরিদ্রের ক্ষুধা।
অভদ্র অসভ্য যত বর্ব্বরের দল
মরিছে চীৎকার করি' ক্ষুধার তাড়নে
কর্কশ ভাষায়। রাজকুঞ্জে ভয়ে মৌন
কোকিল পাপিয়া যত।
সুমিত্রা। আহা কে ক্ষুধিত?
দেবদত্ত। অভাগ্যের দুরদৃষ্ট!—দীন প্রজা যত!
চিরদিন কেটে গেছে অর্দ্ধাশনে যা'র
আজও তার অনশনে হ'ল না অভ্যাস,
এমনি আশ্চর্য্য!
সুমিত্রা। হে ঠাকুর, একি শুনি?
ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা, তবু প্রজা কাঁদে
অনাহারে?
দেবদত্ত। ধান্য তা'র বসুন্ধরা যা'র।
দরিদ্রের নহে বসুন্ধরা। এরা শুধু
যজ্ঞভূমে কুকুরের মত, লোল জিহ্বা—
একপাশে পড়ে থাকে; পায় ভাগ্যক্রমে
কভু যষ্টি, উচ্ছিষ্ট কখনো। বেঁচে যায়
দয়া হয় যদি, নহে ত' কাঁদিয়া ফেরে
পথপ্রান্তে মরিবার তরে।
সুমিত্রা। কি বলিলে,
রাজা কি নির্দ্দয় তবে? দেশ অরাজক?
দেবদত্ত। অরাজক কে বলিবে! সহস্র-রাজক!
সুমিত্রা। রাজকার্য্যে অমাত্যের দৃষ্টি নাহি বুঝি?
দেবদত্ত। দৃষ্টি নাই? সে কি কথা! বিলক্ষণ আছে!
গৃহপতি নিদ্রাগত, তা' বলিয়া গৃহে
চোরের কি দৃষ্টি নাই? সে যে শনি-দৃষ্টি!
তাদের কি দোষ? এসেছে বিদেশ হ'তে
রিক্ত হস্তে, সে কি শুধু দীন প্রজাদের
আশীর্ব্বাদ করিবারে দুই হাত তুলে?'
সুমিত্রা। বিদেশী? কে তারা? তবে আমার
আত্মীয়?
দেবদত্ত। রাণীর আত্মীয় তারা, প্রজার মাতুল,
যেমন মাতুল কংস, মামা কালনেমী!
সুমিত্রা। জয়সেন?
দেবদত্ত। ব্যস্ত তিনি প্রজা-সুশাসনে।
প্রবল শাসনে তাঁর সিংহগড় দেশে
যত উপসর্গ ছিল অন্নবস্ত্র আদি
সব গেছে—আছে শুধু অস্থি আর চর্ম!
সুমিত্রা। শিলাদিত্য?
দেবদত্ত। তাঁর দৃষ্টি বাণিজ্যের প্রতি।
বণিকের ধনভার করিয়া লাঘব
নিজস্কন্ধে করেন বহন।
সুমিত্রা। যুধাজিৎ?
দেবদত্ত। নিতান্তই ভদ্রলোক, অতি মিষ্টভাষী,
থাকেন বিজয়কোটে, মুখে লেগে আছে
বাপু বাছা, আড়চক্ষে চাহেন চৌদিকে,
আদরে বুলান হাত ধরণীর পিঠে—
যাহা কিছু হাতে ঠেকে যত্নে লন তুলি'।

—রবীন্দ্রনাথ
(রাজা ও রাণী হইতে উদ্ধৃত)

১ম বর্ষ **ধৃতিদীপা** ৬ষ্ঠ সংখ্যা

Friday, 1st April, 1966 ● শুক্রবার, ১৮ই চৈত্র, ১৩৭২ 50 Paise

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি :

নাম ও ঠিকানা-সহ স্পষ্টাক্ষরে কাগজের এক দিকে লিখিত রচনার পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নিকট পাঠান আবশ্যক। কোন মনোনীত রচনা কোন বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট পাঠালে ফেরত পাঠান হবে।

গ্রাহকদের প্রতি :

সপ্তাহের প্রতি শুক্রবারে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে কুড়ি পয়সার ডাকটিকিট-সহ অতিরিক্ত কপির জন্য জানাতে হবে। ঠিকানার পরিবর্তন হলে, পনেরো দিন আগে জানাতে হবে। ভিঃ পিঃ-তে পত্রিকা পাঠান হয় না। চিঠি-পত্রে ও কুপনে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করা দরকার।

এজেন্টদের প্রতি :

এজেন্সীর নিয়মাবলী পত্রিকার কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি :

পত্রিকার কার্যালয়ে পত্র দিলে বিজ্ঞাপনের মূল্য, নিয়মাবলী ইত্যাদি জানান হয়।

চাঁদার হার :

ডাকসহ বার্ষিক	২৪·০০	টাকা ;
ষাণ্মাসিক	১২·০০	টাকা ;
ত্রৈমাসিক	৬·০০	টাকা ;
প্রতি সংখ্যা	০·৫০	পয়সা ;

ম্যানেজার, ধৃতিদীপা

৪০, বজীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৪

ফোন : ৩১-৪২৯৭

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

৬ই এপ্রিল

অযথা বহু জীবন ও জাতীয় সম্পত্তির বিরাট ক্ষয়-ক্ষতির পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বামপন্থী নেতাদের মধ্যে মিটমাটের একটা রকম দেখিয়া আমরা খুবই আশ্বস্ত হইয়াছিলাম এবং একান্তভাবে আশা করিয়াছিলাম, দেশের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, জনগণের স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া উভয় দল একটা মতৈক্যে উপনীত হইবেনই। কিন্তু সেই আশা বৃথা। রক্তের দাগ মুছিতে না মুছিতে, বেদনাশ্রু শুকাইতে না শুকাইতেই, ক্ষয়-ক্ষতির জ্বালা ভুলিতে না ভুলিতেই আবার ঝড়ের পূর্ব্বাভাষ দেখা যাইতেছে।

সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রণ্ট খাদ্য, আলো ইত্যাদি সম্বন্ধে সরকারের কাছে যে চারিটি দাবী উপস্থিত করিয়াছিলেন, সেই সম্পর্কে সরকার তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে না পারায় তাঁহারা আগামী ৬ই এপ্রিল আবার হরতাল পালনের ডাক দিয়াছেন। শান্তিপূর্ণ হরতালের কথাই তাঁহারা বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা প্রত্যেকবারই দেখিয়াছি, যতই 'শান্তিপূর্ণ' বলা হউক না কেন, মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহা শুধু অশান্তিপূর্ণ হইয়াই উঠে না—ধ্বংসের তাণ্ডবে পরিণত হয়। দিন কয়েক আগেকার হরতালও 'শান্তি-পূর্ণ' ভাবেই পালন করার ডাক দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু তাহা কি ভাবে পালিত হইল? সেই নারকীয় বীভৎসতার রূপ আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেকের মনে এখনও জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। তাহার জের এখনও মিটে নাই। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলেই ভয় পায়। শান্ত, নিরীহ জনসাধারণেরও আজ সেই অবস্থা। আবার হরতালের ডাক শুনিয়া এখন হইতেই তাহারা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

জনগণের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ বিধানের একাদর্শে বিধৃত হইয়াও কংগ্রেস এবং বামপন্থী নেতৃবৃন্দ জনগণেরই কল্যাণের জন্য একটা মতৈক্যে উপনীত হইতে পারিতেছেন না কেন? এই না-পারার পশ্চাতে যদি কোন কারণ ও উদ্দেশ্য থাকিয়া থাকে তবে তাহা নিশ্চয়ই সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র আত্মস্বার্থ বা দল-স্বার্থগত। মহান্ নেতৃবৃন্দের পক্ষে সেই সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে যাওয়া কি এতই অসম্ভব? কংগ্রেসী বা বামপন্থী যে কোন দলের অন্তর্ভুক্তই হউন না কেন—তাঁহারা কাহাদের নেতা? তাঁহারা যাঁহাদের নেতা, কোন মহান্ উদ্দেশ্যে, কোন মহান্ কল্যাণার্থে, আজ সেই নীতদেরই কথা তাঁহারা ভাবিবার অবকাশটুকুও পাইতেছেন না? একটা প্রবাদ আছে—'লঙ্কায় যে যায়, সে হয় রাবণ'। একবার এসেম্ব্লী হাউসে যাইতে পারিলেই হইল!

খাদ্য ও আলোর দাবী শুধু বামপন্থীদের নহে। দেশের জনসাধারণ প্রত্যেকেরই। সত্য সত্যই জনসাধারণের এই অতীব ন্যায়সঙ্গত চাহিদা পূরণ করা গণ-সরকারের পক্ষে যদি বর্ত্তমানে একান্তই অসম্ভব হয়, তবে তাঁহাদের উচিত যাঁহাদের নিকট হইতে তাঁহারা এসেম্ব্লী হাউসের গেটপাশ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে গিয়া ভালভাবে তাঁহাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া এবং তাঁহাদের আন্তরিক চেষ্টার কথাও বুঝাইয়া বলা। ভোটের জন্য যাঁহাদের দ্বারে দ্বারে যাইতে পারিয়াছেন, আজ এই চরম দুর্দ্দিনে তাঁহাদের দ্বারে গিয়া দুই একটা সান্ত্বনার কথা বলিতেও আমাদের মহানুভব সরকারী নেতৃবৃন্দের এত সঙ্কোচ হইতেছে কেন? তাহাতে মান না হারাইয়া মান পাইবারই কথা। যে কোন পন্থী নেতার পক্ষেই ইহা একান্ত কর্ত্তব্য।.........

ভারত গণতন্ত্রী দেশ। গণতন্ত্রের প্রতি ভারতীয় জনসাধারণের শ্রদ্ধাও আছে। সেই শ্রদ্ধার যাঁহারা এখন অপব্যবহার করিবেন, সময়মত জনসাধারণও তাঁহাদিগকে ইহার ফল বুঝাইয়া দিতে নিশ্চয়ই চেষ্টা করিবেন। বাস্তবে কে তাঁহাদের দরদী, আর সেবকের ছদ্মবেশে কে প্রতারক— নির্মম ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া ইহা বুঝিবার মত এক-আধটু জ্ঞান তাঁহাদের হইয়াছে বৈকি!

আমরা মনেপ্রাণে আশা করি, শেষ পর্য্যন্ত হরতাল যদি হয়ই, তাহা হইলে তাহা শান্তিপূর্ণ ভাবেই প্রতিপালিত হইবে। এইবার নেতৃবৃন্দ যাঁহারা হরতাল ডাকিয়াছেন, তাঁহারা বাহিরে আছেন এবং আশা করি থাকিবেনও। 'শান্তিপূর্ণ হরতাল' যাহাতে প্রতিপালিত হয়, তাহার সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা তাঁহারা তো করিবেনই, তাহা ছাড়া কোন দুষ্কৃতকারীই যাহাতে ইহার কোন সুযোগ না লইতে পারে তৎসম্বন্ধেও আন্তরিক ভাবেই তাঁহারা সজাগ থাকিবেন, এমনটাই আমরা আশা করিব। সেই সঙ্গে আমরা অন্তরের সহিত ইহাও আশা করিব যে জনগণের কোনপ্রকার ক্ষয়-ক্ষতি যাহাতে কেহ এতটুকুও করিতে না পারে, সরকার তাহার যথাযথ ব্যবস্থা করিবেন এবং সেই ব্যবস্থা করিতে গিয়া কোনপ্রকার ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া দুষ্কৃতকারীদের কুশল-কৌশলী প্রতিরোধে জনগণকে এবং জনগণের স্বার্থকে রক্ষা করিবেন। এই ব্যাপারে উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দের সম্মিলিত প্রচেষ্টা শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অটুট থাকিবে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি।

দেশবাসী প্রত্যেকের কাছে আমাদের অন্তরের নিবেদন, শান্তি ও শৃঙ্খলার পথ হইতে তাঁহারা যেন কোন সময়েই, কোন কারণেই বিচ্যুত না হন; শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট করিবার চাঞ্চল্য যদি কাহারও মধ্যে দেখেন তাহা হইলে বিহিত উপায়ে অথচ দরদী প্রয়াসে তাহাকে যেন শান্ত রাখেন।

সর্ব্বশেষে, যাঁহারা দেশের পরম সম্পদ, যাঁহারা দেশের ভবিষ্যৎ ও আশার প্রতীক—সেই তরুণদের কাছে আমরা আমাদের অন্তরের অন্তস্তল হইতে আবেদন জানাইতেছি: সঙ্কটে সবাইকে সুস্থ ও স্বস্থ রাখুন, কোথাও যাহাতে এতটুকুও বিশৃঙ্খলা ঘটিতে না পারে তাহার জন্য সব সময় চেষ্টিত থাকুন—তবেই আমরা সকল সঙ্কটকে কাটাইয়া উঠিতে পারিব—দুর্গতি সব আমাদের বাঁচার দুর্গ হইয়া উঠিবে। অসহায়, দুর্ব্বল কোটি কোটি দেশবাসী আপনাদের মুখপানে তাকাইয়া আছে—আপনাদের অবিচলিত নিষ্ঠাই সকল প্রকার অনিষ্টকে ইষ্টে সার্থক করিয়া তুলিবে। হরতাল হউক বা না হউক, নিরলস প্রয়াসে ঘরে-বাহিরে সমস্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে সদা সতর্ক সুশৃঙ্খল চলনার মাধ্যমেই আবার সব বেতালকে তালে লইয়া আসা সম্ভব।

"ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্ব্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হোতে পারি তথা
তোমার আদেশে. যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি' উঠে খরখড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে; যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে, আর, অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।"

—রবীন্দ্রনাথ

পরাঙ্কি খানি

—শ্রীতারকনাথ ঘোষ

চেয়ে দেখি ;
ফাল্গুনের আমন্ত্রণে পৃথিবীর সাড়া
আনন্দিত কলতান পুষ্পের উচ্ছ্বাসে
অফুরন্ত রঙে আঁকা গান।
চেয়ে দেখি, উদাসী বোশেখে
হাওয়ার খ্যাপামি আর
গুরু গুরু উতলা মেঘের ;
ঘন শ্রাবণের দিনে শিহরিত মাটি
নিবিড় ভাষায় যেন গান গেয়ে ওঠে—
সবুজ পাতার মর্মর।
চেয়ে দেখি,
প্রভাতের উষারাগ
সূর্যাস্তের ঘন রঙে কী করে মেশায় ;
নির্বাক রাত্রির বুকে কী করে যে ফোটে
তারাফুল ;
নদীর বিচিত্র বেগ, অরণ্যের গান,
পর্বতের গাঢ় ধ্যান,
উত্তরোল সমুদ্রের দুরন্ত আবেগ।
চেয়ে দেখি রূপসজ্জা নটী পৃথিবীর॥
চেয়ে দেখি,
বিচিত্র দেহের অন্তরালে
অজেয় বিচিত্রের মন দিয়ে গড়া
জীবন্ত মানুষ।
দেখি তার হৃদয়ের বাসনা কামনা
অফুরন্ত প্রাণের সাধনা
সর্বজয়ী প্রেম।
চেয়ে দেখি,
অজস্র মানুষ
হাসি দিয়ে দুঃখ দিয়ে
কী বিচিত্র আলপনা
এঁকে চলে প্রতিদিন ;
জীবনের প্রতিক্ষণ
আলো আর জ্যোতির জোয়ারে
তাড়িত কণার মতো উদ্দাম উজ্জ্বল ;
ইতিহাস নামে এক অতিকায় চীনের প্রাচীর
ধীরে ধীরে গড়ে তোলে,
দূর থেকে দেখা যায় আলো অন্ধকারে
দু একটা তোরণের চূড়া॥

চেয়ে দেখি,
রূপ, শুধু রূপ।
রূপের প্রবাহ বয়ে চলে,
রূপের ফেনাই উথলায়।
কি প্রকৃতি, কি মানুষ
রূপের গঙ্গায় স্নান করে
আপনাকে ভরে ভরে তোলে
প্রাণে আর রূপের কণায়।
জড় দেহ
কী বিচিত্র হয়ে ওঠে
রূপের দাক্ষিণ্যদানে।
এই প্রাণ, এই মন
অপরূপ রূপের বিলাসে
ব্যক্ত হয় অজস্র অচেল
সীমাহারা মায়ার লীলায়।
চেয়ে দেখি, সারাটা জীবন
অজস্র রূপের ডালি
ভরে নিয়ে চলে আর চলে॥

রূপ দেখি,
রূপ, শুধু রূপ।
সুরটুকু থেকে যায় অতল গভীরে।
প্রাণে তার নেই অনুভব।
মনের আকাশে শুধু
কল্পনার ছায়া যেন ভাসে।
রূপ দেখি,—রূপ, শুধু রূপ।
আগ্রহে অধীর হয়ে সারা সত্তা যেন
সংবৃত্ত হয়েছে দুটি চোখে।
চেয়ে দেখি, রূপের জোয়ারে
এ জগৎ নিত্য ঝলমল।
অরূপের শিখা শুধু জ্বলে
চোখের আড়ালে।
রূপহারা জ্যোতির পাথার
দৃষ্টির অতীত দেশে নিত্য প্রসারিত।
রূপে মুগ্ধ দুটি চোখ
বার বার ফিরে আসে তার তীর থেকে,
ভুলে যায় রূপের মায়ায়॥

বাংলাভাষা ও জাতীয়ভাষা

—সুনীল মিত্র

"নানান্ দেশের নানা ভাষা,
বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা ?"

আমরা যতই নানা ভাষায় পারদর্শী হই বা বিদেশী ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া যশস্বী হই না কেন, সত্যিকার মনের ক্ষুধার পরিতৃপ্তি মাতৃভাষা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়।

তাই দেখি, "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ডরূপে" আর তার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ভাষা যখন প্রচলিত হতে লাগল সমগ্র ভারতে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, তখন 'ইয়াং বেঙ্গল' ঝুঁকে পড়ল সেই বিদেশী ভাষার প্রবাহে। এমন কি অনেকে আবার সাগর পাড়ি দিয়ে মাতৃভাষাকে জীর্ণ পোশাকের মত পরিত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হল না। কিন্তু সুখের বিষয়, তাদের সেই মোহান্ধতা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। "মাতৃভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে" দেখে তাদের সেই দিবাস্বপ্ন টুটে যায়। অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাই আক্ষেপ করে বলেছেন—

"হে বঙ্গ ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ
রতন,
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা
করি,
পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।"

মাতৃজঠর হতে মুক্ত হওয়ার পর জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে শুনে শুনে যে-ভাষায় আমাদের মনের ভাব প্রথম প্রকাশ পায়, যে-ভাষায় হয় আমাদের 'নিবিরের স্বপ্নভঙ্গ' তা-ই হল আমাদের মাতৃভাষা। প্রত্যেক জাতির মাতৃভাষা তার জীবন-যুক্তির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

মনের ভাব প্রকাশের প্রকৃষ্ট বাহন হ'ল ভাষা। আবার ভাষা সংস্কৃতির ধারক। শুধু তাই নয়, "সমাজ এবং সমাজের লোকদের মধ্যে এই প্রাণগত, মনোগত মিলনের ও আদান-প্রদানের উপায়স্বরূপে মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে সৃষ্টি সে হচ্ছে তার ভাষা। এই ভাষার নিরন্তর ক্রিয়ায় সমস্ত জাতকে এক করে তুলেছে, নইলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে মানব-ধর্ম থেকে বঞ্চিত হত।"

যে জাতির মাতৃভাষা যত সমৃদ্ধ, সে জাতি হয় তত উন্নত। কারণ, জাতীয় আদর্শ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই সম্যগ্‌রূপে বিকাশ লাভ করতে পারে। বিদেশী ভাষা কখনও মাতৃভাষার মত সহজ ও স্বাভাবিক হতে পারে না। তাই দেখা যায়, মাতৃভাষার সাহায্যে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষালাভ যত সহজ অন্য কোন ভাষায় ততটা হয় না।

শিক্ষা জাতিকে উন্নত ও প্রগতিশীল করে তোলে। মানব-মনের সম্যক্ পুষ্টিসাধন একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। আর সেই শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয় একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই। তাই ব'লে বিদেশী ভাষা শিক্ষায় যে কোন ফল নেই এমত নয়, একাধিক ভাষার জ্ঞান বহুবিধ জ্ঞান-আহরণের সহায়ক। তদুপরি এর ফলে মানব-মনের চিন্তাশক্তিরও প্রসার লাভ ঘটে।

ভারতবর্ষে আনুমানিক দেড়-কোটি লোকের মাতৃভাষা বাংলা। কিন্তু, কমবেশি সাড়ে-চার কোটির মত লোক বাংলা ভাষা বোঝে ও বলতে পারে। তদুপরি আসাম, উড়িষ্যা ও বাংলার ভাষা আদিতে ছিল প্রায় এক। ক্রমে আসামী ও উড়িয়া মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অবশ্য ভারতীয় সমস্ত ভাষারই উৎস হল সংস্কৃত ; যার ফলে সংবিধান-স্বীকৃত 'হিন্দীভাষা' ও 'খড়ী-বোলী' অনেকাংশে বাংলা শব্দ-সম্ভারে পুষ্ট।

বাংলা-ভাষা ও লিপির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, আর্য-পূর্ব বাংলায় অর্থাৎ খৃষ্টীয় দশম শতকের পূর্বে বাংলার আদিবাসীদের কোন লিপি ছিল কিনা তার যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, আর্যদের আগমন ও আর্য-সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত অনার্য-ভাষাগুলি কোনঠাসা হয়ে পড়ে এবং তাদের কিছু কিছুর বিলোপ-সাধনও ঘটে।

আর্য ভাষার প্রাচীনতম রূপ আমরা পাই 'ঋগ্বেদে'। কিন্তু ঋগ্বেদের ভাষা সর্বসাধারণের সহজবোধ্য না হওয়ায় ধীরে ধীরে সবজনীন বোধগম্য একটি 'লৌকিক' ভাষা জন্ম নেয়। এই ভাষাই 'সংস্কৃত' বা 'দেব-ভাষা' নামে খ্যাত হয়। আবার তার এই পথ-পরিক্রমা এখানে এসেই স্তব্ধ হয়ে থাকেনি। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে তার রূপ পুনরায় পরিবর্তিত হতে থাকে। ক্রমশঃ তা রূপ নেয় 'প্রাকৃত' ভাষায় এবং তারও পরবর্তী পর্যায়ে এই ভাষা অপভ্রংশের স্তরে এসে দেশ ও কাল-ভেদে নানা আধুনিক ভাষায় জন্ম দেয়। এরই ফলস্বরূপ আমরা পাই বাংলা ভাষা।

কিন্তু বাংলাভাষার জন্মের বহু-

বিতর্কিত। তার জন্মকুণ্ডলী আজ বিচারসাপেক্ষ। অনেকের মতে আট-শত খৃষ্টাব্দের পালযুগের চর্যাপদগুলি হল প্রাচীনতম বাংলা ভাষার নিদর্শন।

বাংলা-ভাষার বর্তমান উন্নতির সূচনায় আমরা দেখতে পাই এর প্রথম হাতে-খড়ি আরম্ভ হয় রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে, আর তার চরম পরিণতি লাভ হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা। বর্তমান বাংলা ভাষা ও তার সাহিত্য বিশ্বের যে-কোন উন্নত ভাষা ও সাহিত্যের সমপর্যায়ভুক্ত। অধিকন্তু তুলনামূলক ভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, বাংলা ভাষার যে সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলির অভাব অন্যান্য ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে থাকায় তারা বাংলার মত এতটা সফল হতে পারেনি।

"বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, রাঢ়, বারেন্দ্রর ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয়, অন্তরের ভাগও ছিল তার সঙ্গে জড়িয়ে, সমাজেরও মিল ছিল না। তবু এর মধ্যে যে ঐক্যের ধারা চলে এসেছে তা ভাষার ঐক্য নিয়ে।"

বিশাল এই ভারতবর্ষ। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও ভাষা-ভাষীর বাস এই ভারতে। তদুপরি, এদেশের ভূপ্রকৃতিও সর্বত্র সমান নয়। তথাপি, 'নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর' ভারত তার স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রেখেছে।

"পর্দা উঠিবামাত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথমাঙ্কেই আমরা আর্য-অনার্যের প্রচণ্ড জাতি-সংঘাত দেখিতে পাই। এই সংঘাতের প্রথম প্রবল বেগে অনার্যের প্রতি আর্যের যে বিদ্বেষ জাগিয়াছিল তাহারই ধাক্কায় আর্যেরা নিজের মধ্যে নিজে সংহত হইতে লাগিল।"

যদিও প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগের ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য সর্বদা রক্ষিত হয়নি, তথাপি মহাভারতের যুগে এই সংহতির প্রথম প্রয়াস আমরা দেখতে পাই। উহার পরবর্তী যুগে মনে হয় চন্দ্রগুপ্তই হলেন একমাত্র সার্বভৌম সম্রাট। এরপরে মহামতি অশোকের রাজত্বকালে এবং তুঘলক ও মোগলদের শাসনকালে সমগ্র ভারতব্যাপী এক-সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা প্রায় সফলতার কাছাকাছি এসেছিল; কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। এরপর বেশ কিছুকাল ধরে চলে ভারতের অন্ধকারময় যুগের পরিক্রমা। তারপর 'একধর্মরাজ্যপাশে খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত' বেঁধে দেওয়ার মানসে ছত্রপতি শিবাজীও একদা স্বপ্ন দেখেছিলেন; কিন্তু তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সফল হননি।

যাই হোক, "ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা। নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।"

তাই "ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় আর্যদের আসবার পূর্বে আর্য-পূর্ব দ্রাবিড় সভ্যতাকে আর্যরা নষ্ট করেননি। দ্রাবিড়রাও তৎপূর্ব সভ্যতার উচ্ছেদসাধন করেননি। এইভাবে বহু সভ্যতা ও সংস্কৃতির পলিমাটি দিয়ে স্তরে-স্তরে ধীরে-ধীরে ভারতের সংস্কৃতি-সৌধটি গড়ে উঠেছে। পাশাপাশি সবাই বসবাস করেছে। কেউ কাউকে নির্মূল করেনি।"

এর পরবর্তীকালেও দেখা গেছে এই "মহামানবের সাগরতীরে"—

—"রণধারা বাহি জয়গান গাহি
উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরি-পর্বত
যারা এসেছিল সবে"—

ভারত তাদের কাহাকেও দূর করে দেয়নি। উপরন্তু নিয়েছে একান্ত আপনার ক'রে, সম্পূর্ণ নিজের মধ্যে মিশিয়ে নিয়ে। এই দূরকে আপন করবার ক্ষমতা ভারতের সহজাত বৈশিষ্ট্য। আর এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই ভারতে কোনকালে রাষ্ট্রীয় ঐক্য দানা বেঁধে ওঠেনি বা উঠতে পারেনি। একের পর এক পরজাতি এসে পদানত করেছে ভারতকে।

তথাপি, আমরা দেখতে পাই, "আমাদের প্রাচীন ভারতে অসামঞ্জস্য রকমের প্রকার ছিল না; সে ছিল এক জাতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য জাতি সম্প্রদায়ের। এই সকল নানা উপজাতির বর্ণ ভাষা, আচার ধর্ম, চরিত্রের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন ছিল। অথচ ইহারা সকলেই প্রতিবেশী। ইহাতে একদিকে যেমন পরস্পরের লড়াই চলিতেছিল, তেমনি আর এক দিকে পরস্পরের সমাজ ও ধর্মের সামঞ্জস্য-সাধন চেষ্টারও বিশ্রাম ছিল না। কি করিলে পরস্পরে মিলিয়া এক বৃহৎ সমাজ গড়িয়া উঠে; অথচ পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য একেবারে বিলুপ্ত না হয়। এই দুঃসাধ্য সাধনের প্রয়াস বহুকাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে, আজও তাহার সমাধান হয় নাই।"

এক জাতি, এক ভাষা, একতা—স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে এই দাবী আজ প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে, এছাড়া নাকি রাষ্ট্রীয় ঐক্য সম্ভব নয়। তাই, এরই ফলস্বরূপ আমাদের সংবিধানে 'হিন্দী' ভাষাকে জাতীয় ভাষারূপে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য আইন

বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। তবে একে 'সংযোগের ভাষা' বললে মনে হয় অনেকটা যুক্তিযুক্ত হত। তাহলে হয়ত বর্তমানে 'হিন্দী'র বিরুদ্ধে যে জেহাদ ঘোষণা করা হচ্ছে বা এরই পরিপ্রেক্ষিতে যে ভাষা-ভিত্তিক প্রদেশ গঠনের ধুয়ো উঠেছে তা অনেকাংশে প্রশমিত হতে পারত।

একথা সত্য যে, প্রাচীনকালে আমাদের মধ্যে ছিল বর্ণগত বা শ্রেণী-গত ঐক্য। জনগত ঐক্য ছিল না,—যা আমাদের রাজনৈতিক জীবনের বিরাট অভাব। অবশ্য, এর মূলে ভাষাই ছিল প্রধানতম অন্তরায়। কাজেই ভারতে যদি একটি সর্বজন-বোধ্য সর্ব-ভারতীয় ভাষা প্রচলিত করা যায়, তাহলে তা যে রাষ্ট্রীয়, প্রশা-সনিক ও জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে সুফল দান করবে তাতে সন্দেহ নেই। তথাপি, বিপুলা এই পৃথিবীর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই এক-জাতি, এক-ভাষাতত্ত্ব ব্যতীতও অনেক স্বাধীন রাষ্ট্র একাধিক ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দান করে স্পর্ধাভরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সুইজার-ল্যাণ্ড, কানাডা প্রভৃতি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কাজেই ভারতের তথত্-তাউসে মাত্র একটি ভাষাই স্থান পাবে—এটা সমীচীন কিনা ভেবে দেখতে হবে।

মাতৃভাষা এমন একটি জিনিস যাকে জীর্ণ বস্ত্রের মত বর্জন করা যায় না। দেখা গিয়েছে, মাতৃভূমির মত মাতৃ-ভাষার সম্মান রক্ষার্থ প্রাণদান করতে কেহ কুণ্ঠিত হয় না। দক্ষিণ ভারত ও পূর্ব বাংলার আন্দোলন ও আত্মত্যাগের ঘটনাবলী তার চাক্ষুষ প্রমাণ। কাজেই "যদি রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পক্ষে একাকারত্বই একান্ত আবশ্যক বলিয়া ধরা হয় তবে বলিতেই হইবে, রাষ্ট্রীয় ঐক্য ঐক্যের আদর্শ নহে। ইহাতে একপ্রকার স্বাধীনতার লোভে মানুষের গভীরতর স্বাধীনতাকে বলপূর্বক বলি দেওয়া হয়।"

তা বলে ইংরেজী ভাষাকেও দীর্ঘ-কাল ধরে ভারতের জাতীয় ভাষার মসনদে বহাল রাখতে চাওয়াও ঠিক নয়। "এই কথা নিশ্চিতই বুঝিব, আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখাও তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।" অবশ্য-স্বীকার্য যে সমগ্র ভারতে সংযোগ-রক্ষাকারী সর্বজন-বোধগম্য একটি ভাষার প্রয়োজনীয়তা আছে।

"বিশেষ কাজের প্রয়োজনে কোন বিশেষ ভাষাকে কৃত্রিম উপায়ে স্বীকার করা চলে, যেমন আমরা ইংরেজী ভাষাকে স্বীকার করেছি। কিন্তু ভাষার একটা অকৃত্রিম প্রয়োজন আছে; সে প্রয়োজন কোন কাজ চালাবার জন্যে নয়, আত্মপ্রকাশের জন্যে।" কিন্তু "তার চেয়ে বড় কাজ দেশের চিত্তকে সরস, সবল ও সমুজ্জ্বল করা। সে কাজ আপন ভাষা নইলে হয় না। দেউড়িতে একটা সরকারি প্রদীপ জ্বালানো চলে, কিন্তু, একমাত্র তারই তেল যোগাবার খাতিরে ঘরে ঘরে প্রদীপ দেখানো চলে না।"

কাজেই একভাষারূপ নিজেদের পথ পরিত্যাগ করে ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত ১৪টি প্রধান ভাষা এবং অন্যান্য আদিবাসীর ভাষাগুলোকেও স্বীকার করে নিয়ে ভারতীয় জনশক্তিকে মিলনের পথে পরিচালিত করবার চেষ্টা করা উচিত বলে মনে হয়,—"সবভাষা একাকার করার দ্বারা নয়, সব ভাষার আপন আপন বিশেষ পরিণতির দ্বারা।"

রক্ত-গোলাপ

—রমা ঘোষ

আমার বিছানার কাছে ওরা অনেকক্ষণ ছিল। ওরা আমার পুরোনো বন্ধু, স্কুল-কলেজের বন্ধু। আমাকে দেখতে এসেছিল। আমি ওদের মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধু দীপঙ্কর। ওরা কথা বলল, হাসল। কিন্তু ওদের কথায় হাসিতে সেই ছেলেমানুষী আর নেই। ছাত্রজীবনের গণ্ডী অতিক্রম করেছে বলেই কি ওদের আচরণে সংযম এসেছে! অথবা বেচারী আমাকে দেখতে এসে ওরা সংযত হয়েছিল! কারণ আমার জীবন সীমিত হয়ে গেছে, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। মৃত্যু নেমে আসছে আমার জীবনে। অকালে আমি মরে যাচ্ছি মাত্র চব্বিশ বছরে। তাই ওরা আমার সামনে হাসির বন্যা বহাতে পারেনি, কথার তুফান তুলতে পারেনি। সবাই শান্ত ছিল। ওদের দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে। আমার মনটা ভরে উঠেছে খুশীতে। আমার বন্ধুরা আমাকে ভালোবাসে. একথা যেন আবার নতুন করে অনুভব করলাম। আমার অনেক বন্ধু আমাকে প্রায়ই দেখতে আসে।

কত দিন হল রোগশয্যায় শুয়ে আছি। আমার স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল না, খারাপও ছিল না। কিন্তু আমার দেহের মধ্যে কীট ঢুকেছে। আমার শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে। আমি আর বেশী দিন বাঁচব না। অনেক দেরীতে রোগ ধরা পড়েছে। ডাক্তারবাবুরা বলেছেন আমার জীবনের কোন আশা নেই। [illegible] চায়নি আমায় এই পরিণতির কথা। তবু আমি জেনেছি। আমার প্রিয়জনদের চোখমুখ দেখে বুঝতে পেরেছিলাম আমার রোগের স্বরূপ। তার পর অনেকভাবে অনেক কিছু শুনেও ফেলেছি।

আমি এই বিছানায় থাকি সারাদিন সারারাত—কখনও শুয়ে, কখনও বসে। বই পড়ি। বেশীক্ষণ পড়তে পারি না। চোখে লাগে, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে। কত কথা চিন্তা করি। আর চেয়ে চেয়ে দেখি কত কি। আমার ঘরটা দোতলার পূর্বদিকের সবশেষের ঘর। এই ঘর থেকে অনেক কিছু দেখা যায়। কাছেই গঙ্গা। গঙ্গার তীরে জেলেপাড়া। একটা মসজিদ আছে। তার সাদা চুড়োটা দেখতে ভালো লাগে। দাঙ্গার সময় ওই পাড়ার মুসলমানরা সব পালিয়েছে। মসজিদের ভিতর অনেক জিনিস কারা নষ্ট করে দিয়েছিল। তখন ছোট ছিলাম। বাড়ীতে লুকিয়ে লুকিয়ে আমার বন্ধুদের সঙ্গে ওখানে গিয়েছিলাম। মসজিদের ভিতর কত রঙীন কাঁচ কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, সে কথা আজও মনে পড়ে যায় মসজিদটার দিকে চাইলে। সেই কাঁচগুলো খুব ভালো লেগেছিল বলেই কি বার বার মনে পড়ে সেই কথা? অথবা বাড়ীতে লুকিয়ে মসজিদে যাওয়ার রোমাঞ্চে সেই স্মৃতি বার বার মনে পড়ে?

জীবনের আরো কত রোমাঞ্চিক কাহিনী ঘুরে-ফিরে মনে পড়ে. ছেলেবেলা থেকে [illegible] অনেক ঘুরেছি। এরকম ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে একটা নেশা আছে। আজ কিন্তু রোগ আমাকে কাবু করেছে। আমাকে চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী হয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। আর আমি বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে পারি না। মসজিদের পুকুরের পাড়ে সেই কদমগাছটায় উঠে কদমফুল তুলে আনতে পারি না; বৃষ্টি এলে মনের সুখে ভিজতে পারি না; দীঘি থেকে পদ্মফুল তুলে এনে পারুলকে দিতে পারি না।

অবশ্য পারুল আর আমার কাছ থেকে ফুল পাবার প্রতীক্ষায় বসে নেই। আমার কলেজ-জীবন আরম্ভ হবার কিছুদিন আগে ওর বিয়ে হয়ে গেছে। সুতরাং তুচ্ছ পদ্মফুল কেন, পারুলকে আরো কত সম্পদ এনে দেবার লোক হয়েছে।

তবু আমি ভুলতে পারিনি আমার জীবনের প্রথম প্রিয়া পারুলকে। ষোল-সতের বছর যখন আমার বয়স তখন ও আমাকে পাগল করেছিল। পারুল আমার সমবয়সী। আমাদের পাশাপাশি বাড়ী, আমার কৈশোরের আকাশে পারুলের আবির্ভাব স্নিগ্ধ জোৎস্নার মত মধুর। ওর মোহে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত আমার সারা দেহ-মন।

কেমন শান্ত গাম্ভীর্য আছে পারুলের মুখে। ওই গাম্ভীর্য, ওই শান্ত ভাব বোধ হয় পারুলের জন্মগত। পারুলের মধ্যে কি যেন এক মহিমা আছে। আমি সেই মহিমার সামনে সংকুচিত হয়ে পড়ি। ওকে আমি সমীহ করি, শ্রদ্ধা করি। আমার মনে হয় পারুল নামটা পারুল না হয়ে মহাশ্বেতা [illegible] ভালো হ'ত।

একদিনের কথা পারুল [illegible] আমার কাছে [illegible]। [illegible]

ভালোবাসলাম পারুলকে। এ প্রেমে-পড়ার প্রথম দিন বলে কিছু নেই। একটু একটু করে নিজের অজান্তে কবে ভালোবেসে ফেলেছি পারুলকে। তখন যদি মনের গতি দেখে আমি সতর্ক হতাম, মনকে শাসন করতাম, তা হলে ওকে না পাওয়ার যন্ত্রণা সহ্য করতে হ'ত না। কিন্তু তখন আমি বুঝেও বুঝতে পারিনি আমার মনের গতি। সেই সাধারণ ভালোলাগা যে অসাধারণ ভালোবাসায় পরিণত হবে তা কি আমি জানতাম।

বেশ চলেছিল আমাদের গোপন প্রেমে ভরা জীবন। হঠাৎ একদিন শুনলাম পারুলের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। বুকটা হুহু করতে লাগল। পারুল, আমার পারুল! কিন্তু না, ওই পারুল আমার কেউ নয়। আমাদের এত ভালোবাসার কোন সামাজিক মর্যাদা নেই। কেউ বুঝবে না আমার হৃদয়ে পারুল কতখানি।

পারুলের বিয়ে শুনে পর্যন্ত পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি। ওর সঙ্গে দেখা করতে চাইতাম না। কিন্তু পারুলের সঙ্গে দেখা না করে থাকতে পারিনি।

বললাম অত্যন্ত সহজ ভাবে—

"পারুল, তোমার বিয়ে ?"

—বলে আমি হাসলাম। বুঝতে পারলাম আমার হাসিটা ভাঙাভাঙা হচ্ছে।

পারুল বলল—

"শুনেছ তো! আর সেইজন্যই এড়িয়ে চলছ।"

তারপর একটু থেমে বলল—

"এখন থেকে ভুলতে শুরু করলে ?"

পারুলের কথায় চোখে অভিমান ফুটে উঠল। আমার এত দুঃখেও হাসি পেয়েছিল। ওর ওই অভিমান আমার কত পরিচিত! আর কি আশ্চর্য, পারুল যখন অভিমান করে তখন ওর প্রতি আমার মন খুব দুর্বল হয়ে পড়ে।

বললাম—,

"তোমাকে যে আমি ভুলতে পারব না, তা তুমি জানই।"

"জানি। তবু বলছি—"

"ওটা তা হলে তোমার কথার বিলাস।"

পরিহাসের সুরে বললাম। বুঝলাম আমার এই উক্তিতে পারুলকে প্রচ্ছন্ন-ভাবে একটু খোঁটা দেওয়া হ'ল। তবু কথাটা বলে বেশ তৃপ্তি অনুভব করলাম।

সত্যি, পারুল আমার পর হয়ে যাবে। এতে ওর ও আমার কিছু করবার ছিল না। যা করবার ছিল তা হ'ল দুজনের নিষ্ফল চোখের জল ফেলা। সেদিন পারুলকে অনেক পদ্মফুল এনে দি'য়েছিলাম।

বললাম—

"আর কখনও হয়ত তোমাকে ফুল দেবো না। এই শেষবারের মত দিচ্ছি।"

"কেন, আবার যখন আমি আসব তখন দেবে না ?"

"কি জানি!"

কিছু না ভেবেই বললাম। তারপর বললাম—

"তোমাকে আজ তোমার প্রিয় রক্ত-গোলাপ দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমার প্রিয় শ্বেতপদ্মই তোমাকে দিলাম—মানে দিতে ইচ্ছা হ'ল।"

"বেশ, আমিও আজ আমার প্রিয় ফুল তোমাকে দেবো।"

পারুল ওদের বাড়ীর বাগান থেকে দুটো আধফোটা রক্ত-গোলাপ তুলে আমায় দিয়েছিল। আমি পারুলকে অনেকবার ফুল দিয়েছি। পারুল আমাকে এই প্রথম ফুল দিল। আমি দুদিন ধরে ওই দুটো গোলাপ পকেটে নিয়ে ঘুরেছি। সকলকে লুকিয়ে বার বার আঘ্রাণ করেছি, ঠোঁটে ঠেকিয়েছি—পারুলকেই যেন অনুভব করতে চেয়েছি গোলাপ দুটোর মধ্যে। শুকনো পাপড়িগুলো সংগোপনে রেখে দিতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছি। মনকে বুঝিয়েছি, 'মায়া, সব মায়া'।

পদ্মফুল আমি ভীষণ ভালবাসি, বিশেষ করে শ্বেতপদ্ম। পদ্মফুলে একটা স্নিগ্ধ মাধুর্য আছে। আবার এই স্নিগ্ধতায় কেমন মহিমময় গভীরতার আবেশ জড়ান। পারুলের সুন্দর মুখটাও পদ্মকুঁড়ির মতো সুন্দর লাগে। পারুল কত কোমল হৃদয়ের, শান্ত প্রকৃতির মেয়ে। মনে হয় যা-কিছু নম্র তা-ই পারুল বেশী ভালোবাসবে। তবু পারুল উদ্ধত রক্ত-গোলাপকে পদ্মের থেকে বেশী ভালবাসে। ও যদি শ্বেতপদ্ম সবচেয়ে বেশী ভালোবাসত তবেই যেন মানাত। রক্ত-গোলাপকে ভালোবাসা মন্দিরার মতো উজ্জ্বল মেয়েদের মানায়।

এই রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে মন্দিরার কথাও খুব মনে পড়ে। আমার কলেজ-জীবনের বান্ধবী। ওকে আবিষ্কার করতে আমার একটুও সময় লাগেনি। পারুলের বিয়ে হয়ে যাবার পর থেকে আমি দিন দিন নৈরাশ্যের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলাম। আমার মনের পক্ষে তখন মন্দিরার মতো প্রাণচঞ্চল একজনকে প্রয়োজন ছিল। শুধু ওর উচ্ছ্বসিত হাসি থেকেই আনন্দের সুর ঝরত না। মন্দিরার ভাবভঙ্গী এমন কি তাকানোর মধ্যেও খুশীর আমেজ ছড়ানো ছিল। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল ওর দুটো চোখ। কালো প্রজাপতি যেমন ফুলের ওপর বসে থর থর করে ডানা কাঁপায় তেমনি মন্দিরার চোখের পাঁজরে আনন্দ

যেন ধর ধর করে কাঁপে। আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর আমরা দুজনে প্রায়ই গঙ্গার ধারে বসে থাকতাম। এমনি কোন একদিন হঠাৎ উড়ে-আসা কয়েকটা প্রজাপতি দেখে, মন্দিরা আমায় একটা প্রজাপতি ধরতে বলেছিল কৌতুক করে। আমি বলেছিলাম—

"একটা কেন, আমি এখুনি দুটো প্রজাপতি ধরতে পারি।"

"দেখি তবে—"

আমি হাসতে হাসতে ওর দুটো চোখ স্পর্শ করেছিলাম। মন্দিরা হাসির ঝংকার ছড়িয়ে আমাকে মুগ্ধ করে বলেছিল—

"এ প্রজাপতি দুটো হাত দিয়ে ধরা যায় না, দীপঙ্কর।"

কয়েকটা বছর মন্দিরার সান্নিধ্যে আশ্চর্য খুশীতে কেটে গেছে। সে সব দিন স্বপ্নের মতো মধুর। এবং আমার মধ্যেকার কত কিছু বার বার করে ভাবি। ভাবতে বড় সুখ লাগে। আমাকে অনেক গান শুনিয়েছে মন্দিরা। সে-সব গানের কত কলি মনে পড়ে যায়। রোগশয্যায় চুপচাপ শুয়ে থাকতে থাকতে মন্দিরার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, হাসি শুনতে পাই। মন্দিরা আমার মনের দর্পণে একটা দীপ্ত ছবি। ওকে ভাবতে গেলে মনে ভেসে ওঠে একটি হাস্যোজ্জ্বল মেয়ে; যে প্রাণ ঢেলে রবীন্দ্রসংগীত গায়, বাক্যনৈপুণ্যে যে অদ্বিতীয়া। মন্দিরার সব-কিছুতে তীব্র প্রাচুর্য আছে। ও রক্ত-গোলাপ খুব ভালোবাসে। ওটাই মন্দিরাকে মানায়। আমি ওকে অনেকবার রক্ত-গোলাপ উপহার দিয়েছি। রক্ত-গোলাপের মধ্যে যেন ওর প্রাণের রঙ ধরা পড়েছে। [illegible] ভালোবাসি বলে মন্দিরা আমায় পরিহাস করত। বস্তুত, আমার মত নির্জীব মানুষের পক্ষে ওটাই স্বাভাবিক। ও আমার শান্ত রূপটা ঠিক মেনে নিতে পারত না। উদ্দাম আমাকে চাইত। কিন্তু আমি উদ্দাম হতে পারিনি, বেপরোয়া হতে পারিনি। শুধু দুচোখ মেলে দেখেছি বেপরোয়া মন্দিরাকে।

মন্দিরার আর একটা রূপও আমি চিনেছি, অনেক পরে। আমার অসুখ হবার পর থেকে অনেকবার মন্দিরা আমাকে দেখতে এসেছে। সেই সূত্রেই আমি মন্দিরার হৃদয়ের গভীরতা দেখতে পেয়েছি। ওকে প্রিয়া হিসাবে জানতাম। ও প্রেয়সী হয়ে আমার মনে জীবন তৃষার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এখন মন্দিরা স্নেহময়ী কল্যাণী মূর্তি নিয়ে আমার কাছে আসে। বুকটা পরিতৃপ্তিতে ভরে দিয়ে যায় স্নেহের প্রসাদে। মন্দিরার মধ্যে এতখানি কোমলতা আছে আগে কখনও জানিনি, বুঝিনি। আগে ওর চোখ দুটো শুধু প্রজাপতির মতো আনন্দোজ্জ্বল লাগত। এখন ওর চোখ দুটো প্রদীপের মত সুন্দর লাগে। কিন্তু প্রদীপের সৌন্দর্য বলতে কি বোঝায় ম্লানতা, বিষণ্ণতা, না স্নিগ্ধতা! হয়ত সব কটাই। মন্দিরার ওই চোখ দেখবার আগে কখনও জানিনি চোখ এত সুন্দর হয়। ও যখন চুপচাপ আমার রোগশয্যার একপাশে বসে থাকে তখন ওকে রাফায়েলের জীবন্ত ম্যাডোনা বলে মনে হয়।

অবশ্য মন্দিরা যে আগের মত হাসে না, তা নয়। মন্দিরা এখনও হাসে, এখনও চপল হয়। আমাকে গান শোনায়। কিন্তু মন্দিরা এখন গম্ভীর হয়—ওর হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ নিঙড়ে আমার দিকে তাকায়। মন্দিরা কথায় দৃষ্টিতে ভঙ্গীতে আমাকে ভালোবাসা জানায়। সুযোগ হলে কখনও কখনও আমাকে আদর করে। ও মাঝে মাঝে আমার সামনেই কেঁদে ফেলে। ওর প্রিয়তম যে বাঁচবে না! অবশ্য মন্দিরা আমার সামনে কাঁদতে চায় না, বিষণ্ণ হতে চায় না। ও আমাকে হাসিতে ভরিয়ে রাখতে চায়। আমার কষ্ট হয় মন্দিরার জন্য। আমি ওকে বলি—

"তুমি বিয়ে করবে তো?"

মন্দিরা আমার কথা শুনে খুব হাসে, বলে—

"আচ্ছা, আচ্ছা, করব এখন।"

মন্দিরা কি করবে শেষ পর্যন্ত, আমি বুঝে উঠতে পারি না। আমি ও-সব ভাবতেও চাই না।

আজ মন্দিরা এসেছিল। ও একা আসেনি। ওর সঙ্গে আমার পুরানো বন্ধুরা এসেছিল। আমার খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু মন্দিরা আজ আমায় পদ্মফুল উপহার দিয়ে গেল কেন? ও এর আগে আমাকে রক্ত-গোলাপ দিয়েছিল কয়েকবার। আমি পদ্মফুল ভালোবাসি বলেই কি পদ্মফুল দিয়েছে! অথবা পদ্মফুলে আমি যে গভীর প্রশান্তি দেখি, সেটা ও মেনে নিয়েছে! অর্থাৎ ও আমাকে প্রশান্তির পথে এগিয়ে যেতে দিচ্ছে! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, ও যদি আমায় রক্ত-গোলাপ দিত, তা হলে ভালো হ'ত।

পারুল প্রায়ই আমায় দেখতে আসে। মাঝে মাঝে আমার টেবিলের ফুলদানিতে শ্বেতপদ্ম রেখে দিয়ে যায়। কিন্তু আমার মন পারুলের কাছ থেকে রক্ত-গোলাপ পেতে চায়।

একদিন পারুলকে বলেছিলাম—

"তুমি আমায় তোমার প্রিয় রক্ত-গোলাপ না দিয়ে, শ্বেতপদ্ম দাও কেন?"

"শ্বেতপদ্ম যে তোমার প্রিয়!"

"আমার যে প্রিয় না!"

ও হয়ত বলতে পারল না—সুন্দর-পূজারী আমাকে খুশী করবার জন্য আমার প্রিয় ফুল আমাকে উপহার দেয়। পারুল একটু হাসল। তারপর বলল—

"তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কি ?"

"তুমি অসুস্থ, তোমাকে রক্ত-গোলাপ দেওয়া উচিত নয়। রঙটা বড় চড়া যে ;"

পারুলের এই কথায় প্রবল প্রতিবাদ করতে ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু না, প্রতিবাদ করে লাভ কি ? মন্দিরাও অবশেষে আমাকে পদ্মফুল উপহার দিয়েছে। আমার ইচ্ছা হয়েছিল মন্দিরাকে জিজ্ঞাসা করি, "কেন আমায় পদ্মফুল দিলে ? কেন রক্ত-গোলাপ দিলে না ?" কিন্তু মন্দিরাও পারুলের মত একই উত্তর দেবে নিশ্চয়, এই ভেবে আমি ওকে কোন প্রশ্ন করিনি।

আমি আমার অজান্তে কখন রক্ত-গোলাপকে ভালোবেসেফেলেছি। আমি ওদের জানাতে পারিনি, এখন আমি পদ্মের চেয়ে গোলাপকে বেশী ভালোবাসি। ওদের জানাতে পারিনি আমি অসুস্থ হলেও গোলাপের রক্তিমতা আমাকে আনন্দ দেবে।

এখন প্রকৃতির রাজ্যে বসন্তের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। একদিকে পাতা ঝরে যাচ্ছে, অপরদিকে নতুন পাতায় ভরে উঠছে গাছেরা। আমি ঝরে যেতে চাই না। আমি গাছের ডালে নতুন পাতার মত, এই পৃথিবীতে আবার নতুন করে বেঁচে উঠতে চাই। আমি পৃথিবীকে ভালোবাসি।

পারুল ! মন্দিরা ! তোমরা জানো না, আমিও তোমাদের মত এখন রক্ত-গোলাপকে ভালোবাসি। আমার মনে আজ তাজা রক্তের স্বপ্ন জেগেছে। আমি উজ্জ্বল হয়ে উঠতে চাই। রক্ত-গোলাপ আমার মনে প্রাণপ্রাচুর্যের পিপাসা জাগায়। আমার দেহের স্তরে স্তরে রক্ত-গোলাপের মতো তাজা রক্তের প্রবাহ আমি কামনা করি। আমি এই সুন্দর পৃথিবীতে রক্ত-গোলাপের মত উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠতে চাই। মন্দিরার মত একটি জীবন্ত রক্ত-গোলাপের হাত ধরে আমি বাঁচতে চাই।

কোলাহল থেকে কিছু দূরে

—শ্রীপরেশ সাহা

মৃত দূরেই যাই
মন ফিরে চায়
ঘরে ফেরার দিন মোর
আজো হয় নাই,
এই অবেলায়
শুধু লিখে যাই
রূপসী বাংলার কথা
পাণ্ডুলিপিকায়।

অস্তগামী স্তব্ধতায়
প্রেরণা যোগায়
আমার মনের কথা
চুপিসারে চায়।
ধূমালী আকাশের গাঁয়
পূর্বাভাস পাই
ঐ দূর মরুর শিখায়
তাই লিখে যাই।

গীতার্থ-সন্ধানে

—শ্রীখগেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত

—পঞ্চম পরিচ্ছেদ—

(কর্মযোগ)

মানুষের জীবন কর্মময়। স্বভাবজাত কামনা ও বাসনা দ্বারা চালিত হইয়াই মানুষ কর্মে নিযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কর্ম করিলেই যে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। যদি বাঞ্ছিত ফল লাভ না হয় তবে দুঃখ উপস্থিত হয়, আর যদি ফল লাভ হয় তাহা হইলেও মানুষ হয়তো তাহাতেই মত্ত হইয়া মনুষ্যজীবনের কর্তব্যাকর্তব্যের প্রতি দৃষ্টিহীন হয় আর স্বকীয় কর্মক্ষমতা বা শক্তিমত্তার অতিমাত্র আস্থাশীল হইয়া অহংকারবুদ্ধিকে আরও দৃঢ় করে। শাস্ত্র বলিতেছেন, ফলাসক্তি লইয়া জীব যে কোন কর্মই করুক না কেন তাহাই তাহার ইহ ও পরজন্মের বন্ধনের হেতু হয়। কর্মের ফল—তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক, মানুষকে তাহা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে—ভোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উহার হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই—"নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম।"

জীবনে আমরা বহু কর্ম করিয়া বহু ফল সঞ্চয় করিতেছি। এক জন্মের কর্মফল সেই জন্মেই ভোগ করিয়া শেষ করা যায় না। অভুক্ত কর্মফল পরজন্মের জন্য সঞ্চিত থাকে। আমরা বর্তমান জীবনে যে-সকল কর্মফল ভোগ করিতেছি তন্মধ্যে পূর্ব পূর্ব জন্মের বহু সঞ্চিত ফলও রহিয়াছে। উহার কতক এই জন্মে ভোগ হইয়া শেষ হইয়া যাইতেছে এবং অবশিষ্টগুলি পরজন্মের জন্য সঞ্চিত থাকিয়া যাইতেছে ও সেই সঙ্গে আবার বর্তমান জীবনের অভুক্ত কর্মফল যোগ হইতেছে। এইরূপে কর্মফলের বোঝা ক্রমেই ভারী হইয়া [illegible]

আমরা এইরূপ কর্মফল সঞ্চয় করিতে থাকি তবে কোনকালেই এই ভোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। আর ভোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত 'জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষ'ময় সংসারে আমাদের গতি ও অগতির নিবৃত্তি হইবে না—"পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্" চলিতেই থাকিবে। আর ভোগের শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরমপুরুষার্থ লাভের আকাঙ্ক্ষাও জাগ্রত হইবে না—সেদিকে দৃষ্টিই পড়িবে না। তবে কর্তব্য কি?

কর্মমাত্রই যখন দোষাবহ তখন সর্বপ্রকার কর্ম পরিত্যাগ করাই নিরাপদ, ইহাই মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহাও তো সম্ভব নয়। কারণ দেহধারী জীবের পক্ষে সর্বকর্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্র অবস্থান করাও সম্ভব নয়—"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ" (৩।৫)। চক্ষু আছে সে দেখিবেই, কর্ণ আছে সে শুনিবেই, নাসিকা আছে সে ঘ্রাণ লইবেই। এইরূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয় নিজ নিজ কার্য করিবেই। আর শারীর যাত্রা নির্বাহের জন্যও কর্ম না করিয়া উপায় নাই—"শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ।" (৩।৮)। সুতরাং দেহধারীর পক্ষে আত্যন্তিক কর্মত্যাগ সম্ভব নহে—"ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ" (১৮।১১)। কিন্তু

আমরা দেখিয়াছি কর্ম করিলেই কর্মফলে আসক্তিনিবন্ধন উহা বন্ধনের সৃষ্টি করিয়া জীবকে বারবার দুঃখময় সংসার ভোগ করাইবে ও ক্রমে তাহাকে বিনাশের পথে লইয়া যাইবে—"ফলে সক্তো নিবধ্যতে"। (৫।১২)। তাহা হইলে উপায় কি? কি উপায়ে এই বন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ করা সম্ভব? এই উপায় নির্দেশ করিতে গিয়া শ্রীভগবান কর্মযোগের উপদেশ দিলেন। বলিলেন, যদি ফলভোগরূপ বন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে চাও তবে 'কর্মযোগ' অবলম্বন কর। কর্মযোগই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের কৌশল—"যোগঃ কর্মসু কৌশলম্"। (২।৫০)। এই কৌশল অবলম্বন করিয়া কর্ম করিয়া যাও, কোন কর্মই বন্ধনের হেতু হইবে না।

কর্মযোগের আলোচনায় প্রবেশ করিবার পূর্বে গীতায় ব্যবহৃত 'যোগ' শব্দটির তাৎপর্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। এই শব্দটি গীতায় বহু স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু সর্বত্র একই অর্থে উহা ব্যবহার করা হয় নাই। 'যোগ' শব্দটার মৌলিক অর্থ যোজনা বা সংযোগ। পরমার্থ-প্রসঙ্গে ভগবৎ-বস্তুর সঙ্গে যে সংযোগ তাহাকেই 'যোগ' বলা হয়। এই সংযোগ স্থাপন করিতে হইলে চিত্তবৃত্তিকে অন্যান্য বা বিষয়বস্তু হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া একমাত্র সেই পরমাত্মবস্তুতেই স্থাপন করিতে হয়। পাতঞ্জল শাস্ত্র বলিয়াছেন, "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"। আমাদের চিত্ত সর্বদা বিষয় চিন্তাতেই চঞ্চল। এই চঞ্চলতা থাকিতে উহা ভগবৎ-বস্তুতে সংলগ্ন হইতে পারে না। চঞ্চল চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করিয়া একমাত্র পরম বস্তুতে সংলগ্ন করিবার নামই যোগ। কিন্তু চিত্তের এই চঞ্চলতা কোথা হইতে [illegible]

কামনা-বাসনা হইতেই এই চঞ্চলতার উদ্ভব। চিত্তবৃত্তি সংকল্প-বিকল্পাত্মক। বিষয়ের সম্যক্ কল্পনা বা চিন্তার নামই সংকল্প। এই সংকল্প বা বিষয়-চিন্তা হইতেই বিষয় লাভের ইচ্ছা বা কামনার উদ্ভব হয়—"সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামান্" (৬।২৪)। কামনা-বাসনা-রহিত হইলেই জীব সর্বাবস্থায় চঞ্চলতা বর্জিত হইতে পারে—তখনই সে যোগ লাভের উপযুক্ত হইতে পারে। গীতা বলিতেছেন—"সমত্বং যোগ উচ্যতে" (২।৪৮)। কামনা ও বাসনা দূরীভূত হইলেই জীব সর্বাবস্থায় 'সমত্ব' রক্ষা করিয়া চলিতে পারে অর্থাৎ কাম্যফল প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি উভয় অবস্থাতেই তাহার চিত্ত স্থির ও অচঞ্চল রাখিতে পারে। চিত্তের এই প্রকার অচঞ্চল অবস্থা লাভ হইলেই উহাকে পরমবস্তুতে বা ভগবানে সংযুক্ত করা সম্ভব হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কামনা-বাসনা রাহিত্য যাহাকে গীতা 'সন্ন্যাস' আখ্যা দিয়াছেন তাহাই যোগের মূল ভিত্তি।

"যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং
বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি
কশ্চন॥" (৬।২)

এই যোগ বা ভগবদ্‌বস্তুর সহিত সংযোগসাধনের জন্য যে-সকল উপায় বা সাধনপ্রণালী অবলম্বন করা হয় তাহাকেও 'যোগ' নামে অভিহিত করা হয়। বিভিন্ন মতানুসারে বিভিন্ন প্রকার উপায় অবলম্বনে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি প্রধানতঃ এই তিনটি উপায়। সর্বপ্রকার কামনা-বাসনা-বর্জিত হইয়া অর্থাৎ কর্মের সফলতা ও বিফলতায় চিত্তকে সমানভাবে স্থির রাখিয়া অনাসক্তভাবে কর্ম করিবার নাম 'কর্মযোগ'। গীতা প্রধানতঃ কর্মযোগ অর্থেই 'যোগ' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে প্রায় সর্বত্র এই অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। কর্মযোগীকে 'যোগী', 'যুক্ত', 'যোগযুক্ত' ইত্যাদি শব্দদ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। তবে স্থলবিশেষে 'যোগ' শব্দদ্বারা পাতঞ্জল শাস্ত্রোক্ত 'যোগ'কেও নির্দেশ করা হইয়াছে। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই যোগের বিষয় বিবৃত হইয়াছে এবং ইহাকে 'ধ্যানযোগ' বা 'অভ্যাসযোগ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবানের বিভূতি ও যোগের উল্লেখ আছে। সেখানে 'যোগ' শব্দ দ্বারা সৃষ্টির সহিত ভগবানের সংযোগ-সূত্ররূপী যোগৈশ্বর্যকে বুঝাইয়াছে অথবা যে শক্তি-প্রভাবে ঈশ্বর হইতে জগতের প্রকাশ সেই পরমেশ্বরী শক্তিকে নির্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং বক্তব্য বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষি অনুযায়ী গীতার উক্ত 'যোগ' শব্দের তাৎপর্য বুঝিতে হইবে।

ভগবদ্‌বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হইবার প্রধানতঃ তিনটী উপায় গীতা নির্দেশ করিয়াছেন—(১) কর্মযোগ (২) জ্ঞানযোগ ও (৩) ভক্তিযোগ—অর্থাৎ কর্মরূপ উপায়, জ্ঞানরূপ উপায় ও ভক্তিরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া পরমবস্তুর সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়। মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিকে প্রধানতঃ তিনটী ভাগে বিভক্ত করা যায় (১) চিন্তাশীলতা, (২) ভাবপ্রবণতা বা রসানুরক্তি ও (৩) কর্মোন্মুখতা।

প্রত্যেকের মধ্যেই এই তিনটী ভাব বর্তমান আছে। প্রকৃতিভেদে ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে ইহাদের কোন একটী ভাব হয়তো প্রবল দেখা যায় ও অপর দুইটি অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ থাকে। স্বাভাবিকভাবে কেহ বা প্রধানতঃ চিন্তাশীল, কেহ বা ভাবপ্রবণ, আবার কেহ বা কর্মপ্রবণ। মানব-প্রকৃতির এই ত্রিবিধতার [illegible] লক্ষ্য করিয়াই অধিকারিভেদে এই তিন প্রকার যোগের বিধান দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা স্বভাবতঃ চিন্তাশীল তাঁহারা জ্ঞানযোগ, যাঁহারা ভাবপ্রবণ তাঁহারা ভক্তিযোগ ও যাঁহারা কর্মপ্রবণ তাঁহারা কর্মযোগ অবলম্বন করিবেন। চিন্তাশীলতা ও ভাবপ্রবণতার প্রকাশ অনেকের মধ্যেই পরিস্ফুট না থাকিতে পারে, কিন্তু কর্মশীলতার প্রকাশ প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু আছেই। কর্ম না করিয়া কেহই থাকিতে পারে না। কাজেই মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাবগত এই কর্মপ্রবৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া কি উপায়ে পরমবস্তুর সহিত যুক্ত হওয়া সম্ভব তাহাই গীতাশাস্ত্র বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, আর এই উপায়ের নামই 'কর্মযোগ'। জীবজগতে প্রত্যেকের নিকটেই ইহার বিশেষ উপযোগিতা রহিয়াছে।

এই কর্মযোগ কি তাহা এখন আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। কর্মযোগের মূলকথা ফলাসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমান বর্জিত হইয়া কর্ম করা। আমাদের সমস্ত কর্মই আমরা ফলাসক্তিযুক্ত হইয়া অর্থাৎ কোন ফললাভের আশায় এবং কর্তৃত্বাভিমান লইয়া অর্থাৎ 'আমিই এই কর্মের কর্তা' এই বুদ্ধি লইয়া করিয়া থাকি। এই ভাব ও বুদ্ধিই আমাদের বন্ধনের হেতু। আমরা যখন কোন কর্ম করিতে যাই তখন নিজ নিজ বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়াই কর্মে প্রবৃত্ত হই। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিই আমাদের সকল কর্মের প্রবর্তক। এই বুদ্ধি কিন্তু সকল সময়ে বা সর্বজীবে একরূপ হয় না। একই অবস্থায় পড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই ব্যক্তি অথবা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া থাকে। নির্বিকল্প [illegible]

অবস্থায় পড়িয়া যে বুদ্ধি স্থির করিবে ও যেরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হইবে, একজন সুনিয়ন্ত্রিত মহাত্মা অবস্থায় ভিন্ন বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া ভিন্নরূপ কার্যে ব্রতী হইবে। ইহা আমরা নিত্যই প্রত্যক্ষ করিতেছি। অপরের অজ্ঞতা, সরলতা বা দুর্বলতার সুযোগ লইয়া কেহ বা তাহার সর্বনাশ সাধন করিয়া নিজ স্বার্থপূরণের চেষ্টা করিতেছে, আবার কেহ বা তাহার অসহায় অবস্থা দেখিয়া করুণা-পরবশ হইয়া নিজ স্বার্থ বিসর্জন দিয়াও সর্বতোভাবে তাহার মঙ্গলবিধানে যত্নবান হইতেছে। কাজেই বুদ্ধির পার্থক্য অবশ্যই রহিয়াছে। ইহার কারণ কি ? এ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ মনস্তত্ত্বের আলোচনা করা প্রয়োজন। বাহ্য বিষয়ের অনুভূতি আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া যখন অন্তরে প্রবেশ করে, তখন মন উহা বুদ্ধির নিকট উপস্থিত করে। বুদ্ধি তখন উহার স্বরূপ অবধারণ করে; উহা ত্যাজ্য কি গ্রাহ্য তাহা নিরূপণ করে ও সমস্ত বিচার করিয়া কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করে। নির্ধারিত কর্তব্যানুসারী কার্যসাধনের জন্য মন তখন উপযুক্ত কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে নিয়োগ করিয়া থাকে। এই অবস্থায় কর্ম আরম্ভ হয়। বুদ্ধির কার্য ঘটনা-পরম্পরা বিচার করিয়া কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করা। বুদ্ধি-বৃত্তির এই কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণাত্মক কার্যকে শাস্ত্রে 'ব্যবসায়' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই জন্য বুদ্ধিকে 'ব্যবসায়াত্মিকা' বা 'নিশ্চয়াত্মিকা' বুদ্ধি বলা হয়। কোন ঘটনা-পরম্পরা উপস্থিত হইলে স্বরূপতঃ শুদ্ধ ও নির্মল বুদ্ধি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবেই উহার বিচার করিয়া কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করিয়া থাকে। বাহিরের কোন প্রভাব এই বুদ্ধির উপর ক্রিয়া করিতে পারে না। [illegible] এই বুদ্ধিবৃত্তি উহার স্বরূপ শুদ্ধ [illegible] অবস্থায় সর্বদা স্থির থাকিতে পারে না। মানুষের অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় বুদ্ধিও একটি বৃত্তি এবং উহাও অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় সংস্কার, সংসর্গাদি দোষে নানা প্রকারে দূষিত হয়। এই বুদ্ধি বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি যখন ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন উহা স্বরূপ শুদ্ধ অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। বাসনাদ্বারা এইরূপে বিকৃত বুদ্ধিকে 'বাসনাত্মিকা' বুদ্ধি বলা হয়। যাহার যেরূপ স্বভাবগত বাসনা, যাহার চিত্ত যেরূপ বাসনায় রঞ্জিত, তাহার বুদ্ধি সেইরূপ বাসনা পূরণোপযোগী বিচার করিয়া থাকে। শুদ্ধা বুদ্ধির ন্যায় একটি নিশ্চয় বা স্থির বুদ্ধি উহার নাই। বাসনাদ্বারা প্রভাবিত মলিন চিত্তের বুদ্ধি বাসনার প্রকারভেদে বহু প্রকার হইয়া থাকে—"বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্।" (২।৪১)। অব্যবসায়ী অর্থাৎ যাহাদের বুদ্ধির স্থিরতা নাই; যাহারা নানারূপ কামনা-বাসনা দ্বারা চালিত, তাহাদের বুদ্ধি কামনা-বাসনার প্রকারভেদে নানা প্রকার হইয়া থাকে। কোন বিশেষ ঘটনার সমাবেশে একই ব্যক্তির বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বা বিভিন্ন ব্যক্তির বুদ্ধি একই সময়ে কামনা-বাসনাদির তারতম্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ বিচার অবলম্বন করিয়া মানুষকে তদনুযায়ী কার্যে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে।

কর্মযোগে শুদ্ধা বুদ্ধির প্রয়োজন; বাসনাত্মিকা বুদ্ধির স্থান এখানে নাই। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।" (২।৪১)। 'ইহ' অর্থাৎ এই কর্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্থাৎ যে বুদ্ধির কার্য কর্তব্যাকর্তব্য নিশ্চয় করা, তাহা একই প্রকার বিচারযুক্ত, একমুখী; কামনা-বাসনা দ্বারা বিকৃত হইয়া উহা বহুমুখী বা বহু প্রকার বিচারযুক্ত হয়। কর্ম-যোগে শুদ্ধা বুদ্ধিকেই আশ্রয় করিতে হইবে। এজন্য কর্মযোগকে "বুদ্ধিযোগ" নামেও নির্দেশ করা হইয়াছে। কামনা-বাসনা দ্বারা যাহাদের বুদ্ধি মলিন হইয়াছে তাহারা সেই সকল কামনা-বাসনা পূরণোপযোগী ফলপ্রাপ্তির আশায় কর্মে প্রবৃত্ত হয়—তাহাদিগকে কৃপণ, ক্ষুদ্রচেতা, হীনাশয় বলা হইয়াছে—"কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।" (২।৪৯)। হে অর্জুন তুমি ঐরূপ হইতে যাইও না। তুমি শুদ্ধা বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া কর্মযোগপরায়ণ হও—"বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ" (২।৪৯)। তুমি ফলপ্রাপ্তির আশায় কর্ম করিতে যাইও না। তাহা হইলেই তুমি শান্তির অধিকারী হইতে পারিবে—

"বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্
পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধি-
গচ্ছতি॥" (২।৭১)

শুদ্ধা বুদ্ধি কামনা-বাসনা দ্বারা প্রভাবিত নহে; সুতরাং উহা কোন বিশেষ ফললাভের জন্য কর্মের প্রবৃত্তি দেয় না—কর্মটা করণীয়, এই বিচার হইতেই উহা সম্পাদনের প্রবৃত্তি দিয়া থাকে। সুতরাং ঐ কর্মের ফল যাহাই আসুক না কেন, শুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত পুরুষের চিত্তকে উহা চঞ্চল করিতে পারে না—কারণ উহাতে সে আসক্ত নয়; ফলের দিকে দৃষ্টি দিয়া উহা পাইবার আশায় সে কর্ম করে নাই। এই প্রকার কর্ম যাহা পুরুষের চিত্তকে সর্বাবস্থায় সমত্বে রক্ষা করে, কার্যের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিহেতু যাহা চিত্তকে সুখ-দুঃখাদি দ্বারা আলোড়িত করে না, তাহারই নাম কর্মযোগ—সমত্ব রক্ষাই এই যোগের লক্ষণ—"সমত্বং যোগ উচ্যতে।" (২।৪৮)।

কর্মযোগীর ফলাসক্তি নাই বলিয়া তিনি স্থিরচিত্ত, সমত্ব অবলম্বনে [illegible]

প্রাকৃতিক নিয়মে কৃতকর্মের ফল যাহাই আসুক না কেন তাহাতে তিনি অচঞ্চল, ফলভোগে তৃষ্ণাবর্জিত। ভোগতৃষ্ণা না থাকিলে কর্মফল বন্ধনের হেতু হইতে পারে না। সুতরাং ঐরূপ কর্ম বারংবার জন্ম পরিগ্রহেরও কারণ হয় না। পরন্তু উহা পরমশান্তিময় অবস্থা লাভেরই কারণ হইয়া থাকে—"জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্।" (২।৫১)।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ সকাম কর্মের যে দোষ তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিবার পক্ষে কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ উপায়। এই পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে অভ্যাস করিলে মৃত্যুময় সংসারসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়। এমন কি, এইরূপ কর্মের সামান্যমাত্র অনুষ্ঠানও বৃথা যায় না, উহাও জীবকে ক্রমে উচ্চতর ভূমিতে উন্নীত করিয়া পরিশেষে তাহাকে ঘোর সংসারাবর্তরূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকে—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" (২।৪০)।

জীব কর্ম করিতে পারে বটে, কিন্তু বিচার করিলে দেখা যাইবে কর্মের ফলাফল তাহার আয়ত্তাধীন নহে। কৃষক উত্তমরূপে ভূমি কর্ষণ করিয়া যথাসময়ে বীজ বপন করিতে পারে সত্য, কিন্তু ফলাফল কি হইবে তাহা সে বলিতে পারে না—উহা প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সুতরাং যে ফলের উপর মানুষের কোন অধিকার নাই তাহাতে আসক্ত হইয়া সুখদুঃখভাগী হওয়া অল্পবুদ্ধিরই পরিচায়ক। তাই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—হে অর্জুন, কেবলমাত্র কর্মেই তোমার অধিকার আছে, কর্মফলে তোমার কোন অধিকার নাই। সুতরাং কর্মফল প্রাপ্তির কামনা লইয়া কোন কর্ম করিতে যাইও না—দুঃখ পাইবে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মনে করিও না যে ফলাকাঙ্ক্ষাই যদি ত্যাগ করিতে হয় তবে আর কর্ম করিবার আবশ্যকতা কি? এইরূপ বিচার হইতে কর্মত্যাগ করিবার সংকল্প যেন তোমার মনে উপস্থিত না হয়। কারণ কর্ম তোমাকে করিতেই হইবে, উহা নিঃশেষে ত্যাগ করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া কর্ম কর—

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥" (২।৪৭)

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, নিষ্কাম কর্মযোগী, যিনি নিজের জন্য কিছুই চান না, তাহার সংসার-নির্বাহ কি উপায়ে হইবে। উত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, কর্মফলে আসক্তি না থাকিলেই যে কোন ফল আসিবে না তাহা নহে। কর্মমাত্রেরই ফল প্রাকৃতিক নিয়মে যাহা আসিবার তাহা আসিবেই—আসক্তি থাকিলেও আসিবে, না থাকিলেও আসিবে। উহা কাহারও প্রার্থনার অপেক্ষা রাখে না। ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া মানুষ লাভের মধ্যে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয় মাত্র—ফলপ্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি বিষয়ে উহা কিছুই সাহায্য করে না—প্রাকৃতিক নিয়মে যাহা হইবার তাহাই হয়। কর্মফল আসুক বা না আসুক অথবা যেভাবে ও যে আকারে আসুক না কেন, কর্মযোগী তাহাতে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ ও উদাসীন থাকেন এবং ফল উপস্থিত হইলে উহা নির্বিকারভাবেই ভোগ করিয়া থাকেন। গীতার উপদিষ্ট কর্মযোগ মানুষকে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী করে না—উহা তাহাকে একাধারে আদর্শ গৃহী ও মুক্ত পুরুষে পরিণত করে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন এই কর্মযোগ তিনি সূর্যকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সূর্য মনুকে এবং তৎপর মনু ইহা রাজর্ষি ইক্ষ্বাকুকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। অনন্তর বংশপরম্পরায় এই শিক্ষা রাজন্যবর্গের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কালক্রমে উহা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া আবার সেই পুরাতন বিদ্যা অর্জুনকে উপদেশ করিতেছেন (৪।১-৩)। জনকাদি রাজর্ষিগণ এই কর্মযোগ আচরণ করিয়াও রাজ্যভোগ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং কর্মযোগ অবলম্বন করিলেই যে সংসারযাত্রা নির্বাহ করা অসম্ভব হইবে তাহা নহে। অন্যপক্ষে কর্মযোগ যে মোক্ষপ্রদ, উহা অবলম্বন করিয়া যে পরমব্রহ্মপদও লাভ করা যায়, তাহাও গীতার সর্বত্র বলা হইয়াছে।

আলোর প্রহর

শৈলেন কুমার দত্ত

এতক্ষণ ধরে গাড়িটার যে বিশ্রী একটা আওয়াজ হচ্ছিল, এবার সেটা থামল। দেখলাম বিবর্ণ একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে রিক্সাটা দাঁড়াল। পিয়ার্সন সাহেব পকেট থেকে পয়সা বার করে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বললেন—নামুন। এটাই সেই হোম।

ব্যাগটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু সেই চার্চটা? আপনি যে বলেছিলেন হোমের সঙ্গে একটা চার্চ আছে।

—আছে, আছে। ভিতরে এলে সব পাবেন।

আগে আগে পিয়ার্সন সাহেব এগিয়ে চললেন, পিছনে আমি। পিয়ার্সন সাহেবের উপর আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। কোথাকার মানুষ উনি, আমিই বা কোথাকার! আত্মীয়তার নাম-গন্ধ নেই, বন্ধুও নন উনি। অথচ কি উপকারটা না করলেন আমার!

পিয়ার্সন সাহেবের সঙ্গে পরিচয় আমার এক ট্রিল-প্রমেনাডে। কথা [illegible]

দেখছিলেন, আর আমিও ছিলাম ওঁর কাছাকাছি। ছেলেবয়েস থেকেই সাদা রঙের উপর আমার কেমন যেন একটা আকর্ষণ ছিল—দেখলে, কথা না বলে থাকতে পারতাম না।

সেদিনেও ব্যতিক্রম হয়নি। আমিই উপযাচক হয়ে ধা; ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—What s the time ?

কোঁচকানো লাল চামড়ার মুখ থেকে কয়েকটা দাঁ বার করে হেসে পরিষ্কার বাংলায় উত্তর দিলেন উনি—সাতটা বশ।

অবাক্ হয়ে গেলাম। এত পরিষ্কার বাংলা বলতে পারেন উনি! ভদ্রলোক সম্পর্কে কৌতূহল বাড়ল বেশ। জিজ্ঞেস করলাম—উনি কোথায় থাকেন? এত সুন্দর বাংলা শিখলেন কি করে?

বেশ হাসিখুশি হয়েই ভদ্রলোক আমার সব কথার জবাব দিলেন। তারপর আমাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। শেষমেষে ওঁর বাড়িতে একদিন খাবার নিমন্ত্রণও হয়ে গেল। সেখানেই আমি ওঁকে একটা চাকরী করে দেবার অনুরোধ জানিয়েছিলাম।

উনি কথা দেননি। তবে বলেছিলেন চেষ্টা করবেন। সেই চেষ্টার ফলেই আজ ওঁর সঙ্গে এখানে এসেছি। চাকরী একটা বটে, তবে থাকতে পারলে। পিয়ার্সন সাহেব আমাকে আগেই বলেছিলেন—গিয়ে দেখুন, যদি কাজ করতে পারেন, বা ও পরিবেশ আপনার ভাল লাগে তবেই করবেন।

বেকার মানুষ, তার ওপর শিক্ষা-দীক্ষা কম। কাজেই সরাসরি বলে ফেললাম—ওসব পরিবেশ-টরিবেশ ঠিক মানিয়ে নেব।

পিয়ার্সন সাহেব আর কথা বলেন নি।

আমারই তাগিদে শেষ পর্যন্ত তাড়াতাড়ি এখানে আসার ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

—এই হ'ল আপনার কর্মক্ষেত্র, বুঝলেন? পিয়ার্সন সাহেবের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলাম।

ইতিমধ্যে পিছন পিছন এগিয়ে পিয়ার্সন সাহেবের সঙ্গে আমি একটা ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম। বেশ বড় ঘর।

কেমন যেন একটা বিষণ্ণতার ছাপ সর্বত্র। টেবিলে ঢাকা আচ্ছাদনীতে কয়েকটা বড় বড় ফুলকাটা। দেওয়ালে বড় বড় কয়েকটা ফটো—তার মধ্যে যীশুর ফটোটা সুন্দর। একপাশে একটা বড় র‍্যাকে থাক থাক বই—মলাট দেখে দূর থেকেই বুঝতে পারলাম বিদেশী বই—পেপার-ব্যাক এডিশন।

একটা চেয়ার টেনে আমাকে বসতে বললেন পিয়ার্সন সাহেব। তারপর সিগারেটটা ফেলে দিয়ে মিস্ প্যাট্রিক, মিস্ প্যাট্রিক বলতে বলতে পাশের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

ব্যাগটা টেবিলে রেখে একটা চেয়ারে বসলাম।

পাশের ঘরে রেডিওতে মৃদুস্বরে কি যেন একটা বিদেশী গান হচ্ছে। বসে বসে কি একটা যেন ভাবছিলাম পিয়ার্সন সাহেব ভেতরে ঢুকলেন। পিছনে এক ভদ্রমহিলা। ঘন নীল রঙের একটা গাউন, তার ওপর সাদা একটা এ্যাপ্রন বাঁধা। মাথায় ডোনাট করা চুল, গায়ের রং বেশ কালো।

পিয়ার্সন সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—ইনি মিস্ প্যাট্রিক, এখানকার নার্স। তারপর আমার দিকে দেখিয়ে ভদ্রমহিলাকে বললেন—ইনি মিঃ দত্ত, এখানকার নতুন সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট।

স্মিতহাস্যে ভদ্রমহিলা হাতজোড় করলেন। আমিও প্রত্যভিবাদন জানালাম। পিয়ার্সন সাহেব চেয়ার টেনে বসে আমাদের বসতে বললেন। আমরাও বসলাম।

কয়েক মিনিট নীরবতার পর পিয়ার্সন সাহেব বেশ গম্ভীর স্বরে আমাকে বললেন—আপনি আস্তে আস্তে কাজ দেখে নেবেন। কোনো প্রয়োজনে মিস্ প্যাট্রিকের সাহায্য নিতে পারেন।

—ও ইয়েস! মিস্ প্যাট্রিক চুলগুলো দুপাশে সরিয়ে আমার দিকে তাকালেন, তারপর বললেন—আপনি কি খেতে ভালবাসেন, চা, না কফি?

—কফি, কফি! আমি কিছু বলবার আগেই পিয়ার্সন সাহেব বলে দিলেন।

কয়েক মিনিট পরেই একজন বাবুর্চি ট্রেতে করে কয়েক কাপ কফি দিয়ে গেল। পিয়ার্সন সাহেবের নীরব নির্দেশে আমি একটা কাপ তুলে নিয়ে চিনি মেশালাম।

—এখানকার পরিবেশটা আপনার ভাল লাগবে তো? মিস্ প্যাট্রিক হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন।

—নিশ্চয়ই, অন্তত আমার তো তাই মনে হয়।

এ কথায় কোন কান না দিয়ে মিস্ প্যাট্রিক হাসলেন—বললেন, এখানে অনেকেই এসেছিলেন—কেউ থাকতে পারে নি কিনা।

—কেন? ভুতুড়ে বাড়ি নাকি? আমি বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম।

—না না ভুতুড়ে নয়, তবে বিস্ময়ের, পিয়ার্সন সাহেব আবার একটা সিগারেট ধরালেন।

—কি রকম? আমার বিস্ময় যেন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল।

পিয়ার্সন সাহেব থামিয়ে দিলেন—আরে থাকুন না ক'দিন, আস্তে আস্তে সব জানতে পারবেন।

মিস্ প্যাট্রিক এবার উঠে দাঁড়ালেন। পিয়ার্সন সাহেব ওঁকে বললেন—আপনি এঁকে ওপরের বড় ঘরটা দেখিয়ে দিন, উনি ও-ঘরেই থাকবেন।

—ঠিক আছে। আপনি আমার সঙ্গে আসুন। মিস্ প্যাট্রিক পথ দেখিয়ে চললেন আগে আগে। পিয়ার্সন সাহেবও দেখলাম আমাদের সঙ্গে সঙ্গে উঠে এলেন।

লাল কার্পেট পাতা সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় ডানদিকে হাত দেখিয়ে মিস্ প্যাট্রিক বললেন—ওটা চার্চ, খ্রীষ্টান রোগীদের উপাসনার জায়গা।

নিঃশব্দে চোখ ফিরিয়ে দেখলাম একটা সাদা ছোট লম্বা ঘর। দরজার ওপর বড় ক্রশটা না থাকলে চার্চ বলে মনেই হ'ত না।

ওপরে কয়েকটা সিঁড়ি ওঠবার পরই দেখলাম একটি ঘোমটা টানা বৌ চট করে ভিতরের দিকে চলে গেল। মিস প্যাট্রিক তারই দিকে এগিয়ে চললেন।

বিরাট একটা হলঘর। দু'পাশে গোটা-কুড়ি বিছানা পাতা। সব কটি বিছানাতেই দেখলাম একজন করে নারী শায়িতা।

ভিতরে গিয়ে মিস্ প্যাট্রিক ভাঙা গলায় বললেন—নমস্কার করুন, ইনি আমাদের নতুন সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট।

সকলেই হাত জোড় করলেন। দেখলাম কারও বা একটা হাত উঠল, কারও বা কোন হাতই উঠল না।

পিয়ার্সন সাহেব বললেন—এঁদের বেশীর ভাগই প্যারালাইজড্।

মিস্ প্যাট্রিক যথাসম্ভব আস্তে আস্তে ঘরটা পেরিয়ে গিয়ে একটা মাঝারি গোছের ঘরে ঢুকলেন, তারপর দু'হাত দিয়ে দরজার পর্দাটা টেনে দিয়ে বললেন—এইটি আপনার ঘর।

চারদিকে একবার করে চোখ বুলোলাম। এ ঘরেও প্রায় সেই ধরণের পরিবেশ। শুধু যীশুর ছবিটা নেই।

মিস্ প্যাট্রিক জানলার ধারে গিয়ে বললেন—আপনার থাকতে কোন অসুবিধে হবে না। দরকার পড়ি-

বেশ। জানলা দিয়ে দেখুন, কি বিউটিফুল সীনারি।

জানলা দিয়ে আলতোভাবে চোখ ফেরালাম। শীতের মৌসুমীফুলে ভরে আছে বাগানটি। দু'একটি মালী জল দিতে দিতে একবার আমার দিকে তাকাল।

পিয়ার্সন সাহেব আর একটা জানলা খুলে দিয়ে বললেন—হিয়ার ইজ এ্যানাদার ভিউ, দি হোলি প্যালেস্।

ও! জানলার বাইরের দিকে তাকালাম। শীতের ক্ষীণ গঙ্গানদী। বললাম—বেশ চমৎকার। আমি ঠিক পারব।

—ছাটস রাইট। পিয়ার্সন সাহেব আস্তে আস্তে চলে গেলেন। মিস্ প্যাট্রিকও যাবার আগে একবার জিজ্ঞেস করলেন—রাত্রের খাবারটা আটটার সময় পাঠালে হবে তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। পরেও পাঠাতে পারেন।

ঘরের মধ্যে একলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম—কি এমন কাজ যে পারা যায় না। ওই তো কয়েকটি রোগী। ওদের সেবা করার জন্যে নার্স আছেন, ডাক্তার আছেন। আমার কাজ কেবল এই সব দেখ-শোনা করা। এটুকু পারব না? নিশ্চয়ই পারব।

ব্যাগটা পাশে রেখে একটা জানলা খুলে ফেললাম। সামনেই সেই চার্চ। পিয়ার্সন সাহেব দেখলাম সেই দিকেই যাচ্ছেন। সঙ্গে মিস প্যাট্রিক এবং আরও কয়েকজন লোক।

নীচের উঠোন থেকে আমাকে জানলার ধারে দেখতে পেয়ে পিয়ার্সন সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন—হিয়ার ইজ ইয়োর চার্চ। আপনি আসতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

বাইবেলে জোব

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার

[Old Testament হইতে যে দুইটি অংশকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কার্লাইল পাঠক-সমাজের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন সে দুইটি—King David ও Book of Job. কার্লাইল ছিলেন মনীষী সাহিত্যিক। তাঁহার দৃষ্টিতে Book of Job-এর শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্যই উহার শৈলী ও শিক্ষার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দিক দিয়া কার্লাইলের সহিত আমার আদৌ মতবিরোধ নাই,—অক্ষম শৈলীর কাঠামোর উপরে শিক্ষার সাফল্য দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না; শিক্ষাকে মানুষের হৃদয়-মনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাইয়া দিয়া সজ্ঞানে অজ্ঞানে সমস্ত চেতনাকে অধিকার করিবার ভঙ্গ কৌশলই শৈলী। উহাকে বাদ দিয়া Book of Job-এর আলোচনাতে কিছুটা রসহানি হইবে জানি। কিন্তু একটা প্রবন্ধের স্বল্প সীমার মধ্যে দুইটি দিকের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব নয়। সেই কারণেই এই প্রবন্ধে ঐ দিকটি যথাসম্ভব উপেক্ষা করিয়া মাত্র শিক্ষার দিকটি গ্রহণ করা হইয়াছে।]

উপাখ্যানটি অতি সংক্ষেপে এইরূপ। জোব ঈশ্বরের পরমভক্ত, ঈশ্বরও তাহা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু উহাতে ঘোর আপত্তি শয়তানের। শয়তান মনে করে, জোব ঈশ্বরের কৃপায় সুখ ও সমৃদ্ধি ভোগ করিতেছেন, তাই এই ভক্তি,—দুর্দশায় পড়িলেই ভক্তি ছুটিয়া যাইবে। সুতরাং জোবের উপরে পরীক্ষা চলিল। এক এক করিয়া জোব সবই হারাইলেন—পত্নী-পুত্র ধন-সম্পত্তি সমস্তই। শেষ পর্যন্ত বাকী ছিল নিজের দেহখানি, তাহাও কুষ্ঠব্যাধিতে জর্জরিত হইল, দুর্ভোগের একশেষ, তথাপি মৃত্যু হইল না। এই দুর্দশার দিনে জোবের তিন বন্ধু তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল, তাঁহারা ধর্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা প্রথমে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, ধর্মের সুফল হইতে কেহই বঞ্চিত হয় না, ধর্মের পথে চলিলে সব বিপর্যয় এড়ানো যায়,—যেন জোব ধর্মের পথে না চলিয়াই নিজের এই দুর্দশা সৃষ্টি করিয়াছেন। জোবের উপরে যে পরীক্ষা চলিতেছে জোব তাহা জানেন না, সুতরাং তাঁহার প্রতি এই নির্যাতনের জন্য ঈশ্বরকে দায়ী না করিয়া দুর্দান্ত অভিমান করিয়াছেন। ঈশ্বরই তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার জীবনকে তিনি তো যখন-তখন বিনাশ করিতে পারেন। এইভাবে তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখা কেন? শেষ পর্যন্ত উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়া জোব তাঁহার ভক্তি-বিশ্বাস লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি আবার সব ফিরিয়া পাইলেন।

আপাত উপাখ্যানটির মধ্যে এমন কিছু নাই,—পানিতে না ফেলিলে ইক্ষু রস ত্যাগ করে না, যাঁহারা সমা-

লোচনায় ভক্তাদির গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের কাছেও এই সম্যক্ আলোচনায় থামিতে ফেলিয়া রস নিষ্কাশন করা। জানি না কোনদিন শয়তানের সহিত ঈশ্বরের দেখা হইয়াছিল কিনা; গোটা বাইবেলের মধ্যে ভগবানকে সাকার মনুষ্যরূপে দেখা যায় নাই, তাঁহার বাণী শ্রবণ করা গিয়াছে, তাঁহার নির্দেশ, মোজেস, যীশু প্রভৃতি মানুষের মাধ্যমে মর্তে পৌঁছিয়াছে, সাধারণ মানুষ তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই, শুধু অন্যের মুখে তাঁহার ইচ্ছা, অভিপ্রায় ও আকারের বর্ণনা পাইয়াছে। সুতরাং এ কেন ঈশ্বরের সহিত কোথায়, কিভাবে শয়তানের সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। অথবা ঈশ্বর ও শয়তানের সহিত শলা-পরামর্শ হইয়া জোবের ভাগ্য লইয়া খেলা চলিতেছিল কিনা, বাস্তবে তাহা সম্ভব কিনা তাহা লইয়া বিতর্কেরও প্রয়োজন নাই। আসল কথা, যাহারা ভক্তি-বিশ্বাস নিষ্ঠার পথে চলিতে চাহেন তাঁহাদের জীবনে এজাতীয় পরীক্ষা প্রায়ই হইয়া থাকে। নিষ্ঠা লইয়া আদর্শের পথে চলিতে গেলে উহার বিরোধী পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া খুবই স্বাভাবিক; বিরোধী পরিস্থিতির মধ্যে ভক্তি-বিশ্বাস অটুট রাখিয়া নিয়ত চলার সংকল্প, ইচ্ছা ও ক্ষমতার মধ্যেই নিষ্ঠার পরীক্ষা, যেমন প্রেমের পরীক্ষা মিলনে যতখানি, তার চেয়ে বিরহে অনেক বেশী। বাস্তবে জোব এমন একটা পরিস্থিতির সম্মুখীন না হইতে পারেন এমন নহে; তিনি সব হারাইয়াছেন, সব মরিয়া ছাড়িয়া নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, নিজেও দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত। এই অবস্থায় জোব কি করেন তাহাই দেখিতে হইবে। তিনি বিশ্বাস হারাইয়া ঈশ্বরের পথ ত্যাগ করেন, না সেই পথে নিরত চলিতে থাকেন অর্থাৎ এই অবস্থায় জোবের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং তাহা বিশ্বাসের অনুকূলে, না প্রতিকূলে দেখিতে হইবে।

জোব পরীক্ষার মধ্যে পড়িয়াছেন। দুঃসহ দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে পড়িয়া তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা একজন ভক্ত, যাহার রক্ত-মাংসের দেহ আছে, তাহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। জোব একজন গৃহস্থ ভক্ত, তাঁহার ঘর-সংসার, স্ত্রী-পুত্র, ধন-দৌলত, বিষয়-আশয় আছে, ভক্তি বিশ্বাস আছে, কিন্তু তাহাতে তথাকথিত সন্ন্যাসীর মনোভাব নাই। যে সব সন্ন্যাসী এ ক্ষেত্রে বলিতে পারিতেন, এ সংসারে কে কাহার— এ দেহখানিও নিজের নয়, কেবল মাত্র তিনিই সব—জোব সেদলের ন'ন। তাঁহার সবই চাই, ঈশ্বরকে লইয়া এই সবই তাঁহার প্রয়োজন। সুতরাং এক এক করিয়া সব যখন খসিয়া পড়িল তখন জোবের মনে দুঃখের ঢেউ খেলিয়া গেল। তবে এই দুঃখে ঈশ্বরের পথ ছাড়িয়া অন্য পথ ধরিবার পাত্র জোব ন'ন। কেননা তাঁহার ইচ্ছা ঈশ্বরকে লইয়াই সবকিছু ভোগ করা, ঈশ্বরকে বাদ দিয়া কোন ভোগের পরিকল্পনা তাঁহার নাই। সুতরাং তাঁহার মধ্যে দুঃখের প্রতিক্রিয়া আক্রোশ বা বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করে নাই। ঈশ্বরকেও ছাড়িয়া যাইবার ইচ্ছা নাই, অথচ অন্য সব গেল তার জন্য দুঃখও কম নয়,—এই ক্ষেত্রে যাহা স্বাভাবিক, জোবের মধ্যে তাহাই জাগিয়া উঠিল। ইহারই নাম অভিমান, এ যেন মায়ের আঁচল ধরিয়া কাঁদা। জোব তাহাই করিলেন—

Let the day perish wherein I was born, and the night in which it was said, there is a man child conceived.

Let that day be darkness; let not God regard it from above, neither let the light shine upon it......Because it shut not up the doors of my mother's womb, nor hid sorrow from mine eyes.

Why died I not from the womb? Why did I not give up the ghost when I came out of the belly? [Verses 3—11, Chap. 3, The Book of Job.]

জোবের অভিযোগ করিবার কিছু নাই, কিন্তু অভিমান আছে। ঈশ্বর তাঁহার পরমাশ্রয়, তাঁহার কোলে থাকিয়া তাঁহার এত যন্ত্রণা! চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা-দিবা-রাত্রি, তোমরা কেন মাতৃগর্ভে প্রবেশে সেদিন বাধা সৃষ্টি করিলে না, মাতৃগর্ভে যখন স্থান হইল তখন ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কেন তাঁহার মৃত্যু হইল না। এই গোটা অধ্যায় এই জাতীয় অভিমানের আত্মপ্রকাশে উচ্ছ্বসিত হইয়া রহিয়াছে। রক্ত-মাংসের শরীর লইয়া ভগবান যদি সম্মুখে বর্তমান থাকিতেন তবে অভিমানের আত্মপ্রকাশ একটু অন্যরূপ হইত, আশা করা যায়। তেমন কেহ সম্মুখে থাকিলে জোব হয়তো অভিমান করিলেও জিজ্ঞাসা হইতে বিরত থাকিতেন না— প্রভু, এ সংকটত্রাণের উপায় কি? যীশু বা মূসা, ইহাদের মত কেহ সম্মুখে না থাকিবার জন্য অভিমান বাঁচিয়া থাকিবার পথ না লইয়া মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিল; কেননা কে পথ দেখাইবেন, বাঁচিবার পথ কি? সুতরাং জোবের পথ একটু বিশেষ ধাঁচের। ঈশা-মূসা যে ধর্ম ও বিশ্বাসের ট্র্যাডিশন সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন জোব উহাতে সক্রিয়ভাবে বিশ্বাসী, উহাই তাঁহার

কাছে ঈশ্বরের পথ ; তিনি উহা হইতে বিচ্যুত হইবেন না। তথাপি যে দুঃখের হলাহল সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সহ্য করা যায় না, অথচ এই পথও ত্যাগ করা চলিবে না, সুতরাং তাঁহার জন্ম না হইলেই সব সমস্যা মিটিয়া যাইত। এই ক্ষেত্রে এই জাতীয় মনের বিকৃতি খুবই স্বাভাবিক। জোবের কাছে ধর্মের পথ অর্থে সেই ঈশা-মুসা-প্রবর্তিত কৃষ্টির পথ। তিনি ত সেই পথ হইতে বিচ্যুত হন নাই, তবুও তাঁহার এতবড় বিপর্যয় আসিল কেন, তিনি অভি-মানের সুরে বন্ধুদের কাছে তাহাই উত্থাপন করিলেন:—

Doth not he see my ways, and count all my steps ?

* * *

Let me be weighed in an even balance, that God may know mine integrity * * If mine heart have been deceived by a woman, or if I have laid wait at my neighbour's door ,

[Verses 4—10, Chap. 31, Ibid.]

ধর্মের ভিত্তি সেই মুসা-প্রবর্তিত দশ নির্দেশ। জোব সেই নির্দেশগুলি হইতে বিচ্যুত হন নাই, ঈশ্বর বলিয়া কোন ব্যক্তিতে তিনি অনুরাগ-নিবদ্ধ হন নাই, ঈশা, মুসা বা যীশু এমন কোন ব্যক্তির সন্ধানও তিনি পান নাই ; সুতরাং তাঁহার ঈশ্বরভক্তি অথবা ঈশ্বরে বিশ্বাস আসলে ধর্মের নীতির প্রতি আনুগত্যই বুঝায়। সেই জন্যই জোব বন্ধুদের উদ্দেশ্যে অভি-মানের সুরে এই সব কথা বলিয়া-ছিলেন।

এই তো গেল জোবের কথা। ঈশা, মুসা, যীশুর মত কোন মানুষকে অবলম্বন করিয়া ধর্মাচরণের সুযোগ তিনি পান নাই ; তিনি তাঁহাদের নির্দেশিত পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে-ছিলেন, এই পথই তাঁহার কাছে ভগবান। তাহা ছাড়া উপায়ই বা কি ? ভগবানকে তিনি স্বচক্ষে দেখিতে পান নাই—গোটা অধ্যায়ের মধ্যে এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। তথাপি ঈশ্বরকে ভালবাসেন, ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস আছে, তার অর্থ ঈশ্বরের পথে বিশ্বাস ও ভক্তি। সুতরাং এমন দুর্দশার দিনে জোবের যাহা সব চাইতে বেশী প্রয়োজন ছিল তাহাই মিলিল না। বিপদে বিপর্যয়ে মানুষ শুধুমাত্র নীতি আঁকড়াইয়া ধরিয়াই নিরাপদ বোধ করে না, সে সহানুভূতি, সাহায্য ও ভালবাসার আশ্রয় চায় ; একটা বাদ বা নীতির অশরীরী হাওয়ার মধ্যে উহার কোনটিই মেলে না। তার জন্য চাই একজন মানুষ। জোবের সেই মানুষেরই অভাব হইল। জোব যদি এই বাদের বা নীতির ধর্ম কোন মানুষের মধ্যে প্রকট দেখিতেন তবে সেখানে ধর্মের সহিত সহানুভূতি, সাহায্য, ভালবাসা, ভরসা সবই মিলিত, এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইত না। তবুও আশ্রয় তাঁহার চাইই। মনে করিয়া-ছিলেন তাঁহার তিন বন্ধুর মধ্যে কিছুটা আশা-ভরসার তিনি সন্ধান পাইবেন। বন্ধুরা যাহা করিলেন তাহা লইয়া অধ্যায়টির দ্বিতীয় দিক্ উদ্ঘাটিত হইল।

বন্ধুরা জোবকে সাহায্য করিতে অথবা সহানুভূতি দেখাইতে আসে নাই, তাহারা ভুল ভাঙ্গিতে আসিয়াছে। প্রকৃত বন্ধু তাহারা আদৌ নয়, জোবের ও তাহাদের জীবনের পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং জোব যেভাবে চলিয়াছেন তাহা যে ভুলের পথ উহাই প্রমাণ করিতে তাহারা ব্যস্ত।

Call now, if there be any that will answer thee ; and to which of the saints wilt thou turn ?

[Verse. 1, Chap. 5]

* * *

If thou wert pure and upright , surely now he would awake for thee, and make the habitation of thy righteousness prosperous.

[Verse 6, Chap 8.]

গোটা-কয়েক অনুচ্ছেদের সুর একই। জোব যে পথে চলিয়া আসি-য়াছেন তাহা ধর্মের পথ নয়, ঈশ্বরের পথ নয়। তাহা যদি হইত তবে জোবের এই দুর্দশা হইত না, ঈশ্বরের পথে চলিলে ঈশ্বরই তাহাকে রক্ষা করেন, তাহার বিলক্ষণ উন্নতি হয়। জোব এখন ঘোর বিপদে পড়িয়াছেন। কোন্ ঈশ্বর এখন তাঁহাকে রক্ষা করিবেন ? জোবের বন্ধুরা নিজেদের সহিত তুলনা করিয়া জোবকে বিচার করিতে চলিয়াছেন। বিলক্ষণ বুঝা যায় ধন-সম্পদ ও বিষয়-আশয় লইয়া তাহারা বেশ আছে। এই সাময়িক বেশ থাকাটাই তাহাদের মতে ঈশ্বরের পথে চলার একমাত্র পুরস্কার। উহা যাহার নাই তিনি নিশ্চয়ই ঈশ্বরের পথে চলেন নাই—উহাদের যুক্তির মর্ম এই গিয়া দাঁড়ায়। জোব তাহা স্বীকার করিতে রাজি ন'ন, ঈশ্বরের পথে চলিলে স্পষ্ট যে একমাত্র পারি-তোষিক তাহা তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি স্বীকার করিতে রাজি ন'ন, এই পারিতোষিক লাভ করিতে না পারিলেই সোজা করিয়া ধর্মের পথ ত্যাগ করিতে হইবে। সেই পথে থাকিয়া তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সোজা করা চলিবে, এমন কি

সাময়িক অভিমানও করা চলিবে, কিন্তু তাই বলিয়া ত্যাগ করা চলিবে না। তাই জোব উত্তর দিলেন—

And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God :

Whom I shall see for myself and mine eyes shall behold, and not another, though my reins be consumed within me.

[Verses 26-27, Chap 19]

জোবের দৃঢ় প্রত্যয়ে ফাটা লাগে নাই। ধর্মের পথ হইতে তিনি বিচ্যুত হইবেন না। যদি অবস্থার পরিবর্তন করিতে হয় তবে এই পথে চলিয়াই তিনি তাহা করিবেন, বন্ধুদের পরামর্শে নীতিভ্রষ্ট হইয়া উন্নতির প্রত্যাশা করিবেন না। জোবের এই উত্তরে আর একটা জিনিস স্পষ্ট হইতে চলিল। বন্ধুরা উন্নতি করিয়াছে, আর তিনিও উন্নতি চাহিতেছেন, কিন্তু পথ দুই জনের সম্পূর্ণ ভিন্ন, একটি ধর্মের পথ, আর একটি সুবিধার পথ —সেখানে ধর্ম বা অধর্ম বলিয়া কিছু নাই, যাহা সুবিধা তাহাই পথ, তাহাতে অন্যের যাহা ঘটে ঘটুক নিজের সুবিধা হইলেই হইল। ধর্মের পথ অন্যের মৃতদেহের উপর নিজের সমৃদ্ধির সৌধ রচনা করিতে চাহে না, এই জাতীয় সুবিধার পথ আদৌ জোবের পথ নয়। জোব নিজের সমৃদ্ধি ও সুখ চাহেন এবং চাহেন বলিয়াই এত অভিমান, কিন্তু চাহেন ন্যায়ের পথে তাহা অর্জন করিতে।

বন্ধুদের মুখে বড় বড় কথার অভাব নাই। ধর্মের মন্ত্র পাঠ করিতে তাহারা কম দক্ষ নয়, তাহা জোব উপাখ্যান পড়িয়া স্পষ্ট ধারণা হয়, ধর্ম, জীবন, ঈশ্বরের ইচ্ছা, বিধান, বিভূতি প্রভৃতি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জোব যেমন গোটা প্রকৃতিকে অনুভূতির আলোকে আলোকিত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার বন্ধুরাও ধর্মের গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে প্রকৃতির বৈচিত্র্যগুলিকে তাদের রথে চাপাইবার বেলায় কম যান নাই। বাইবেলের স্তোত্রগুলি যেমন ভাব ও অনুভূতির গভীরতা সৃষ্টির বৈচিত্র্যের মধ্যে সহজ প্রকাশ খুঁজিয়া পাইয়াছে, তেমনি জোব উপাখ্যানের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়, ছন্দায়িত ভাবের দোলা-ই বাইবেলের সৃষ্টি-বৈচিত্র্য। সুতরাং সেই সূক্ষ্ম-অনুভূতির সূত্র ধরিয়া জোব ও তাঁহার বন্ধুরা সমানভাবে সূক্ষ্ম ভাবকে স্পষ্ট করিবার জন্য স্থূল প্রকৃতিকে যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছে। তাই বিভ্রান্ত হইবারই কথা—কে ধার্মিক, জোব না বন্ধুরা? অনুভূতির অভাব বন্ধুদের মধ্যে আছে বলিয়া মনে হয় না। আপাত জোবের দৃষ্টিতে জোবও ধার্মিক, আর বন্ধুদের দৃষ্টিতে তাহারাও ধার্মিক। কে ধার্মিক, কে অধার্মিক বুঝা শক্ত হইয়া দাঁড়াইল। বন্ধুদের যুক্তি উপেক্ষা করিবার নয়,—আমাদের সুখ-সমৃদ্ধি আছে উহাই ত ধর্মের ফল। আবার জোবের যুক্তি, বিপদ, আপদ, দুঃখ, দৈন্য যাহাই আসুক, আমি ধর্মের পথ ত্যাগ করি নাই।

এই বিভ্রান্তির কারণ স্পষ্ট। আগেই বলিয়াছি, জোব বাধ্য হইয়া নীতির ধর্ম পালন করিতেছেন। তাঁহার যুগে ধর্মের বাস্তব রূপ কোন মানুষের জন্ম হয় নাই—ঈশা, মুশা, যীশু কেহই তখন জন্ম লন নাই। বস্তু নির্দেশই তাঁহার ধর্ম, অর্থাৎ বাদের ধর্ম। এই বাদের ধর্ম লইয়া বিবাদ খুবই স্বাভাবিক। জোবের একটা বাদ আছে, তাঁহার বন্ধুদেরও একটা বাদ আছে। এ বলে আমার বাদ ঠিক, আর ও বলে আমারটা ঠিক; সবাই বলে আমরা ভগবানেরই পূজা করিতেছি, কে যে ভূতের পূজা করিতেছে তাহা ভগবান ছাড়া আর কে জানিবেন? জোব যদি বলেন আমি মুশার নির্দেশ পালন করিতেছি, বন্ধুরা বলিবেন এ-যুগে মুশার যুগের ধর্ম চলে না। মোট কথা, বাদের বিবাদ খুবই স্বাভাবিক। মিথ্যারও আকর্ষণীয় পোষাক আছে, যাহারা পোষাক পরাইতে জানেন তাঁহারা মিথ্যাকেও সত্য বলিয়া চালাইতে পারেন, এমনিভাবে কত নকল আসল বলিয়া বিলক্ষণ চলিয়া যাইতেছে। যাহার যুক্তির বুদ্ধি আছে তিনি যুক্তির কলা-কৌশলে ফেলিয়া মন্দকে ভাল, মিথ্যাকে সত্য বলিয়া চালাইতে পারেন। তাই বাইবেলে false prophet-এর সম্পর্কে বিশেষ হুঁসিয়ারী উচ্চারণ করা হইয়াছে। এই আসল ও নকল ঠিকমত চিনিয়া লইবার একটিমাত্র পথ আছে, উহারই নাম নিকষ পাথর। উহাতে না কষিলে শুধু বাহিরের ঔজ্জ্বল্য দিয়া সোনা খাঁটি বা অখাঁটি চেনা যায় না। ধর্মের ক্ষেত্রে সেই নিকষ-পাথর ধর্মবিৎ-আচার্য, যাহার মধ্যে ধর্ম বাস্তবে রূপ লয়। তেমন কোন মানুষ তখন পাওয়া যায় নাই, তাই জোব ঠিক, না বন্ধুরা ঠিক, বুঝিবার বেশ অসুবিধা আছে। সুতরাং শেষ পর্যন্তও জোব বুঝাইতে পারিলেন না যে, তিনি ঠিক পথে আছেন।

জোবের অবশ্য নিজের মত ও পথ প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু বন্ধুদের বিরোধিতার জন্য সেই প্রয়োজন উপস্থিত হইল এইমাত্র। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, এই দুঃসহ দুর্দিনে অন্তত একটু সান্ত্বনা ও সহানুভূতির ছোঁয়াচ পাওয়া। তাঁহার সেই অভাবই মিটিল না, বরং স্নেহ ও মমতার [illegible]

তুষানল ধুকে ধুকে করিয়া জলিতেছিল তাহাতে বন্ধুরা দিল ঘৃতাহুতি। ধর্মের শুধুমাত্র নীতি বা বাদই যথেষ্ট নয়, উহা মানুষের চরিত্র তৈরী করিবার জন্য, আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য, আর উহারই মধ্য দিয়া কারণ, ভাব ও বোধকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য। ধর্মের যার নীতি যাহাই হউক, তাহার উদ্দেশ্য আঘাত করিয়া মানুষের মনে ক্ষত সৃষ্টি করা নয়, অসহায় করিয়া তোলা নয়, বরং ক্ষত সারানো, আর অসহায়কে সান্ত্বনা ও ভরসা দিয়া দাঁড় করানো; শুধুমাত্র নীতির কচ্কচি যদি সেই উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে, তবে নীতি যত নিখুঁত হউক না কেন, তাহা ধর্ম নয়। তাই নীতি রূঢ়তার শুষ্ক মরুভূমিতে বিকাশ লাভ করিতে পারে না নীতির বীজ বালুকাপে শুকাইয়া বিনষ্ট হয়। সেইজন্য ধর্মের সার্থকতা উহার সরস ভূমির উপর নির্ভর করে, ধর্ম সেখানেই ফুটিয়া উঠিতে পারে, সেই সরস ভূমিই একজন মানুষ, তাঁহার মধ্যে নীতি সবুজ সরস পত্র-পল্লবে বিকশিত হয়। সেখানে ধর্ম থাকে, নীতি থাকে, কিন্তু রূঢ়তা থাকে না। তিনি মানুষকে ভরসা দেন, আশ্রয় দেন। তাঁর কাছে ক্ষত সারানোই ধর্ম, নীতির ছুরিকায় কাহাকেও আহত করা তাঁহার কাজ নয়। বন্ধুরা এই ভুলটিই করিয়া গিয়াছে বরাবর। নীতি নিখুঁত হইলে কি হইবে? তাহারা মরম না জানিয়া ধরম ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছে, ধর্মের ক্ষেত্রে তাহাদের প্রয়োজন নাই। সেইজন্য পরিশেষে বিধাতাকেই বিচার করিতে হইল, কে সৎ কে অসৎ, কে ধার্মিক কে অধার্মিক।

জোব উপাখ্যানের শেষের দিকে বিধাতা স্পষ্ট ভাষায় রায় দিলেন। বন্ধুরা নীতি জানে, কিন্তু ধর্ম জানে না। তাহারা নীরস শুষ্ক মরুভূমি, সেখানে ধর্মের মরীচিকা আছে, মরুদ্যান নাই। আর জোব দুঃখ-দুর্দশায় পড়িয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া সুখের অন্বেষণে ধর্মের পথ ত্যাগ করেন নাই। শুধু আঁচল ধরিয়া কাঁদিয়াছেন, সহানুভূতি ও আশ্রয় চাহিয়াছেন, কিন্তু তাহা পান নাই। তাহাতে অভিমান হইয়াছে, কিন্তু প্রতিহিংসা বা ঘৃণা জাগে নাই। সুতরাং Then answered the Lord unto Job out of the whirlwind, and said, Gird up thy loins now like a man: I will demand of thee, and declare thou unto me

[Verses 6-7, Ch 40]

ঘূর্ণিবাত্যার মধ্য হইতে ঈশ্বরের আদেশ আসিল,—কারণ ঈশ্বরকে তখন তো মানুষের স্বাভাবিক রূপে পাওয়া যায় নাই। ঈশ্বর যখন যেমনি অব্যক্ত থাকেন তখন ঈশ্বরকে দেখা যায় না, শুধু তাঁহার বাণী শোনা যায়, সেই আদেশ-নির্দেশ সকলে শুনিতে পায় না, তাহা শুধু জোবের মত ভক্ত মানুষের চেতনায় ধরা পড়িতে পারে। জোবের ইতিহাস, তিনি কোনও অবস্থায়ও সৎ ও ধর্মের নীতি হইতে বিচ্যুত হ'ন নাই, তাঁহার নির্বন্ধ নির্দেশ চেতনার আকাশে সজোরে প্রতিধ্বনি ছড়াইয়া পড়িতে পারে। তাই তিনি ঈশ্বরের বাণী শুনিতে পারিলেন,—তাঁহার নিজের মধ্যে বিপদ-মুক্ত হইবার শক্তি রহিয়া গিয়াছে, একবারটি তাঁহাকে মাথা ঝাঁকাইয়া দাঁড়াইতে হইবে, ঈশ্বর তাঁহার কাছে উহাই দাবী করিতেছেন। ঈশ্বরের বাণীতে উহা আরও স্পষ্ট হইল—

Lo now, his strength is in his loins, and his force is in the navel of his belly. [Verse —14, Chap. 40, Ibid.]

ঈশ্বরের কাজ ঈশ্বর করিলেন, জোবের ভুল ভাঙিয়া দিলেন। ভগবান ভক্তেরই, তিনি ভক্তকে এইভাবেই রক্ষা করেন। তিনি মানুষরূপে যখন আসেন তখন সহানুভূতিকে আবরণ-রূপে আশ্রয় দিয়া বলেন, লক্ষ্মি, দেখো, তোমার মধ্যেই শক্তির উৎস রহিয়াছে, তুমি জাগো, ওঠো, আর কাঁদিও না, ধূলায় গড়াইয়া কি হইবে! জোব এবার বুঝিলেন তাঁহার ভুল হইয়াছে, এত অভিমান অভিযোগের কোনো কারণ নাই। তিনি চান আমি কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াই, wherefore I abhor myself, and repent in dust and ashes [Verse 6, Chap. 42] জোব যখন এইভাবে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন তখন কান্না থামিয়া গেল, অবস্থারও পরিবর্তন আরম্ভ হইল। এতক্ষণ জোব ঈশ্বরের কথা কানে শুনিতে পাইতেছিলেন, এবার তিনি নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলেন, I have heard of thee by the hearing of the ear but now mine eae seeth thee. [Verse 5, Chap. 42] জোব ঈশ্বর দেখিলেন তাঁহার নিজের মধ্যে, সেই ঈশ্বরের নির্দেশে যখন ধর্মের পথে সক্রিয় হইলেন, নিষ্ক্রিয়ভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া না থাকিয়া তাঁহার আদেশকে কর্মে রূপ দিতে লাগিয়া উঠিলেন, তখনই অবস্থার আমূল পরিবর্তন হইল। রোগ-ব্যাধি তখন খসিয়া পড়িল দুর্দশা-দৈন্য তখন আর সুবিধা করিতে পারিল না। ইহার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের কৃপা নামিয়া আসিল। জোব আবার সব ফিরিয়া পাইলেন।

জোব উপাখ্যান হইতে ঠিক বোঝা যায়, ধর্ম যতক্ষণ কোন মানুষের মধ্যে মূর্ত না হয় ততক্ষণ মানুষকে বাদের

নীতির ধর্ম লইয়া চালাইতে হয়. সেই পথে যাবার অন্ত নাই। প্রথমতঃ ধর্ম-সম্পর্কে বাস্তব কোন ধারণা হয় না। ধর্ম শুধুমাত্র থিওরিতে থাকিলে তাহাতে মানুষের কাজ হয় না, নীতির ধর্ম আচরণে দৃঢ়তা আনিয়া দিতে পারে, অথবা জীবনের দুর্দিনে দুর্দশায় যখন সহায় সহানুভূতি সান্ত্বনা বিশেষ প্রয়োজন তখন তেমন আশ্রয়ের অভাব হয়। যতক্ষণ ধর্মের মূর্ত প্রতীক হিসাবে কোন মানুষের আবির্ভাব না হয়, ততক্ষণ ধর্ম আচরণ অনুষ্ঠানের ধর্ম—উহার শেষ লক্ষ্য থাকে অভ্যাস-সৃষ্টি, সেই মানুষ না পাওয়া পর্যন্ত ধর্ম প্রেমের উপরে ভিত্তি করিতে পারে না, আর প্রেমবিহীন ধর্ম শুষ্ক না হইয়া পারে না। দ্বিতীয়তঃ ধর্মের পথে, সততার পথে বাধা, বিপত্তি, অশান্তি না আসিতে পারে তাহা নয়, যাহারা সততা ও ধর্মের প্রকৃত পথিক তাঁহারা উহার জন্য নিষ্ঠাবিহীন বিকৃত ছলনা অবলম্বন করেন না, তাঁহারা সৎপথেই অবস্থার পরিবর্তন করিতে চান। সেইজন্য দরকার নিজের মধ্যের কর্মশক্তিকে জাগানো, আর উহাকেই বিহিত পথে চালানো। বিধাতা যে অবস্থায়ই থাকুন, —তা তিনি অব্যক্ত থাকুন আর ব্যক্তির রূপ লইয়া আমাদের সম্মুখে বর্তমান থাকুন,—তিনি আমাদের জন্য কিছুই করিতে পারেন না যতক্ষণ না আমাদের মধ্যে শক্তির উদ্বোধন হয়। তবে ঈশ্বরের প্রয়োজন কেন? তিনি প্রেরণা দেন, তাঁহারই প্রেরণায় সুপ্ত শক্তি জাগিয়া ওঠে। এখানে অব্যক্ত ভগবান বাণী উচ্চারণ করিয়া প্রেরণা দিয়াছেন, জীবন্ত ভগবান প্রেমের ও ভালবাসার কেন্দ্রে বসিয়া মানুষের স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে শক্তির শিহরণ সৃষ্টি করেন। মোটকথা, নিজের মধ্যেই সৎ শুভ ও ভগবানের আবির্ভাব হয়। বাহিরের ভগবানকে ধরিয়া ভিতরের ভগবান জাগানোই ধর্মের মূল রহস্য। তৃতীয়তঃ, কি ধর্ম কি অধর্ম তাহা নিখুঁত নির্ভুলভাবে কেবলমাত্র তিনিই নির্দেশ করিতে পারেন, যিনি আদি-অন্ত বৃত্তান্ত জানিয়া ধর্মের মূর্ত প্রতীক হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাকে না পাওয়া পর্যন্ত মানুষ পূর্ববর্তীর নীতিই অনুসরণ করে। সেই মানুষ যাহার মধ্যে নীতি মূর্ত হইয়াছিল তাঁহাকে পাওয়া গেল না, থাকিয়া গেল তাঁহার নীতি, সেই মানুষের অভাবে নীতির অনুসরণে শুষ্কতা আসে, নীতির অর্থ বোঝা যায় না। তাই পরবর্তীর আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত ঠিক বোঝা যায় না কোনটি ধর্ম, কোনটি অধর্ম। সেই জন্য ঈশ্বরের বাণীই নির্ভুল। জোব উপাখ্যান হইতে বাইবেল যেন ইহাই জানাইতে চাহিতেছেন।।

ক্রীড়া-জগৎ

—শ্রীখেলোয়াড়

ফুটবল ষ্টেডিয়াম

আরও একটা বছর ঘুরে এল। আর মাস দেড়েকের মধ্যে কলকাতা ময়দানে ফুটবল খেলা শুরু হয়ে যাবে—কিন্তু ময়দানে একটা ষ্টেডিয়াম করার ব্যাপারে আমরা আগেও যেখানে ছিলাম এখনও সেইখানে আছি; অর্থাৎ পরিকল্পনা তৈরী হয়েছে, কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করে একজন বিদেশী বাস্তুকার এসে প্ল্যান তৈরী করেছেন, মডেল বানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর পর মাঠও বাছা হয়েছে। কিন্তু ব্যস, ঐ পর্যন্ত। তারপর সব ধামা চাপা পড়ে গেছে। এখন আর কেউ ষ্টেডিয়ামের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না।

অথচ কলকাতা ময়দানে একটা ফুটবল ষ্টেডিয়াম প্রয়োজন। ফুটবল দর্শকের এ-দাবি অত্যন্ত সঙ্গত। জনপ্রিয় ফুটবল দলগুলোর আকর্ষণীয় খেলা থাকলে দর্শকরা টিকিটের অভাবে খেলা না দেখে ফিরে যেতে বাধ্য হন। অনেকে আশপাশের বৃক্ষশাখায় স্থান করে নিয়ে খেলা দেখেন। পরিখার দিকে অগণিত দর্শক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলোয়াড়দের শুধু টিকিটুকু দেখে উল্লসিত হ'ন। আর অবশিষ্টরা ভিড় করেন রেডিও-র সামনে। তাও সব খেলার ধারা-বিবরণী দেওয়া হয় না। এমন অবস্থায় একটা ষ্টেডিয়াম হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। আর এ দাবি বহুকালের, বহু জনের।

কলকাতা ময়দানে একদল বাস্তুঘুঘু আছেন—খেলাধুলার আসরে এঁরা অতি পরিচিত। এঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে এক রাজনীতিকের। এঁরা আবার ছোট বড় অনেকগুলো ক্লাবের মাথা। এঁদের ওঠা-বসা-শোওয়ার সঙ্গে ক্লাবগুলোর উত্থান-পতন বিজড়িত। ফলে এঁদের মর্জি-মত কলকাতা ময়দানের খেলাধুলার রাজনীতি পরিচালিত হয়। লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতি বছর এঁদের মাধ্যমে খরচ হয়—ক্লাবগুলোর এবং আই-এফ-এ'র টাকা। এর উপর আছে গোটা-ছয়েক চ্যারিটি শোয়ের টিকিট। এখন মাঠে দর্শক আসন সীমিত—অথচ দর্শকসংখ্যা অপরিমিত। চাহিদাও আছে কিন্তু সাপ্লাই নেই। ফলশ্রুতি—গোপন পথে চোরাকারবার। ফলাও ব্যবসা। কিন্তু একটা ষ্টেডিয়াম হ'লে দর্শক আসন বাড়বে। চাহিদা ও সাপ্লাইয়ে তারতম্য থাকবে না। দর্শকদের কষ্টের লাঘব হ'বে—কিন্তু এঁদের মনের কষ্ট বাড়বে। তাই কি ষ্টেডিয়াম তৈরী হওয়ার কাজে দীর্ঘসূত্রী অবস্থা বিরাজ করছে? অতএব ষ্টেডিয়ামের আশা কি এখন দুরাশা মাত্র?

বিশ্ব অলিম্পিক ও ভারতীয় হকি দল

আর মাত্র দু'টি বছর আছে—তারপর-ই মেক্সিকো শহরে বিশ্ব অলিম্পিকের আসর বসবে। ভারত হকিতে বিশ্ববিজয়ীর আখ্যা পুনরধিকার করেছে। কিন্তু তার বড় প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান চুপ করে বসে নেই। পরবর্তী অলিম্পিকের আসরে প্রতিশোধ নেবার জন্যে তারা উঠে-পড়ে লেগেছে। এছাড়াও হল্যান্ড, ইংলন্ড, কেনিয়া এবং জার্মানীও হকি খেলার উন্নত ক্রীড়া কৌশল আবিষ্কার করার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। সুতরাং এবার অনেক শক্তিধর প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে ভারতকে লড়াই করে বিজয়ীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

সম্প্রতি বিখ্যাত হকি-কোচ শ্রীহাবুল মুখার্জি বলেছেন যে, ভারতীয় দলকে শক্তিশালী করে তুলতে হলে তরুণ হকি প্রতিভা খুঁজে বার করতে হবে। হকি খেলার প্রাণ হচ্ছে গতি এবং সঠিক নিশানা। এ দু'টি জিনিস একমাত্র তরুণ প্রতিভাধরদের কাছ থেকে আশা করা যায়। স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়াঙ্গন থেকে তিনি তরুণ প্রতিভাধরদের খুঁজে বার করতে উপদেশ দিয়েছেন।

বিশ্ব কাপ ও ইংলণ্ড

বিশ্বে খেলাধুলার আসরে ইংলণ্ড তার খ্যাতির আসন হারাতে বসেছে। খেলোয়াড়দের দুর্বলতা কিংবা অক্ষমতার জন্য এ বিপত্তি দেখা দেয়নি—এ বিপত্তির সৃষ্টি হয়েছে এক চোরের কৃপায়। লণ্ডন শহরের বুকের উপর থেকে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার সোনার ট্রফি জুলেরিমে কাপটি খোয়া গেছে।

বিশ্ব ফুটবলে ব্রেজিল বিগত কয়েকবারের বিজয়ী। জুলেরিমে কাপটি তাই এতদিন ছিল ব্রেজিলের রাজধানী রিও-ডি-জেনেরো-তে। আগামী জুলাই মাস থেকে ইংলণ্ডে বিশ্ব ফুটবলের প্রতিযোগিতা শুরু

হয়েছে। কাপটিকে সেই উপলক্ষে লণ্ডনে আনা হয়েছিল। এক সপ্তাহের জন্য জাতীয় প্রদর্শনীতে সাধারণের দেখবার জন্য কাপটি রাখা হয়েছিল। ত্রিশ হাজার পাউণ্ডে কাপটি বীমা করা আছে। বার ইঞ্চি দীর্ঘ খাটি সোনায় তৈরী কাপটি দিয়েছিলেন ফ্রান্সের এক ক্রীড়া-রসিক। তাঁর নামের সঙ্গে কাপটির নামকরণ করা হয়েছে। এই চুরি তাই বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

লণ্ডন শহরের এক জনবহুল অঞ্চলে ভর দুপুরবেলা চোর কি করে যে আলমারি ভেঙ্গে কাপটি নিয়ে পালাল তা রীতিমত বিস্ময়ের ব্যাপার। হাজার চেষ্টা করেও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ঘুঘু গোয়েন্দারা এখনও তার সন্ধান করে উঠতে পারেননি। হয়ত ভবিষ্যতে অক্ষত অবস্থায় কাপটি পাওয়া যাবে না। কারণ পুলিশ সন্দেহ করছে যে, কাপটি ইতিমধ্যে গালিয়ে ফেলা হয়েছে।

ইংলণ্ডের ফুটবল সংস্থা তাই আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থার (ফিফার) সঙ্গে পরামর্শ করে নূতন একটি কাপ তৈরী করার ব্যবস্থা করছেন। কারণ বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা আর কয়েক মাস পরে শুরু হবে। বাছাই পর্বের খেলাগুলো শেষ হয়েছে। সারা বিশ্ব থেকে ষোলটি দল বাছাই করা হয়েছে —এই দলগুলো শেষ পর্যায়ের খেলায় যোগদান করবে। আর নিঃসন্দেহে এদের মধ্যে সব সেরা হচ্ছে ব্রেজিলের জাতীয় ফুটবল দল।

ভারত বনাম ইরাণ

গত বছর ডেভিস কাপের চ্যাম্পিয়ান (টেনিস খেলা) হয়েছে শক্তিশালী অষ্ট্রেলিয়া দল। ভারত আকস্মিক ফাইন্যালে প্রথমবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে গিয়েছিল স্পেনের কাছে। এ বছর ডেভিস কাপের পুর্বাঞ্চলের প্রথম রাউণ্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হল ভারত ও ইরাণের মধ্যে। খেলার আসর বসেছিল আমেদাবাদে। ভারতের কৃষ্ণাণ এবং জয়দীপ মুখার্জি এখন বিদেশ-সফরে ব্যস্ত। তাই প্রেমজিৎলাল, রবি ভেঙ্কটেশন এবং শিব মিশ্র ইরাণের বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ভারত পাঁচটি খেলাতেই বিজয়ী হয়েছে।

এর পূর্বেও ভারত দু'বার ইরাণকে ডেভিস কাপের খেলায় হারিয়েছিল। দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলায় ভারত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে সিংহল ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিজয়ীর সঙ্গে।

ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়দের মান নির্ণয় করে একটি বাছাই তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। পুরুষ খেলোয়াড় —(১) রমানাথন কৃষ্ণাণ (২) জয়দীপ মুখার্জি (৩) প্রেমজিৎলাল (৪) শিব মিশ্র (৫) রবি ভেঙ্কটেশন (৬) শ্যাম মিনোত্রা। মহিলা খেলোয়াড়—(১) নিরুপমা বসন্ত (২) লক্ষ্মী মহাদেবন (৩) বেগম ফে খান। কুমার খেলোয়াড়—(১) সি বলরাম (২) সি কুপতি।

চলতি বছরে কৃষ্ণাণকে হারিয়ে মুখার্জি এশীয় লন টেনিস চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। তবে কৃষ্ণাণ মুখার্জির চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ খেলোয়াড়।

• রঙ্গজগৎ •

উত্তর কলিকাতার সুভাষবাগে (স্কোয়ার) নাট্য সম্মেলন শুরু হয়েছে। এর সূচনা গত বছর থেকে। বাংলা দেশের বিভিন্ন অ-পেশাদারী নাট্যসংস্থা এতে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। কয়েকটী বিশেষ অনুষ্ঠানে পেশাদারী কিছু কিছু শিল্পীরাও এখানে যোগ দেন। প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে নাট্যামোদী মহলে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছিলো এবছরও তা অব্যাহত আছে এবং ক্রমশই এ উৎসবের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধু শহর কলকাতারই নয়—মফঃস্বল থেকেও বিভিন্ন সংস্থা এ সম্মেলনে যোগদান করে থাকেন। বাংলা নাটকের বর্তমান গতি-প্রকৃতি, উপস্থাপনা, অভিনয়, কলাকৌশল প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের পর্যবেক্ষণে এ ধরণের উৎসব বিশেষভাবে সাহায্য করে।

বর্তমান সমাজব্যবস্থা তথা মানুষের নৈতিক ও সামগ্রিক বিচারবুদ্ধির উপর আলোকপাত করতে যে সব উৎসের সাথে আমাদের পরিচয় আছে—নাটক তার মধ্যে অন্যতম। জাতীয় জীবনের যেকোনস্তরে মানুষের মর্মকথা নাটকের মাধ্যমে উচ্চারিত হয়ে সমাজের উপর

গভীর প্রভাব বিস্তার করে। দেশের সামগ্রিক উন্নতিতে নাটক ও নাট্যশালার অবদান আজ অনস্বীকার্য।

লোকরঞ্জন এবং লোকশিক্ষা নাটক ও নাট্যশালার দুটি প্রধান উদ্দেশ্য। আজকের মানুষ মনোরঞ্জনের সাথে সাথে আরও একটি জিনিষের সন্ধান করে,—তা হ'ল 'কলাশিল্পবোধ'—যার প্রতিচ্ছবি আমাদের কাছে খুবই প্রত্যক্ষ। এক সময় ছিল যখন 'আর্ট' কথার একটা বিশেষ অর্থ ছিল, কিন্তু যুগের পরিবর্তন হয়েছে—আজকের ব্যক্তি-সত্তা ও 'আর্ট' এ দুটি কথাকে পৃথক ভাবে ভাবা যায় না। মানুষ তার ব্যক্তিসত্তার মাঝেই বেঁচে থাকে,—নাটক তারই সৃষ্টি, সেখানেও সে জীবন্ত হয়ে থাকতে চায়। ব্যক্তি-সত্তার যে শিল্পবোধ, সৌন্দর্য তা যেন তার সৃষ্টির মাঝেও ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। নাটকের মাঝেই দর্পণের মত প্রতিবিম্বিত হয় মানুষের কথা—তার হাসি—কান্না—দর্শন সব কিছু। তাই নাটক ও নাট্য আন্দোলনের মান নির্ণয়ের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না।

নাটকের সঙ্গে সঙ্গে তার 'টেকনিক'ও বদলে যাচ্ছে, কিন্তু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে নাটক তার মূল রস হারিয়ে যেন 'টেকনিক-সর্বস্ব' হয়ে না পড়ে। নাট্যামোদী মানুষের সাথে বিভিন্ন নাটকের বিস্তারিত পরিচয় করিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় 'নাট্যসম্মেলন' জাতীয় অনুষ্ঠান দ্বারা।

যে সব নাটক এই নাট্যসম্মেলনে অভিনীত হচ্ছে সে সব নিয়ে বারান্তরে আলোচনা করার ইচ্ছে রইলো। পর্দার অন্তরালে থেকে যে সব গুণীজনের সাফল্যের সঙ্গে এ সম্মেলনের পরিচালনা করছেন তাঁরা অবশ্যই ধন্যবাদের পাত্র। বিশেষ করে বলতে হয় চরিত্রাভিনেতা সবিতাব্রত দত্ত (রূপকার), নাট্যকার মন্মথ রায়, সুনীল সিংহ, তাপস সেন, সাংবাদিক মহেন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতির কথা—যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম এ নাট্য সম্মেলনের মূলধন।

প্রসঙ্গতঃ সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের কাছে আমরা অন্য একটি প্রস্তাব রাখতে চাইছি। এ ধরণের সম্মেলনে যদি আঞ্চলিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা তাঁরা করতে পারেন তাহ'লে প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ নিঃসন্দেহে সাধুবাদ জানাবেন।

—'পর।'

কান্ চলচ্চিত্র উৎসবে "আকাশ কুসুম"

মৃণাল সেন পরিচালিত "আকাশকুসুম" কান চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় চিত্র হিসেবে প্রতিযোগিতা করবে। উক্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ৫ই মে থেকে ২০শে মে পর্যন্ত। ছবির একটি প্রিন্ট ইতিমধ্যেই উৎসব কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলা ছবি "চারুলতা"

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "চারুলতা" ভারত সরকার কর্তৃক নিম্নলিখিত চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্য নির্বাচিত হয়েছে।

১। এ্যাফ্রো-এসিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল
(২৬শে মার্চ থেকে শুরু)

২। ব্রিসবেন ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল
(২৯শে এপ্রিল থেকে ২রা মে)

৩। এ্যাডেলেইড্ ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল
(২৩শে মে থেকে ৪ঠা জুন)

৪। সিড্নী ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল
(১লা থেকে ১৩ই জুন)

৫। মেলবোর্ণ ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল
(৩রা থেকে ১৮ই জুন)

প্রযোজক আর. ডি. বনশল উক্ত উৎসবগুলিতে "সাবটাইটেল্ড্" প্রিন্ট পাঠাবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' অবলম্বনে 'চারুলতা' ছবিখানি নির্মিত হয়েছে। এর তিনটি প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায় ও শৈলেন মুখোপাধ্যায়। 'চারুলতা' গত বছর রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করে এবং বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে "শ্রেষ্ঠ পরিচালনা" পুরস্কারে ভূষিত হয়। এ ছাড়া এ্যাকাপুলকো (মেক্সিকো) চলচ্চিত্র উৎসবে 'চারুলতা' ছবিখানিকে "গোল্ডেন হেড অফ্ প্যালেঙ্কুই" পুরস্কার দেওয়া হয়।

রাজদ্রোহী
(সমালোচনা)

চিরাচরিত ধারা ও সহজ রীতির ছবি এই 'রাজদ্রোহী' চলচ্চিত্র-শিল্পে কোন বিদ্রোহ বা বলিষ্ঠতা নিয়ে হাজির হয়নি। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এই শিল্পটিকে নিয়ে যে পরীক্ষা নিরীক্ষার সমারোহ চলেছে, তার কণামাত্র আভাসও চিত্রটিতে দুর্লক্ষ্য। শুধু তাই নয়, শিল্পের সর্তও ছবিতে অক্ষুণ্ণ থাকেনি। এবং সেকারণেই চিত্রটি শিল্পকৃতির অধি-

ধার বিশেষিত হবার সুযোগ থেকে স্বাভাবিকভাবেই বঞ্চিত। কাহিনী বর্ণন যেখানে ব্যঞ্জনাধর্মী চিত্রময়তার বিশিষ্ট স্বাতন্ত্রের পরিচায়করূপে দেখা দেয় না, বরং পরিবর্তে শুধু সংলাপ আর ঘটনা বিন্যাসের চিত্রপদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল, সেখানে চলচ্চিত্র-ধর্ম বজায় রইল কোথায়? চিত্রকরের কোন ইংগিতময়তা নেই, নেই কোন ক্যামেরার শিল্পসম্মত দৃষ্টি-কোণ। বি. কে. প্রোডাকসন্সের এই ছবিটি ব্যবসায়িক সাফল্য হয়তো আনবে, কিন্তু শিল্প-কৃতিত্বের মর্যাদায় অভিনন্দিত হবে না। সম্ভবতঃ এটাই হয়তো চিত্রনির্মাতার অভিপ্রেত ছিল। তবে ছবিটি দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং কিছু কিছু অংশ আতিশয্য-দোষে দুষ্ট হোলেও, মোটামুটি ভাবে বিরক্তিকর নয়। বুভুক্ষু জনসাধারণের মধ্যে গুদামজাত ধান-চাল পৌঁছে দেওয়ার মধ্যে যে প্রশংসনীয় যুগের ছাপ আছে, তা স্বীকার্য অবশ্যই। পশ্চিমের এক দেশীয় রাজ্যে স্বার্থপর অত্যাচারী শ্রেষ্ঠীদের নির্যাতনের পটভূমিকায় এক নির্ভিক দরিদ্র কৃষক তরুণের রোমাঞ্চকর নাটকীয় বিদ্রোহকে কেন্দ্র কোরে যে সংঘাত সৃষ্টি হোয়েছে, তার মধ্যে নাট্য-দ্বন্দ্ব থাকতে পারে, কিন্তু চিত্রনাট্যে অতি সরলীকরণের ফলে তা দুর্বার হোয়ে ওঠেনি রসের বিচারে। ছবিতে নতুন কোরে আবার যেন রবীন হুড্‌কে প্রত্যক্ষ করা গেল প্রতাপ সিং চরিত্রটির মধ্যে। নিজের জীবনে অবিচারের যে জ্বালা অনুভূত হোল, তার ফলে জন্ম নিল বিদ্রোহ আর প্রতিশোধস্পৃহা—পক্ষান্তরে তাই আবার ছড়িয়ে পড়ল অগণিত নিপীড়িত জন-জীবনে সহানুভূতির সহস্রধারায়। প্রতাপসিং তার দলবল নিয়ে শোষকদের কাছে সন্ত্রাসসৃষ্টিকারী হোয়ে দাঁড়াল, কিন্তু দরিদ্র অত্যাচারিত কৃষক সমাজে ত্রাণকর্তারূপে দেখা দিল। অর্থাৎ রবীন হুড্ সুলভ ধনীদের সম্পদ ছিনিয়ে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘটনাবহুল এই কাহিনীটি শুধু বিবৃত করাই হোয়েছে, আংগিক দুর্বলতাহেতু তা চলচ্চিত্র পদবাচ্য হয়নি।

সুদীর্ঘকাল পর পরিচালক নীরেন লাহিড়ীর এই ছবিটি কোন নতুন বৈশিষ্ট নিয়ে উপস্থিত হয়নি। তাঁরই বহুকাল আগের তোলা 'গরমিল' ছবি থেকে বর্তমান ছবিটি চিত্ররীতির দিক থেকে মোটেই উন্নতরূপে দেখা যায়নি! অথচ এযুগে চলচ্চিত্র-আংগিকের সমৃদ্ধি, শিল্প-দ্যোতনায় কতখানি ভাবুন! বরং 'রাজদ্রোহী' ছবিতে যোথে মার্কা সস্তা স্টান্ট্‌ধর্মী সংঘর্ষমূলক ছবির প্রভাব চোখে পড়ে—যার পেছনে শুধুমাত্র ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি সক্রিয় আছে ব'লে মনে করি। সাধারণ রুচি অনুযায়ী নাচ-গানের চটুল ব্যবহার, অবাস্তব সংঘর্ষের রোমাঞ্চ সৃষ্টি ও উত্তেজনা-সুলভ দৃশ্য রচনার কারসাজি (বিশেষ কোরে ছবিটির শেষাংশ) ছবিটিকে দর্শক আকর্ষণে সামর্থ দিলেও, সাধারণ অ্যাড্‌ভেঞ্চারমূলক সৃষ্টির চেয়ে বেশী মর্যাদা দেবে না। কারণ নিগৃহীত কৃষক প্রজাবৃন্দের বিক্ষোভ অংশতঃ দেখানো হোলেও, কৃষক বিদ্রোহের সুসংহত রূপ না ফোটায় তার সামাজিক তাৎপর্য গভীরতা পায়নি, বরং একক নেতৃত্বের 'রোমান্টিসিজম' সেক্ষেত্রে পরিস্ফুটিত।

বিজয় ঘোষের ক্যামেরা যেমন বৈশিষ্টহীন, আলী আকবরের সংগীত সৃষ্টিও অনভিনব। উত্তমকুমার প্রতাপ সিং চরিত্রে যে-ব্যক্তিত্ব আরোপ কোরেছেন, তার মধ্যে মামামরসুলভ লঘুতা লক্ষ্যে পড়ে। চরিত্র বিশ্লেষণের তেমন গভীরতা নেই। তবু তাঁর অভিনয় অনেকেরই ভাল লাগবে। বিকাশ রায় তাঁর নিজস্ব ঢঙেই চরিত্র ফুটিয়েছেন। অনুপকুমারের অভিনয়ও আনন্দ দেবে অনেককে। ক্লীব রাজার ভূমিকায় বীরেশ্বর সেন যথাযথ। অঞ্জনা ভৌমিক মোটামুটি মানিয়ে নিয়েছেন তাঁর চরিত্রের সংগে।

—'সব'।

সাময়িক প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গে অশান্তির প্রশ্ন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখপাত্র মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রণ্টের মধ্যে মীমাংসার সূত্রটা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাচ্ছে। সুতরাং একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়ার মধ্যে জনসাধারণের দিন কাটছে। একদিকে খাদ্যসমস্যাকে কেন্দ্র করে, অপরদিকে বামপন্থী দলগুলির দাবী এবং সরকারী নীতি ও প্রকৃতির প্রতি ক্ষুব্ধ অসন্তোষ নিয়ে, এবং সরকার-পক্ষের ভ্রান্তিবিলাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত অশান্তির উদয় হয়েছে। অনেক দুর্ভোগ ও হাঙ্গামা সহ্য করে অনেক খেসারত দিতে হয়েছে জনসাধারণকে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সেনের সঙ্গে বামপন্থী নেতৃবৃন্দের সাম্প্রতিক আলাপ-আলোচনার ব্যর্থতার পর প্রচারিত হয়েছে, আবার ২৯এ মার্চ প্রতিবাদ ও মিছিল-দিবস উদ্‌যাপিত হবে, আবার সর্বাত্মক হরতাল হবে ৬ই এপ্রিল।

সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রণ্টের এই সংকল্প আমরা সমর্থন করতে পারি না। গত ১০ই মার্চ ও তার পরবর্তী দিনগুলির অভিজ্ঞতা আমাদের যথেষ্টই আছে। আমরা জানি, অশান্তি, অনিশ্চয়তা ও অস্বাভাবিকতা কারো কাম্য নয়—সরকারও চান না, বিরোধী দলগুলিও চান না। বিরোধী দলগুলি যে আপোস বিরোধী তার প্রমাণ পাওয়া যায় নি, বরং আপোসের ব্যাপারে তাঁরা যথেষ্টই উৎসাহ দেখিয়েছেন। সরকার-পক্ষে শ্রী সেনও তাঁদের সঙ্গে একটা শুভ মীমাংসার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছেন তাও আমরা স্বীকার করি। কিন্তু উভয় পক্ষের মধ্যকার ফাঁকটুকু বর্তমান সঙ্কটজনক অবস্থাতেও থেকে যাচ্ছে। স্বাভাবিক অবস্থা হলে শ্রী সেন হয়তো মীমাংসায় আগ্রহী না হতে পারতেন, হয়তো স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মাভিমান তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখত, কিন্তু বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আন্তরিকতা নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন একথা আমরা অস্বীকার করব না।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনার পর গত ২৩এ মার্চ বামপন্থী ফ্রণ্ট জানিয়েছেন, তাঁদের সর্বনিম্ন দাবীর ব্যাপারে সরকারের মনোভাব জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যে পত্র দিয়েছেন তাতে তাঁরা মোটেই সন্তুষ্ট ন'ন— সরকারী নীতির যে সামান্য পরিবর্তন হয়েছে তাতে তাঁদের দাবী মানা হয়নি, জনসাধারণেরও কিছু উপকার হবে না। সুতরাং আবার হরতাল হবে। আমরা বলব, হরতাল ছাড়া আর কি কোন শান্তিপূর্ণ পথ নেই? জানা গেছে, প্রজাসমাজতন্ত্রী দল, ফরওয়ার্ড ব্লক ও রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি তাঁদের কর্মসূচীর সমর্থন করেছেন। বিরোধী দলগুলিতে অনেক নেতা আছেন যাঁরা ব্রিটিশ আমলে নিষ্ঠাবান্ কংগ্রেসকর্মিরূপে দীর্ঘদিন শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম ও আন্দোলন করেছেন—সরকার-পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী নিজেও কংগ্রেসসেবী দেশকর্মিরূপে বহু দুঃখ-কষ্ট ও নিগ্রহ ভোগ করেছেন। জাতীয় ও সমাজ-জীবনের দুর্যোগ ও দুরদৃষ্টের বহু অভিজ্ঞতা তাঁদের আছে। সাধারণ বাঙালী আজ দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত, নানা আঘাত ও প্রতিক্রিয়ায় তাদের সমাজ-জীবনের কাঠামো জীর্ণ হয়ে উঠেছে, শিক্ষার পথ দুর্গম হয়েছে—মোট কথা বহু সমস্যা-বিজড়িত পশ্চিমবঙ্গ এক মহা-দুর্বিপাকের মধ্যে যেন আপন অস্তিত্বটুকু বজায় রেখে চলেছে। কোনো বাঙালী নেতৃত্ব নাই, জনপ্রিয় সবল নেতা নাই যে, এই দুর্গত বাঙালী সমাজকে সংযত ও সংহত করে পরিচালিত করবে। এখন সমস্ত দলীয় নেতৃবর্গের বৃহত্তর আদর্শের অনুপ্রেরণায় মিলিত হওয়া প্রয়োজন—বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসকেই প্রথমে অগ্রণী হতে হবে। বাঙলা কংগ্রেসের অন্তর্বিরোধের আচরে অবসান হওয়া দরকার। কোনো অভিমান ও ক্ষমতালিপ্সার প্রশ্ন না থাকাই উচিত। সব-দলের মিলনের মধ্যে যে কর্মসূচীর প্রণয়ন হবে তার কার্যকারিতায় সমস্ত সমস্যার নিশ্চিত পরিসমাপ্তি হবে।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যসঙ্কট

ভারতীয় সংসদের বাজেট-বিতর্কে সম্প্রতি আচার্য কৃপালনী কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষয়িক ও খাদ্যের নীতি নিয়ে যে বক্তৃতা করেছেন, সুচিন্তিত বিচার-বিশ্লেষণে ও যুক্তি দিয়ে যে তাঁর সমালোচনার অবতারণা করেছেন, ভারতীয় আইনসভার ইতিহাসে তার তুলনা কম বললে অত্যুক্তি হবে না। সরকারের খাদ্যনীতির যে মূল সত্যটুকু তিনি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে উদ্‌ঘাটিত করেছেন এমনভাবে সরকারী নীতিকে আঘাত বহুকাল দেখা যায় নি। ১২৬৬

সালের দুর্ভিক্ষ ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের পরোক্ষ সৃষ্টি, বাঙলায় তাতে ত্রিশ লক্ষ লোকের অনাহারে জীবনহানি ঘটেছিল, তাতে ব্রিটিশের দুঃশবোধের বালাইটুকু না থাকলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী যে ক্রমাবর্ধ খাদ্যাভাব ও খাদ্যনীতির ত্রুটিগুলি নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে প্রকট হয়ে রয়েছে, তার কোন সুষ্ঠ ব্যবস্থা দীর্ঘ উনিশ বছরেও সম্ভব হয়নি। খাদ্যের ব্যাপারে আমাদের দেশ স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়, স্বয়ংক্রিয় হওয়ার কোন বাস্তব প্রচেষ্টাও নাই। একেই খাদ্যাভাবে সহজ জীবনযাপনে অগতি, তার উপর নিত্যব্যবহার্য জিনিসগুলির দামের নিত্য উর্দ্ধগতিতে মধ্যবিত্ত সমাজ বিব্রত হয়ে উঠেছে।

ভারতের মত একটা বিরাট দেশ লোকসংখ্যায় যা পৃথিবীর দ্বিতীয়, তার পক্ষে খাদ্যের ব্যাপারে চিরকাল পরনির্ভর হয়ে থাকা কাজের কথা নয়। দেশের খাদ্যসঙ্কটের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকেই অনেকাংশে দায়ী করা যেতে পারে। একদিকে খাদ্যশস্য এবং অপরাপর খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্য প্রস্তুতের উপকরণগুলির উৎপাদনে বাস্তব ব্যবস্থার অভাব, অপরদিকে মুনাফাসন্ধানী ও মজুতদারদের যে তৎপরতা আমাদের জনসাধারণ ও সামাজিক শান্তিকে বিব্রত ও বিপন্ন করে তুলেছে তার কোন সুরাহা সরকার করতে পারেননি। বড় বড় প্রকল্পের রূপায়ণ হওয়ায় আত্মগরিমার কথা শুনে সাধারণ জনের লাভ নাই—তারা বেঁচে থাকবার পথ চাইবেই। শস্যোৎপাদনে ঘাটতি যখন থেকেই যায়, তখন প্রগতিশীল জাতীয় সরকার বিকল্প পুষ্টিকর খাদ্যোৎপাদনে তৎপর হন। কিন্তু যেটুকু পুষ্টি-কর জিনিস পাওয়া সম্ভব, সেটুকুতেও প্রচুর ও অস্বাভাবিক ভেজাল। এই পাপজনক সমাজবিরোধী ব্যবসা রোধের কোনো ব্যবস্থা নাই। মুনাফাদারদের এই অতিলোভী পাপাসক্তিকে সংযত করবার জন্য কোন কঠোর আইন রচনা ও তার প্রয়োগের ব্যবস্থা হয়নি। মজুতদার আপনার স্বার্থসাধনে জাতিকে সঙ্কটের মুখে ঠেলে দিলেও তার চরম শাস্তির প্রয়োজন হয়নি। বিগত হাঙ্গামায় অনেকের জীবনাহুতি ঘটেছে, অনেকের শাস্তি হয়েছে—এগুলির প্রয়োজনীয়তাও ছিল। হাঙ্গামাকারীদের চেয়েও মুনাফাদার ও মজুতদারদের অপরাধ কি কোন অংশে কম? শোনা গেছে, কোন কোন দেশে ভেজালদার অপরাধীকে ধরে এনে উন্মুক্ত প্রকাশ্য স্থানে চরম শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আর আমাদের দেশে, তারা অবাধে চরে বেড়ায়। হয়তো কোন মুনাফাখোর ও মজুতদারকে ধরা হলো এবং হয়তো তার কিছু শাস্তিও হলো, কিন্তু বড় বড় রাঘব-বোয়াল মহাসুখেই আছে, তাদের সাত-খুন মাপ।

সরকারী প্রশাসনে দক্ষতার পরিচয় বড় একটা পাওয়া যায় না, বরং অকর্মণ্যতাই বেশী। যে সর্ষে নির্ভেজাল ও উপযুক্ত হবে সেই সর্ষেতেই তো ভূত ছাড়ানো যায়। না হলে, ভূতের উপদ্রব বাড়বেই। আর রোজা যদি নির্লিপ্ত উদাসীন থাকে, ভূত তখন অদম্য উৎসাহে মেতে যায়। সুতরাং মুনাফাখোর ও মজুতদারদের স্বার্থপরতা ও উপদ্রব যে বাড়বে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে!

পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রের ঔদাসীন্য ও কর্তব্যহীনতা যে যথেষ্ট সে বিষয়ের অবতারণাও এখানে করা দরকার। সমগ্র ভারতের রাজ্যগুলির বিন্যাস-ব্যবস্থা ও লাভ-ক্ষতির বিচার করলে, একমাত্র কেবল বাদে, পশ্চিমবঙ্গকেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে সবচেয়ে বেশী। এই পশ্চিমবাঙলাই সমগ্র ভারতের প্রয়োজনে তার আবাদী জমির একটা মোটা অংশ অর্থকরী ফসল চাষের জন্য ছেড়ে দিয়েছে এবং তার জন্য চিরস্থায়ী শস্যোৎপাদনের ঘাটতি ঘাড়ে নিতে হয়েছে। এদিকে মোট জনসংখ্যা যেখানে সাড়ে-তিন কোটি, তাদের মধ্যে পূর্ববঙ্গ হতে আগত বাঙালী জনের সংখ্যা প্রায় ৩৮ লক্ষ এবং অন্যান্য রাজ্যগুলি হতে আগত ৫৫ লক্ষ। সমগ্র ভারতের স্বার্থ ও সংহতির পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গকে এই অস্বাভাবিক চাপ সহ্য করতে হচ্ছে। 'সোনার বাঙলা' নামেই আছে এবং জমির সদ্ব্যবহারে এখনও বাঙলা অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে পুরোধা। কিন্তু এতগুলি জনের অন্ন-সংস্থান করতে যে চাষোপযোগী জমির প্রয়োজন, সে জমি তার নাই। যে-সমস্ত জায়গা চাষ করলে এই রাজ্যে শস্যোৎপাদনের অনেকটা ঘাটতি পূরণ হতে পারত সেই বারো হতে চৌদ্দ লক্ষ একর জমি তাকে চা ও পাট-চাষের জন্য ছেড়ে দিতে হয়েছে। এই রাজ্যেরই উৎপন্ন পণ্য দিয়ে বৎসরে দু'শো কোটি টাকারও বেশী বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন হয়; খাদ্য আমদানীর জন্য তার শতকরা ১৫ ভাগ ছেড়ে দিলেও এই রাজ্যের খাদ্যসমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান হতে পারে। ভাষার ভিত্তিতে অন্যান্য রাজ্যে সীমানা পুনর্বিন্যাসের ব্যবস্থা হতে পারে, কিন্তু এখানে তা হবার উপায় নাই। তবুও যে-সমস্ত অঞ্চল ব্রিটিশের কারসাজীতে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল সেগুলি ফেরত পেলেও বাঙলার অনেকটা দুঃখ মিটতে পারত। সুতরাং বাঙলার খাদ্যসঙ্কটে কেন্দ্রের দায়িত্ব যে কতখানি এবং সেই দায়িত্ব পালনে ভারত-সরকারের

অন্ততঃ নৈতিক আদর্শে কতখানি কর্তব্যপর হওয়া দরকার তা অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রণালয় সংবাদ পেয়েছেন, অন্ধ্র, উড়িষ্যা ও পঞ্জাবে প্রচুর গম ও চাল এবং রাজস্থানে মোটা দানার শস্য উদ্বৃত্ত পড়ে রয়েছে, অথচ জাতীয় লেভি-ব্যবস্থা প্রযুক্ত হয়নি। এই খাদ্যশস্য সময়মত সংগ্রহ না হওয়ায় এক অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। একটা সঙ্কটজনক অবস্থায় সংগ্রহ ও বণ্টনের এ এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত। খাদ্যশস্যের অভাব বলে কেন্দ্রীয় সরকার সারা বিশ্বে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ছুটাছুটি করছেন এবং সাহায্যও অবশ্য পেয়েছেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা যত কমই হোক না কেন, নিজেদের উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলি হতে খাদ্যশস্য নিশ্চয়ই সংগৃহীত হওয়া উচিত এবং অবিলম্বে তা ঘাটতি অঞ্চলে প্রেরণ করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজন আমরা সেখানে সর্বাধিক বলেই মনে করি। এদিক দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের গাফিলতি অগৌরবের।

যা হোক, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের খাদ্য ঘাটতিটুকু মিটিয়ে দিলেই আমাদের সঙ্কটের প্রতীকার হতে পারে। ছোড়া নাক্স পথা। এ-রাজ্যে জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে, সেই অনুপাতে চাপও বাড়ছে। এই চাপ-সৃষ্টির পথ রোধ করাও এই রাজ্যের কাজ। খাদ্য-শস্য ও খাটবার প্রশ্ন যেখানে বড় সেখানে নিরর্থক বিতর্কের সৃষ্টি না করে ও উত্তরোত্তর দুর্বহ করের বোঝা না চাপিয়ে এই রাজ্যের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হলেই মঙ্গল। আমাদের সমস্যা-সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকেই চাপ দিতে হবে—বাঙলার সঙ্কটত্রাণের দায়িত্ব মুখ্যতঃ তাদের। খাদ্যের প্রয়োজনে ও অখাদ্যের প্রাদুর্ভাবে যে নৈরাশ্য আজ জাতীয় জীবনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে তার পরিণতি শুভদায়ক হবে না। রাজ্য সরকার জনসাধারণের ধৈর্যের উপর যতটা চাপের সৃষ্টি করছেন তার চেয়েও বেশী চাপ কেন্দ্রীয় সরকারকে দিলে ফল ভালই হবে—মাত্র একটা অনুগ্রহের চিন্তা থাকা কখনই বাঞ্ছনীয় নয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে অচল অবস্থা

পশ্চিমবাঙলায় শিক্ষার ক্ষেত্রেও এক অবাঞ্ছিত অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। স্কুল-কলেজ অনির্দিষ্ট কাল বন্ধ হয়ে রয়েছে; সেকেণ্ডারী বোর্ডের পরীক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি স্থগিত আছে—কবে হবে তার স্থিরতা নাই। ফেব্রুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহ হতে ছাত্র আন্দোলনের সূচনা এবং পরিণামে ১০ই মার্চ সর্বাত্মক হরতাল ও তার পরবর্তী ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তদুপরি অধ্যাপকেরা অসন্তুষ্ট; পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৪০ টাকা হিসাবে অতিরিক্ত মাসিক বেতন-দানের সিদ্ধান্ত এবং শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলার সঙ্গে অধ্যাপকদের আলোচনা কোনটাই ফলপ্রসূ হয়নি। অধ্যাপকেরা যে পরীক্ষা-বর্জন নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা অপরিবর্তিতই আছে।

বিগত ১লা মার্চ হতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি পরীক্ষা শুরু হবার কথা ছিল, কিন্তু তা ক্রমাগত পিছিয়ে এখন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়েছে। এর পরিণাম যে সুদূরপ্রসারী তা খুলে বলার প্রয়োজন হবে না। এর উপর স্কুল ফাইনাল ও হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষারও প্রশ্ন আছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে অনেকগুলি পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। একটা পিছিয়ে গেলে পরের গুলিও পিছোতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত সবটি রক্ষা করা সঙ্গীন হয়ে উঠবে। স্নাতক পরীক্ষার ত্বরান্বিত না হলে, স্নাতকোত্তর ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। স্কুল ফাইনাল ও হায়ার সেকেণ্ডারীর পরীক্ষা না হলে কলেজগুলিতে নূতন ছাত্র আসবার সম্ভাবনা নাই। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলি যে এক অস্বস্তিকর অস্বাভাবিক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

পরীক্ষার্থী ছাত্রদের মধ্যেও এক গভীর নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়েছে। অনেকেই অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়েছে—এরূপ বাধা-বিপত্তির জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। অভিভাবকদের উদ্বেগের সীমা-পরিসীমা নাই। একেই তো দৈনন্দিন জীবনের অভাব-অভিযোগ ও দুঃখ-বেদনায় অধিকাংশ অভিভাবক বিব্রত, তার উপর বহু কষ্টার্জিত অর্থ যোগান দিয়ে শেষ পর্যন্ত এই অনিশ্চিত অবস্থার সামনে এসে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

শিক্ষা-বিজ্ঞানের একটা তত্ত্ব আমরা জানি, ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহের একটা সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করা শিক্ষাবিদদের একটা বড় কাজ। শিক্ষার যাঁরা ধারক ও বাহক তাঁদের যেমন একটা দায়িত্ব আছে, রাষ্ট্রেরও তেমনি দায়িত্ব আছে যথেষ্ট। একেই শিক্ষক-সমাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষালাভের উদগ্র বাসনা জাগিয়ে তোলার মত অবস্থা সৃষ্টি করেন না বা করবার অবসর পান না, তদুপরি এমন অবস্থার সৃষ্টি হওয়া উচিত নয় যাতে ছাত্রদের উৎসাহ ভঙ্গ হতে পারে। আসক্তি না এলে স্বভাবতঃই পড়াশোনায় ঝোঁক থাকে না।

ফলে শিক্ষার অবনতি হচ্ছে, ছাত্রেরা রাজনৈতিক কার্যকলাপে অধিকতর ঝুঁকে পড়ছে। তাদের উপযুক্ত পথে পরিচালিত করা শিক্ষক-সমাজের একটা নৈতিক কর্তব্য। এই সমস্ত দিক বিচার করলে পরীক্ষা ক্রমাগত স্থগিত হয়ে চলা সমীচীন নয়। এদিক দিয়ে রাষ্ট্রের কর্তব্য আরো বড়। ছাত্রেরা রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ—এখানে রাজনীতির সংস্রব থাকা ঠিক নয়। রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে ছাত্রদের প্রতি অভিভাবকসূচক দৃষ্টি রাখা রাষ্ট্রের উচিত। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক-সমাজের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা না থাকলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

জানা গেছে, বামপন্থী নেতৃবর্গের মধ্যে কয়েকজন এখনই স্কুল কলেজ খুলতে চান না। তাঁরা চান প্রথমে আন্দোলনের সামগ্রিক সমাধান। মাধ্যমিক শিক্ষকেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি খুলতে চান বটে, তবুও বামপন্থী নেতৃবর্গের শর্তগুলির সমর্থন করছেন। স্কুল খোলার ব্যাপারেও রাজনীতিকে নিয়ে আসা খুবই দুঃখের বিষয়। রাজ্য সরকার স্কুল-কলেজ খোলার মনঃস্থির করতে পারছেন না—তাঁদের আশঙ্কা যথেষ্ট। ছাত্র-সমাজের সম্পূর্ণ অংশ না চাইলেই বামপন্থী নেতারা হয়তো তাদের আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাতে পারেন এই ভীতিই হয়তো সরকারের রয়েছে। হয়তো একটা বিভ্রান্তি সরকারের এই নীতিকে প্রভাবিত করছে।

অধ্যাপকদের পরীক্ষা বর্জনের নীতি এখন যে কতটা সঙ্গত তা আমরা জানি। দাবীর একটা অংশ যখন মেনে নেওয়া হয়েছে অথবা একটা সাহায্যের ব্যবস্থা হয়েছে, তখন অন্ততঃ পরীক্ষা-বর্জনের সিদ্ধান্ত বর্জন করাই উচিত ছিল। এতে পরীক্ষার্থী ছাত্রসমাজের যেমন ক্ষতি হচ্ছে, শিক্ষাকেন্দ্রগুলিও তেমনি যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এ বিষয়ে শান্তর অবস্থা বিবেচনা করে শুভবুদ্ধি নিয়ে রাজ্য-সরকারকে এগিয়ে আসতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নেতৃবর্গ সমগ্র অবস্থাটা পর্যালোচনা করে সম্যক পথ অবলম্বন করবেন এই আমাদের আশা।

প্রেসিডেন্ট সুকার্নো ও ইন্দোনেশিয়া

—কালপুরুষ

কয়েক বছর আগে ইন্দোনেশিয়ানদের কাছে যা ছিল একটা অসম্ভব এবং অবাস্তব ঘটনা—অবশেষে তাই বাস্তবে পরিণত হ'ল এবং পরিণত হল অত্যন্ত করুণভাবে। মহারণ্যে বনস্পতির অকাল মৃত্যু যেমন একটা বিশাল ট্রাজেডির অবতারণা করে, তেমনি প্রবলতম ট্রাজেডির সৃষ্টি হয়েছে সারা ইন্দোনেশিয়া জুড়ে—যখন খবরটা রটে গেল যে, প্রেসিডেন্ট সুকার্নো সমস্ত ক্ষমতা জেনারেল সুহার্তোর হাতে তুলে দিয়ে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। নামে প্রেসিডেন্ট থাকলেও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হবেন জেনারেল সুহার্তো এখন থেকে।

সুতরাং দীর্ঘ ষোল বছর পর অবশেষে প্রেসিডেন্ট সুকার্নোর রাজনৈতিক মৃত্যু হ'ল। ইন্দোনেশিয়ার আকাশ থেকে বুঝি একটা দেদীপ্যমান সূর্য অস্ত গেলেন। প্রেসিডেন্ট সুকার্নোর উত্থান-পতনের ইতিহাসের সঙ্গে আজকের ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসও বিজড়িত।

প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগরের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বে অনেকগুলো ছোট-বড় দ্বীপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সংখ্যায় এগুলো হবে প্রায় হাজার তিনেক। সবচেয়ে বড় দ্বীপটির নাম যবদ্বীপ। সুদীর্ঘ কাল আগে থেকে বহির্ভারতীয় এই সব দ্বীপগুলোর সঙ্গে ভারতের নিকট-সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি এই সব দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তী কালে বৌদ্ধ এবং মুসলিম ধর্মও ভারত থেকে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপগুলিতে অনুপ্রবেশ করেছিল। আজও এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মুসলিমদের সংখ্যা অধিক। মালয় উপদ্বীপ থেকে সুরু করে ইন্দোনেশিয়ার শেষ দ্বীপটি পর্যন্ত প্রধান প্রচলিত ভাষা হচ্ছে মালয়ি। কারণ এক সময় এই সমগ্র অঞ্চল ছিল শ্রীবিজয় (Srivija) সাম্রাজ্যের অধীন। পরবর্তী কালে এই সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। সেদিনকার হিন্দু, বৌদ্ধের

বীর্য-গাথা আজও ইন্দোনেশিয়ানরা স্মরণ করে থাকেন।

আজকের ইন্দোনেশিয়ায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজরা উপনিবেশ স্থাপন করে। প্রথমে ওরা এসেছিল বণিক হিসাবে। তারপর সুলতানকে পরিচ্যুত করে সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। বালিদ্বীপের অধিবাসীরা তীর-ধনুক আর বর্শা নিয়ে ওলন্দাজ সৈন্যদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল—কিন্তু বন্দুকের সামনে সামান্য তীর ধনুক নিয়ে লড়াই করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য বণিক ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে যবদ্বীপ-সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপের অধিবাসীরা অনেকদিন ধরে গোপনে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়েছিল।

'বনজ এবং খনিজ সম্পদে ইন্দোনেশিয়া সম্পদশালী।'

'ওলন্দাজ বণিকরা তিনশ বছরের উপর এই সম্পদ শোষণ করেছে।' আর ইন্দোনেশিয়ানরা দারিদ্র্য ও অশিক্ষার অন্ধকারে বাস করতে বাধ্য হয়েছে। 'ধর্মীয় অনৈক্য থাকার ফলে ইন্দোনেশিয়ানরা বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে নি।' এ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে পরে। জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছে এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষ দিকে। আর জাতীয় ভাবধারার প্রবক্তা হ'চ্ছেন আজকের কর্ণধার প্রেসিডেন্ট সুকার্নো।।

সুকার্নোর মা ছিলেন বালিদ্বীপের এক হিন্দু রমণী আর বাবা ছিলেন জাভানীজ খানদানি বংশের মুসলমান। ইন্দোনেশিয়ার দুটি প্রধান ধর্মের, সভ্যতার ও সংস্কৃতির ধারা সুকার্নোর মধ্যে। তাই সুকার্নোর মন থেকে ধর্মীয় গোঁড়ামির ভাবটুকু লোপ পেয়েছে। এরপর সুকার্নো যখন ইউরোপে পড়াশুনা করছেন তখন সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণীর মধ্যে তাঁর মন উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। ওখানে তখন নবীন সাম্যবাদী রাশিয়া খুঁড়িয়ে চলবার লাঠি দিয়ে ছুটে চলবার পথ বানাচ্ছে। এশিয়াও পিছিয়ে নেই। ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, সান-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে মহাচীনের ঘুম ভেঙেছে। তরুণ ছাত্র সুকার্নো সব দেখে শুনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ফিরলেন জন্মভূমিতে।

এবার প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে সুকার্নো জড়িয়ে পড়লেন। সেটা ১৯২৮ সাল। ধীরে ধীরে জাতীয় ভাবধারা ছড়িয়ে পড়তে লাগল হাজার হাজার দ্বীপের অধিবাসীদের মনে। এমনিভাবে ইন্দোনেশিয়ান ন্যাশনালিষ্ট পার্টি গড়ে তোলার আগেই স্বদেশবাসীর মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন সুকার্নো।

সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার ভূমির পরিমাণ হচ্ছে প্রায় সাত লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার আট শ' বর্গমাইল। আর এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় দশ কোটি। ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন মুসলমান। অর্থাৎ প্রায় ন' কোটি মুসলমান এখানে বাস করেন। শিক্ষিত, ধনী ও মধ্যবিত্ত মুসলমানদের শক্তিশালী সংগঠনটির নাম নাহদাতুল উলেমা (Nahadatul Ulema)। সাম্প্রদায়িকতাবাদী ভারতবিরোধী এই সংগঠনটি অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল। ইন্দোনেশিয়ার সব চেয়ে সংগঠিত ও শৃঙ্খলাপরায়ণ রাজনৈতিক দল হচ্ছে ইন্দোনেশীয় সাম্যবাদী দল (P K. I.)। ত্রিশ লক্ষ সভ্য নিয়ে উহা গঠিত। বিশ্বের বৃহত্তম সাম্যবাদী দলগুলির মধ্যে তৃতীয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইউরোপীয় শাসকদের উৎখাত করতে সক্ষম হয়। সমগ্র ইন্দোনেশিয়া জাপান অধিকার করে নেয়। সুকার্নোর নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়ার মুক্তি-যোদ্ধারা তখন একতাবদ্ধ। জাপানীদের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ানরা অবিরাম লড়াই চালিয়ে (১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত) দেশকে স্বাধীন করলেন। কিন্তু তখনও পুরাপুরি স্বাধীনতা তাঁরা লাভ করেন নি। মার্কিন সামরিক সাহায্যে পুষ্ট হয়ে ওলন্দাজরা হারানো সাম্রাজ্য আবার অধিকার করার জন্য সচেষ্ট হল। আরও চার বছর ধরে ওলন্দাজদের সঙ্গে যুদ্ধ করার পর জাতীয়তাবাদী ইন্দোনেশিয়ানরা স্বাধীনতা অর্জন করলেন। ১৯৪৯ সালের ২রা নভেম্বর ওলন্দাজদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হল এবং ২৭শে ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হল।

সুকার্নো হ'লেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।।

এ'র কয়েক মাস আগে ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি এক বিপ্লব সংগঠিত করেছিল। মজুর এবং কৃষাণদের উপর এই দলের অপ্রতিহত প্রভাব—বিশেষ করে মধ্য জাভার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই দল অত্যন্ত সক্রিয়। কিন্তু সামরিক বাহিনীর উপর সুকার্নোর প্রভাব কম্যুনিষ্টদের বিপ্লব প্রচেষ্টা চূর্ণ করল।

সমস্ত শাসন ক্ষমতা হাতে তুলে নিলেন সুকার্নো।

ইন্দোনেশিয়ার বুকে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য সব ক'টি দলের সদস্য নিয়ে এক বিরাট মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। এমন কি সামরিক বাহিনী থেকেও সদস্য নেওয়া হল। তাঁর

আদর্শ হ'ল নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র। সর্বদলের মধ্যে সমন্বয়ের এই মতাদর্শকে বলা হল—নাসাকম। ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতির আসরে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রেসিডেন্ট সুকার্নো হলেন ভারসাম্য-স্বরূপ।

সংবিধান-বলে নিজের ক্ষমতাকে আরও সুনিশ্চিত ও সুরক্ষিত করার জন্য ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে এক আইন প্রবর্তিত হল। তা'তে ঘোষণা করা হল যে, প্রেসিডেন্ট সুকার্নো আমৃত্যু যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধার থাকবেন। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র রূপায়িত হল একনায়ক-তন্ত্রে। নির্বাচনের মাধ্যমে নয়, সংবিধান বলে দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেন প্রেসিডেন্ট সুকার্নো।

আজকের ইন্দোনেশিয়াকে জানতে হলে তার সামরিক সংগঠনকে ভালভাবে জানতে হবে। কারণ লড়াই করে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে ইন্দোনেশীয় সামরিক বাহিনী। প্রথমে লড়াই করতে হয়েছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে—তারপর ওলন্দাজদের সঙ্গে। ফলে এদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা মুখ্য। সব দলের প্রভাব রয়েছে সামরিক বাহিনীর উপর এবং সব দলের অনুগামী রয়েছেন সামরিক বাহিনীতে। ফলে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে সাধারণ সৈনিক ও সৈন্যাধ্যক্ষদের। ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনীতে সৈনিকের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় তিন লক্ষ। বিমান-বাহিনী খুবই শক্তিশালী। রাশিয়ার দেওয়া মিগ-বিমানও রয়েছে। আর আছে চার শ' জঙ্গী বিমান। চারিদিকে সমুদ্র-ঘেরা, তাই স্বাভাবিকভাবে ইন্দোনেশিয়াকে এক বিশাল নৌবাহিনী গড়ে তুলতে হয়েছে। ক্রুজার-ডেস্ট্রয়ার-সাবমেরিন-মাইন-সুইপার সমন্বিত নৌবাহিনী ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগর তোলপাড় করে ঘুরে বেড়ায়। এশিয়ার বুকে ইন্দোনেশিয়া নিঃসন্দেহে উল্লেখ-যোগ্য সামরিক শক্তির অধিকারী।

বিরোধী শক্তিগুলোর মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করে দেশের মধ্যে সাময়িকভাবে শান্তি রচনায় সফল হলেও প্রেসিডেন্ট সুকার্নো এই শান্তিকে চিরস্থন করতে পারেন নি। নাহাদাতুল উলেমা এবং বামপন্থী সাম্যবাদী দলগুলো সব সময় ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টায় রত ছিল। এর উপর সামরিক বাহিনীতে একদল প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণ-পন্থী রাজনৈতিক ধীরে ধীরে শক্তি আহরণ করছিলেন। বামপন্থী সাম্যবাদীদের সবচেয়ে বড় ভরসা ছিল সাম্যবাদী চীন। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত চীনা অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এই দল গেরিলা-বাহিনীকে সংগঠিত করছিল।

দেশের মধ্যে এই যে পরস্পর-বিরোধী শক্তিগুলো লড়াইয়ের জন্য তৈরী হচ্ছিল তা প্রেসিডেন্ট সুকার্নোর কাছে অজানা ছিল না। মালয়েশিয়া ধ্বংসের ধ্বজা তুলে প্রেসিডেন্ট সুকার্নো অগ্নিগর্ভ ইন্দোনেশিয়াকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। দেশের তীব্র অর্থ-সংকটকে চাপা দেওয়ার মানসে জনতাকে যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে শান্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন তিনি সফল হন নি।

ইতিহাসের অনুশাসন বড় অমোঘ।

আসন্ন বিপ্লবকে বাধা দিতে পারলেন না প্রেসিডেন্ট সুকার্নো। ঝড়ের গতিতে বিপ্লব ঘটিয়ে ইন্দোনেশীয় সাম্যবাদী দল গত বছর ৩০শে সেপ্টেম্বর ক্ষমতা দখল করে নিল। ওদের হাতে বন্দী হলেন প্রেসিডেন্ট সুকার্নো। আর সামরিক-বাহিনীর ছ'জন দক্ষিণ-পন্থী সেনা-নায়ক সাম্যবাদীদের হাতে নিহত হলেন।

কিন্তু এবারও বিপ্লব সফল হল না।

দক্ষিণ-পন্থী সমর-নায়ক জেনারেল নাসুটিয়ান সাতদিনের মধ্যে রাজধানী থেকে সাম্যবাদী সেনাদলকে তাড়িয়ে রাজধানী দখল করলেন। ইন্দোনেশীয় সামরিক বাহিনী সারা দেশ থেকে সাম্যবাদীদের খতম করার জন্য অভিযান সুরু করল। জাকার্তায় অবস্থিত সাম্যবাদী-দলের প্রধান দপ্তর পুড়ে ছাই হয়ে গেল। প্রতিক্রিয়াশীলদের সাহায্যে সামরিক-বাহিনী এক লক্ষ সাম্যবাদীকে হত্যা করল—অনেক সাম্যবাদী নেতা নিহত হলেন। মধ্য জাভার সাম্যবাদীদের শক্ত ঘাঁটিগুলোও অধিকৃত হল।

জেনারেল নাসুটিয়ান একদিকে যেমন দৃঢ়হস্তে বিপ্লবীদের নিশ্চিহ্ন করছিলেন তেমনি অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট সুকার্নোকে অসামরিক শাসন ক্ষমতা বজায় রাখতে সাহায্য করছিলেন। কিন্তু মনে-প্রাণে সমাজতন্ত্রবাদী প্রেসিডেন্ট সামরিক কর্তাদের এই সাম্যবাদ নিধনযজ্ঞকে পুরাপুরি সমর্থন করতে পারছিলেন না। চীন সমর্থক পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুবান্দ্রিও তখনও ক্ষমতায় আসীন ছিলেন। এমন কি প্রেসিডেন্ট নিজেই ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি নতুনভাবে সাম্যবাদীদল সংগঠিত করবেন। সামরিক কর্তাদের কাছেও তিনি নির্যাতন বন্ধ করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার বুকে দুটি বিরোধী শক্তি আজ পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। একদিকে দক্ষিণ-পন্থী সামরিক-বাহিনী আর অন্যদিকে বিপ্লব-পন্থী সাম্যবাদী দল। গৃহযুদ্ধ চলছে এবং চলবে। আর এ যুদ্ধ

দীর্ঘকাল ধরে ইন্দোনেশিয়ার নগরে, গ্রামে, বনে-প্রান্তরে আগুন জ্বালিয়ে রাখবে। কাজেই সাম্যবাদ নীতির জন্যই প্রেসিডেণ্ট সুকার্নোর হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করেছে ইন্দোনেশিয়ার ফৌজী-সরকার। জেনারেল সুহার্তো আজ নতুন সরকারের প্রধান কর্ণধার। সাম্যবাদ-বিরোধী সেনানায়ক সুহার্তোকে রাজধানীর মুসলিম মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অভিনন্দন জানিয়েছেন। সামরিক শাসনে রাজধানীর অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসছে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার মজুর ও কৃষাণদের মধ্যে আগুন এখনও নেভেনি। সাম্যবাদীদের প্রভাব আজও তাদের মধ্যে এতটুকু শিথিল হয়নি। দুটি বিরোধী শক্তি আগামী দিনে আবার লড়াই করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। এমন অবস্থায় প্রেসিডেণ্ট সুকার্নোর প্রয়োজন বাহুল্য মাত্র।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নববর্ষে পুরুষোত্তম অস্থিতীর্থ মহাযজ্ঞ

সৎসঙ্গের প্রেসিডেণ্ট শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাচ্ছেন যে, আগামী ৩১শে চৈত্র, ১৪ই এপ্রিল হইতে ৩রা বৈশাখ, ১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত দেওঘর সৎসঙ্গ আশ্রমে নববর্ষ সম্মেলন ও পুরুষোত্তম অস্থিতীর্থ মহাযজ্ঞ এবং ওইসঙ্গে সৎসঙ্গের ১১২তম ঋত্বিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। দেশবাসী সকলকে যোগদান করবার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। অনুষ্ঠান-সূচী নিম্নরূপ: ৩১শে চৈত্র, সকাল ৮-৩০ মিঃ—পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থি যাত্রা ও সুদীর্ঘ জীবন এবং বিশ্বশান্তি কামনায় মহামঙ্গলানুষ্ঠান, সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ—নববর্ষ উৎসবের উদ্বোধন ও সাধারণ সভা, বিষয়—বিশ্ব মানবের সর্বাঙ্গীন কল্যাণে মহামানবের অবদান। রাত্রে—বিচিত্রানুষ্ঠান। ১লা বৈশাখ—সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর সমীপে প্রার্থনা, নববর্ষের আশীর্বাণী গ্রহণ ও অর্ঘ্যাঞ্জলি নিবেদন। তৎপর সাধারণ সভা, বিষয়—সুস্থ ও সবল জাতিগঠনে স্বাস্থ্য ও সদাচারের প্রয়োজনীয়তা। সন্ধ্যায় সাধারণ সভা—বিষয় দেশ ও জাতিগঠনে ভারতীয় সমাজতন্ত্রের আদর্শ। রাত্রে—যাত্রাভিনয়। ২রা বৈশাখ সকাল ৮ ঘটিকায় সাধারণ সভা, বিষয়—জাতীয় অভ্যুদয়ে সাহিত্যের প্রভাব। সন্ধ্যায় সাধারণ সভা, বিষয়—জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার আদর্শ। রাত্রে—যাত্রাভিনয়। ৩রা বৈশাখ সকাল ৮ ঘটিকায় ও সন্ধ্যায় ঋত্বিক-সম্মেলন। প্রত্যহ মধ্যাহ্নে নরনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যোগদানেচ্ছু প্রত্যেককে বিছানা ও অন্যান্য ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য ও কলেরা হবার পূর্বেই সংক্রামক ব্যাধির প্রতিষেধক গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। উৎসবের এবং নরনারায়ণ সেবার জন্য অর্ঘ্যাদি উৎসব কমিটি কর্তৃক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত হবে। এই উপলক্ষে একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছে।

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

আগামী ২২, ২৩ ও ২৪শে এপ্রিল ভারতীয় ধর্ম ও কৃষ্টির মূলকেন্দ্র, পুরুষোত্তম লীলা-তীর্থ শ্রীধাম বৃন্দাবনে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ৪০তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। 'অমৃতবাজার' ও 'অমৃত' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ এই অধিবেশনের মূল সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। মথুরা ও বৃন্দাবনের বিশিষ্ট বাঙ্গালী ও স্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়েছে। এই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন আচার্য বিশ্বম্ভর গোস্বামী।

• সাহিত্য-বার্তা •

ভারতে গ্রন্থপ্রকাশের পরিসংখ্যান

শ্রীনকুল চট্টোপাধ্যায় ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারতে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন। ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রদত্ত বইগুলির হিসাব অনুসারে তাঁর গৃহীত সংখ্যা—

রাজ্য	বইএর সংখ্যা
পশ্চিমবঙ্গ	২৬৫২
পঞ্জাব	৯৮০
বিহার	৫৩৫
মধ্যপ্রদেশ	৫৪৯
মণিপুর	১৭
মহারাষ্ট্র	৩১৬৩
মহীশূর	৪৯০
মাদ্রাজ	২৫৬৮
রাজস্থান	১১৭
হিমাচল-প্রদেশ	৪০
অন্ধ্র	৯১৯
আন্দামান-নিকোবর	২
আসাম	২৫০
উত্তরপ্রদেশ	১৫৫৩
উড়িষ্যা	৪৭১
কেরল	৭৫০
গোয়া-দমন দিউ	২
গুজরাট	৯১৭
জম্মু ও কাশ্মীর	১০
ত্রিপুরা	২৪
দিল্লী	৫০৪৮

ভাষা	বইএর সংখ্যা
তেলেগু	৮১৭
পাঞ্জাবী	৫৯৭
বাঙলা	১৩০২
মরাঠা	১৫১৪
মলয়লম	৫৯৫
সংস্কৃত	১৭৭
হিন্দী	২৬৩৩
অসমীয়া	৭৭
ইংরেজী	১০৪৩৮
উর্দু	৩৫২
ওড়িয়া	৩১২
কনাড়ী	৩০৬
গুজরাটী	৯৭২
তামিল	৯১০
অন্যান্য	২৫৩

পুস্তক-প্রকাশে সোভিয়েটের স্থান

ইউনেস্কোর সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী জানা যায় যে বর্তমান বিশ্বে প্রকাশিত প্রতি চারখানা বইয়ের একটি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হয়। অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশনাতেও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র শীর্ষস্থানের অধিকারী—বৃটেনের চেয়ে নয় গুণ এবং আমেরিকার চেয়ে চার গুণ বেশী। গত পাঁচ বছরে বিদেশী লেখকদের রচনাবলীর অনুবাদ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ৩৫.৩ কোটি কপি প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় লেখকদের রচনাবলীও এর মধ্যে রয়েছে।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যা ১২৫ কোটি কপি। সোভিয়েট পাঠক পাঠিকারা প্রত্যহ ৩০৫,০০০ খানা বই ও পত্র-পত্রিকা পান। এই সংখ্যা এ বছর আরও বৃদ্ধি পাবে। দুই শত খণ্ডে 'বিশ্ব-সাহিত্য গ্রন্থমালা' প্রকাশের এক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ১৯৬৭ সালে অক্টোবর-বিপ্লব-বার্ষিকী উপলক্ষে এর প্রথম কুড়িটি খণ্ড প্রকাশিত হবে। গত বছর দশ খণ্ডের বিশ্ব ইতিহাস, সোভিয়েট সমাজতত্ত্ব ও বিশ্বকোষ অভিধান প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীমতী সাবিত্রী সাহনী

লক্ষ্মৌএর বীরবল সাহনী ইনষ্টিটিউট অফ্ প্যালাও বোটানীর সভানেত্রী শ্রীমতী সাবিত্রী সাহনীকে সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়ার সর্বোচ্চ বিজ্ঞান সংস্থা 'সায়েন্স অ্যাকাডেমী' বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করেছেন। ভারতীয় মহিলা বিজ্ঞানীর এই সম্মান সামান্য নয়। সায়েন্স অ্যাকাডেমীর অধ্যাপক শ্রীচাপতাজান ভারতে এসে শ্রীমতী সাহনীর হাতে এই সম্মানসূচক পদকটী প্রদান করেছেন।

ডক্টর শ্রীমতী নবনীতা সেন

ডক্টর শ্রীমতী নবনীতা সেন মৌলিক মহাকাব্য সম্বন্ধে তুলনামূলক গবেষণা করে এই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পোস্ট-ডক্টরেট সিনিয়র ফেলোশিপ লাভ করেছেন। ডক্টর শ্রীমতী সেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ ও ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি.। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পাশ্চাত্য মহাকাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাল্মীকির রামায়ণ মহাকাব্যের আলোচনা করেছেন।

ডক্টর শ্রীমতী আশা দাশ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগে বাঙলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করে শ্রীমতী আশা দাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ফিল্. উপাধি লাভ করেছেন—পালি বিভাগের তিনিই প্রথম মহিলা ডক্টরেট।

সংবাদ-বিচিত্রা

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে, সোভিয়েট রাশিয়া আন্তর-মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের হাত থেকে মস্কো এবং লেনিনগ্রাড শহর রক্ষা করবার জন্য দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ-ব্যবস্থা গড়ে তুলছে। পর্যটকেরা সম্প্রতি এই দুটো মহানগরের আশেপাশে যে-সব রহস্যময় বস্তু নির্মিত হতে দেখেছেন, সেগুলো সব এই প্রতিরোধ-ব্যবস্থারই অঙ্গ। মাঠের মধ্যে বিরাট বিরাট যে-সব কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে, সেগুলি এক ধরনের অতিকায় ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, সম্ভবতঃ রাডার এবং ক্ষেপণাস্ত্র-নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম। আপাতদৃষ্টিতে এই সমস্ত স্থানে ক্ষেপণাস্ত্র রাখা হয়েছে বলে মনে হয় না। ক্ষেপণাস্ত্র যদি থাকেও, তবে তা মাটির নীচে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞেরা মনে করছেন।

• • •

১০ই মার্চ বিধান সভায় লিখিত প্রশ্নোত্তর থেকে জানা গেছে - পশ্চিমবঙ্গে আগামী বছরে গাঁজার উৎপাদন বাড়বে। এই বছর প্রায় ১৪০ কুইন্টাল গাঁজা পাওয়া যাবে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ১২৪.৭২ কুইন্টাল গাঁজা হয়েছিল।

উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ, বেশি জমিতে এখন গাঁজার চাষ হচ্ছে। আগে চাষ ৮৬.৮৬ একর জমিতে, এখন হচ্ছে ১৫৩.২৬ একর জমিতে।

• • •

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাতনামা ব্যক্তিদের মধ্যে এখানকার ছেলেমেয়েরা কাকে কতখানি শ্রদ্ধা করে সাপ্তাহিক 'নিউজ উইক' তার এক হিসাব নিয়ে প্রকাশ করেছেন। হিসাবটী এইরূপ—

		শতকরা	
		ছেলে	মেয়ে
জন এফ কেনেডি	...	৪৭	৫০
আব্রাহাম লিন্কন	...	২১	১৯
জর্জ ওয়াশিংটন	...	১০	৫
বর্তমান প্রেসিডেন্ট জনসন	...	৫	৫
হেলেন কেলার	...	২	৮
উইন্স্টন চার্চিল (যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের অধিকারপ্রাপ্ত)		৪	৪
বিটল্‌স	...	২	৫
জ্যাকুলিন কেনেডি	...	১	৮
বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন	...	৪	১
ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট	...	৪	২
এলভিস প্রিস্‌লি	...	১	৫
ডুইট আইজেনহাওয়ার	...	৪	২
আল্‌বার্ট আইনস্টাইন	...	৩	২

• • •

অবিবাহিত পুরুষেরা বেশ খোশমেজাজে থাকে, কিন্তু কুমারী মেয়েরা হয় খিটখিটে মেজাজের, এই ধারণাই এতদিন ছিল। কালিফোর্নিয়ার বার্কলের মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা সংস্থার মহিলা মনঃসমীক্ষক ডক্টর জেনেভিয়েভ নুপার ৭৮৫ জনের মনস্তত্ত্ব নিয়ে ২৩ বৎসরের অধিককাল গবেষণা করে সম্প্রতি সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বিয়ে না করে পুরুষেরা শান্তি পায় না—তাদের নিয়ে নানা অভিযোগ, সমাজবিরোধী প্রবণতাও তাদের কম বেশী আছে। অপরপক্ষে অবিবাহিতা মেয়েরা বেশ স্বচ্ছন্দেই দিন কাটায়। অবশ্য তাঁর মতে বিবাহিতেরাই সবচেয়ে সুখী। অপেক্ষাকৃত কম ভাবনাচিন্তা নিয়ে তারা বেশ সুস্থভাবে কাজকর্ম করে যায়—মনের জোরও তাদের বেশী। অধিকাংশ স্বামী স্ত্রীর কাছে নিজেদের বড় ভাবতে অভ্যস্ত। আবার স্ত্রী যখন নিজের সাজগোজের চিন্তায় মাথা ঘামাইয়া যান, তখনই অশান্তির সূত্রপাত হয়, তাঁর যত গুণই থাক না কেন স্বামীর আকর্ষণ আর থাকে না—স্বামী তখন কোন শান্ত-শিষ্ট মেয়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন।

• • •

বিশিষ্ট ব্রিটিশ সামরিক লেখক ও ঐতিহাসিক স্যর বেসিল লিডেল-হার্ট সম্প্রতি 'এনকাউন্টার' মাসিকপত্রে যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের রণনীতির সমালোচনা করেছেন। স্যর বেসিলের মতে চার্চিলের চরিত্র ও ব্যক্তিগত কর্মোদ্যম, যাদু তথা রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির প্রতিকূল ছিল। বেহিসেবী দুঃসাহসই ছিল তাঁর রণনীতির ভিত্তি। এছাড়াও স্যর বেসিল বলেছেন যে, চার্চিল

চেয়েছিলেন দ্রুত যুদ্ধ জয় করতে এবং সেজন্য জোর বোমাবর্ষণ। এ যেন চাঁই চাঁই পাথর ছুঁড়তে সক্ষম প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে খুদে-খুদে নুড়ি-নিক্ষেপ। তথাপি ব্রিটেনের রক্ষা পাওয়ার কারণ কি, সে-সম্বন্ধে স্যর বেসিল্ বলেন—আগে রাশিয়াকে পরাস্ত করার জন্য হিটলারের আত্মঘাতী একগুঁয়েমী।

• • •

একটি ভারতীয় অজগরীকে নিউ ইয়র্কের চিড়িয়াখানায় রেখে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয়েছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে অজগরীকে রেখে দেওয়া হল। অজগরী তার ২৩টি ডিমে তা দিতে বসে গেল। দেখা গেল তার দেহের তাপমাত্রা কুঠরীর তাপ মাত্রার চেয়ে ১০ ডিগ্রী বেশী। উষ্ণ-রক্ত প্রাণী যে ভাবে অক্সিজেন ব্যবহার করে থাকে, অজগরীটিও সেই ভাবে অক্সিজেন ব্যবহার করেছে। ডিমে তা দেওয়া শেষ হবার পর সাপটির তাপ কুঠরীর নিয়ন্ত্রিত তাপের সমান হয়ে যায়।

এতদিন জানা ছিল সাপের রক্ত কখনও উষ্ণ হ'তে পারে না। অজগর ইচ্ছে মত নিজ দেহে তাপ সৃষ্টি করতে পারে এবং ডিমে তা দেবার কালে ওরা অনায়াসেই উষ্ণ রক্ত জীব হয়ে ওঠে—বিজ্ঞানীরা এ কথাটি স্বীকার করেননি।

উপরোক্ত পরীক্ষা নিরীক্ষায় যা প্রমাণিত হ'ল, তাতে জীব-বিবর্তনের বহু-ঘোষিত কয়েকটি সত্যের ভিত্তি নড়ে উঠল।

• • •

১৮শ শতাব্দীর শেষের দিকে রাশিয়ায় এক কৃষকের প্রথম পক্ষের স্ত্রী চারবার চারটি করে, সাতবার তিনটি করে এবং ষোলবার যমজ সন্তান প্রসব করে। ঐ কৃষকের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী দু'বার তিনটি করে এবং ছয়বার যমজ সন্তান প্রসব করে। ঐ শতাব্দীতে আর একজন কৃষকেরও দুই স্ত্রীর গর্ভে ৭২টি সন্তান হয়।

• • •

ছায়াপথ বা আরও দূরের কোন উৎস থেকে অবিরাম যে 'এক্স-রে' বেরিয়ে আসছে, তার রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করবার জন্য এবং ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তনের ইতিহাস খুঁজে বের করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কৃত্রিম উপগ্রহের আকারে একটি জ্যোতির্বিজ্ঞানী মানমন্দির মহাকাশে তুলে দিয়েছে। এ-পর্যন্ত আমেরিকা মানব আরোহীহীন যত উপগ্রহ পাঠিয়েছে, এটি তার মধ্যে সর্বাধুনিক।

• • •

জার্মানীর বোকাম মহাকাশ মানমন্দিরের ডিরেক্টার শ্রীকামিনস্কী জানিয়েছেন—সূর্য-দেহের মাঝামাঝি জায়গায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দীর্ঘ দাগ দেখা যাচ্ছে; এর ফলে বেতার যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

সূর্যাস্তে বা সূর্যোদয়কালে খালি চোখেও এ দাগ দেখা যেতে পারে।

• • •

মস্কো পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় কোন নারী একবার যমজ প্রসব করলে পরবর্তী কালেও যমজ প্রসব করতে পারেন। এমনকি দু'য়ের বেশীও প্রসব করতে পারেন।

হিসাব করে দেখা গেছে, শতকরা একটি যমজ হয়। তিনটি বা চারটি সন্তানের একসঙ্গে জন্মদান কম শোনা যায়। ৫ কোটি ৪৭ লক্ষটি প্রসবের মধ্যে একটি ক্ষেত্রে একযোগে ৬টি সন্তান প্রসবের কথা শোনা যায় এবং প্রতি ৪৭১ কোটি ১০ লক্ষের মধ্যে একটি ক্ষেত্রে একযোগে ৬টি সন্তানও প্রসব হতে পারে।

একসঙ্গে একটির বেশী সন্তান প্রসবের ব্যাপারে ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে ও হল্যাণ্ডের মেয়েরা প্রথম স্থানের অধিকারিণী। ব্রাজিল, কলম্বিয়া ও প্যারাগুয়ে সর্বশেষ স্থানের অধিকারী।

এর কারণ জানা না গেলেও, সাধারণতঃ দেখা যায় যমজ প্রসবের ব্যাপারটা কিছুটা বংশগত। ভিয়েনার এক মহিলা এগার বার প্রসবের মধ্যে তিন বার যমজ, ছয় বার তিন জন করে, দু'বার চার জন ক'রে সন্তান প্রসব করেছেন।

• • •

আগামী অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে ভারতে চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। দিল্লীতে একটি অস্থায়ী মুক্তাঙ্গন প্রদর্শন-মঞ্চ তৈরী করে তথায় উৎসব অনুষ্ঠানের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ৩০খানি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ-চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্য আনা হবে।

● সাপ্তাহিকা ●

২০ মার্চ :

পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার অধিবেশনে খাদ্যনীতি নিয়ে আলোচনায় নীতি সংশোধনের আভাষ পাওয়া গেছে।

● শ্রীজ্যোতি বসু প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে দিল্লী থেকে ফিরে এসেছেন। কংগ্রেস সরকারের কাছ থেকে কিছু আশা করার নেই বলে তিনি মনে করেন।

● সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিজ্ঞান, কারিগরি ও সংস্কৃতি বিষয়ক একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

২১ মার্চ :

পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থির করেছেন সরকারীভাবে খানা করডনিং বন্ধ হতে পারে। খুচরা চাল বিক্রেতার সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি, মধ্যশ্রেণীভুক্ত লোকদের জন্য আংশিক রেশন, লেভির মেয়াদ বাড়ানো—মন্ত্রিসভায় এগুলি নিয়ে আলোচনা হয়। নির্দিষ্ট বিক্রেতাদের মাধ্যমে চিড়ামুড়ি বিক্রয়ের ব্যবস্থা সরকার করছেন বলে প্রকাশ।

● ভারত সরকার নাগাদের রাজনৈতিক পুনর্গঠন নীতিগতভাবে মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছেন।

● চতুর্থ যোজনাকালে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দু'কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন।

● ভারতে সামরিক সাজসরঞ্জাম প্রেরণ সম্পর্কে বৃটিশ ও মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

● দূর-প্রসারী মহাকাশ গবেষণার কাজে সোভিয়েট ইউনিয়ন আর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়েছে।

২২ মার্চ :

ঢাকা থেকে ১২ মাইল দূরে গজারিয়ার কাছে মেঘনা নদীতে 'মীরা' নামক লঞ্চখানায় আগুন ধরে ডুবে যায়। কিছু যাত্রীকে জল থেকে তোলা হয়। একশত জন যাত্রী নিখোঁজ।

● কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম্ রাজ্য সভায় বলেন যে খাদ্যশস্য সরবরাহ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ন্যায়-সঙ্গত দাবী পূরণ করা হবে। তবে তা' খাদ্য শস্য সংগ্রহের উপর নির্ভর করে।

● মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন চার দফা দাবীর যে জবাব দিয়েছেন, তাতে ফ্রন্টের নেতারা সন্তুষ্ট নন।

● রাজ্য সভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ঘোষণা করেন ভারতের ৪০ হাজার বর্গমাইল এলাকা পাক-চীন দখলে আছে।

● সাম্প্রতিক হাঙ্গামা কালে পুলিশকে নিকটবর্তী রাজ্যগুলি হ'তে কাঁদুনে গ্যাস-শেল ধার করে আনতে হয়। এগুলি বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়—ভারতে তৈরী হয় না।

● প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী দিল্লীতে এশিয়া ও দূর-প্রাচ্যের অর্থনৈতিক কমিশনের ২২তম অধিবেশনের উদ্বোধন করে বলেন পৃথিবী থেকে দারিদ্র, রোগ ও অজ্ঞতা দূর করতে হবে।

২৩ মার্চ :

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এক বৈঠকের পর মিট-মাটের আলোচনায় ইতি করে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট ৬ই এপ্রিল চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী শান্তিপূর্ণ হরতাল ও সাধারণ ধর্মঘট এবং ২৯শে মার্চ প্রতিবাদ ও মিছিল দিবসের ঘোষণা করেছেন। শীঘ্র স্কুল কলেজ খুলছে না এবং পরীক্ষাও স্থগিত।

● যাত্রী বিক্ষোভের ফলে হাওড়া-খড়্গপুর শাখায় ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হয়। বিভিন্ন স্থানে ট্রেন আটক, লাইন অবরোধ এবং রেল কামরায় অগ্নিসংযোগের খবর পাওয়া যায়।

● পাকিস্তান এই প্রথম স্বীকার করে যে, চীনে তৈরী ট্যাঙ্ক ও জেট নিয়ে সে তার সামরিক-বাহিনীকে অস্ত্রসজ্জিত করেছে।

● প্রেসিডেন্ট আয়ুব বলেন যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্মানজনক শর্তে শান্তি স্থাপিত না হলে দুই দেশের মধ্যে অস্ত্র-সজ্জার প্রতিযোগিতা চলতে থাকবে।

● ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স কর্পোরেশনের কর্মচারী

ইউনিয়ন ধর্মঘটের নোটিশ প্রত্যাহার করেছে। বৃহস্পতিবার থেকে কর্পোরেশনের সব বিমান কলকাতা থেকে যাতায়াত করবে।

● রাষ্ট্রপুঞ্জে তাসখন্দ চুক্তি রেকর্ডভুক্ত করা হয়।

২৪ মার্চ :

পশ্চিমবঙ্গে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের আবার হরতাল আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য মন্ত্রীসভার জরুরী বৈঠক হয়। সিদ্ধান্ত হয়—বিধিবদ্ধ ও সংশোধিত রেশন এলাকায় মাথা পিছু গমের পরিমাণ যথাক্রমে ১০০ গ্রাম ও ৩০০ গ্রাম বাড়ানো হবে।

● ২৪ পরগণা, হাওড়া ও নদীয়া জেলায় থানা কর্ডনিং অবিলম্বে তুলে দেওয়া যেতে পারে প্রকাশ। হুগলী জেলা থেকেও আংশিক ভাবে উঠে যেতে পারে।

● কলকাতা শিল্পাঞ্চল ও সম্প্রসারিত শিল্প এলাকায় রেশন কার্ডে কেরোসিন দেওয়া হবে।

● আজ রাত্রে ওয়াশিংটনের পথে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যাত্রা করেছেন।

● বর্দ্ধিত খাদ্য সাহায্য কর্মসূচীর জন্য কানাডা ভারতকে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার সাহায্য করবেন।

২৫ মার্চ :

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-স্তরে ব্যাপক ভিত্তিতে বিধান সভার কয়েকজন ও লোকসভার ৬'জন সদস্য সহ মোট ৩২ জন সদস্যকে নিয়ে খাদ্য উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এই কমিটির সভাপতি।

● প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আমেরিকার পথে প্যারিসে উপনীত হলে প্রেসিডেন্ট দ্য গল তাঁকে বলেন যে উভয় দেশের মধ্যে রাজনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পেলে পরিবর্তিত বিশ্বে স্থিতি, প্রগতি ও শান্তি স্থাপনে সহায়তা করা হবে।

● বিগত সংঘর্ষের সময়ে বিদেশ থেকে জাহাজে করে ভারতের জন্য সাহায্য হিসেবে পাঠানো যে সব মাল পাকিস্তান আটক করেছিল, তা' এখন পাকিস্তান ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছে।

● উর্দ্ধাকাশে বাতাস ও তাপ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য থুম্বা ঘাঁটি থেকে চারিটি রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়।

● পূর্ব পাকিস্তানে চীনা ট্যাঙ্ক আমদানী করা হয়েছে।

২৬ মার্চ :

● পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর বাম-নেতারা বলেন হরতালের সিদ্ধান্তে তাঁরা অটল, তবে মিটমাটের আশা যে নেই তা' বলা যায় না।

● রাজস্থানে এক শোভাযাত্রার উপর পুলিশের গুলিতে পাঁচজন আহত হয়;

● প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে ফরাসী নেতারা স্বীকার করেছেন ভারতের পক্ষে চীন ভয়ের কারণ এবং পাকিস্তান উপদ্রব বিশেষ।

● চীনের রাষ্ট্রপ্রধান ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাওয়ালপিণ্ডিতে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

● জগদলপুরে হাঙ্গামায় মোট ১৩ জন নিহত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডি. পি. মিশ্র মধ্যপ্রদেশ বিধান সভায় জানান, আজ সকালে পুলিশ বস্তার প্রাসাদে ঢুকে বস্তারের পদচ্যুত শাসক শ্রীপ্রবীরচন্দ্র ভঞ্জদেব ও সাতজন আদিবাসী লোককে মৃতাবস্থায় দেখতে পায়। বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

● পশ্চিমবঙ্গের প্রতিমাসের কেরোসিনের পরিমাণ আরও কিছু বাড়িয়ে দিতে কেন্দ্র সম্মত হয়েছেন।

● বিগত ভারত-পাক সংঘর্ষের সময়ে ভারতে আটক পাকিস্তানী ছাড়া বিদেশী মালবাহী জাহাজগুলি ভারত ফেরৎ দেবার সিদ্ধান্ত করেছে।

শ্রীবীরেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক ১৩৮।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬, দ্যুতি প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক ৪০, বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক — শ্রী শিখররঞ্জন চক্রবর্তী

প্রথম বর্ষ] শুক্রবার, ২৫শে চৈত্র, ১৩৭২ DHRITI DEEPA Friday, 8th April, 1966 মূল্য ১০ পয়সা [সপ্তম সংখ্যা

• বিশেষ বিজ্ঞপ্তি •

আগামী ১লা বৈশাখ, ১৫ই এপ্রিল পত্রিকার ৮ম সংখ্যা নববর্ষ উপলক্ষে

একটি 'বিশেষ সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত হইবে।

ইহার জন্য কোন অতিরিক্ত মূল্য লাগিবে না।

—কর্মাধ্যক্ষ

১ম বর্ষ **ধৃতিদীপা** ৭ম সংখ্যা

Friday, 8th April, 1966 শুক্রবার, ২৫শে চৈত্র, ১৩৭২ 50 Paise

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি :

নাম ও ঠিকানা-সহ পরিষ্কারভাবে কাগজের এক দিকে লিখিত রচনার পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নিকট পাঠান আবশ্যক। কোন মনোনীত রচনা কোন বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট পাঠালে ফেরত পাঠান হবে।

গ্রাহকদের প্রতি :

সপ্তাহের প্রতি শুক্রবারে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে কুড়ি পয়সার ডাকটিকিট-সহ অতিরিক্ত কপির জন্য জানাতে হবে। ঠিকানার পরিবর্তন হলে, পনেরো দিন আগে জানাতে হবে। ভিঃ পিঃ-তে পত্রিকা পাঠান হয় না। চিঠি-পত্রে ও কুপনে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করা দরকার।

এজেন্টদের প্রতি :

এজেন্সীর নিয়মাবলী পত্রিকার কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি :

পত্রিকার কার্যালয়ে পত্র দিলে বিজ্ঞাপনের মূল্য, নিয়মাবলী ইত্যাদি জানান হয়।

চাঁদার হার :

ডাকসহ বার্ষিক ২৪-০০ টাকা,
ষাণ্মাসিক ১২-০০ টাকা;
ত্রৈমাসিক ৬-০০ টাকা;
প্রতি সংখ্যা ০-৫০ পয়সা;

ম্যানেজার, ধৃতিদীপা
৪০, বলীদাস টেম্পল স্ট্রীট
কলিকাতা-৩

Statement about Ownership, etc., of Dhriti Deepa

1.	Place of Publication	...	...	40, Badridas Temple Street, Calcutta-4
2.	Periodicity of its Publication	...	...	Weekly
3.	Printer's Name	...	...	Sri Birendra Lal Mitra
	Nationality	...	...	Indian
	Address	...	...	40, Badridas Temple Street, Calcutta-4
4.	Publisher's Name	...	...	Sri Birendra Lal Mitra
	Nationality	...	...	Indian
	Address	...	...	40, Badridas Temple Street, Calcutta-4
5.	Editor's Name	...	...	Sri Vivek Ranjan Chakravarty
	Nationality	...	...	Indian
	Address	...	...	40, Badridas Temple Street, Calcutta-4
6.	Names and addresses of individuals who own the Newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital		...	Sri Vivek Ranjan Chakravarty 40, Badridas Temple Street, Calcutta-4

I, Sri Birendra Lal Mitra, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. BIRENDRA LAL MITRA
Signature of the Publisher

• চয়ন •

"যিনিই আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং যাঁহার শ্রেষ্ঠতা হইতে আমরা উপকৃত হই, তিনিই ভক্তির পাত্র। ভক্তির সামাজিক প্রয়োজন এই যে, ভক্তি ভিন্ন নিকৃষ্ট কখন উৎকৃষ্টের অনুগামী হয় না; নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টের অনুগামী না হইলে সমাজের ঐক্য থাকে না, উন্নতি ঘটে না।

গৃহস্থ পরিবারের যে গঠন, সমাজের সেই গঠন। গৃহের কর্তার ন্যায় রাজা সেই সমাজের শিরোভাগ। তাঁহার গুণে, তাঁহার দণ্ডে, তাঁহার পালনে সমাজ রক্ষিত হইয়া থাকে। পিতা যেমন সন্তানের ভক্তির পাত্র, রাজাও সেইরূপ প্রজার ভক্তির পাত্র। প্রজার ভক্তিতেই রাজা শক্তিমান—নহিলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত? রাজা বলশূন্য হইলে সমাজ থাকিবে না। অতএব রাজাকে পিতার মত ভক্তি করিবে। যুদ্ধকালে রাজার সহায় হইবে। হিন্দুধর্মে পুনঃ পুনঃ রাজভক্তির প্রশংসা আছে।.........

•   •   •   •

রাজা যতক্ষণ প্রজাপালক, ততক্ষণ তিনি রাজা। যখন তিনি প্রজাপীড়ক হইলেন, তখন তিনি আর রাজা নহেন, আর ভক্তির পাত্র নহেন। এরূপ রাজাকে ভক্তি করা দূরে থাক, যাহাতে সে রাজা সুশাসন করিতে বাধ্য হয়, তাহা দেশবাসীদিগের কর্তব্য। কেননা, রাজার স্বেচ্ছাচারিতায় সমাজের অমঙ্গল। রাজা যেমন ভক্তির পাত্র, তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ রাজপুরুষগণও যথাযোগ্য সম্মানের পাত্র। কিন্তু তাঁহারা যতক্ষণ আপন আপন রাজকার্যে নিযুক্ত থাকেন, এবং ধর্মতঃ সেই কার্য নির্বাহ করেন, ততক্ষণই তাঁহারা সম্মানের পাত্র। তারপর তাঁহারা সাধারণ মনুষ্য।'

রাজপুরুষে যথাযোগ্য ভক্তি ভাল, কিন্তু বেশী মাত্রায় কিছুই ভাল নহে। কেননা, বেশীমাত্রা আত্মাবমাননার কারণ। রাজা সমাজের প্রতিনিধি এবং রাজপুরুষেরা সমাজের ভৃত্য—একথা কাহারও বিস্মৃত হওয়া উচিৎ নয়। আমাদের দেশীয় লোক একথা বিস্মৃত হইয়া রাজপুরুষের অপরিমিত তোষামোদ করিয়া থাকেন।

রাজার অপেক্ষাও যাঁহারা সমাজের শিক্ষক তাঁহারা ভক্তির পাত্র। এই গুরুগণ কেবল গার্হস্থ্য গুরু নহেন, সামাজিক গুরু। যাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধি বলে পরিশ্রমের সহিত সমাজের শিক্ষায় নিযুক্ত তাঁহারাই সমাজের প্রকৃত নেতা, তাঁহারাই যথার্থ রাজা। অতএব ধর্ম-বেত্তা, বিজ্ঞান-বেত্তা, নীতি-বেত্তা, দার্শনিক, পুরাণ-বেত্তা, সাহিত্যকার, কবি প্রভৃতির প্রতি যথোচিত ভক্তির অনুশীলন কর্তব্য। পৃথিবীর যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা ইঁহাদিগের দ্বারা হইয়াছে। ইঁহারা পৃথিবীকে যে পথে চালান, সেই পথে পৃথিবী চলে, ইঁহারা রাজাদিগেরও গুরু। রাজগণ ইঁহাদিগের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া তবে সমাজ শাসনে সক্ষম হয়েন। এই হিসাবে ভারতবর্ষে ভারতীয় ঋষিদিগের স্থান—এই জন্য ব্যাস, বাল্মিকী, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কপিল, গৌতম—সমস্ত ভারতবর্ষের পূজাপাদ পিতৃগণ-স্বরূপ।"

•   •   •   •

—বঙ্কিমচন্দ্র, 'রাজভক্তি'।

সম্পাদকীয়

সমস্যা-জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের দুঃখদুর্দশা, বেদনা ও হতাশা নানা অবাঞ্ছিত আবর্তের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া আজ এক অতি সমস্যাকীর্ণ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। খাদ্যাভাব, অর্থাভাব, গৃহসমস্যা, বেকারসমস্যা, শিক্ষাসঙ্কট, স্বাস্থ্যহীনতা—সমস্ত লইয়া বাঙালীর জীবনধারায় এক অস্বাভাবিক আলোড়ন আনিয়াছে। এগুলির সমাধান যে কি ভাবে হইবে, কোন্ বৈজ্ঞানিক কর্মসূচীর সূত্র ধরিয়া সমস্যাগুলি হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে, সে-সমস্ত প্রশ্নে আলোর নিশানা আমরা দেখি না। প্রকল্পের পর প্রকল্পের যোজনা হইয়াছে, ভাঙিয়া-গড়িয়া সারা-দেশব্যাপী নবরূপায়ণের প্রচেষ্টা চলিয়াছে, ছোট-বড় শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, পরিকল্পনা হইয়াছে কৃষি-উন্নয়ন ও সেচ-ব্যবস্থার, ব্যবস্থা হইয়াছে শিক্ষা বিস্তারের, কারিগরী শিক্ষার, চিকিৎসার উন্নতির ব্যবস্থা হইয়াছে—তবুও জাতীয় ও সমাজ-জীবনে এত গ্লানি ও দুঃখ-বেদনার হাহাকার ঘনীভূত হইয়াছে কেন, কেনই বা আমরা দিন দিন হতাশার মর্মপীড়ায় ক্রমেই জর্জরিত হইয়া উঠিতেছি?

আমরা বলিব, প্রশাসন-ব্যবস্থায় দক্ষতার অভাব যেমন সর্বস্তরে প্রকটিত, শাসনক্ষমতার মূল অধিকারটুকু যাঁহাদের আয়ত্তাধীন তাঁহাদেরও তেমনি ত্রুটি-বিচ্যুতির পরিমাণ যথেষ্ট। যাঁহারা সংস্কার আনিবেন, দেশ ও সাধারণ জনের প্রতিটি যুক্তিসঙ্গত স্বার্থ সার্থকতায় রূপ দিবার জন্য দরদী চিন্তা ও প্রচেষ্টা লইয়া উৎসাহিত হইবেন তাঁহাদের ভ্রান্তি-বিলাসের শেষ হইবে কিরূপে? আমরা বুঝি, বৃহত্তর আদর্শের অনুপ্রেরণায় আপনার আত্মপ্রসাদ ভুলিয়া দেশ ও জাতির স্বার্থকেই ধ্যান-ধারণায় কেন্দ্রীভূত করিতে পারিলে মঙ্গল হইবে সন্দেহ নাই। এই কল্যাণী চিন্তাই নেতৃত্বের ধর্ম ও কর্ম। এরূপ অধিনায়কত্বের বিকাশ বাঙলায় প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

খাদ্যসঙ্কট চরমে উঠিয়াছে, বেকার-সমস্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে, এগুলির যথেষ্ট কারণ আছে স্বীকার করি—সর্বভারতীয় সমস্যানিচয়ের সহিত এগুলি বিজড়িত। কিন্তু শিক্ষাসঙ্কটের যুক্তিসঙ্গত কারণ আমরা বুঝি না, স্বাস্থ্যসংরক্ষণ-ব্যবস্থায় অব্যবস্থার অপরিহার্যতা স্বীকার করি না। পরীক্ষাবর্জন নীতির পরিণতি অধ্যাপকদের বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। যখন এপ্রিল হইতে ৪০।৫০ টাকার অতিরিক্ত মাসিক বেতনের প্রতিশ্রুতি মিলিয়াছে তখনও সমূহের সমস্যার সমাধানে তাঁহারা সর্বাঙ্গীন সুবিবেচিত চিন্তা লইয়া অগ্রসর হইতে পারিলেন না। সরকার-পক্ষও তাঁহাদের সমুদয় কর্মের মধ্য দিয়া এমন কিছু বৃহৎ বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্বের পরিচয় দেন নাই যাহার উপর শিক্ষিত অধ্যাপক-সমাজ স্বাভাবিক শ্রদ্ধায় প্রভাবিত হইতে পারেন। সরকারী নির্দেশে স্কুল-কলেজ বন্ধ রহিয়াছে, স্কুল ফাইনাল ও হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা স্থগিত রহিয়াছে (বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি তো বন্ধ আছেই), সেগুলিরও আশু সমাধানে সরকার অক্ষম হইয়াছেন। অনতিবিলম্বে শিক্ষাক্ষেত্রে এই ক্রমবর্ধমান জটিলতার কি অবসান হইতে পারে না?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে প্রশস্তির পরিবেশন হইয়াছে, শিল্পের ক্ষেত্রে এই রাজ্যের [illegible] উন্নতি হইয়াছে। উন্নতি যথেষ্ট হইয়াছে আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু [illegible]

কাহারা? এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণের বহু-কষ্টার্জিত অর্থ শোষণ করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা করিতেছে। জনসাধারণের ইহাদের প্রতি কোনরূপ প্রীতি নাই। সর্বদাই ইহারা সুযোগ-সন্ধানে তৎপর—কি করিয়া বাজারে কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করিয়া কালোবাজারীর পথ সুগম করিতে পারে, কি করিয়া দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক উচ্চ হারে আদায় করিতে পারে তাহাই ইহাদের লক্ষ্য। ইহার উপর ভেজাল—এক্ষেত্রে অতি বর্বর প্রকৃতির মনোবৃত্তি লইয়া নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যে ভেজাল দিয়া ইহারা অর্থোপার্জন করিতেছে; তাহাতে জাতীয় স্বাস্থ্যের যত ক্ষতিই হউক না কেন, তাহাদের দ্বিধা নাই। নকল ঔষধ বা ঔষধে ভেজাল দিয়াও পাপ-ব্যবসায়ে তাহারা অর্থোপার্জন করে। ইহাদের হাতে নাকি এত কালোবাজারী টাকা জমিয়াছে যাহা সমস্ত ব্যাঙ্কে যত মজুত টাকা আছে—তাহারও অনেক বেশী। এই শ্রেণীবিশেষের প্রতি সরকারী প্রীতি কিছু আছে কিনা জানি না, কিন্তু এই পাপ ব্যবসায়ীদের সরকার সংযত করেন নাই—রাঘব-বোয়ালদের অংশবিশেষকেও গ্রেপ্তার করিয়া সমুচিত শাস্তি দেওয়া হইয়াছে শুনি নাই। অথচ কোন কোন দেশে এরূপ ব্যবসায়ীকে প্রকাশ্য স্থানে চরম শাস্তি দেওয়া হইয়াছে শোনা গিয়াছে। এখানে সরকারের চরম ব্যর্থতা। জনসাধারণের প্রতি প্রকৃত অন্তরটান না থাকিলে সে সরকার কখনই জনপ্রিয় হইতে পারেন না। সাধারণজনের ক্ষোভ ও দুঃখের মূল কোথায় সেটুকু হৃদয়ঙ্গম করিলে তাহাদের প্রতি অকারণ দমননীতিও প্রয়োজন হয় না।

সরকারের যাঁহারা বাহক ও পরিচালক, বহু আশা-আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া জনগণ যাঁহাদের উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন, জনগণের স্বার্থে ক্ষমতা রক্ষার ও অভিমানের কোনরূপ প্রশ্ন না রাখিয়া একান্তভাবে জনসেবায় ব্রতী হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই জনপ্রিয় হইয়া উঠিবেন। আমাদের বিশ্বাস, জনগণের সহযোগিতা লাভে তাঁহারা অক্ষম হইবেন না—সমস্যাগুলি উত্তীর্ণ হইবার দায়িত্ববোধ ও প্রয়াস তখন সকলের মধ্যেই আসিবে।

"ইষ্ট নাই নেতা যেই
যমের দালাল কিন্তু সেই।"

—শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ময়ূরাক্ষী বহিয়া যায়—

—ডাঃ অশোককুমার বসু

ময়ূরাক্ষী বহিয়া যায়……
পানোন্মত্ত বন্যা নারী সম
সর্ব্বাঙ্গ তাহার,
আক্ষেপে ফুলিয়া উঠে
নবধারা পেয়ে।
গৈরিক বসনাঞ্চল শুভ্র বালুতটে
করিয়া বিস্তৃত, দুর্ব্বার আকুল বেগে
ধেয়ে চলে ঘূর্ণাবর্ত্ত রচিয়া রচিয়া।
দুই তটে ধূমেল পাহাড়
উঁচু বালুময় ভূমি—
ঝুঁকে পড়ে দেখে এই
নগ্ন বন্য-রূপ।
লজ্জাহীনা বর্ব্বর রমণী
যদি পড়ে ধরা, যদি হয় চোখাচোখি—
শুভ্র ফেনপুঞ্জ তুলি' অট্টহাস্য সম
ছুঁড়ি' দেয় ঊর্দ্ধ পানে।

শীতার্ত্তা ময়ূরাক্ষী—
ক্ষীণ কলেবর তার
স্বচ্ছ জলধারা।
কিশোরী বালিকাসম
বয়ে যায় কলহাস্য তুলি'।
দুইপাশে শুভ্র বালুরাশি,
কাদা-খোঁচা, চখাচখী,
খঞ্জনা কত কি,
পদচিহ্ন ফেলে
তারই পরে।
জোৎস্না মাখা আবেশে নিঝুম
স্তব্ধ রাত্রি নেমে আসে
সারা অঙ্গব্যাপী
ময়ূরাক্ষীর—
প্রভাতে একটি পাখা

পড়ে থাকে নদীতটে—
শুধু চিহ্ন মিলনের
ক্রৌঞ্চ ও ক্রৌঞ্চীর।

এই নদীতটে, বহু বর্ষ আগে
এলো আদিম মানব একদল।
তারা মাটি কাটে
তারা দেয় হল,
তারা বীজ পোঁতে
তারা বয় জল,
এইভাবে বেড়ে ওঠে
মানব সমাজ
শ্রমলব্ধ উৎপাদনে।

কর্ণ অন্তে ধ্বনি ওঠে—ব্যাকুল বাঁশরী,
বাজে ঘন মাদলের বোল,
ছাতিম গাছের তলে জোটে এসে
যুবক যুবতী, অসঙ্কোচ নৃত্যচ্ছন্দপরা,
মদির চাহনি আর চটুল হাসিতে
উল্লসিয়া ওঠে বনতল।

শ্রাবণ সন্ধ্যায়,
ঘনকৃষ্ণ মেঘ আসি' চুমে যবে পর্ব্বত শিখর,
সজল বরষা নামে গিরিগাত্র বাহি'
কুটীর-ভিতরে
শোনে শিশু রূপকথা,
একটানা ঝিঁঝির কণ্ঠের স্বর
মিশে যায় দাদুরী-ডাকের সাথে।

দূর লোকালয়ে—
কত বিবর্তন চলে সমাজ ও রাষ্ট্রের।
ভারতের পশ্চিম সীমান্ত-প্রান্তে,
প্রান্তরের দল যেন ঘনাইয়া আসে।
শক ও কুষাণ
হূণ ও তাতার
বার বার হানা দেয়
পররাজ্য-লোভে।
উচ্চ বর্ণ শোষিত ভারত
জাতি ভেদে বর্ণ ভেদে
বিভক্ত শতধা,
জনসাধারণ
নিষ্ক্রিয় নির্বীর্য্য
জন্মভূমি বিদেশ তাদের কাছে।
নাহি জানে কারে তারা করিবে বিশ্বাস
কেবা তার আপনার জন।
বিভিন্ন ধর্মের মত
করে হানাহানি
নারী দেহ নয় মাংস আর
পূজা উপচারে পরিণত।
বিশুদ্ধ উদার বৌদ্ধধর্ম
বামাচার রূপ করেছে ধারণ।
ত্যাগ ও ভোগের
অপূর্ব্ব যে সমন্বয়
বৈদিক ভারত তুলে ধরেছিল
নিখিল বিশ্বের কাছে
আজ তাহা 'মায়াবাদে' পর্য্যবসিত,
শূন্য ও ব্রহ্ম বাদের
অপূর্ব্ব নির্য্যাস
মায়া-বাদী দেশে
স্বাধীনতা—মায়ারূপে
হ'ল রূপায়িত।

হোথা দূর স্রোতস্বিনী তীরে
শ্যামল বনের মাঝে
কালো মেয়ে দোলাইয়া

বেণী মালা
কালো প্রণয়ীর গলে।

কালের কুটিল চক্র ঘোরে আর ঘোর
বন্ধ মানবের রথ
থামে এসে বনানীর প্রান্তদেশে
ধরণীর বক্ষ চিরি'
বাহির করিতে হবে
মৃত অরণ্যের কালো পথ,
দূর হিমালয়-সানুদেশে
উদ্যান রচিতে হবে।
সুউচ্চ হর্ম্যরাজী গড়িতে হইবে
মানুষের উষ্ণ রক্ত দিয়ে।

তাই আসে বণিকের দল
মুখেতে কুটিল হাসি
বাক্য সুমধুর।
নানা পণ্য আনে তারা
ভুলাতে বনের হরিণীরে।

শ্যামল অরণ্য হ'ল অন্তর্হিত
বাজে না বাঁশরী আর
অকারণে। মুক্ত আরণ্যক
'কুলি' নামে হলো পরিচিত,
কালো মেয়ে পোড়ে কামনা আগুনে
পরাশ্রয়ী শোষকের মাঝে।
যে মানব সমাজ
বনের গোপন ছায়ে
হতেছিল বিকশিত
স্বাভাবিক রূপে

উপকারকের দল
ঘিরিয়াছে তারে
তাহা আর সিদ্ধান্ত লইয়া।
ধীরে অতি ধীরে
অনতিবৃহৎ এক
মানব সমাজ
শেষ শ্বাস ফেলে এই
ধরণীর কোলে।

নদী চেয়ে আছে বরষার পানে
অপলকে।
প্রখর রবির তাপে তাপিত হইয়া
মেঘজাল সৃজিবে ধরণী।
সেই মেঘ বারিরূপে
ঝরিয়া পড়িবে পুনর্বার।
বিন্দুই রচিবে সিন্ধু মিলিত হইয়া,
বিক্ষিপ্ত ঘটনারাজী
রচে ইতিহাস।

অতি শীর্ণা ময়ূরাক্ষী
রৌদ্রতপ্ত বৈশাখের দিনে।
অগ্নি ঝরে চারিদিকে,
উত্তপ্ত পাহাড় ফেলে
উষ্ণ বিষাক্ত নিঃশ্বাস।
নির্মল প্রবাহ আজ শৈবালে ভরিয়া
অবরুদ্ধ স্রোতে পরিণত।
পুতিগন্ধ কুণ্ডলী রচিয়া ফেরে
মাটির ওপর,
ময়ূরাক্ষী মরিয়া যায়
প্রতি পলে তিলে তিলে।

সেইরূপ—
আসিবে কি বরষা আবার
অর্দ্ধমৃত মানব সমাজে?
স্নিগ্ধ মিষ্ট, জীবন প্রবাহ
পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে
মহা বিপ্লবের বেগে?
অবক্ষয়ী যাহা কিছু,
যাহা কিছু জীর্ণ ও মলিন
যতকিছু বাধা, বিঘ্ন সুপ্রাচীন
দলিয়া ভাঙিয়া সব
মথিত করিয়া
নব সৃষ্টি করিবে রচনা
মহামানবের আগমন লাগি'।
আশার আলোক শিখা
হৃদয়ে জ্বালিয়া
কবি চেয়ে আছে সেই
অনাগত মহাবিপ্লবের
আবির্ভাব পানে।

• ভদ্রতা •

—ত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ট্রেনে অত্যন্ত ভিড়, বসবার একটুকু জায়গা নেই, সকলে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছেন। তার মধ্যে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তি ঘর্মাক্ত কলেবরে হাঁপিয়ে উঠেছেন। তাঁর হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, চুল রুক্ষ, চোখে-মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ। মনে হয় হাসপাতাল থেকে সদ্য ছাড়া পেয়ে এসেছেন। উপরে একটা 'ফ্যান' ঘুরছে বটে কিন্তু তার সেবার শীতল স্পর্শ এতদূরে পৌঁচচ্ছে না। ভিড়ের চাপে ও উষ্ণতায় লোকটির মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। সামনের বেঞ্চে উপবিষ্ট একজন যুবকের নজর হঠাৎ পড়ল তাঁর দিকে। যুবকটি তখনই তাঁর আসন থেকে উঠে তাঁকে নিজের আসনে বসবার আহ্বান জানিয়ে বললেন,—আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে, আপনি এইখানে বসুন। আমার দাঁড়িয়ে যেতে কোন কষ্ট হবে না। ঘটনাটি অতি সামান্য। কিন্তু মনুষ্যত্বের আদর্শ-ভ্রষ্ট হয়ে আমরা এখন জৈব-স্তরে নেমে যেতে থাকলেও বুঝলাম ভদ্রতা এখনও দেশ থেকে একেবারে অন্তর্হিত হয়ে যায়নি। দয়া, প্রীতি, পরার্থপরতা, ভদ্রতা প্রভৃতি যে সকল গুণ মনুষ্য-জীবনের পরম সম্পদ বলে স্বীকৃত, তার আচরণ এখনও একেবারে লোপ পায়নি। কোথাও তা দেখতে পেলে আনন্দ ও তৃপ্তি বোধ হয় বৈকি। ভৌগোলিক ব্যবধানকে সঙ্কুচিত করে 'দূর' কে আমরা বড় নিকটে টেনে আনছি, 'নিকট'কে আমরা [illegible] ঠেলে দিচ্ছি। এটা আমাদের বর্তমান সমাজ-জীবনে একটা মর্মান্তিক প্যারাডক্স্।

দেশের আজ চরম দুর্দিন। চারিদিকে অত্যাচার ও অনাচারের লেলিহান শিখা, সমাজ-জীবন বিপর্যস্ত, জনচিত্ত বিক্ষুব্ধ ও শঙ্কিত। ক্ষুধাকাতর নরনারী একমুষ্টি তণ্ডুল সংগ্রহের জন্ত ব্যাকুল ও বিপন্ন। এমন দিনে সভ্যতা, শিষ্টাচার ও ভদ্রতার ললিতবাণী বলতে গেলে তা ব্যর্থ পরিহাস বলেই মনে হবে। তথাপি এই মহাদুর্দিনে কোন্ আশার বাণী আমাদিগকে সান্ত্বনা দিবে? কোন্ সমুজ্জ্বল আদর্শ অনুসরণ করে আমরা দুর্যোগময়ী কালরাত্রি অতিবাহিত করব?

আমরা ভুলে গিয়েছি ভারত-আত্মার সেই শাশ্বত আশীর্বাণী—'সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু'। আমরা ভুলে গিয়েছি—পরের জন্ত আত্মত্যাগেই মানবতার পূর্ণ বিকাশ; অন্তকে বিমুখ করে স্বতন্ত্রভাবে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টাই মৃত্যু। বিশ্বাস ও সরল উদার ব্যবহার—যা আত্মার সহিত আত্মার সংযোগ ঘটায়—মানুষের অন্তর থেকে তা মুছে গিয়েছে। স্বার্থপর আত্ম-সংরক্ষণের হীন প্রয়াসে তৎপর আমাদিগকে স্মরণ করিয়ে দিবার জন্তই কি কবি গেয়েছেন—

'আপনারে লয়ে বিব্রত থাকিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'?

ব্যবহারিক জীবনে আমরা সকলেই ভদ্রলোক বলে অভিহিত হলেও 'ভদ্রতা'র প্রকৃত সংজ্ঞা হিসাবে কথাটা ব্যবহার করা হয় না। পরের দুঃখে যে ব্যক্তির প্রাণ কাঁদে না, পরের ব্যথায় যার প্রাণ বিগলিত হয় না, নিজের স্বার্থকে তুচ্ছ করে অন্তের চোখের জল মুছাবার জন্ত যার চিত্ত ব্যাকুল হয় না, তাকে প্রকৃত 'ভদ্র' বলে অভিহিত করলে সত্যেরই অপলাপ করা হয়। জনৈক বিশিষ্ট ইংরাজ ধর্মযাজক 'ভদ্রলোক'এর সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন—

"A gentleman is a person who considers other people's feelings before his own and is above taking personal offence.

"He is a gentleman who habitually and on principle subordinates his own personal convenience and if necessary his standing in the community to the general good."

আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তৃপ্তি অস্বীকার করে অপরকে সেবা করবার যে বৃত্তি তাই হ'ল ভদ্রতার পরিচায়ক। এই সেবা-বৃত্তিই ব্যথিত নিপীড়িত জনসমাজে আশা ও উৎসাহের সঞ্জীবনী শক্তি বহন করে আনে এবং বিপদে-সঙ্কটে সাহস ও ধৈর্য এনে দেয়। গত শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে বিভ্রান্ত ভোগবিলাসপরায়ণ দেশবাসীকে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ এই বাণী দিয়েই উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এই বাণীই ভারত-আত্মার শাশ্বত-বাণী। বেদান্তের যে মহান্ আদর্শ—বহুত্বের মধ্যে একত্ব দর্শন—একমাত্র 'ভদ্রতা'-মূলক এই সেবা-ধর্মের সাধনাতেই লাভ হয়।

গীতার্থ-সন্ধানে

—শ্রীখগেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত

—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—

(পূর্বানুবৃত্তি)

কর্মযোগ (২)

নিষ্কাম ভাবে অর্থাৎ ফলাসক্তি-বর্জিত হইয়া কর্ম করা কিরূপে সম্ভব? একটা ফল লাভ করিব বলিয়াই তো আমরা কর্ম করিয়া থাকি। ফলের আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে কর্ম করিবার প্রেরণা আসিবে কোথা হইতে? এই অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। বস্তুতঃ ভালমন্দ যে কোন কর্মই করিতে যাই না কেন, একটা ফলের দিকে লক্ষ্য করিয়াই তো তাহা করিতে প্রবৃত্ত হই। একটা সৎকর্ম, জনহিতকর কর্ম করিতে যাইয়াও তো আমরা ফলাকাঙ্ক্ষা লইয়াই উহা করিতে যাই। উহাও কি দূষণীয়? না, তাহা নহে—অবশ্য যদি উহাতে কোন প্রকার স্বার্থবুদ্ধি না থাকে। 'ফলাকাঙ্ক্ষা' ও 'ফলাসক্তি' এক কথা নহে। আসক্তিই দূষণীয়। ফলে যখন আসক্তি বা স্বার্থবুদ্ধি থাকে—আমি এই কর্মের ফলভোগ করিব—এই বুদ্ধি লইয়া যখন কাজ করিতে যাই, তখনই উহা বন্ধনের কারণ হয়। স্বার্থবুদ্ধি হইতেই আসক্তির জন্ম। স্বার্থবুদ্ধি অর্থাৎ নিজের ভোগবুদ্ধিদ্বারা প্রণোদিত কর্মই কামনামূলক বা 'সকাম' কর্ম; স্বার্থবুদ্ধিহীন কর্ম 'নিষ্কাম' কর্ম। এই নিষ্কাম কর্মই কর্মযোগের লক্ষ্যস্থানীয়। 'নিষ্কাম' বলিতে যে কেবল কাহারও জন্য কিছু না চাওয়াকেই বুঝাইবে তাহা নহে—পরের জন্য, দেশের, দশের উপকারের জন্য যে কর্ম করা হয় তাহাও নিষ্কাম কর্ম। নিজ স্বার্থের জন্য যাহা করা হয় তাহাই 'সকাম'। নিজের কোন প্রকার স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবলমাত্র কর্তব্য বুদ্ধিতে অথবা পরোপকার বা লোকসেবার জন্য যে কর্ম করা হয়, তাহাতে বিশেষ কোন ফল লাভের উদ্দেশ্য থাকিলেও উহা নিষ্কাম কর্ম। এইরূপ পরহিতকর কর্মই কর্মযোগের প্রথম সোপান। বুদ্ধদেব সমস্ত জীবন ভরিয়া এই সেবা-ধর্মই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। "বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়" এই বুদ্ধ-প্রবচনটী স্বামী বিবেকানন্দের জীবনেও মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সকলকে "বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়" কর্মে ব্রতী হইতে উপদেশ দিয়াছেন—দরিদ্রনারায়ণ সেবায় সকলকে আত্মোৎসর্গ করিতে বলিয়াছেন। আমাদের বর্তমান পতিত অবস্থায় তিনি উহাই আমাদের একমাত্র ধর্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কঠিন ধর্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। নানা ধর্মমত-বাদে আমাদের চিত্ত বিভ্রান্ত। সুতরাং সেই সকল মতবাদ লইয়া তর্ক-বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া, তাহা দ্বারা বিভ্রান্ত না হইয়া "বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়" কর্মে লাগিয়া যাও; তাহাতেই জীবন উৎসর্গ কর—ইহাতেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে—ইহাই শ্রীবিবেকানন্দের অমূল্য উপদেশ। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ তাঁহার 'গীতা-তত্ত্বে' বলিয়াছেন—"যেখানে যত পরার্থ চেষ্টা, আপন শরীর মনের ব্যয়ে অপর কাহাকে সুখী করবার উদ্যম, সেখানেতেই আলোক ও ধর্ম। যে আপনাকে ভুলতে পেরেছে, স্বার্থত্যাগ করতে পেরেছে—তার সাধন ভজন সব হয়েছে।" কর্মযোগের প্রথম ভূমি এই প্রকার নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কর্ম। ইহা সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। কর্মযোগের উচ্চভূমিতে সাধক "বহুজন হিতায়" অবস্থা অতিক্রম করিয়া "সর্বভূতহিতেরতাঃ" হইয়া থাকেন। জ্ঞানে অধিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থা লাভ করা সম্ভব হয় না।

পরের হিতের জন্য কাজ করিলেও যেখানে উহার অন্তরালে কোন স্বার্থবুদ্ধি লুক্কায়িত থাকে—সেখানেই উহা সকাম কর্মে পরিণত হইয়া বন্ধনের হেতু হয়। পরের মঙ্গলের জন্য জলাশয় খনন করিলাম; বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় স্থাপন করিলাম; সৎকার্যে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিলাম—বাহিরে দেখা গেল আমি অসাধারণ নিষ্কাম কর্মী; কিন্তু ঐ সকল কর্মের অন্তরালে আমার গুপ্ত উদ্দেশ্য রহিয়াছে—উহা দ্বারা আমি সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিব, সকলে আমার গুণগান করিবে; হয়তো বা জনসমাজে আমার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধিহেতু নানা উপায়ে আমার অধিকতর ধনাগমের সুবিধা হইবে; অথবা ঐ সকল পুণ্যকর্মফলে স্বর্গলাভ করিয়া আমি অক্ষয় সুখের অধিকারী হইব। আমার উপরোক্ত কর্ম মোটেই নিষ্কাম কর্ম হয় নাই—উহার পিছনে স্বার্থবুদ্ধি লুক্কায়িত রহিয়াছে, উহা পূর্ণমাত্রায় সকাম। যেখানে কোনপ্রকার স্বার্থগন্ধ নাই, কর্ম দ্বারা নিজের কোন প্রকার স্বার্থসিদ্ধি হইবে এই বুদ্ধি ভুলক্রমেও যেখানে স্থান পায় না, কেবলমাত্র সেখানেই নিষ্কাম কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। স্বার্থবুদ্ধি এইভাবে নিঃশেষে দূর করিবার পক্ষে কেবলমাত্র বুদ্ধিবিচারই [illegible]

নহে। একটু কিছু জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন।

এই জ্ঞান কি এবং উহা লাভের প্রয়োজনীয়তাই বা কোথায় তাহা আমরা এখন বুঝিতে চেষ্টা করিব। গীতাশাস্ত্রে আমরা 'দ্বন্দ্ব' শব্দটীর বহুল ব্যবহার দেখিতে পাই। এই দ্বন্দ্ব বা বিরোধ কি এবং ইহার উৎপত্তি কোথায় তাহাও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। মানুষের জীবনে জাগতিক বিষয়ে সুখ-দুঃখ, ঘৃণা ভালবাসা ইত্যাদি যে সকল বিরুদ্ধভাব দেখা যায় উহার উৎপত্তি-স্থান অন্তরে, মানসভূমিতে কর্তৃত্বা-ভিমান ও ফলকামনারূপ প্রবৃত্তিতে। আমি কর্মের কর্তা, সুতরাং কর্মফলে আমার অধিকার, আমি উহা ভোগ করিব এই বুদ্ধি লইয়া এবং কর্মফলে আসক্তিযুক্ত হইয়া যখন কর্ম করি তখন ফলপ্রাপ্তিতে সুখ আর অপ্রাপ্তি বা প্রাপ্তফল নাশে দুঃখের উদ্ভব হয়। সুখদুঃখরূপ বিরুদ্ধভাব বা দ্বন্দ্বের উৎপত্তি এই প্রকারেই সংঘটিত হইয়া থাকে। সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্বই বন্ধন—এই দ্বন্দ্ব যাহার নাই তিনি মুক্ত "নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে"। (৫।৩)। দ্বন্দ্বের মূলে অবস্থিত এই কর্তৃত্বাভিমান বা অহঙ্কারবুদ্ধি এবং ফলাসক্তি কোথা হইতে আসিল? জীব চিৎ ও অচিৎ এই দুইয়ের সমাবেশে সৃষ্ট। চিৎবস্তু আত্মা এবং অচিৎবস্তু দেহ। অচিৎ, অনাত্ম বা জড়বস্তু প্রকৃতি, আর চিৎ বা আত্মবস্তু চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে বা একত্র অবস্থিতিতে জীবের উৎপত্তি। আত্ম ও অনাত্মবস্তুর একত্রবাস ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যহেতু আত্মার চৈতন্য সত্তা, অনাত্মবস্তু দেহে সংক্রামিত হয় ও অনাত্মা প্রকৃতির কর্তৃত্ব জীবাত্মায় সংক্রামিত হইয়া থাকে। এইভাবে জীবাত্মায় কর্তৃত্বাভিমান এবং জীবদেহে চৈতন্যভাব সম্ভব হইয়াছে। স্বরূপতঃ উহা মিথ্যা, ভ্রমাত্মক প্রতীতি-মাত্র। বস্তুতঃ আত্মবস্তুর কোন কর্তৃত্ব নাই। প্রকৃতিই কর্মের কর্তা, আত্মা নহেন। আত্মবস্তু প্রকৃতিজ দেহে অবস্থিত থাকা হেতু উহা যেন কর্তৃত্ব-যুক্ত হইয়াছেন বলিয়া ভ্রম হয়। এই সত্য অনুভূতির নাম 'জ্ঞান'। যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহার এই ভ্রম বিদূরিত হইয়াছে। তিনি দেখিতে পান আত্মসত্তায় কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, কর্মাদি নাই, প্রকৃতিবশে দেহে-ন্দ্রিয়াদি যে সকল কার্য সম্পন্ন করিতেছে, প্রকৃতির গুণ সমূহই উহার কর্তা, আত্মবস্তু নহেন। অজ্ঞানী মোহগ্রস্ত ব্যক্তিই নিজ স্বরূপসত্তায় অহংকার বুদ্ধি, অর্থাৎ আমি কর্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি বুদ্ধি আরোপ করিয়া থাকে। জ্ঞানী দেখিতে পান প্রকৃতির গুণ সমূহই কর্মের কর্তা ও ভোক্তা—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ
কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি
মন্যতে॥" (৩।২৭)

"তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম-
বিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন
সজ্জতে॥" (৩।২৮)

কর্মে কর্তৃত্ববুদ্ধি না থাকিলে কর্ম-ফলে আসক্তি জন্মিতে পারে না—অপরের কর্মে বা কর্মফলে আমার আসক্তি হইবে কেন? সুতরাং জ্ঞান-লাভ করিবার পরেই মাত্র মানুষ কর্তৃত্বাভিমান ও কামনা-বাসনা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে তৎপূর্বে নহে। এইরূপ জ্ঞানীব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ কর্মযোগের উপযোগী। এই জ্ঞান লাভ কি উপায়ে সম্ভব? গীতা এজন্য তত্ত্বদর্শী গুরুর নিকট যাইতে উপদেশ দিয়াছেন:—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন
সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্ব-
দর্শিনঃ॥" (৪।৩৪)

গুরুকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে; তাঁহার উপদেশমত সাধন-পরায়ণ হইতে হইবে, তবেই তিনি কৃপা করিয়া তত্ত্ব-জ্ঞান প্রদান করিবেন। জ্ঞানলাভ, তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের কৃপা-সাপেক্ষ। এই কৃপালাভের জন্য শিষ্যকে কায়মনো-বাক্যে গুরুসেবাপরায়ণ হইতে হয়। গুরুসেবায় সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিলে, তাঁহারই নির্দেশ পালন ও অভিপ্রায় পূরণের জন্য কর্মরত হইলে শিষ্যের চিত্ত ক্রমে শুদ্ধ হইয়া থাকে। কামনাবাসনাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াই মানুষের চিত্ত মলিনতাগ্রস্ত হইয়া থাকে। উহা হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই চিত্ত স্বরূপ শুদ্ধ অবস্থা লাভ করিতে পারে। অশুদ্ধ চিত্তে জ্ঞানের প্রকাশ সম্ভব হয় না। গুরুসেবাদ্বারা কিরূপে চিত্ত শুদ্ধ হয় তাহা বিচার করিলে দেখা যাইবে—অনন্যচিত্তে গুরুসেবাপরায়ণ হইলে, কায়মনোবাক্যে গুরুর প্রীতিবর্ধনের জন্য সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিলে, শিষ্যের নিজ কামনাবাসনাদির চিন্তা ও উহা পূরণের চেষ্টা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়। সেবা-পরায়ণ ব্যক্তি সর্বদা কিসে গুরুর সুখ বিধান হইবে সেই চিন্তা ও চেষ্টাতেই নিমগ্ন থাকে। সুতরাং নিজ স্বার্থচিন্তা তাহার মনে স্থান লাভ করিতে পারে না। শিষ্যের সমস্ত চিন্তা ও কর্মচেষ্টা তখন গুরুসেবার জন্যই থাকে নিয়োজিত। আর গুরুর নির্দেশমতই সমস্ত কর্ম নিষ্পন্ন হইতেছে বলিয়া শিষ্যের নিজের কর্তৃত্বাভিমানের স্থানও সেখানে থাকে না। অতএব এই অবস্থায় চিত্ত কামনাবাসনা ও কর্তৃত্বাভিমানাদি

বন্দিনতা হইতে মুক্ত হইয়া স্বরূপ শুদ্ধতা লাভ করিয়া থাকে। চিত্তশুদ্ধ হইলেই জ্ঞানলাভের জন্য ভূমি প্রস্তুত হইল। এই অবস্থায় গুরুনির্দিষ্ট উপায়ে ধ্যান-যোগ অভ্যাস করিতে হয়। গুরুকে আশ্রয় করিয়াই এই ধ্যানযোগ পরি-পক্কতা লাভ করে। তখন আপনা হইতেই জ্ঞানের প্রকাশ হয়—"তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি" (৪।৩৮)।

লক্ষ্য করিবার বিষয় গুরুসেবা-পরায়ণ হইলে শিষ্য নিজে অজ্ঞাতসারেই ক্রমে কর্মযোগের ভূমিতে উন্নীত হইয়া থাকে। কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত হইয়া কর্তব্য সম্পাদন করার নামই কর্মযোগ ইহা আমরা দেখিয়াছি। গুরুসেবাপরায়ণ শিষ্যের কর্তৃত্বাভিমান ও কর্মে স্বার্থবুদ্ধি থাকে না। সুতরাং সে তখন কর্মযোগের জন্য উপযুক্ততা লাভ করিয়া থাকে।

জ্ঞানলাভ হইলে এই বোধ স্থির হইবে যে জীবাত্মা কর্তা নহেন, প্রকৃতির গুণসমূহই কর্তা, প্রকৃতিগত গুণদ্বারা পরিচালিত হইয়াই জীব কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রকৃতির ক্ষমতা অতি দুর্বার। ইহাকে রোধ করা জীবের পক্ষে সম্ভব নহে। প্রকৃতি জীবকে জোর করিয়া তদনুযায়ী কার্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে—

"সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতে-
র্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ
কিং করিষ্যতি॥" (৩।৩৩)

"স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ
স্বেন কর্মণা
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ
করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥" (১৮।৬০)

সুতরাং কর্ম সম্বন্ধে জীবের স্বাধীনতা কোথায়? আমি কর্তা; স্বাধীন ভাবে নিজ ইচ্ছামত কর্ম করি-বার ক্ষমতা আমার আছে এইরূপ বুদ্ধি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। বস্তুতঃ প্রকৃতিই সমস্ত কর্মের কর্তা। অতএব প্রকৃতিকেই যিনি কর্তা বলিয়া জানেন এবং আত্মাকে অকর্তা বলিয়া উপলব্ধি করেন তিনিই যথার্থদর্শী—

"প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি
সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স
পশ্যতি॥" (১৩।২৯)

এইরূপ দ্রষ্টাপুরুষই অহঙ্কার বুদ্ধি-শূন্য হইয়া কর্ম করিতে পারেন। এইরূপ কর্মীই যথার্থ 'কর্মযোগী'।

কর্মফলে আসক্তিহীনতা বা স্বার্থ-বুদ্ধিত্যাগই কর্মযোগের মূলকথা ইহা আমরা দেখিয়াছি। ত্যাগমূলক কর্মকে গীতা 'যজ্ঞ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। কামনা-বাসনামূলক কর্মই জীবের বন্ধন সৃষ্টি করে ইহাও আমরা দেখিয়াছি। সুতরাং গীতা বলিতেছেন যজ্ঞ অর্থাৎ ত্যাগমূলক কর্ম ভিন্ন অন্য সমস্ত কর্মই বন্ধনের হেতু—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং
কর্মবন্ধনঃ।" (৩।৯)

অতএব তোমার সমস্ত কর্মকে যজ্ঞে পরিণত কর—একমাত্র যজ্ঞকর্মই তোমার করণীয় হউক।

গীতোপদিষ্ট যজ্ঞের তাৎপর্য বেদ-বিহিত যজ্ঞের সাধারণ তাৎপর্যের সহিত এক নহে। গীতায় 'যজ্ঞ' সম্পূর্ণ ত্যাগমূলক, কিন্তু বেদবিহিত যজ্ঞে দ্রব্যাদি ত্যাগের ব্যবস্থা থাকিলেও উহা কাম্যকর্ম—উহার উদ্দেশ্য কোন কামনা পূরণ। পুত্রকামনা, ধনকামনা, যশ-কামনা, স্বর্গকামনা ইত্যাদি পূরণের জন্যই ঐ সকল যজ্ঞের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। গীতার তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বহুবিধ যজ্ঞের বিষয় বলা হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে আমরা তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সাধারণতঃ ত্যাগমূলক যে কোন কর্মকেই যজ্ঞ বলা হয়। অন্নদান, বস্ত্র-দান, গোদান, ভূদান ইত্যাদি দানমূলক কর্ম অর্থাৎ স্বীয় ভোগের জন্য যাহা সঞ্চিত আছে তাহা হইতে কিছু ত্যাগ করা, পরার্থে দান করা; ইহাই যজ্ঞের মূল কথা। শাস্ত্রমতে এই যজ্ঞ সকল মানুষেরই অবশ্য কর্তব্য কর্ম। বস্তুতঃ নিজ স্বার্থ পরার্থে কিছু ক্ষুণ্ণ না করিলে পরিণামে নিজ স্বার্থই ব্যাহত হয়—সমাজ অচল হয়, সংসার-চক্র বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, পরস্পর আদান-প্রদান লইয়াই সংসার চলিতেছে। প্রকৃতিতেও এই নিয়মের খেলা দেখা যাইতেছে। উৎসের দান লইয়া নদী জললাভ করিয়া গতিপথে নানাদেশে জল বিতরণ করিতে করিতে সাগরে আত্ম-বিসর্জন করিতেছে। আবার সমুদ্রও নদীর জলরাশি উহার কিয়দংশ বাষ্পাকারে দান করিতেছে বলিয়া উহা মেঘরূপে বারিবর্ষণ করিয়া সেই উৎসকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিতেছে, নদীকে পূর্ণ করিয়া দিতেছে। এইরূপ আদান-প্রদান না থাকিলে জগৎ-চক্র অচল হইত। সৃষ্টিতে এই যজ্ঞ প্রবৃত্তি জীব-হৃদয়ে স্বভাবগত। প্রজাপতি এই ত্যাগমূলক প্রবৃত্তি জীবের হৃদয়ে দিয়া তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। গীতা বলিতেছেন—

"সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ
প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্ট-
কামধুক্॥" (৩।১০)

প্রকৃতিগত এই ত্যাগবৃত্তির একটি বিশিষ্ট স্ফুরণ আমরা জীবমাত্রেরই বংশরক্ষণ কার্যে দেখিতে পাই। মাতা কত ত্যাগ স্বীকার করিয়া সন্তানকে গর্ভে ধারণ, প্রসব ও পালন করেন, এমন কি ক্ষুধার্ত বনস্পতি বীজ ধারণ

ও পোষণ জন্য কিরূপে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়া থাকে তাহা আমরা নিত্যই প্রত্যক্ষ করিতেছি। স্বভাবগত এই ত্যাগ প্রবৃত্তিবশেই জীবগণ নিজ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া পরস্পর পরস্পরের সেবা করিবে ইহাই সৃষ্টিকর্তার অভিপ্রায়। এই যজ্ঞ-প্রবৃত্তিবশেই তাহারা দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞ অর্থাৎ দ্রব্যাদি ত্যাগমূলক কর্মদ্বারা তাঁহাদের সেবা করিবে এবং দেবগণও তাহাদিগকে বাঞ্ছিত ফল দান করিয়া অনুগৃহীত করিবেন এবং এইরূপ পরস্পর আদান-প্রদান দ্বারাই সকলে মঙ্গলের পথে চলিতে থাকিবে; জগৎ-চক্রের সুষ্ঠু গতি অব্যাহত থাকিবে, ইহাই সৃষ্টিকর্তার অভিপ্রায়। দেবোদ্দেশে যজ্ঞের বিধান বেদের কর্মকাণ্ডে দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ কামনা বাসনা পূরণের জন্যই ঐ সকল যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধি দেওয়া হইয়াছে—উহারা সকলেই কামনামূলক। জীব কামনা বাসনা লইয়াই জন্মগ্রহণ করে—উহা পূরণের প্রকৃতিগত চাহিদা তাহার মধ্যে রহিয়াছে। জোর করিয়া তাহাকে উহার প্রভাব হইতে একেবারে মুক্ত করিয়া নিবার করা সম্ভব নহে। সুতরাং তাহাকে যথাসম্ভব সংযতচিত্ত হইয়া ঐ সকল কামনা বাসনা পূরণের উপাযভূত বিবিধ যজ্ঞের ব্যবস্থা বেদ দিয়াছেন। ঐ সকল যজ্ঞ কর্ম-দ্বারা জীব ক্রমে ত্যাগ ও ইন্দ্রিয় সংযমে অভ্যস্ত হইয়া কালক্রমে শুদ্ধচিত্ত হইয়া শ্রেয়পথে চলিতে পারিবে ইহাই উদ্দেশ্য। বেদবিহিত যজ্ঞকর্মাদি জীবের প্রকৃতিগত কামনা বাসনা পূরণের সহায়ক, কিন্তু গীতার 'যজ্ঞ' কামনা-গন্ধহীন সম্পূর্ণ নিষ্কাম। তাই গীতা জীবকে বেদের কর্ম কাণ্ডের ঊর্ধ্বে উঠিতে উপদেশ দিয়াছেন—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥" (২।৪৫)

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে বহুবিধ যজ্ঞের বর্ণনা করা হইয়াছে। সে কালে সমাজে বহুপ্রকার যজ্ঞের প্রচলন ছিল। কিন্তু বর্তমানে উহা সমস্তই লোপ পাইয়াছে। সুতরাং ঐ সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রণালী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাও আমাদের প্রবল নহে। সর্বপ্রকার যজ্ঞের অন্তর্নিহিত তত্ত্বটাই আমাদের প্রণিধানযোগ্য। যজ্ঞের রহস্য ত্যাগে। এই ত্যাগ সম্পূর্ণ হয় অহংকারনাশে বা কর্তৃত্বাভিমান দূর হইলে। অহংকার বা কর্তৃত্বাভিমান দূর হয় আত্মজ্ঞান লাভে। তাই জ্ঞানলাভের বেদবিহিত সমস্ত যজ্ঞকর্মের পরিসমাপ্তি ঘটে—"সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" (৪।৩৩)। জ্ঞানীর কর্ম বেদবিহিত সকামকর্মের ঊর্ধ্বে উঠিয়া গীতার 'যজ্ঞে' পর্যবসিত হয়। শ্রীভগবান অর্জুনকে উপদেশ দিতেছেন—তোমার সমস্ত কর্মকে এইরূপ যজ্ঞে পরিণত কর—জীবন ভরিয়া তুমি যাহা কিছু কর্ম কর সমস্তই যজ্ঞ বুদ্ধিতে সম্পন্ন কর—"তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচার।" (৩,৯)। ফলাকাঙ্ক্ষা ও অহংকার বুদ্ধি রহিত হইয়া কর্ম করিয়া যাও। জীবের প্রকৃতিগত স্বাভাবিক কর্ম এইভাবে যজ্ঞে পরিণত হইলে উহা কখনই তাহার বন্ধনের কারণ হয় না। ইহাই কর্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভের গূঢ় রহস্য—ইহাই কর্মযোগ।

(ক্রমশঃ)

আলোর প্রহর

শৈলেন কুমার দত্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কৌতূহল যখন রয়েছে তখন আর দেরি না করে হাত তুললাম—যাচ্ছি।

চার্চের ভিতর গিয়ে একপাশে দাঁড়িয়েছিলাম। পিয়ার্সন সাহেব ও অন্যান্যদের উপাসনা দেখছিলাম। কি নীরব, শান্ত পরিবেশ। সামনে ওপরে ক্রুশবিদ্ধ যীশু। দু'পাশে দুই বাতিদানে বাতি জ্বলছে। মনে হ'ল যেন সত্যিকারের কোন দেবদূত হাসিমুখে ক্রুশবিদ্ধতার জ্বালা সহ্য করছেন।

ওরা প্রায় সেই মূর্তিটির নীচে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি অনেক দূরে। দূর থেকে দেখলাম বড় আলখাল্লা-পরা এক পাদ্রী ভদ্রলোক একটু ওপরে উঠে আস্তে আস্তে বাইবেল পাঠ করতে শুরু করলেন। ওরাও অস্পষ্টভাবে কি যেন পাঠ করতে লাগলেন।

পাশের জানলার রঙিন কাঁচ দিয়ে খানিকটা আলো ঠিকরে এসে পড়েছিল—আমি সেই জানলাটার দিকে এগিয়ে গেলাম। পাশে অস্পষ্ট আলোয় একটা বিরাট গাছ দেখলাম। সম্ভবত রাস্তার ওপরের সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটা। কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে আমি সেই গাছটার দিকে তাকিয়ে রইলাম মুগ্ধ বিস্ময়ে। কতক্ষণ বিমুগ্ধ ছিলাম জানি না, বেশ কিছুক্ষণ পরে কানে এল :

Amen, Lord have mercy
upon us :
Christ have mercy upon us :
Lord, have mercy upon us.

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম ওদের উপাসনা শেষ। পিয়ার্সন সাহেব মন্থর গতিতে গীর্জা থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন—এখানে আশাকরি আপনার কোন অসুবিধা হবে না। মিস্ প্যাট্রিক আছেন, আলবার্ট রয়েছে—তা'ছাড়া আমিও আসব মাঝে মাঝে।

—না না, কিছু অসুবিধে হবে না ; আমি অপ্রস্তুত ভাবে বললাম।

পিয়ার্সন সাহেব আরও কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। আলবার্ট ব'লে এক যুবক। কত আর বয়েস ! জোর তিরিশ ! লম্বা সরু দাড়িতে মুখ ঢাকা, রোগাটা চেহারা।

আলাপ হতেই আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে—ট্ ইয়ং !

—বাট্ কম্পিটেন্ট ; পিয়ার্সন সাহেব গম্ভীরভাবে সংযোজন করলেন।

হো হো করে হেসে উঠলেন মিস্ প্যাট্রিক—তা'হলে চলি, আপনার সঙ্গে আজ আর দেখা হবে না। রাত্রের খাবার আপনি আটটার মধ্যেই পাবেন।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে ; আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম।

কিন্তু ওঁরা তখন অনেকটা এগিয়ে গেছেন।

আমি ধীর মন্থর গতিতে নিজের ঘরে চলে এলাম।

খট খট করে দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ধড় মড় করে উঠে দেখি জানলার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ঠিকরে পড়েছে ঘরে। বাইরে মিস্ প্যাট্রিকের শান্ত গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল।

কিছুটা অপ্রস্তুত ভাবে দরজাটা

মুখে দেখাতে মিস্ প্যাট্রিক হেসে ঘরে ঢুকলেন—নতুন জায়গায় তাহলে ঘুমের কোন ব্যাঘাত হয়নি!

—না, ওদিক থেকে আমি ভাগ্যবান। ঘুমের ব্যাঘাত আমার বড় একটা হয় না।

—ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি সেরে নিন। আপনার চা দেখি। দেরি করবেন না, তা'হলে চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।—বলতে বলতে মিস্ প্যাট্রিক হন হন করে চলে গেলেন।

একটু পরে একজন আয়া টুথব্রাশ-পেষ্ট আর একটা টাওয়েল দিয়ে গেল। তারপর জানলাগুলো খুলতে খুলতে বলল—আপনি একেবারে বাথরুমে চলে যান। ওখানে গরম জল আছে। স্নানও ইচ্ছে করলে সেরে নিতে পারেন।

—ঠিক আছে, বিছানাটা তুলে যাচ্ছি।

—না না, ওসব আমি করছি, আপনি যান।

স্নান সেরে টাওয়েলে মাথা মুছতে মুছতে ঘরে এসে দেখি ঘর পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। বিছানার কভার বদলে দেওয়া হয়েছে। টেবিলে ফুলদানীতে এক গুচ্ছ টাটকা মৌসুমী ফুল। ঘরের স্নিগ্ধতা আর মৌসুমী ফুলের বিচিত্র সমাবেশে মনে মনে বেশ খুশি হলাম।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে কালকের আল-বার্টের কথা মনে পড়ছিল—ট্ ইয়ং! ব্রাশ দিয়ে চুলগুলো আয়ত্তে আনছি এমন সময় আয়নায় ছায়া পড়ল একটা মুখের। চেয়ে দেখি আলবার্ট। হাসতে হাসতে পিছন থেকে সে বলল—মর্নিং। আপনি দেখছি আমার চেয়েও দেরী করলেন!

—আপনি বুঝি খুব ভোরে ওঠেন? হাসতে হাসতে আমি বললাম।

—হ্যাঁ। মানে ফার্স্ট নাইটে আমি ঘুমোতে পারি না।

—কেন?

—না, মানে,—একটু আমতা আমতা করে আলবার্ট বলল—মানে ফার্স্ট নাইটে আমার ঘুম আসে না।

সতর্ক হয়ে এই পরিবর্তনটুকু লক্ষ্য করে আমি তাই আবার একবার জিজ্ঞেস করলাম—কোন ইতিহাস আছে নাকি!

—না না, ওসব অন্য ব্যাপার।—হাতদুটো ওপরে তুলে আলবার্ট প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল। চলুন—মিস্ প্যাট্রিক আপনাকে নিতে পাঠালেন। চা তৈরি।

—চলুন; আমি আলবার্টের পিছন পিছন এগিয়ে গেলাম।

ঘরে ঢুকতেই মিস্ প্যাট্রিক হাসলেন—আসুন, আপনার কি চা খাওয়ার নেশা নেই?

—কেন বলুন তো? আমি প্রশ্ন করলাম।

—এখনও চা খাওয়ার তাড়া নেই—ঘড়িতে ক'টা বেজেছে দেখেছেন?

দেওয়ালের বড় ঘড়িটার দিকে তাকালাম। এঃ ন'টা বেজে গেছে!

—নিন, একই সঙ্গে ব্রেকফাস্টটা সেরে নিন, মিস্ প্যাট্রিক একটা প্লেট এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

আলবার্ট নিজে আর একটা প্লেট টেনে নিয়ে আমার দিকে তাকাল—আপনাকে দেখলে বড্ড ছেলেমানুষ মনে হয়!

—আমি কিন্তু ছেলেমানুষ নই; আমি হেসে বললাম।

—যা হোক আপনার কথা বলুন, শুনি; আলবার্ট সরু দাড়িতে হাত বুলোল।

মিস্ প্যাট্রিক পাল্টা প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা এ হোম সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন?

—মানে! আমি বিস্ময় প্রকাশ করলাম।

—মানে পিয়ার্সন সাহেবের মুখে আপনি কতটুকু শুনেছেন সেটাই জানতে চাইছি।

—বিশেষ কিছু না। উনি তো আপনার কাছে শুনতে বলেছেন।

মিস্ প্যাট্রিক হাসলেন—সেই জন্যেই জিজ্ঞেস করছিলাম। মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে এটা একটা নার্সিং হোমই। তবে এখানকার পেসেণ্টরা সকলেই রোগগ্রস্ত নয়। স্বাভাবিক মানুষও থাকতে পারেন এখানে। অবশ্য জীবনে যাঁরা অন্য দিক থেকে দেউলিয়া!

—অর্থাৎ! আমি জিজ্ঞেস করলাম।

হাত থেকে প্লেটটা নামিয়ে আলবার্ট বলল—অর্থাৎ জীবনে যাদের চাওয়া পাওয়ার ব্যাপার মিটে গেছে। দানের প্রতিদানে যারা কিছু পায়নি; পেয়েছে বঞ্চনা, আঘাত, বেদনা—

আলবার্ট কেমন যেন একটা বিষণ্ণ সুরে বলতে যাচ্ছিল। মিস্ প্যাট্রিক ব্যাপারটা সহজ করে বললেন—ওসব আপনি আস্তে আস্তে সব জানতে পারবেন। এখন এই হোমটার ইতিহাসই শুনুন। হোমের মানুষদের যখন দেখাশোনার ভার আপনারই ওপর—তখন আপনি নিজেই তাদের দেখে শুনে সব ইতিহাস জানবেন।

—বেশ, তা'হলে হোমের কথাই বলুন।

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুকটা দিয়ে মিস্ প্যাট্রিক ঘরের দেওয়ালে একটা বড় ছবির দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন—উনি হলেন মিঃ ওয়েলার। সি, আর, ডবলু, ওয়েলার। জন্ম ইংলণ্ডে হলেও

মামামা'র সঙ্গে পোল্যাণ্ডে থাকতেন। ডাক্তারী পড়তে পড়তে একদিন হঠাৎ সৈন্যবাহিনীর ডাকে সাড়া দেন। তারপর যৌবনে বন্দী হয়ে যান কোন এক যুদ্ধপ্রান্তে। মহাযুদ্ধের করাল ছায়া তখন পাশ্চিমী দেশগুলোকে ছেয়ে ফেলেছে। ওয়েশার এমনি এক বীভৎস যুদ্ধপ্রাঙ্গনে ছিলেন তখন। পোলা-ধাকদে বিকলাঙ্গ কয়েক হাজার সৈন্য আর সাধারণ নরনারীদের তত্ত্বাবধানের ভার পড়ে তাঁর ওপর। সে-যন্ত্রণার চিৎকারে তিনি অধীর হয়ে ওঠেন। মনে মনে ভাবেন এইসব জীবনের কি হবে। চিকিৎসা বিদ্যার কল্যাণে ওরা হয়তো প্রাণ ফিরে পাবে, কিন্তু তাদের জীবন? জীবন তো তাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। এই সব বিকলাঙ্গ নিরুপায় অসহায় জীবনগুলোর ভার কে নেবে? আত্মীয় অনাত্মীয় কেউ কি এ ভার নিতে রাজী হবে? নিজেও কি ওরা সুখী হবে?

মিস প্যাট্রিক একটু চুপ করলেন। তারপর বললেন—মিঃ ওয়েশারের তখন এক চিন্তা। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এই সব চিন্তা করেন আর মনে মনে গুমরে ওঠেন। ভাবগতিক দেখে একদিন ওঁর বোন এ্যানি এর সমাধান করলেন—তুমি ভেবো না জন, আমরাই এদের ভার নেব।

—আমরা ভার নেব।—মিঃ ওয়েশার অবাক বিস্ময়ে বোনের দিকে তাকালেন। এ্যানির চোখে এক দৃঢ় প্রত্যয় হাঁ, আমরাই পারব এদের ভার নিতে। সেদিন থেকেই ওঁরা দুই ভাই বোন মিলে ওঁদের যাবতীয় সম্পত্তির একটা উইল করে ছোটখাট একটি হোম খুললেন—'এ্যানিজ হোম'। প্রথম প্রথম যুদ্ধে আহতদের নিয়ে সে হোম খোলা হল তারপর তার বিস্তৃতি শুরু হল। আস্তে আস্তে সারা পৃথিবীতে খোলা হ'ল তার কেন্দ্র। সেদিনের মিঃ ওয়েশার আর তাঁর বোন এ্যানির জায়গায় শত শত নার্স ডাক্তার নিয়োগ করা হল।

—আচ্ছা, এত টাকা জোগান কে? ওয়েশার সাহেবের সে উইলে কত টাকা ছিল? মাঝখানে আমি প্রশ্ন করলাম।

—না না, সে-টাকা আর কত। এখন সারা দুনিয়ার মানুষ সাহায্য করেন এ মহৎ প্রচেষ্টাকে।

—সত্যিই মহৎ। কতকটা আবেগে উঠে এসে ওয়েশার সাহেবের ফটোর সামনে এসে দাঁড়ালাম। বিরাট লম্বা দীর্ঘকায় পুরুষ। সামরিক পোশাকে চমৎকার মানিয়েছে। ফিকে মাটি র' কোট প্যাণ্টের মাঝখানে জলজল করছিল চমৎকার নীল চোখ দুটো। মুখশ্রী কি চমৎকার। বাটন-হোলের গোলাপও যেন তাঁর শ্রীর কাছে ম্লান হয়ে গেছে।

—মিঃ ওয়েশার ব্যাচিলর ছিলেন, না? ফটো থেকে মুখ ফেরালাম মিস প্যাট্রিকের দিকে।

—না না, ওঁর স্ত্রী আছেন। এই হোমেই থাকেন—ও পাশের ঘরে। কানে শুনতে পান খুব কম—চোখেও খুব কম দেখেন।

—তা'হলে তো ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে হবে।

—নিশ্চয়ই। আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। উনি আপনাকে পেলে খুব খুশী হবেন, আলবার্ট মাথা নেড়ে মিস্ প্যাট্রিকের সমর্থন চাইলেন।

—নিশ্চয়। মিস্ প্যাট্রিক সমর্থন জানালেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—আজ মোটামুটি হোমের সম্পর্কে জানুন, চারপাশ ঘুরে দেখুন, তারপর মানুষদের সঙ্গে আলাপ হবে;

—কিন্তু আমার হোম সম্পর্কে জানার আগে মানুষ সম্পর্কে জানতে ইচ্ছে হয়, মিস্ প্যাট্রিকের মুখের দিকে তাকালাম।

—ও হো, আপনার লেখা টেখার খাতিক আছে নিশ্চয়ই। মিস্ প্যাট্রিকের কণ্ঠে উচ্ছ্বাস দেখা গেল।

—না, মানুষ সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা আছে. মানুষকে আমি ভালবাসি। বিচিত্র জীবন জানতে আমার কৌতূহল হয়।

—ঠিক আছে, জানবেন। মিস্ প্যাট্রিক দু' মিনিট আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, আমাদের সম্পর্কে আপনি কিছু জানতে চান না?

—নিশ্চয়ই। এ প্রশ্ন আমিই করতাম, আপনি আগে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কাজটা এগিয়ে দিলেন, আমি উত্তর দিলাম।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিস্ প্যাট্রিক ম্লানভাবে জবাব দিলেন—আমাদের কোন ইতিহাস নেই। বিধাতার ব্যর্থ সৃষ্টি আমরা—মানে আমি।

—আমিও ঠিক তাই, আলবার্টও একই কণ্ঠে উত্তর দিল—আমার জন্ম মাদ্রাজে। বাবা ছিলেন আমেরিকান, মা ভারতীয়। মাদ্রাজে কাজ করতে করতে বাবা কলকাতায় বদলী হয়ে আসেন। আমিও এখানকার রীতি-নীতি ভাষা সব আয়ত্ত করে ফেলি। তারপর বাবা মারা গেলেন, মা তার আগেই মারা গেছলেন। মিঃ পিয়ার্সন বাবার বাল্যবন্ধু—উনিই আমাকে এখানে নিয়ে আসেন। মাঝখানে চাকরীও করেছি কিছুদিন।

—আমার মা-বাবা কলকাতারই বাসিন্দা ছিলেন। তাঁরা এখানকার

কোথায় ছিলেন। সেই সূত্রেই কতকটা এখানে আমার চাকরী, মিস্ প্যাট্রিক উদাসভাবে ওয়েলার সাহেবের ছবির দিকে তাকালেন।

আমি চুপ করে শুনছিলাম। ওদের চাপা দীর্ঘশ্বাসের নীচে কোথায় যেন কিছুটা করে ইতিহাস আছে, গোপন কান্নার কাহিনী আছে। মনে মনে সে-সব কাহিনী জানবার ইচ্ছে হচ্ছিল।

মিস্ প্যাট্রিক হঠাৎ আমার চমক ভাঙলেন—চলুন এবার নীচে যাই। পেসেন্টদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করতে হবে তো! পিটার আছে, জন আছে, মজুমদার আছেন!

—চলুন, চেয়ার ছেড়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

নীচের হলঘরে পাশাপাশি অনেকগুলি বেড পাতা। বেশির ভাগই শুয়ে শুয়ে বিভিন্ন কাগজপত্র পড়ছেন। দু' একজন শীতের রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছেন।

মিস্ প্যাট্রিক আগে আগে এসে আস্তে আস্তে বললেন—ইনি মিঃ দত্ত—আমাদের নতুন সুপারিনটেন্ডেন্ট।

সকলে আমাদের দিকে চোখ ফিরিয়ে আমাকে দেখল। তারপর হাতজোড় করে অভিবাদন জানাল।

আমিও প্রত্যভিবাদন জানালাম।

একেবারে ধারের বেডে বসেছিলেন এক ভদ্রলোক। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা। একেবারে মনেই হয় না উনি অসুস্থ। মুখে-চোখে বেশ হাসি হাসি ভাব।

মিস্ প্যাট্রিক এগিয়ে এসে তাঁর বেডের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন—ইনি পিটার এডওয়ার্ড। যুদ্ধে গিয়ে দু'টি পা খুইয়ে এসেছেন। তাস ভাল খেলতে পারেন, গানও ভালই গাইতে পারেন।

—ভালই তো, আমি কিন্তু গান শুনতে খুব ভালবাসি, কতকটা প্রশংসার সুরেই বললাম আমি।

—ওকে গাইতে বললেই গাইবে, আলবার্ট আড়চোখে একবার পিটারের দিকে তাকাল।

পিটার বাঁ হাতটা এগিয়ে তার পাশে একটা চেয়ারে বসতে অনুরোধ করল।

মিস্ প্যাট্রিক বাধা দিয়ে বললেন—বসবেন, বসবেন। উনি আগে সব বেডগুলো ঘুরে দেখুন।

—তাই ভাল। আমি মিস্ প্যাট্রিকের পরামর্শে সায় দিলাম।

আস্তে আস্তে ঘোরা হল সব বেডগুলি। অধিকাংশই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। দু' একজন বিদেশীয় এবং দু' চারজন বাঙালিও আছেন। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল, বিভূতি মজুমদার। এককালে ভাল চাকরী করতেন। মানসিক রোগে ভোগার পর এখানে থেকেই পেন্সন ভোগ করেন।

আর একটি বাঙালি যুবক আছেন—বিপ্লব সান্যাল। খুব কম কথা বলেন। শুনলাম উনি নাকি যুদ্ধ-ফেরত। বর্তমানে মানসিক রোগে উনিও ভুগছেন।

ঘুরে ফিরে আবার পিটারের কাছে এলাম। চেয়ারে বসে আমি হেসে বললাম—কই আপনার গান শুরু করুন।

পিটার হাসল—কিন্তু বাংলা গান জানি না।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, গান হলেই হ'ল। শুনব তো সুরটা, পিটারকে আশ্বাস দিয়ে বললাম।

দু'এক মিনিট চুপচাপ কাটল। পিটার গান গাইবার জন্যে একটু ঘুরে বসার চেষ্টা করল। আলবার্ট ওপাশে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ—দেখলাম মিস্ প্যাট্রিকের দেখাদেখি ও একটা চেয়ার টেনে বসল।

আলবার্ট কতকটা নাটকীয় ভঙ্গীতে বলল—রেডি স্টার্ট!

পিটার হেসে সে নির্দেশেই যেন শুরু করল—

He is a jolly good fellow,
He is a jolly good fellow.
He is a jolly good fellow,
Oh, hip hip 'ray,
Oh, hip hip hip 'ray.

গান থামতে সকলে একসঙ্গে হাততালি দিয়ে পিটারকে ধন্যবাদ জানাল। আমিও ওদের সঙ্গে হাত মেলালাম। একটা জিনিস নজরে পড়ল আমার—এখানে গলা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। পিটারের গলাটা সরু কি মোটা—এসব চিন্তা নয়, ওদের প্রচেষ্টা হল পিটারকে কি করে খুশী করা যায়।

আমিও প্রশংসা করলাম পিটারকে। পিটার হেসে বলল—আমার বাংলা গান শেখার ভীষণ ইচ্ছে আছে কিন্তু কার কাছে শিখব! আপনি গান জানেন?

দেখলাম পিটারের জীবনের উপর কোন ধিক্কার নেই। এই পঙ্গু জীবনেও তার প্রেরণা আছে। বাংলা গান শিখতে চায় সে।

হেসে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করলাম—না, আমি গান জানি না।

পিটার নিজেই এবার বলল—আমি জাতীয় সঙ্গীতের কিছুটা জানি।

আমি আবার অনুরোধ করব কিনা ইতস্ততঃ ভাবে ভাবছি এমন সময় পিটার নিজেই গেয়ে উঠল—জন-গণ-মন অধিনায়ক জয় হে—

(ক্রমশঃ)

• ভবঘুরের ডাইরী থেকে •

—শ্রীভবঘুরে

(পূর্বানুবৃত্তি)

আমরা ডাকবাংলোতে উঠলাম। চাপরাশী আমাদের ভাল ঘরটিই দিল। দোকান বাজার করে দিল, স্নানের জল, রান্নার ব্যবস্থা সব করে দিল। আমরাও স্নানের পর আহারাদি শেষ করে বেশ খানিকটা বিশ্রাম করে নিলাম ইজি-চেয়ারে শুয়ে।

বেলা তিনটা নাগাদ কুলিরা বোঝা পিঠে করে চলতে লাগল, আমরা তাদের পিছনে। পাহাড়ী পথ হলেও রাস্তা ভাল। অসুবিধা বিশেষ হচ্ছে না। পাইন, ওক, বার্চ প্রভৃতি গাছের বন; পাহাড়ের গার দিয়ে পথ, নীচে খাদ—প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপূর্ণ পরিবেশ। উপভোগ করো—হিমালয়ের সৌন্দর্যরাশি, চলার গতি বৃদ্ধি হবে। সাবধান, চলার গতি বন্ধ করো না—তা'হলেই হবে দুর্গতি। পরিশ্রান্ত হয়েছ, পথের ধারে বসে বিশ্রাম করো—মৃদুমন্দ সমীরণ তোমার শ্রান্তি দূর করবে। ভুলেও চোখ বুজোনা হিমালয়ের কোলে—সহজে সে চোখ খুলবে না তা'হলে।

সন্ধ্যা নাগাদ বীনসারে পৌঁছলাম। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সুন্দর সুন্দর বাড়ী। ধনীর দুলালরা এখানে আসেন গ্রীষ্মকালে; বাস করেন, আমোদ করেন, ফটো তোলেন, আবার চলে যান যার যার স্থানে। চারদিকে চোখ মেলে তাকাও—গাছের তলায়, পাহাড়ের ধারে, নির্জন পরিবেশে দেখতে পাবে কপোত কপোতীর মত মানব-দম্পতিও প্রেম নিবেদন করছে, উপভোগ করছে জীবনটাকে। এখানে দোকান-বাজার, সরকারী অফিস, ডাকঘর, বিদ্যালয় সব আছে। ছোট ছোট বাংলোও ভাড়া পাওয়া যায়—চাই শুধু পয়সা। পাহাড়ী লোকেরাও ভাল—সরল, বিশ্বাসী। আমরা ছোট একটি বাংলো ভাড়া নিলাম চার দিনের জন্য। মজুররা সব ব্যবস্থা করে দিল।

বীনসারে চারদিন আনন্দেই কাটল। সকাল বিকেল ঘুরে বেড়ান, দুপুরে খাওয়া আর রাত্রে ঘুমান। বিরাট হিমালয়ের দিকে যখনই তাকাই, মন আপনা থেকেই সমাহিত হয়ে আসে—বিরাটের স্পর্শ-সুখ অনুভব করি।

আজ বীনসারে শেষ রজনী। বিকেল থেকেই আকাশ মেঘলা—থমথমে ভাব। স্থানীয় লোক বলছে 'বরিষ আয়গা'। আমরা বেশী দূর না গিয়ে বাংলোর সামনেই পায়চারি করে ঘরে ঢুকলাম সন্ধ্যার সময়। দোর-জানলা বন্ধ করে হারিকেনটা জেলে খাটিয়ার উপর বসে গল্প করতে লাগলাম। মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে লাগল, মেঘের গর্জন আর তার সঙ্গে প্রবল ঝড়ের সাঁই সাঁই শব্দ। দমকা হাওয়া মনে হচ্ছে বাংলোটাকে ফেলে দেবে—আর আমরা এই ঘরের মধ্যে সমাধিস্থ হয়ে থাকব। চিত্রার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। মেঘের গর্জন ঘন ঘন আরম্ভ হল, বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, দমকা হাওয়া দরজা জানলাগুলোয় এসে ধাক্কা দিচ্ছে। চিত্রা ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল, লেপমুড়ি দিয়ে জড়সড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

ঝড় থামলো, বৃষ্টিপড়া বন্ধ হল—আকাশ মেঘমুক্ত। দরজা খুলে বাইরে এলাম। চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে, তার কিরণ গাছপালার ভিতর দিয়ে বাংলোর উঠানে ছড়িয়ে পড়েছে। আকাশের দিকে তাকালে কে বলবে কিছুকাল আগে এখানে প্রলয়ের ঝড় বেজে উঠেছিল! চিত্রাকে ডেকে তুললাম। যথারীতি নৈশ আহারের ব্যবস্থা হল। খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম। কাল ভোরে এস্থান ত্যাগ করতে হবে।

বেলা তখন সাতটা। সূর্য উঠেছে, সামান্য শীতের স্পর্শ অনুভব হচ্ছে। কুলিরা মালপত্র নিয়ে এগোতে লাগল, আমরা তাদের পেছনে। 'সেরাঘাটে' আজ গিয়ে পৌঁছাতে হবে। কানালি-ছিনায় মধ্যাহ্ন ভোজন হবে। পাহাড়ী পথ হলেও প্রশস্ত, চড়াই নেই। পাইন বন, গিরিখাত আর হিমালয়ের কুটিল পথের বক্ররেখা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। পথে লোকজন খুব কম। স্থানে স্থানে মেষ-পালক তাদের মেষের দলগুলি নিয়ে এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়ে যাচ্ছে। এখানকার লোকজন মুরগী পালন করে, প্রতি গৃহেই মুরগী দেখা যায়।

কানালিছিনায় বন বিভাগের ইন্‌সপেকশন্ বাংলোতে আমাদের মধ্যাহ্নে বিশ্রামের স্থান হলো। এখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে বীনসার পাহাড়ের দৃশ্য অতি মনোরম। পাহাড়ের উপর ছোট ছোট বাড়ীগুলো এক একটা বিন্দুর মত দেখা যাচ্ছে।

মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করে দু'টা নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়লাম। পথ উৎরাই। প্রায় মাইল খানেক পরে

একটা গিরিখাতের নিকট এসে শেষ হয়েছে। কাঠের পুল পার হয়ে পাহাড়ের ধার দিয়ে কিছু চড়াই পথ অতিক্রম করে তারপর উৎরাই। উৎরাই শেষ সরযূ নদীর ধারে। মাঠে কৃষকরা চাষ করছে। মাঝে মাঝে আমের বাগান দেখা যাচ্ছে—ছোট ছোট কাঁচা আম ডালে ডালে ঝুলছে। হাওয়ায় টুপ্ টুপ্ আম পড়ছে আর গাছের তলায় পাহাড়ী ছেলেমেয়ে তাই কুড়াচ্ছে। কলরবে মুখরিত সে স্থান। আশেপাশে দু'চার ঘর লোক স্থানে স্থানে ঘর বেঁধে বাস করছে। মাঝে মাঝে দু' একটি চায়ের দোকানে জল গরম হচ্ছে। তার পাশে আট দশজন লোক বসে আড্ডা জমাচ্ছে, খোসগল্প করছে। তবে ওরা রাজনীতির ধার ধারে না,—তাই রক্ষা। ভারতবর্ষের কোথায় কি হচ্ছে তাই নিয়ে ওরা মাথা ঘামায় না। 'কন্দু গোধূমচূর্ণ আর অড়হর ডাল পেলেই এরা সন্তুষ্ট।

আমাদের খাদ্য-বিধাতারা এটুকুও পরিপূর্ণভাবে দিতে নারাজ। তাই জাতিকে থাকতে হচ্ছে অর্দ্ধাহারে,—অনাহারে বললেও অত্যুক্তি হয় না। 'সমবণ্টন প্রথা' বড় গালভরা শব্দ কিন্তু তাতে পেট ভরে না।

রাস্তার একপাশে বিরাট পাহাড়, আর রাস্তার নীচে বিরাট খাদ। পাহাড় তাকিয়ে আছে খাদের দিকে, আর খাদ তাকিয়ে রয়েছে পাহাড়ের চূড়ার দিকে। বিরাট বিরাটের উপলব্ধি করছে। পথিক পথ চলতে চলতে কখন কখন বিরাটের চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে, তার বাহ্যজ্ঞান থাকে না—সম্বিত ফিরে আসে সরযূ এর ঝুলান পুলের নিকট এসে।

পুল পার হয়ে এলেই সেরাঘাট। পথের পাশে রয়েছে পাহাড়ীদের বস্তি। ডান দিকে মুখ ফেরালে দেখতে পাবে, আরও একটি পাহাড়ী নদী এসে মিশেছে সরযূর সঙ্গে। সরযূ এসেছে মানস সরোবর থেকে, সেখানে নাম তার কর্ণালী, এ নাম অবশ্য তিব্বতী।

সন্ধের উপর আমবাগানের ধারে শিবমন্দিরের নিকট একটি দোতলা ঘরে আমাদের আস্তানা পড়লো। তখন সূর্য ডুবু ডুবু। আজ আমরা বড়ই পরিশ্রান্ত। দোতলার মেজেতেই অস্থায়ীভাবে বিছানা পাতা হল। মজদুররাই রাতের রুটী, আলুর চোখা তৈরী করে দিল। এর মধ্যে রাষ্ট্র হয়েছে মেম সাহেব (চিত্রা) বড় হাসপাতালের ডাক্তার, দলে দলে পাহাড়ী মেয়ে পুরুষ আসছে, কেউ তাকে আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা জানাচ্ছে, কেউ চাইছে ওষুধ, কেউ বলছে তার রোগের বিবরণ। সে সব রকে ব্যবস্থা দিচ্ছে হাসিমুখে। পাহাড়ীরাও অন্তর দিয়ে চেষ্টা করছে অতিথির যাতে কোন কষ্ট না হয়।

পরদিন ভোরবেলায় সরযূ নদীতে স্নান করতে গেলাম। পাহাড়ী নদীতে জল বেশী নেই, জল শীতল আর পরিষ্কার, জলের নীচে ছোট ছোট নানা রং-এর পাথর রয়েছে, সেগুলোও বেশ দেখা যায়। আর ছোট ছোট মাছ খেলা করছে, তাও নজরে পড়ে। স্রোতের টানে বড় বড় কাঠ ভেসে আসছে পাহাড়ের উপর থেকে, আর ছেলেরা তাতে চড়ে খেলা করছে।

মানস সরোবর যাওয়া ঠিক হল। কিন্তু অতদূর হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়। এখানে সোওয়ারী ঘোড়া পাওয়া যাবে না। কি করা যায়! গনাই বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম, সেখানে আমাদের পরবর্তী বিশ্রাম-স্থল। সেখানে সরকারী ডাক্তারখানা আছে। একজন কুলিকে মালপত্র দিয়ে চিঠি লিখে ডাক্তার বাবুর কাছে পাঠিয়ে দিলাম—যাতে দু'টি সোওয়ারী ঘোড়া যোগাড় করে রাখেন। আর একজন কুলী পথ-প্রদর্শক হয়ে যাবে আমাদের সঙ্গে।

গনাই মাত্র ছয় মাইল পথ। সামনের পাহাড়টা ডিঙিয়ে যেতে হবে। তিন মাইলের আগে আর বিশ্রামের স্থান নেই। পথ বলে কিছু নেই। পাহাড়ের উপর পাকদণ্ডী রাস্তা, অসাধারণ চড়াই। ধীরে ধীরে পাকদণ্ডী পথে উঠলাম। তিন মাইল পথ তিন ঘণ্টায় অতিক্রম করে 'নারবাখোলে' পৌছান গেল। পাহাড়ী মেয়েরা এই পথে বোঝা পিঠে নিয়ে অক্লেশে চলা ফেরা করছে। আমরা এখানে বিশ্রাম করে আহারাদি শেষ করলাম। এখানকার দোকানে বেশ ভাল মধু পাওয়া যায়। আট দশ ঘর লোকের বসতি। পথে 'পানচাক্কী' আছে—ঝরণার জলকে কাজে লাগিয়ে লোকে গম পিষে নিচ্ছে।

সন্ধ্যার পূর্বেই গনাই পৌছান গেল। ডাক্তারবাবু বিশেষ ভদ্রলোক, তিনি সমস্ত যোগাড় করে রেখেছেন। বিশেষতঃ চিত্রা মিলিটারী কনস্টেবলের ডাক্তার। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী এসে তাকে সম্বর্দ্ধনা করে নিয়ে গেল। গল্পগুজবে রাতটা কাটল। সবাই শুতে গেলাম।

কয়েকদিনের ভিতর আমরা 'পাক্ষিয়া' পৌছালাম। তিব্বতী গাইড্ কীচ খান্দাকে আগে থেকেই ঠিক করা হয়েছিল চিঠি দিয়ে। খান্দার বাড়ীতেই আমাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা হল। খান্দার স্ত্রী আর চার মেয়ে খুব চিত্রার সম্মান করলো। তারা সবাই খুব যত্ন করেছে আমাদের। কীচ তিব্বত যাত্রার সব আয়োজন করল। দু'টো প্রকাণ্ড ভেড়ার পোষাকের জন্য দিল।

এপার মাইল দূরে কালাপানি। শেষ চেক-পোষ্ট। তাঁবুতেই এখন থেকে বাস করতে হবে। দু'টো তাঁবু যোগাড় করা হল। দিনের বেলায় পথে পথে, সন্ধ্যার পূর্বে তাঁবুতে বাস।

লিপু পার হয়ে তকলাকোট, তিব্বত রাজ্য। এখানেই মণ্ডীবাস। মণ্ডী মানে বাজার। ভোটিয়া মহাজনগণ ব্যবসা উপলক্ষে আসে। ঘরের চাল নেই, উপরে কালো কম্বলের ছাউনি। তিব্বতী মেয়ে পুরুষ ভিক্ষা করতে আসে। ভয়ঙ্কর তাদের চেহারা যেন যমদূত! তিব্বতের অপর নাম কিমপুরুষ খণ্ড।

প্রথম বৌদ্ধ গুম্ফা শিবলিং তকলাকোটেই রয়েছে। টয়োগাম্বে জোরভার সিং-এর সমাধি।

আমরা তিন চার দিনের ভিতর রাবণ হ্রদ দেখে মানসের ধারে এসে তাঁবু ফেললাম। মানসের জলে হাঁসের দল সাঁতার কাটছে। মাছের ঝাঁক মানুষের পায়ের শব্দ পেয়ে দূরে চলে যাচ্ছে। কি স্বচ্ছ জল—শীতল! তাঁবুতেই রাত্রিবাস করলাম। ভোর বেলায় মানস সরোবরের জলে ডুব দিয়ে স্নান করে জমে' যাবার মত অবস্থা। শরীরটাকে গরম করার জন্য নানা কসরত করতে হল।

দূর থেকে দেবাদিদেবের বাসভূমি কৈলাস পর্বতকে দেখা যাচ্ছে। করজোড়ে প্রণাম করলাম দেবাদিদেবকে। মানস সরোবরের ধারেই রয়েছে দু'টী গুম্ফা। তিব্বতী লামা আর তাবা তাতে থাকে। মন্দিরগৃহে বুদ্ধের মূর্তি—হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিও রয়েছে পাশে। মন্দিরে জুতা পায়ে প্রবেশ নিষেধ নয়। প্রচুর ঘিয়ের বাতি সাজানো রয়েছে। দেবমূর্তির দীপ জ্বালিয়ে দিলেই এখানকার পূজা হয়, ফুল বেলপাতার প্রয়োজন নেই। দক্ষিণা দিতে হ'ল দু'টী বাতির জন্য নগদ ভারতীয় দু'টাকা। আরও দু'টী গুম্ফা আছে দূরে। আমরা সেদিকে যাইনি। সরোবরটি ৩৪ মাইল, গভীর, পদ্মফুল নেই। নীল আকাশ—জলও নীল, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় জলের রং মনে হয় যেন লাল।

প্রাতঃকালে সামান্য জলযোগ করে বরখার প্রান্ত পার হয়ে আমরা পৌছালাম একটি তিব্বতী গ্রামে। ঘরদুয়ার নেই, কালো তাঁবুর ভিতর বাস করে এখানকার লোকজন; ভয়ঙ্কর দর্শন কুকুর পোষে প্রত্যেকেই। কৈলাস পর্বত আমাদের সম্মুখে, মেঘমুক্ত আকাশ, ধ্যানমৌলি দেবাদিদেব হাস্যরত রয়েছেন। শীর্ষদেশ বরফে ঢাকা। প্রাণভরে দেখলেও আশা মেটে না। এখান থেকেই কৈলাস পরিক্রমা আরম্ভ হয়। এরপর 'টায়চেন মণ্ডী'। সেখানেও একটা গুম্ফা আছে। আরও ছাড়িয়ে গেলে পাহাড়ের নীচে প্রকাণ্ড একটা ঝাণ্ডা উড়ছে। এখানে বুদ্ধপূর্ণিমার দিনে মেলা বসে। আরও এগিয়ে গিয়ে নদীর ধারে গুম্ফার নিকট আমাদের তাঁবু পড়ল, আমরা বিশ্রাম করলাম।

ভোরে যাত্রা করা হল দোলমালার উদ্দেশে। এপথে সব থেকে উঁচু স্থান প্রায় ১৯০০ ফুট। সমস্ত পথটাই প্রায় বরফে ঢাকা—নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। টক লজেন্স, লেবুর আচার মুখে রাখতে হয়। দোলমালার এক কাণে নীচে গৌরীকুণ্ড। তিন দিকের পাহাড় বরফে ঢাকা। এই কুণ্ডটী বৃত্তাকার, উপরে বরফ, মধ্যে জল, নীচে নীলাভ বরফ। এ সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। অনেকে স্নান করে বরফ ভেঙে, আমরা মাথায় জল স্পর্শ করেই শুদ্ধ হলাম। চিত্ত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো, ছোট ছোট কয়েকটি স্মরণ নুড়ি পাথর কুড়িয়ে নিলাম স্মৃতিকে ধরে রাখতে কৈলাসের স্মৃতি-চিহ্ন হিসাবে।

তারপর নামার পালা। উৎরাই পথ বরফে আবৃত। ধীরে ধীরে নীচে নদীর ধারে এলাম। আরও এগিয়ে গিয়ে আর একটা নদীর ধারে সেদিনের মত আমাদের তাঁবু পড়ল। কি ঠাণ্ডা! থুথু ফেললেও জমে যায়। নদীটার নীচে জলের স্রোত চলেছে, উপরে বরফ জমে গেছে, বালতীর জলও জমে গেছে। প্রতিজনে দু'কাপ করে গরম কফি খেয়ে শরীরটা গরম করি।

আমাদের পরিশ্রান্ত দেখে কীচ আজ খিচুড়ী রান্না করে খাওয়াল। তাতেও শরীরটা একটু গরম হল; তাঁবুর দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। যতই রাত হচ্ছে, শীতের জোর ততই বাড়ছে, আমরা ক্রমে কুকুরকুণ্ডলী পাকাচ্ছি। মুখে কারও রা নেই।

ভোরে উঠে কৈলাস পরিক্রমা শেষ করে তাঁবুর গ্রামে ফেরা হল। আজ এখানে বিশ্রাম। তিব্বতীরা ভিক্ষা করতে এল। তারা পয়সা চায় না, খেতে চায়—নইলে সিগারেট। মেয়ে পুরুষ সবাই সিগারেট চায়—এটা নাকি খুব বিলাসিতার দ্রব্য। আবার কৈলাসের সামনে তাঁবু। কীচ বললে—মাইজী এবার ফিরে চল আপন ঘরে।

ফেরার পথে চিত্রাকে দেখিয়ে আনলাম তকলা মাকালা পর্বত। নানা রংএর বিন্যাস পাহাড়ের গায়ে। লোসাগ্রামের নিকট নারায়ণস্বামীর আশ্রম, 'নাজাং জলপ্রপাত,' 'বুদেরিয়া জলপ্রপাত,' আসকোটের রাজবাড়ী, আর নারায়ণস্বামী প্রতিষ্ঠিত ইন্টার কলেজ। তারপর আলমোড়া হয়ে রানীক্ষেত। রানীক্ষেতে কয়দিন বিশ্রাম করে ফিরে এলাম নিজ কলিকাতায়।

• ট্রেনে •

—চুনীলাল রায় চৌধুরী

ঘড়িটা তখন প্রায় ছাড়ে ছাড়ে। ডিসট্যান্ট্ সিগ্‌নালের নীল আলোটা লাইন ক্লিয়ারের সংকেত্ দিয়ে জলে উঠেছে। প্ল্যাটফর্মে লোকজনের আনাগোনার মধ্যে বিষম ব্যস্ততা। 'চা-গরম' ধ্বনিটা উচ্চগ্রামে মুখরিত। পান-বিড়ি সিগ্রেট নিয়ে হকার দ্রুত-গতিতে ধাবমান। কুলিদলের ছোটা-ছুটির বিরাম নেই। যাত্রীদের একটু আরাম দেবার জন্য যে সমস্ত বাড়তি লোক এতক্ষণ যাত্রী সেজে জাঁকিয়ে বসেছিল তারাও একে একে নেমে গেল। তবু কামরাটা লোকে একদম ঠাসা। রাত্রির শেষ লোকাল ট্রেন। তাই ভীড় একটু বেশী।

ষ্টেশনের ঘন্টাটা ঢং ঢং করে বেজে উঠল। গার্ড বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে নীল আলোটা দোলাতে লাগলো। এঞ্জিনের মুখ থেকে একটা বিকট হুইস্‌ল্ বেজে উঠলো। গাড়ীটা ছাড়বার মুখে গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো—ঠিক এই সময়ে একটি মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে পা-দানীর উপর লাফিয়ে উঠলো। দরজার পাশে দণ্ডায়মান লোকটির দিকে একটু মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে অনুরোধের সুরে আবেদন জানালো,—"আপনি দয়া করে একটু যদি সরে দাঁড়ান—আমাকে একটু ভিতরে ঢুকতে দিন।" কিন্তু উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে হাতলটা ঘুরিয়ে সজোরে দরজাটা খুলে ফেলল এবং ঐ ভীড়ের মধ্যেই একটু জায়গা সে করে নিল।

[illegible] [illegible], অপরিচিত মেয়েটি। মিষ্টি চেহারা, আঁটসাঁট গড়ন। পাতলা সিফন শাড়ীর নীচে সুন্দর একটি ব্লাউজ। অন্তর্বাসের সূক্ষ্ম কাজটুকু পাতলা পোশাক ভেদ করে ফুটে উঠছে। শ্যাম্পু করা ফাঁপানো চুলের বিলম্বিত বেণীটি ঘাড়ের কাছ দিয়ে কাত হয়ে এসে বুকের উপর লতিয়ে পড়েছে। সাদা মুখে উগ্র প্রসাধনের পুরু প্রলেপ। সারা দেহে তীব্র এসেন্সের ঝাঁঝালো গন্ধ। ঠোঁট দুটি রাগরঞ্জিত। কাজলটানা চোখের অলস দৃষ্টি মদির কটাক্ষ বলে ভ্রম হয়। দেখেই মনে হয় পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করবার বিদ্যেটা ওর অধিগত।

মুহূর্তে গাড়ীর সব কয়টা চোখের দৃষ্টি এই তরুণীটির ওপরে নিবদ্ধ হলো।

সমস্ত কামরাটার মধ্যে একটিমাত্র মেয়ে। সুন্দরী, সুবেশা, সপ্রতিভ, অপরিচিতা এবং অনাত্মীয়া। রোমান্সের সবগুলি উপাদানের যেন একত্র সমাবেশ। কিন্তু যাকে নিয়ে রোমান্সের এত উচ্ছ্বাস সে রইলো নাগালের বাইরে, সকলের দিকে পিছন ফিরে বাইরের অদৃশ্যপ্রায় প্রাকৃতিক শোভার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে।

যারা আসন নিয়ে বসে আছে তাদের মনেও অস্বস্তি। একটি সৌখিন মেয়ে, ভদ্রঘরের আপ-টু-ডেট মেয়ে, গাড়ীর মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে আর পুরুষমানুষ হয়ে তারা নিশ্চিন্তে আসন নিয়ে বসে থাকবে—কেমন যেন অশোভন মনে হয়। মেয়েটিকে আসন ছেড়ে দিতে অনেকেই উৎসুক হয়ে উঠলো, কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই কি সব কাজ করা যায়। চক্ষুলজ্জায় বাধে, কে কি মনে করবে কে জানে!

যুবকদের এই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে শেষ পর্যন্ত প্রৌঢ় আশুবাবু আর থাকতে পারলেন না। মেয়েটিকে উদ্দেশ করে বললেন, দরজার কাছে কতক্ষণ তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে মা? তার চাইতে আমি উঠে যাচ্ছি, তুমি এখানে এসে বস।"

তার প্রস্তাবটা শেষ হতে না হতেই একটি অল্পবয়সী ছোকরা লাফিয়ে উঠলো। 'শিভ্যালরি' দেখাবার এমন সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে, তা-ও কি হয়! সে বলল, "আপনি বুড়ো মানুষ আপনি উঠবেন কেন? আমি জায়গা ছেড়ে দিচ্ছি।" মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, "আপনি স্বচ্ছন্দে এখানে এসে বসতে পারেন।"

মেয়েটি উভয়কে সবিনয় প্রত্যা-খ্যান করে বলে উঠলো, "ধন্যবাদ! আপনাদের জায়গা ছাড়তে হবে না। আমি বেশ আছি।"

অনেকগুলি জোড়া ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। এ আবার কেমনধারা মেয়ে, বাপু! বসবার জায়গা পেলেও দাঁড়িয়ে থাকতে চায়। যুবকদের মধ্যে কেউ কেউ বাঁকা চোখে তাকালো। ভাবল, মেয়েটা বড্ড অহঙ্কারী, বৃদ্ধদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবলো, এ যুগের মেয়েদের চালচলনই আলাদা।

তারপর এক সময় উত্তেজনা থিতিয়ে এল, চাঞ্চল্য মিলিয়ে গেল, যে যার জায়গায় নিজেকে গুছিয়ে নিল। গাড়ী একটানা ছুটে চললো। একঘেয়ে গতির ছন্দনাতে ধীরে ধীরে চোখে ঘুম জড়িয়ে এল। কেউ কাত হয়ে, কেউ সামনে ঝুঁকে পড়ে, কেউ কুণ্ডলী পাকিয়ে, কেউ হাঁ করে, কেউ

বা অসাড়ে ঘুমিয়ে পড়লো। গাড়ী ছুটে চললো।

হঠাৎ কামরার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মেয়েটির কণ্ঠস্বর উচ্চকিত হয়ে উঠলো,—'ও কি করছেন? আমাকে স্পর্শ করার লোভ হবে তা জানি, তা বলে অতটা চাপ দিলে আমি পিষে যাবো যে। আপনাকে আরেকটু সরে দাঁড়াতে হবে।" বলেই মেয়েটা খিল খিল করে হেসে উঠলো।

পিছনের ছেলেটি একেবারে অপ্রতিভ। ইতিপূর্বে দু' একবার যে গায়ে গায়ে একটু ঠোকাঠুকি না হয়েছে, তা' নয়। চোখাচোখী হতে মেয়েটা তখন রাগ না করে মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে দিয়েছে,—তাকে প্রশ্রয় বলেই মনে হয়েছে। ভাবাই যায়নি যে এই মেয়েই এমন করে সকলের কাছে অপদস্থ করার জন্য মিষ্টি ছুরিও বসিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু গায়ের উপর ঝুঁকে পড়লেও যে-মেয়ে রাগে জলে ওঠে না, ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলে খিল খিল করে হেসে ওঠে—সে কেমন মেয়ে?

তবে কি ভদ্র ঘরের নয়? আর কিছু? কেমন একটা সংশয় ঘনিয়ে এল যাত্রীদের চোখে। আর এই সংশয়ের ফলে আবার যেন নতুন উত্তেজনায় মুখর হয়ে উঠলো কামরার আবহাওয়া।

একপাশ থেকে সমীর মন্তব্য করল, 'কিন্তু আপনাকে যখন বসবার জন্য জায়গা করে দেওয়া হলো, তা আপনার পছন্দ হ'লো না। ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকাই যখন আপনার পছন্দ তখন একটু ধাক্কাধাক্কি সইতে হবেই—তার জন্য আবার অভিযোগ করছেন কেন?

"আপনার কাছে তো আমি নালিশ জানাতে যাইনি। আপনারই বা আমার জন্য এত মাথাব্যথা কেন? মেয়েটি তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাবটা ছুঁড়ে দিল।

"সমবেদনা জানালে ভদ্রমন কুণ্ঠিত হয়ে ওঠে"—সমীর প্রত্যুত্তর করল, "কিন্তু কুৎসিত মন শুধু সন্দেহ করতেই জানে। আপনার রুচি বিকৃত তাই অযথা লোককে অপমান করতে আপনার বাধে না।"

"আমার বিকৃত রুচি আপনার অভিজ্ঞ চোখকে ফাঁকি দিতে পারে নি দেখছি। অনেক নারী চরিত্র নিয়েই ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন বোধ হয়।" মেয়েটি শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে পাল্টা জবাব দিল,—"কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমার সম্বন্ধে আপনার মন্তব্যটাই কি ভদ্রমনের পরিচায়ক?'

উত্তরে সমীর আবার কি একটা বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিল অমরেশ। এই অমরেশ ছোকরাই প্রথমে জায়গা ছেড়ে দিতে উদ্যত হয়েছিল। রুষ্টকণ্ঠে সে বলে উঠলো, "আপনার হাবভাব দেখে ভাল লাগে নি। তবু আপনারা মায়ের জাত বলেই আমার জায়গাটা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিলাম।"

মেয়েটি এবার বিদ্রূপের হাসি হেসে জবাব দিল—"থাক, কথায় কথায় অমন মায়ের নাম করে দোহাই দেবেন না। মায়ের জাতের জন্য আপনাদের সম্ভ্রম বোধ কতখানি, সে আমার ঢের জানা আছে। বিশেষ বয়সের মেয়েছেলে দেখলেই হঠাৎ যাদের কর্তব্য জ্ঞান টনটনে হয়ে ওঠে, তাদের সাহায্য করার জন্য একেবারে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তাদের মনের কোনে কোন্ ভাব লুকিয়ে থাকে, তা কি আমরা কিছুই বুঝি না মনে করেন? তাদের মুখেই আবার মাতৃভাবের বড় বড় বুলির কপচানি শুনলে গা জ্বালা করে।"

অমরেশ চটে গেল, "আপনার মত মেয়ের জন্য জায়গা ছেড়ে দেবার প্রস্তাব করাটাই আমার ভুল হয়েছে।"

মেয়েটি কঠিন হেসে জবাব দিল, "না, আপনার ভুল হবে কেন? আপনি তো চেষ্টার কসুর করেন নি! কিন্তু আমিই ফাঁদে পা দিই নি।"

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি এবার মুখ খুললেন, "ওদের কথা থাক মা। আমার একটা কথার উত্তর দাও দেখি। ওদের সম্বন্ধে যদি তোমার এই অভিমত, তবে তুমি সব জেনে শুনেও এই পুরুষের কামরায় এসে উঠলে কেন? পাশেই তো মেয়েদের কামরা ছিল, সেইখানেই তো উঠতে পারতে।"

"পারতাম বৈকি।" মেয়েটি আবার স্বচ্ছন্দ হেসে উঠলো। "নিছক আপনাদের একটু আনন্দ দেবার জন্যেই কষ্ট করে আমার এই কামরায় ওঠা।"

—তাহলে তোমার কথা অনুসারেই বলি, পুরুষকে আনন্দ দেবার জন্যই যে-মেয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে, তাকে যদি কেউ খারাপ মেয়ে বলে সন্দেহ করে, তবে তাকেও তো দোষ দেওয়া যায় না।

—কিন্তু মেয়েদের সান্নিধ্য পেলেই যারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে তাদেরই কি সৎপুরুষ বলে জানাতে হবে? স্বভাব মন্দ জেনেও সেই মেয়েকে সাহায্য করার জন্যে আপনারা বেশী ঝুঁকে পড়েন নাকি?

—তোমার একথা বোধহয় ঠিক নয়।

—আপনি বয়স্ক লোক, আপনি রাগ করবেন না। আপনি এতক্ষণ বসে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করছেন। অথচ এই সময়ে আপনার ঘুমিয়ে পড়ার কথা। আমি যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতাম তা'হলে আপনিই কি এতক্ষণ বসে তর্ক করতে উৎসাহ পেতেন। আপনারি বয়সেই যদি এটা

সম্ভব হয়, তবে ছেলে-ছোকরাদের কি হতে পারে তা সহজেই বুঝতে পারেন।

আশুবাবু সখেদে উত্তর দিলেন, "তোমার মেয়েদের কামরায় যাওয়াই উচিত না।"

সমীর অস্ফুটকণ্ঠে গর্জে উঠলো—"ন্যুইসেন্স"।

অমরেশ মন্তব্য করলো, "ভালগার"

মেয়েটি কারও কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে আশুবাবুর উদ্দেশ্যে বলল, "আমার যেতে আপত্তি নেই, কিন্তু আপনারাই পরে আপশোষ করবেন। আর এমনই মজা, সেটুকু স্বীকার করতে পারবেন না। লজ্জা আপনাদের কণ্ঠরোধ করে ধরবে। এইটাই হচ্ছে ভদ্রতার খেসারত।"

আশুবাবু বুঝলেন, এ মেয়ের মুখের বাঁধন আলগা। এর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। তিনি মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

সমীর রক্তচক্ষে তাকিয়ে রইল।

অমরেশ নিষ্ফল আক্রোশে গোমরাতে লাগলো।

গাড়ী নির্দ্ধারিত গতিতে এগিয়ে চলল।

এদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মেয়েটি চাপা কণ্ঠে সেই শিষ ফেলতে উদ্যত পিছনের ছেলেটির সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল। "আপনি যেন আমার উপর রাগ করবেন না। আপনার জন্যেই এই বাগবিতণ্ডার সৃষ্টি। কিন্তু সত্যি বলছি আপনার উপর আমার একটুও রাগ নেই। এরা সব ভদ্রতার মুখোস পরে বসে আছে, আপনার ঐ মুখোসটুকু নেই বলেই ভাল লাগলো। আমি পরের ষ্টেশনেই মেয়েদের কামরায় নেমে যাব। যাবার আগে আপনার পরিচয়টা জানতে ইচ্ছে করে।"

"কোন প্রয়োজন আছে কি?"—ছেলেটি মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল।

—"না—নিছক কৌতূহল।"

—"তবে নাই বা জানলেন!"

"জানলেই বা ক্ষতি কি?"

—"কে জানে আপনার এই কৌতূহলের পেছনেই বা কোন মতলব ওত পেতে আছে!"

"সত্যি বলছি, আপনাকে আমার ভারি ভাল লাগলো।"

—"বিশ্বাস করুন, কোন মতলব নেই।"

"আপনার কচি মুখে দেখে মনে হয় আপনি এখনও ছাত্রাবস্থায় আছেন। আমার অনুমান ঠিক কিনা, বলুন?"

ছেলেটি হাসিমুখে স্বীকৃতি জানালো।

মেয়েটি তখন আবার জিজ্ঞাসা করে, "এবার তা হলে আপনার নামটি বলুন।"

যুবকটি একটু দ্বিধা করলো, তারপর কি মনে করে নিজের পরিচয় জানিয়ে দিল, বলল, "আমার নাম বিনয় মজুমদার।"

"কি বল্লেন বিনয়! সার্থক নাম রেখেছিলেন আপনার বাপ-মা। চরিত্রের সঙ্গে নামটি একেবারে মিশে গেছে। আপনার কথা আমি ভুলবো না বিনয়বাবু!"

গাড়ী ততক্ষণে ষ্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটি নামবার মুখে দু'হাত একত্র করে কপালে ঠেকিয়ে বিদ্রূপের সুরে বলে গেল, "সাধুপুরুষগণ, বিদায়! চটুল মেয়ের সঙ্গ হতে অব্যাহতি পেলেন—এবার সাধুসঙ্গে সদালাপ আরম্ভ করুন।"

কিন্তু বিনয় তাকে মেয়েটার পরিচয় নেওয়া হল না। সে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল। তার অন্তরে একই সময়ে পুলক ও বেদনা দোলা দিয়ে গেল।

তারপর মেয়েটার সম্বন্ধে আলোচনায় কামরাটা মুখর হয়ে উঠল।

কেউ বলল, মেয়েটার স্পর্দ্ধার সীমা নেই।

কেউ বলল, অত্যন্ত মুখরা।

কেউ বলল, অত্যন্ত কুৎসিত মনোবৃত্তি।

নানা মন্তব্যে মুখর কামরা—শোনা গেল, বাজেজাত—বাজে—পাকা শিকারী—আরও কত কি!

শেষ নিষ্পত্তি হলো, ঐ বাজারী মেয়েরই আধুনিক সংস্করণ।

এই উত্তেজনার পর এল অবসাদ; সবাই আবার গাড়ীর ঝুনুনীর সঙ্গে তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়লো।

গাড়ী একটা ষ্টেশনে থামতেই বিনয় চুপি চুপি গাড়ী থেকে নেমে গেল। মেয়ে-কামরার কাছাকাছি এসে একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখল। তারপর উচ্চৈঃস্বরে চায়ের জন্য হাঁক-ডাক সুরু করে দিল।

তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে বিলম্ব হলো না। মেয়েটি জানলা দিয়ে বিনয়কে দেখতে পেয়ে ফিক করে হেসে উঠল। বলল, "এসেছেন তা'হলে? বা বে! একাই চা খাবেন নাকি? আমাদের জন্যও দু'কাপ দিতে বলবেন।"

ইতিমধ্যে মেয়ে-কামরায় এসে ঐ মেয়েটি মল্লিকা নামে আরেকটি মেয়ের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছে। উভয়ে এতক্ষণ কি একটা হাঁটার কথা হচ্ছিল, ঠিক তখনই বিনয় এসে জানালার কাছে দাঁড়িয়েছে।

চা খেতে খেতে মেয়েটি বিনয়কে জিজ্ঞেস করে, "আমার কথা নিয়ে আপনাদের কামরায় আলোচনা হচ্ছে না খুব?"

বিনয় বলল, "আপনার কি মনে হয়?"

মেয়েটি বলল, "নিশ্চয়ই হচ্ছে।"

বিনয় বলল, "নাঃ—সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।"

মেয়েটি আবার বলল, "বলেন কি? তাহলে কেউ আমাকে একটু আমোলও দিল না।"

বিনয় বলল, "কেউ আপনার সম্বন্ধে আলোচনা করছেন না, এমন নয়—অন্ততঃ একজন তো করছে, আমি জানি।"

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে—"লোকটি কে বলুন না?"

বিনয় বলল, "যদি বলি, 'আমি'!"

মেয়েটি ভ্রূ-ভঙ্গী করে বলে উঠল—তাই নাকি? কার সঙ্গে আলোচনা করছেন?"

বিনয় বলল, "নিজের মনে মনে!"

মেয়েটি আবার খিল খিল করে হেসে উঠল।

গাড়ী ছাড়ার ঘণ্টা বাজলো। মেয়েটি চায়ের দাম দিতে গেল। বিনয় নিষেধ করলো।

মেয়েটি বলল, "তা'লে শুধু চা কেন? সামনের ষ্টেশনে মিষ্টি খাইয়ে যাবেন।"

গাড়ী চলতে সুরু করলো।

মল্লিকা জিজ্ঞাসা করে, "এই ভদ্রলোকটি কে?"

—বিনয়বাবু।

—ও। তো বুঝলাম। কে হন?

—কেউ না। পথ চলতে আলাপ। এই তোমার মত।

—বিশ্বাস হয় না। এত অল্প সময়েই এত ভাব।

—বিশ্বাস না হয়, পরের ষ্টেশনে জিজ্ঞেস করলেই পারবে।

—থাক ভাই, আমার অত দরকার নেই।

পরের ষ্টেশনে বিনয় যথারীতি আবার এসে হাজির। অনেকগুলি মিষ্টি নিয়ে উপস্থিত। মেয়েটি বলল, "তা বলে এত মিষ্টি? সবটাই দিচ্ছেন যে, আপনিও কিছু নিন!"

—না, না, এ শুধু আপনাদের জন্তে।

—তা'হলে আমিই দিচ্ছি! হাঁ করুন দেখি।

—না, না, আপনারা খান।

—বলছি হাঁ করুন!

বিনয় আর আপত্তি করলো না। মুখব্যাদান করল। মেয়েটি তার মুখে মিষ্টি পুরে দিল।

তারপর কি মনে করে ঝুঁকে পড়ে বিনয়ের মাথাটা আরও কাছে টেনে এনে কি যেন বলতে গেল।

ইতিমধ্যে গাড়ী ছেড়ে দিল।

মল্লিকা বলল,—"তোমার কি সাহস ভাই।"

মেয়েটি বলে—কেন?

—কি করে পারলে?

—কি পারলাম?

—ও। আমার চোখে ধুলো দিতে চাও!

—কেন, কি হলো?

—তুমি বিনয়বাবুর মাথাটা ধরে—

—মাথাটা ধরে—কি?

"এসো দেখিয়ে দিচ্ছি"—বলেই মল্লিকা মেয়েটির মাথাটা টেনে কাছে এনে গণ্ডদেশে একটি চুম্বন এঁকে দিল। মেয়েটি লাল হয়ে উঠলো, বলল, "দূর, পাগল!"

—বা-রে, আমি দেখলাম যে।

—ভুল দেখেছ। কিন্তু তুমি এ-কি করলে?

—বেশ করেছি, আমার চুমো খেলে তোমার দোষ হবে না।

—আমার নাই হোক, তোমার তো হতে পারে!

—তোমার বর যদি রাগ করেন, তখন আমাকে দুষো না যেন!

—আচ্ছা দুষবো না!

—ঠিক তো?

—ঠিক।

পরের ষ্টেশনে বিনয় আসতেই মেয়েটি বলল, "এবারে পান চাই।" অসংকোচে আদেশ করবার অধিকার যেন ইতিমধ্যে মেয়েটার অধিগত হয়ে গেছে।

বিনয় জিজ্ঞাসা করে—আর কিছু?

—নাঃ আর কিছুর প্রয়োজন নেই। কিন্তু একটা কথা, আমার জন্ত এত খরচ করছেন তার জন্ত পরে আপশোষ করবেন না তো?

—না, করবো না।

—যদি পরে মনে হয়, ভুল করেছেন?

—না তা' কখনই মনে হবে না।

—তা' হলে তো কথাই নেই।

পরের ষ্টেশনে মেয়েটি বলল, "এবার আমি নামব।"

মল্লিকা বলল, "সেকি? আগে তো বলতে হয়।"

মেয়েটি উত্তর না দিয়ে নীরবে একটু হাসল।

মল্লিকা বলল—যাবার আগে তোমার পরিচয়টা দেবে না?

মেয়েটি বলল—না জানাই ভাল। কখনো দেখা হবে না।

মল্লিকা—বলল, আমি এত কথা বললাম, তুমি তো নিজেকে শুধু আড়াল করে রাখলে।

বিনয়বাবু কি জানেন তুমি এখানে নামবে।

মেয়েটি বলল—না।

মল্লিকা বলে—তুমি কেমন ধারা মেয়ে?

মেয়েটি বলে—অদ্ভুত! তারপরেই খিল খিল করে হেসে উঠল।

গাড়ীটা ষ্টেশনে এসে দাঁড়ালো।

মেয়েটি নেমে গেল।

ষ্টেশনে কয়েকটি ছেলে এসে অভ্যর্থনা জানাতে কলরব করছে। হঠাৎ মেয়েটিকে

দেখতে পেয়ে ওরা চীৎকার করে উঠলো—"আরে, তুই ? এই বেশে ?"

—কি করি ? অভিনয় শেষ হতে না হতে গাড়ীর সময় হয়ে গেল। তখন পোষাক বদলাতে গেলে আর ট্রেন ধরা যায় না।

—তাই বলে মেয়েদের কামরায় ঢুকবি ?

—চলে তো এলাম।

—ধন্যি সাহস !

বিনয় যথারীতি আবার মেয়ে-কামরার কাছে এসে হাজির হয়েছে। সব দেখে শুনে বিনয় হতবাক্, মল্লিকা স্তব্ধ।

সেই মেয়েটি এবার যুক্তকরে বিনয় ও মল্লিকাকে নমস্কার জানিয়ে বলল,—কিছু মনে করবেন না, আমার নাম বিকাশ। মেয়েছেলের পার্ট করে এসে এ শুধু আরেকটু বাড়তি অভিনয়। ত্রুটি যা' হলো ভুলে যাবেন। কেউ যে রাগ করবেন না সে কথা আগেই দিয়ে রেখেছেন।

ততক্ষণে বিকাশের সাগরেদ মাথার ওপর থেকে ওর বিসর্পিত বেণীটি তুলে নিয়ে গেছে। খোলস ছাড়া মেয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটি তরুণ যুবক।

এতক্ষণে পথে পাওয়া মেয়েটি সম্পূর্ণ হারিয়ে গেল।

জেনের প্রেম

—শচী রায়

(ভৌতিক রহস্য)

আঠাশ বছর আগের কথা। আজও শোভাবাজারের সুমুখে মসজিদের লাগোয়া উঁচু বাড়ীটা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ীটা যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। শুধু বাইরের রঙটা বদল হয়েছে। তখন বাড়ীটা নতুন তৈরী হয়েছে। বাড়ী শেষ হবার আগেই ভাড়াটে হয়ে ঢুকে'ছিলাম। তিনতলা আর চারতলার মাঝে ছোট একটা চোরকুঠরী। সেখানে বসেই ঐ বাড়ীর আজিজ মিস্ত্রীর কাছে বসে শুনেছিলাম গল্পটা।

আজিজ জোর করেই বলল—আমি নিজে খেয়েছি সেই রসগোল্লা বাবু। আজও বেঁচে আছি বাবু। একদিনের জন্যেও তবিয়ৎ খারাপ হয় নি বাবু। টাটকা তাজা রসগোল্লা রেখে গিয়েছিল মাটির হাঁড়িতে আমাদের বাড়ী থেকে মাইল খানেক দূরে, বুড়ো তেঁতুল গাছটার মাথায়। কসরৎ করে, পেড়ে এনে সাহস করে বাড়ীতে সবাই খেয়েছিলাম। রসগোল্লা যেমন সত্যি ছিল তেমনি সত্যি যদি সেই জেন জেনানাটা হত তাহলে আমার ভাইটার তকদীর অন্য রকম হত। সে সুখী হত, আমরাও সুখী হতাম। কিন্তু সে জেন জেনানা মানুষ নয়।

গল্পটা আগেই বলেছিল আজিজ মিস্ত্রী। পয়তাল্লিশ বছরের জোয়ান মিস্ত্রী। বর্দ্ধমান কি ওরই কাছাকাছি থেকে এসেছিল কলকাতায়। শোভাবাজারের সেই বাড়ীটা তারই হাতে তৈরী। বাড়ীর মালিক তাকে ভুলে গিয়েছে। আমি আজও ভুলিনি।

আজিজ বলেছিল যেমন, তেমনই বলছি।

—আমার বড় ভাই বাবু আগেই ব্যারাম হয়ে মরে গেল ক'দিনের জ্বরে। ছোট ভাইটাকে বুকে করে কাঁদলাম। বললাম তোর ভয় নেই, আমি তোকে মানুষের মত মানুষ করবই। বড় ভাই অনেক টাকা কামিয়েছিল। অবস্থা আমাদের খুব ভালো ছিল, জোত জমি ছিল। গ্রামের মধ্যে এক ডাকে লোকে আমাদের চৌধুরী বাড়ীটা দেখিয়ে দিত। আজ সব গিয়েছে। দিন-মজুর হয়ে কলকাতায় এসেছিলাম, আজ মিস্ত্রী হয়েছি। সবই নসীব বাবু। সবই নসীব।

যেমন নাম, তেমনি ভাই পেয়েছিলাম বাবু। বাইশ বছরের ছেলে। রাস্তা দিয়ে চলে গেলে সবাই চেয়ে থাকত। অত রূপ মানুষের হয় না।

ভেবেছিলাম ওকে প'ড়িয়ে আরও বড় করব। ওর ঘর আলাদা করে সাজিয়ে দিয়েছিলাম। টেবিল, চেয়ার, আলমারি, ঘড়ি—সব সাজিয়ে দিয়েছিলাম। স্কুল ছেড়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে, এমন সময়েই নসীবটা পুড়ল বাবু।

বাড়ীর পাশে একটা পুকুর ছিল। অনেক দিনের পুকুর। আমার বাপজানও যেমন দেখেছেন, আমরাও তেমনি দেখেছি। পুকুরধারে এককালে ভাল বাগিচা ছিল। তার দুই একটা ভাল ফুলের গাছ তখনও জঙ্গ'ল গাছের মধ্যে মিশে ছিল। পুকুরের একটা ঘাট ছিল। পুকুরের জলটা কাচপানা ছিল। জল স্থির থাকলে তলা দেখা যেত।

বাপজান ভাইটার সাধ করে নাম দিয়েছিলেন সেলিম। ওর জন্মে বড়

ভাইজান একটা ঘোড়া কিনে দিয়েছিলেন। ঘোড়ায় চড়ে যখন ও রাস্তার বার হত তখন মনে হত বাবু, বাদশা সেলিম ওর মতোই ছিল।

একদিন ভর দুপুরে ঘোড়ায় চড়ে সে গিয়েছিল ঐ পুকুরের ধারে। একটা লতাগাছ থেকে কি একটা ফুল তুলতে গিয়ে দেখে তার সুমুখে একেবারে নূরজাহান দাঁড়িয়ে আছে। বয়েসকালের ছেলে বাবু, মেয়েটার দিকে চেয়ে আর চোখ ফেরাতে পারেনি। দোষ তার নয় বাবু। দোষ তার নসীবের। অমন রূপ চোখের সামনে দাঁড় করালে কেউ চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না বাবু। আমি চোখে দেখিনি, ভায়ের কাছে শুনেছি। দুধে আবীর-গোলা রঙ। টানা কালো চোখ। মাথার চুল পিঠ ছেয়ে নেমেছে। ঠোঁটজোড়া নাকি ডালিমের মত। আনার কলির রূপও বোধ হয় তার চেয়ে বেশী ছিল না! তাই আনারকলির কথা পড়েছে। সে বলেছে—আনারকলিরও অতো রূপ ছিল না।

বাইশ বছরের আগুন বাবু—। ঠেলতে পারে কি অমন মেয়েকে। ঘোড়া চালিয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সরমে মেয়েটা আরও রাঙা হয়েছিল অমন জোয়ানকে দেখে। মাটিতে চোখ নামিয়ে পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল। ভাই আমার যে ফুলটা ছিঁড়েছিল, সেটাই পরিয়ে দিয়েছিল মেয়েটার মাথায়। ওদের দু'জনের চোখে চোখে কি কথা হয়েছিল জানিনে। ভাই যখন বাড়ী ফিরল তখন আর তার খুশী ধরে না।

সেই খুশীতে সারাদিনটা তার কাটল। আমাদের কাউকে কিছু বলেনি বাবু। আর বলতেও পারে না। সরমও লাগে ভয়ও লাগে। ওর বৌদি মস্করা করে বলেছিল—আসনাই হ'ল নাকি ভাইজান—এত খুশী!

ও ওর বৌদির হাত ধরে একটা খুরপাক দিয়েছিল, কিন্তু কিছু বলতে পারেনি।

ওর বৌদি অনেককরে জিজ্ঞেস করেছিল—কোন বাড়ীর রাজকন্তে বল ভাইজান একবার, জেনমোহরের ব্যবস্থা করি। শুধু 'ধ্যেৎ' বলে ভাই পালিয়ে গিয়েছিল।

আমি হাট থেকে এসে বৌ-এর কাছে শুনে একটু রাগই করেছিলাম। আমি জানতাম, ওর জুড়ী মেয়ে দশখানা গ্রাম খুঁজলে পাওয়া যাবে না। আমি যতদিন ওর জুড়ী না পাব ততদিন ওর সাদী দেব না। কিন্তু ও কাকে দেখল। কে ওর চোখে ধাঁধা দিয়ে ওর মাথাটা খেল, তাই ভাবছিলাম।

সেদিন রাতে ওকে আর কিছু বললাম না।

অন্তদিনের চেয়ে সকাল সকাল খেয়ে ও ঘর আঁধার করে ঘুমুল। আমাদের শুতে একটু দেরি হয়েছিল। কিন্তু যতক্ষণ আমরা জেগেছিলাম, ওর কোন সাড়া শব্দ পাইনি। দোরে খিল এঁটে একেবারে অঘোরে ঘুমুচ্ছে মনে হল।

সেই রাতে বাবু কেমন করে সেই মেয়েটা ঘরের মধ্যে এল, কেউ জানতে পারল না। ভাই ঘুম ভেঙে দেখল, ঘর আলো হয়ে গিয়েছে। সেই দুপুরের নূরজাহান তার পাশে বসে হাসছে।

একবারও সে ভাবতে সময় পায়নি বাবু যে দুয়োর বন্ধ তবু কেমন করে সে মেয়ে ঘরে ঢুকল।

ভাই আমার ভুলবে না কেন? গোপনে সে দিইছিল মেয়েটাকে একটা বেঁটুফুল, আর রাতে মেয়েটা তাকে এনে দিল তারা জলাদের মালা। দিয়ে হাতে সে মালা আমার ভায়ের গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। ওর বৌদি নিজে চোখে দেখেছে বাবু সে তারাদের মালা। অনেক টাকা দিলেও বাবু গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে সে গুলাব মিলবে না। আমায় দেখতে দেয়নি ওরা। তাই শক্ত করে কাটিয়ে নিইছিল ওর বৌদিকে। মালার কথা বা কোন কথা কেউ জানলে ওর জানের হানি হবে।

পরে স-ব বলেছিল বাবু। পরে স-ব বলেছিল। পাশে এসে ঐ আগুনে-মেয়ে গায়ে গা দিয়ে বসেছিল ভায়ের। আগুন পেলে কি ঘি থাকে বাবু? গলে যায়। ভাইও আমার গলে গিইছিল। অমন মখমলের মত মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল দু' হাতে। গালে গাল ঘসেছিল, কিন্তু অমন রাঙা ঠোঁট দুটোর কাছে মুখ নিয়ে যেতেই সে ভায়ের মুখ ঘুরিয়ে দিইছিল। জোয়ান ছেলে কি লোভ সামলাতে পারে বাবু? কত সাধু দরবেশই পারে না। জোর করিছিল খুব। শেষে মেয়েটা বলিছিল—মুখে মুখ দিলে তোমার জান যাবে। চমকে উঠিছিল ভাই। একটু গোসা-ও করিছিল। লুকিয়ে রাতের বেলা আসতে পারলো, মুখেতেই যত সতীপনা! মেয়েটা কিন্তু ভায়ের পা ধরে বলিছিল—তোমায় ভালবাসি বলেই বলছি। মুখে মুখে দিলে তোমার জানের হানি হবে।

তবু ছাড়তে চায়নি ভাই। জান যায় যাক। ভায়ের হাত ছাড়িয়ে জোর করেই সে রাতে চলে গিইছিল মেয়েটা।

সারারাত বসে ভাই ভেবেছে। দুয়োর জানলা যেমন বন্ধ ছিল তেমনি রয়েছে। মেয়েটা গেল কেমন করে!

সে রাতের খবর আমরা কেউ

পাইনি বাবু। ফুলের বনে ওর বৌদি ঘরে গিয়ে ফুলের মালা দেখে এসেছিল কিন্তু জানতে পারেনি কে দিল সে মালা।

পরদিনও ভাই সকাল সকাল খেয়ে ঘরে দোর দিল। কলেজের পরীক্ষা সামনে। পড়া তো অকেই উঠল। ঠিক রাত নিশুতি হলে এলো মেয়েটা। প্রথমেই ভাইকে দিয়ে কড়ার করিয়ে নিল সে কখন মুখে মুখ দিতে চাইবে না।

মুখ থাক, বাধা আর নেই। ওর নরম পরীর বিছানায় মেয়েটাকে নিয়ে শুয়ে পড়ল সে। কত কথা হল ওদের। মেয়েটা খুব সজাগ। বার বার বলে কেউ শুনবে, জোরে কথা বল না।

রাত জেগে কথা হত ওদের। দুটো চোখের পাতা আর এক হয় না ওদের। আগুন আর ঘি। গলছে তো গলছেই। মাঝে মাঝে মেয়েটার হাত যখনই ভায়ের গায়ে লাগে, তখনই চমকে ওঠে। বরফের মত ঠাণ্ডা। মানুষ না মলে অত ঠাণ্ডা হয় না। শুধু হুঁস হয় না ভায়ের।

এমনি চলে দিনের পর দিন। ক্রমে ভাইয়ের মুখে বাড়ীর ভাত রোচে না। মেয়েটা রাতে কত খাবার আনে। সে খেলে বাড়ীর ভাত আর মুখে লাগবে কেন? একজামিনের দিন এসে গেল। তারের ভয় হতে লাগল, কেমন করে দেবে একজামিন! মেয়েটা ওকে বলল—একজামিনের তিন দিন আগে তোমার কোশ্চেন পেপার পেলেই হবে তো? হাঁ করে অনেকক্ষণ চেয়েছিল ভাই মেয়েটার মুখের দিকে। মেয়েটা তখন ওর গলা জড়িয়ে ধরে ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলিছিল—তোমার জন্যে সব পারি গো স-ব পারি।

জবাব শুনে ভাই বলিছিল—

আসমানের চাঁদ যদি চাই?

খিলখিল করে হেসে উঠেছিল মেয়েটা। তারপর মুখের সামনে ধরে সে বলিছিল—এ চাঁদ খানা বুঝি আর মনে ধরছে না?

তারপর, বাবু, সত্যি সেই মেয়েটা এনে দিইছিল কোশ্চেন-পেপার ভাইকে। তাজ্জব ব্যাপার! শুধু তাই নয়, পরীক্ষার তিনদিন আগে থেকে ভাইকে পরীক্ষার পড়া পড়বার সময় দেবার জন্যে রাত থাকতেই চলে যেতো। আর ভাইয়ের তাগদ্ বাড়াবার জন্যে রোজ রাত্তিরেই ফল আর খাবার দিয়ে যেতো।

ভাই আমার পরীক্ষায় পাস করল। মেয়েটা তারপরে এসে জিজ্ঞেস করিছিল ভাইকে—আসমানের চাঁদ চাও? ভাই কিন্তু ওকে বুকের মধ্যে ধরে বলেছিল—যতদিন আমার এ আছে ততদিন আমার সব আছে। আমার জাহানের রানী তুমি নূরজাহান।

খুশী হইছিল মেয়েটা। ভাই ওকে ছাড়া আর কিছু চায় না। ও কে? কোথা থেকে আসে তার জন্যে মাথা ব্যথা নেই। শুধু ওকে পেলেই ভায়ের দুনিয়া পাওয়া হয়ে গেল। একে মোহব্বৎ বলে বাবু—সাচ্চা মোহব্বৎ। এমন মোহব্বৎ পেলে জমিন আসমান এক হয়ে যায়। যে কোন জীবজন্তু সব বশ হয়ে যায়। অমন জোর মেয়েটা পর্যন্ত ভায়ের পায়ের গোলাম হয়ে গেল। ভাইকে ছেড়ে সে আসমানেও যাবে না।

মুশকিল হল এই নিয়ে। ওর বৌদি একদিন রাতের বেলা উঠে ঘরে ফিস্-ফিস্ কথা শুনে সন্দেহ করেছিল। ভাইকে জিজ্ঞেস করতে ভাই প্রথমে স্বীকার করেনি, পরে বলেছিল, ঘরে একটা মেয়ে ছিল, কিন্তু ওর বিষয় কিছুই জানে না সে আজি।

ওর বৌদি শুধিয়েছিল—কাদের বাড়ীর মেয়ে?

ভাই হেসে বলেছিল—আসমানের পরী।

—কোথা দিয়ে, কেমন করে আসে?

—জানিনে। জানতে চাইনে।

—খুব খুপ্‌সুরৎ?

—জাহানের সেরা—একেবারে নূরজাহান।

—একদিন দেখাবে ভাইজান?

—ওকে বলব। ও যদি মত করে।

ভাই জিজ্ঞেস করিছিল। মেয়েটা মত দেয়নি। ওর বৌদির সম্বন্ধে স-ব কিছু মেয়েটাকে বলিছিল ভাই। বলিছিল ওর বৌদির মতন ভাল মেয়ে হয় না। মেয়েটা বলিছিল—এ খবর বৌদি ছাড়া আর কেউ যেন না জানে। ওরা জানলে ভয় পেয়ে আমাকে তাড়াতে চাইবে।

আমাকে তাড়াতে চাইলে আমি যেতে পারবো না তোমাকে ছেড়ে। জোর করলে আমার গোসা হবে, আর গোসা হলে আমরা যে কি করতে না পারি তার ঠিক নেই। তোমাদের স-ব মরবে। তুমি—তুমিও হয়ত—

ভাইই হেসে ওর কথা পূরণ করিছিল—

—মরব? তারপর পাল্টা জিজ্ঞেস করিছিল—

—মরে তোমার কাছে চিরদিনের মত থাকব, সেই ভাল নয়? শিউরে উঠে মেয়েটা বলিছিল।

—না-না। মরেই যে তুমি আমার সাথে মিলবে, তা ভেবো না। মরে কোথায় তুমি যাবে তার খবর জানে খোদাতালা। তুমি মরে আমার কাছে আসবে, এ বলতে পার না।

মেয়েটা রীতিমত ভয় পেয়ে বলেছিল, সে বাড়ী থেকে তাকে

কেউ কোনদিন তাড়াতে চেষ্টা না করে।

ওর বৌদি সব শুনে পরখ্ করতে চেয়েছিল মেয়েটাকে। ভাইকে জিজ্ঞেস করতে বলিছিল মেয়েটাকে—পারে কি তোমার মেয়ে অসময়ের ফল এনে দিতে ?

ভাইয়ের কথা শুনে মেয়েটা বলিছিল—কি ফল বৌদি চায় জিজ্ঞেস করো। অমাবস্যার রাতে একেবারে আদুল গায়ে উলঙ্গ হয়ে যেন উঠোনে দাঁড়ায়, যে ফল চায় তাই পাবে।

আমার বৌ-এরও মরণ—সেও নাছোড়বান্দা। চেয়ে বসল জাম—কালো জাম। তখন কোথাও পাওয়া যায় না।

যেমন কথা তেমনি কাজ। অমাবস্যার রাত। হাওয়ায় যেন উড়ে গেল মেয়েটা। বলে গেল, বৌদি যেন উদোম গায়ে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় উঠোনে।

আমার বৌও থাকল তাই। ওকেও যেন জেদ-এ পেয়ে বসল।

রাত তখন একটা। কোথা থেকে শোঁ শোঁ করে ঝড়ের মত শব্দ হতে লাগল। অনেক দূর থেকে ঠিক যেন একটা ঝড় আসছে। ক্রমে ঝড়টা কাছে এল। ঠিক উঠোনে—যেখানে আমার বৌ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে, সেখেনেই—ঠিক তার মাথার উপরে ঝড়টা—কিছুক্ষণ যেন ঘুরল, তারপরে একটা বড় জামগাছের ডাল শব্দ করে এসে পড়ল উঠোনে। ডাল ভর্তি জাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা হি-হি-হি করে হাসির শব্দ একেবারে চৌদ্দিক কাঁপিয়ে তুলল। আমার বৌটার খু-ব সাহস বাবু। এতেতেও ভয় পেল না। মজা করে ডাল পাকা জাম ছিঁড়ে এনে খেল।

ভয় আমার হল বাবু। একটা জেনের পাল্লায় সারা জীবন ভাইটা কাটাবে ? ওর পরকাল যে ঝরঝরে হয়ে যাবে।

ডাকলাম রোজা। খুব রেগে গেল মেয়েটা। বলল, খু-ব খারাপ হবে। রোজাও কম নয়। সেও বলল, তোমার আরও খুব খারাপ হবে। আগুনের মধ্যে সরষে পড়ে, ছাড়তে লাগল আর চিড়্বিড়্ করে জলে মরতে লাগল মেয়েটা ঘরের মধ্যে। ও যত জলে, ততোই ভাইটা আমার কেমন হয়ে যায়। শেষকালে কেঁদে কেঁদে ও সবাইকে বলতে লাগল—ছেড়ে দাও আমাকে। আমি ওকে ছেড়ে থাকতে পারবো না এক লহমাও।

রোজাও ছাড়নেওয়ালা নয়। সেই একটানা সরষে পড়া ফেলতে লাগল আগুনে। বাড়ী ভরে গেল কান্নায়। পেত্নীর কান্নার মত। ভয়ে সব্বার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। যেন প্রলয় বেধে গেল বাড়ীতে। অজ্ঞান হয়ে গেল ভাই। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলাম সবাই। একা রোজা পড়ে যাচ্ছে মন্তর আর চীৎকার করছে জেন মেয়েটা।

শেষে সে রাজী হ'ল যেতে। রোজা জিজ্ঞেস করল আমাদের—কি প্রমাণ চাও তোমরা ওর কাছ থেকে। আমার বৌ-এর তখনও নোলা।

ও বলছিল যাবার সময়ে ও যেন টাটকা রসগোল্লা এক হাঁড়ী দিয়ে যায়।

—পেত্নীর গলাতে—খিন্-খিন্ করে সে ব'লেছিল—তাই হবে।

তারপরেই প্রলয় বাধল। ঝড় বলে ঝড় ! ঝড়ের অমন দাপট কখনও দেখিনি বাবু। সেই ঝড় আমাদের বাড়ী থেকে চলে যেতে লাগল উত্তর-পশ্চিম দিকে। সেইদিকে একটা বিশ বছরের বুড়ো তেঁতুল গাছ। তার ডাল মড়মড় করে ভেঙে পড়ল সে-ঝড়ে। তারপর চীৎকার করে সেই ঝড়ের মধ্যেই বলল—এই গাছের মাথায় রইল রসগোল্লা।

তারপর সব চুপ। ভোরের আলো দেখা দিতেই লোক নিয়ে গিয়ে গাছে উঠে তন্ন তন্ন করে খুঁজে পেলাম রসগোল্লার হাঁড়ি।

তাই বলছি বাবু, স-ব সত্যি। ও সব জেন-পরী ভূত—সবই সত্যি।

• সাময়িক প্রসঙ্গ •

ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রে শ্রীমতী গান্ধী

ভারতের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র সফর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রার পথে শ্রীমতী গান্ধী ফ্রান্সের রাজধানী প্যারীতে উপনীত হয়েছিলেন। এই সুযোগে তিনি প্রেসিডেন্ট দ্য গল ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা অনেকটা ফলপ্রসূও হয়েছে। প্রেসিডেন্ট দ্য গল, প্রধান মন্ত্রী মশিয়ে পম্পিদু-প্রমুখ ফরাসী নেতৃবৃন্দ যে ভারতের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল তার পরিচয় পাওয়া গেছে। মত-বিনিময়ের ফলে দেখা গেছে, ভারত ও ফ্রান্স উভয় রাষ্ট্রই বহু আন্তর্জাতিক বিষয়ে ও পারস্পরিক কল্যাণজনক ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত।

ফ্রান্সের বক্তব্য, ভারতের মত এই রাষ্ট্রও জোট-নিরপেক্ষ নীতির অনুসারী। ফরাসী নেতৃবর্গ আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন যে, চীন ভারতের পক্ষে ভীতির কারণ এবং পাকিস্তান-উপদ্রবের মূল। এমন কি, তাসখন্দ চুক্তির সম্মান না রেখে পাকিস্তান আবার যে ভারত-বিদ্বেষে বিষোদ্গার শুরু করেছে তার জন্য তাঁরা দুঃখিত। প্রকাশ, অতঃপর শীঘ্রই ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্যারীতে যাবেন উভয় দেশের মৈত্রীর ভিত্তি সুদৃঢ় করবার জন্য। ভারত ও ফ্রান্স শীঘ্রই সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদন করবে। পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনেও ফ্রান্সের সাহায্য লওয়া হবে।

মোট কথা, এখন ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে মৈত্রী-সম্পর্কিত নবোদ্যোগের সৃষ্টি হয়েছে। ফ্রান্স মার্কিন-ঘেঁষা নয়, আমেরিকার সঙ্গে তার সামরিক আঁতাতও নাই। সোভিয়েতের সঙ্গেও তার এখন ঠাণ্ডাযুদ্ধের উত্তেজনা বা উৎকণ্ঠা নাই। ঘরে ও বাহিরের বহু অশান্তি থেকে মুক্ত হয়ে ফ্রান্স এখন আত্মনির্ভরশীল, ব্রিটিশের মত আমেরিকার মুখাপেক্ষী নয়। একথা সত্য যে, মার্কিন ও ব্রিটিশের নায়কত্ব যেখানে নাই সেখানে সমস্ত-কিছু সহজ ও সরল হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। দ্য গলের সার্থক নেতৃত্বে এখন এশিয়া ও আফ্রিকার নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ফ্রান্সের সৌহার্দ্য রচিত হয়েছে—ফ্রান্সের বর্তমান উদার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার প্রয়াস দেশ-বিদেশে সমাদৃত হয়েছে। তাই বহু বিষয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে ভারতের সহযোগিতার সুযোগ এখন প্রশস্ত। এই সহযোগিতার গুরুত্ব এতদিন ভারত গ্রহণ করেনি, বহি-ভারতীয় প্রশ্নে যেখানে ব্রিটেন ও আমেরিকার উপর নির্ভর করেছে সেখানে ফ্রান্সের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করেনি। ফ্রান্সের সহিত নিকটতর সম্পর্কের সূচনায় শ্রীমতী গান্ধীর উদ্যোগ প্রশংসার যোগ্য।

ফ্রান্স হতে শ্রীমতী গান্ধী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে উপস্থিত হন। সেখানে হোয়াইট হাউসে তিনি যথোচিত অভ্যর্থিতা ও সংবর্ধিতা হয়েছেন। যে উদ্দেশ্যে তিনি যুক্তরাষ্ট্র-সফরে উদ্যোগী হয়েছিলেন তা কতটা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে বলা শক্ত। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর এ-পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার শীর্ষ-পর্যায়ে আলোচনা হয়নি। পরলোকগত নেহেরুজী কয়েকবার সেখানে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর উৎসাহের অভাব ছিল। বরং তাঁর সময়ে উভয় দেশের মধ্যে নীতি-গত বৈষম্য যথেষ্ট দানা বেঁধে উঠেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের মনোবৃত্তির অভিজ্ঞতা তাঁর ভালরকমই ছিল। প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজীও কোনো বোঝাপড়ার আলোচনার জন্য সেখানে উপস্থিত হননি; এমন কি, কানাডা-সফরের পর ভারত-প্রত্যাবর্তনের পথে অনুরুদ্ধ হয়েও তিনি সেখানে যাননি। এর কারণ ছিল ভারতের প্রতি আমেরিকার অযৌক্তিক নীতি, আর ছিল তার আপনার স্বার্থপ্রণোদিত ব্যবসায়ী নীতি। দুষ্টি ও মিত্রকে এক পর্যায়ে ফেলে বিশ্বসভায় মুরুব্বিয়ানা করায় তার কুণ্ঠা নাই। শাস্ত্রীজীও এই দেশের পররাষ্ট্রনীতি বুঝেছিলেন। পাকিস্তান তার জন্ম থেকে ভারতের প্রতি শত্রুতা করা একমাত্র ধ্যানজ্ঞান করেছে—ভারতের প্রতি বিষোদ্গারের তার সীমা-পরিসীমা নাই, কাশ্মীর ও কচ্ছ আক্রমণ করেছে, আন্তর্জাতিক আইন ও যৌথ-নিষ্ঠা লঙ্ঘন করে ভারতের ভূখণ্ড দখল করে আছে,—তবুও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ভারত ও পাকিস্তানের বিরোধে উভয়কে একই পর্যায়ে দেখানোর অযথা উৎসাহ

পারেনি। যেহেতু চীন তাদের শত্রু ও স্বার্থের অন্তরায়, সেই চীন ভারত আক্রমণ করলে ভারতের প্রতি আমেরিকার অভূতপূর্ব সহানুভূতি এসেছিল, সামরিক সাহায্য এসেছিল প্রচুর। কিন্তু পাকিস্তান আক্রমণ করলে অপূর্ব কৌশলে সে সত্য এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে—দিবালোকের সত্যকেও তারা স্বীকার করেনি, চীন ও পাকিস্তানের মিতালিতেও তাদের ভ্রান্তি যায়নি। এই আমেরিকা পৃথিবীর সমৃদ্ধতম রাষ্ট্র—খাদ্যশস্য, সমরসম্ভার ও শিল্পোৎপাদনে এ-দেশ প্রচুর উদ্বৃত্তের অধিকারী। তাই সামরিক, বৈষয়িক ও খাদ্যসাহায্য দিয়ে সে গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলির মাথা কিনতে চায়।

আলোচনার শেষে শ্রীমতী গান্ধী ও প্রেসিডেন্ট জনসনের যুক্ত ইস্তাহার প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু ইস্তাহারের সারবস্তু-হীনতায় আমরা নিরুৎসাহ হয়েছি। ইস্তাহারের মূল কথা মার্কিনের খাদ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি—এছাড়া আর কিছুই নাই। অবশ্য পৃথিবীর অন্যান্য যে-সমস্ত দেশ ভারতের বর্তমান খাদ্যসংকটে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ও শস্যপণ্য পাঠাতে আরম্ভ করেছে সে সমস্ত দেশের প্রতি শ্রীজনসনের অকুণ্ঠ অভিনন্দন প্রকাশিত হয়েছে। অন্যান্য দেশের খাদ্যশস্য সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমেরিকা খাদ্যশস্য দেবে, আর দেবে উদ্ভিজ্জ তেল, গুঁড়া দুধ, তুলা ও তামাক। সামরিক সাহায্যকে বিশেষ আমল দেওয়া হয়নি, পাকিস্তানের সাম্প্রতিক গতিবিধি ও দুর্মতির প্রশ্নকে সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধীও মার্কিনের ভিয়েৎনাম নীতিতে সমর্থন দেননি। এর পরেই ভারতে জরুরী সাহায্য প্রেরণের জন্য শ্রীজনসন ১০০ কোটি ডলার ব্যয়ের প্রস্তাব করে কংগ্রেসের অনুমোদন চেয়েছেন, আগামী আগস্ট হতে যে আর্থিক বছর শুরু হবে সেই বছরে ১ কোটি ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ভারতে পাঠানো হবে। ভারতের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক যোজনায় অর্থনৈতিক সাহায্য কিছু পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া উচ্চতর আন্তরিকতার বিশেষ কিছু পরিচয় নাই।

অতঃপর নিউ ইয়র্কে শ্রীমতী গান্ধী শিল্পপতিদের কাছে ভারতকে স্বয়ং নির্ভর করতে সাহায্য করবার জন্য অর্থ-বিনিয়োগ ও কারিগরী সহযোগিতার অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁর যুক্তরাষ্ট্র সফরের সফলতার এটুকুই চিত্র।

তাসখন্দ চুক্তির সমাধিপর্ব

যতদূর মনে হয়, পাকিস্তান তাসখন্দ ঘোষণার সমাধি-রচনায় উদ্যোগ-আয়োজনে তৎপর হয়ে উঠেছে। তিন মাস আগে যখন তাসখন্দের চুক্তি হয়েছিল তখন পাকিস্তানের সুবুদ্ধির আশায় সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। কিন্তু এত শীঘ্র যে অকারণ কোন শান্তি-চুক্তির অসম্মান হতে পারে, তাকে খতম করবার সর্বাত্মক আয়োজন হতে পারে সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। অবশ্য পাকিস্তানের পক্ষে সবই সম্ভব। যে বিষ জন্মগত সঙ্কর, তার শমসাধন সহজসাধ্য নয়—তার মধ্য হতে মঙ্গলময় অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে না।

গত ২৩শে মার্চ রাওয়ালপিণ্ডিতে পাক জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে সৈন্যবাহিনীর কুচকাওয়াজ হয়েছে। তাতে ছিল মার্কিন প্যাটন ট্যাঙ্ক ও স্যাবার জেট বিমানের সঙ্গে চীনাদের কাছ হতে নবলব্ধ মাঝারী ট্যাঙ্ক-বাহিনী ও নূতন ধরণের মিগ বিমান-বাহিনীর প্রদর্শন। এ ব্যাপারে একটা প্রকাণ্ড উদ্দেশ্য আছে। সামরিক কুচকাওয়াজে প্রেসিডেন্ট আয়ুব বলেছেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যদি সম্মানজনক শর্তে শান্তি স্থাপিত না হয় তা হলে দুই দেশের মধ্যে অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা চলতে থাকবে, বর্তমান অবস্থায় পাকিস্তান তার প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা শক্তিশালী করে তুলবে। তাঁর ভাষ্যে কাশ্মীরের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার না থাকাই পাক ভারত বিরোধের প্রধান কারণ এবং তা বিশ্বশান্তির প্রতিকূল। সঙ্গে সঙ্গে চীনা দোহার প্রস্তুত। উপস্থিত চীনা সহকারী প্রধান-মন্ত্রী সিয়ে ফু চি তাঁর ভাষণে বললেন,—পররাজ্যলিপ্সু ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান বীরের মত যুদ্ধ করেছে। চীনা প্রেসিডেন্টের আসন্ন পাকিস্তান-পরিদর্শনের ফলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এশিয়ার সংহতি সুসংবদ্ধ হয়ে উঠবে। প্রেসিডেন্ট আয়ুব ও জনাব ভুট্টো এই ভাষণের পর কতটা বীররসে আপ্লুত হয়েছিলেন জানি না, তবে বিগত যুদ্ধে যেরূপ প্রকারের পরিত্রাহি অবস্থার স্মৃতি তাঁদের হৃদয়ের অন্তস্তলে যে গুমরে উঠেছিল তা অনুমান করা শক্ত নয়।

২২এ মার্চ রাষ্ট্রপুঞ্জে তাসখন্দ চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে রেজিষ্টি হবার পরবর্তী দিনেই পাকিস্তানের উদ্যোগ-আয়োজনের এই প্রকাণ্ড প্রদর্শন পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। ২৪এ মার্চ সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে অনুরোধ জানিয়েছেন, পাকিস্তানের বর্তমান মনোভাব, আয়োজন ও প্রচারে ভারত যেন এখনই কোন প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা না করে। জানা গেছে, সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোসিগিন এ-ব্যাপারে পাকিস্তানের সঙ্গে কথাবার্তা

চালাচ্ছেন। কিন্তু এতে পাকিস্তানী মতিগতিতে কোন সুফল হবে বলে মনে হয় না।

তাসখন্দ-চুক্তি স্বাক্ষর করবার অব্যবহিত পরেই কাশ্মীর-গ্রাসের নবতর পরিকল্পনা নিয়ে পাকিস্তান অভিযান শুরু করেছিল। বিরহী শাস্ত্রীজী তখন অতি দুঃখের সঙ্গেই বলেছিলেন, পাকিস্তানী স্বভাবের এ এক শোচনীয় দীনতার উদাহরণ। সত্যই দেখা যাচ্ছে, তাসখন্দ-চুক্তির সমাধির জন্য প্রেসিডেণ্ট আয়ুব জনাব ভুট্টো পরিবার কোমর বেঁধেছেন। তাসখন্দ-চুক্তি যখন স্বাক্ষরিত হয় তখনই গোপনে চীনের সামরিক সাহায্য লওয়া হয়েছিল। "চুক্তির সাহায্যে" সমূহ বিপদ হতে আত্মরক্ষা করবার সঙ্গে সঙ্গে যৌসব চীনের দাক্ষিণ্যে তাঁরা নবতম সমর-প্রস্তুতি করেছিলেন। এখন জনাব ভুট্টো বলছেন, বিরোধ মীমাংসার জন্য বলপ্রয়োগ না করবার কোন চুক্তি তাসখন্দ ঘোষণায় নাই।

পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তান যেমন আবার সমরায়োজনে মত্ত হয়েছে, উত্তর সীমান্তে তেমনি চীনের সমর-প্রস্তুতি চলছে। পাক চীন চক্রান্তজাত পূর্ব সীমান্তের নাগা অভ্যুত্থানের নূতন কিছু ব্যবস্থা হচ্ছে বলে মনে হয়। কিছু দিন আগে মিজো-বিদ্রোহের প্রাথমিক পর্ব শেষ হয়েছে, কিন্তু তারা আবার প্রস্তুত হচ্ছে এরূপ আভাস পাওয়া গেছে। কোহিমায় নাগাদের লম্ফঝম্প শুরু হয়েছে। সম্প্রতি চীনা রাষ্ট্রপ্রধান লিউশাও চি প্রচার করেছেন আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পিছনে এবার চীন এসে দাঁড়াবে। ইঙ্গিতটা প্রচ্ছন্ন। জনাব ভুট্টো বলছেন, বর্তমান অবস্থায় পাকিস্তানের পক্ষে আর বসে থাকা সম্ভব নয়। পৃথিবী ভারতকে বকে-যাওয়া ছেলের মত চলতে দিয়েছে, ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপবাদের অভিযান চালিয়েছে। কিন্তু চীন তাদের বন্ধু—আমেরিকা যেমন মিত্র তেমনই।

অবস্থা এতখানি ঘোরাল হবার পরেও ভারতবর্ষ তাসখন্দ ঘোষণার সম্মানরক্ষায় স্থিরসঙ্কল্প। ওয়াশিংটনে আমাদের প্রধানমন্ত্রী একথা স্বীকার করেছেন, লোকসভায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী চ্যবনও তাই বলেছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং বলেছেন, বিরূপ পাকিস্তানী প্রচারকার্য সত্ত্বেও আমরা তাসখন্দ ঘোষণা ও তাসখন্দের মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাকিস্তানবিরোধী প্রচারকার্য এড়িয়ে চলেছি। তবুও লোকসভায় তীব্র আলোড়ন উঠেছে। যে-সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে, তাতে পরিষ্কার বোঝা গেছে যে, এবার ভারতকে পাক-চীন যুক্ত আক্রমণের ধাক্কা সামলাতে হবে। সেই প্রচণ্ড আক্রমণ রোধ করবার মত ব্যবস্থা ও আয়োজন ভারতের পক্ষে এখনই প্রয়োজন।

বস্তারে হাঙ্গামা

মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলায় সম্প্রতি এক বিশেষ হাঙ্গামার অনুষ্ঠানে মধ্যপ্রদেশ তথা ভারতের রাজনৈতিক মহলকে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ২৫এ মার্চ রাত্রে পূর্বতন বস্তার রাজ্যের গদীচ্যুত মহারাজা প্রবীণচন্দ্র ভঞ্জদেও-এর জগদলপুরস্থ প্রাসাদে বস্তারের আদিবাসী খণ্ডজাতীয়দের সহিত পুলিশের ভীষণ সংঘর্ষে মহারাজা প্রবীণচন্দ্র ও একজন পুলিশ-সহ ১৩ জন নিহত ও বহু আহত হয়েছে। বন্দুক নিয়ে পুলিশ ও আদিবাসীরা তীর-ধনুক নিয়ে এই খণ্ডযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল।

প্রধানতঃ বস্তার খণ্ডজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চল এবং এখানকার লোকসংখ্যা নয় লক্ষাধিক। স্বাধীনতা লাভের কিছু আগে মহারাজা প্রবীণচন্দ্র নাবালক ছিলেন এবং তখনই তিনি গদী লাভ করেছিলেন। নিজামের হায়দরাবাদ রাজ্যের পাশেই ছিল তাঁর রাজ্য। নিজামের ভারতবিরোধী কার্য-কলাপের সঙ্গে তাঁর যোগসাজস প্রকাশ পায়। তখন তাঁকে প্রথম দিল্লীতে ডেকে এনে হায়দরাবাদের ব্যাপার হতে দূরে থাকবার আদেশ দেওয়া হয়। ১৯৫৩ সালে রাষ্ট্রপতি বস্তারে এলে তিনি তাঁর কাছে উপস্থিত হতে অসম্মত হলেন, তখন দিল্লী হতে তাঁকে দ্বিতীয়বার সতর্ক করে দেওয়া হল। ১৯৫২ সালে বস্তার রাজ্য যখন মধ্যপ্রদেশে মিশে গিয়ে তার একটা জেলায় পরিণত হয় তখন মহারাজার জন্য মোটা টাকার ভাতার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই ভাতার অধিকাংশই তিনি আদিবাসীদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন, আর নিজে গেরুয়া বস্ত্রে সন্ন্যাসীর বেশে থাকতেন। ক্রমে আদিবাসীরা তাঁকে দেবতুল্য মনে করে ভক্তিশ্রদ্ধা করতে থাকে। স্কুল হাসপাতাল ও অন্যান্য দাতব্য-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে তিনি খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। নিজেও বেশ শিক্ষিত, মধুভাষী ও সৌজন্য-পরায়ণ। কিন্তু তাঁর সরকার-বিরোধী কার্যকলাপ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে যথেষ্ট বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে। ফলে ১৯৬০ সালে তাঁকে নিজরাজ্য ছেড়ে সাময়িক ভাবে কৃপালে গিয়ে থাকবার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং শত আদিবাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু এই নির্দেশ অমান্য করে তিনি নিজেকে আপন প্রাসাদ মধ্যে সম্পূর্ণ আবদ্ধ রাখেন। ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বস্তারে তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বর্গোতকগত পণ্ডিত পন্থজীর আগমনের পর প্রবীণচন্দ্রকে

গদীচ্যুত করে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে মহারাজার অধিকার দেওয়া হয়। তাঁকে কিছুকাল আটক করে রেখে এপ্রিল মাসে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। মুক্তির পর জুলাই মাসে তিনি গোপনে পাটনের রাজকন্যা শুভ্রজ কুমারীকে বিবাহ করেন।

গত ২৫এ মার্চের ঘটনা ও প্রবীণচন্দ্রের মৃত্যু দুঃখপূর্ণ ও মর্মান্তিক সন্দেহ নাই। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীডি. পি মিশ্র বলেছেন, বস্তারের পশুজাতির বিদ্রোহ পূর্ব-সীমান্তের পর্বতীয় নাগা ও মিজোদের উদ্যোগের অনুরূপ। একজন দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি যে এমন অর্বাচীনের মত বিবৃতি দিতে পারেন সেটুকুই আশ্চর্যের বিষয়। মিজো ও নাগাদের শত্রুভাবাপন্ন রাজ্যের সঙ্গে সংশ্রব আছে, আধুনিক হাতিয়ার আছে, গেরিলা যুদ্ধের শিক্ষা আছে। কিন্তু বস্তারের পশুজাতীয়দের কিছুই নাই, স্বতন্ত্র রাজ্যের স্বপ্ন দেখাও তাদের বাতুলতা। এমন হাস্যকর কথা শ্রীমিশ্র না বললেই ভাল করতেন। মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলীয়েরা বলতে চান, প্রবীণচন্দ্রের প্রাসাদের মধ্যে পুলিশ ও পশুজাতীয়দের সংঘর্ষ হত্যাকাণ্ডের মধ্যে প্রবীণচন্দ্রের মৃত্যু হয়নি - তাঁর মৃত্যু রহস্যজনক। কিন্তু সরকারী খবর, পুলিশের গুলিতে তিনি নিহত হয়েছেন। অবশ্য তাঁর গায়ে তিনটী গুলির ক্ষতও দেখা গেছে। এ নিয়ে ২৮এ মার্চ সংসদের উভয় সভাতেই যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া ও আলোড়ন উঠেছিল। সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে একটী ট্রাইবুনালের দ্বারা তদন্তের দাবী জানানো হয়েছে।

মাত্র তদন্ত হলেই কি সরকারী কর্তব্য শেষ হবে? বার বার আদিবাসী পশুজাতীয়দের অসন্তোষ ও বিক্ষোভের কারণ কি তার অনুসন্ধান প্রয়োজন। কোন অন্যায় থাকলে সরকারকে উদারভাবে তা বিবেচনা করতে হবে।

ভারতের জাতীয় আয়

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার জাতীয় আয়-সম্পর্কিত বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে, ১৯৬৩-৬৪ সালে যেখানে ভারতের জাতীয় আয় ছিল ১৩,৯১০ কোটি টাকা সেখানে ১৯৬৪-৬৫ সালে ১৫,০৫০ কোটি টাকা আয় দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ ১০৮০ কোটি টাকা বেড়েছে। ১৯৬৩-৬৪ সালে যেখানে গড়ে আয় ছিল ৩০১.১ টাকা সেখানে ১৯৬৪-৬৫ সালে হয়েছে ৩১০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় যোজনার শেষ বৎসর ১৯৬০-৬১ সালে জাতীয় আয় ছিল ১২,৭৩০ কোটি টাকা, আর মাথাপিছু গড়ে আয় ছিল ২৯৩'২ টাকা। চলতি বাজার দর হিসাব করলে ১৯৬৪-৬৫ সালে জাতীয় আয় দাঁড়ায় ২০,১০০ কোটি টাকা ও মাথাপিছু আয় ৪০১'৫ টাকা। এছাড়াও বলা হয়েছে যে, তৃতীয় যোজনার প্রথম চার বছরে নীট উৎপাদন ১৮'২ শতাংশ ও মাথাপিছু নীট উৎপাদন ৮'১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় আয়ের এই ক্রমোন্নতি সামগ্রিক ও সর্বজনের মধ্যে হলে কল্যাণজনক বিষয় হবে।

নূতন আবিষ্কারের জন্য পুরস্কার

নয়াদিল্লীর কেন্দ্রীয় আবিষ্কার বিবর্ধন পর্ষৎ নূতন আবিষ্কারের জন্য সম্প্রতি ১৩ জন আবিষ্কারককে পুরস্কৃত করেছেন, এঁরা পাঁচ শ থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত পুরস্কার পেয়েছেন। পুরস্কৃতদের প্রধান ক'জন—দিল্লীর ডক্টর হর্ষবর্ধন, 'হাই-স্পীড ড্রেসিং ক্যামেরা' আবিষ্কারের জন্য, কৃষিকার্য সংক্রান্ত যন্ত্র-বিশেষের আবিষ্কারের জন্য মহারাষ্ট্রের শ্রী কে. ডি সিন্ধে, একটি দড়ি তৈরী যন্ত্রের জন্য এলাহাবাদের শ্রী ইমতিয়াজ আহমেদ। ছোট বড় সমস্ত আবিষ্কারে উৎসাহ পেলে বহু প্রয়োজনীয় আবিষ্কার হতে পারে এবং তা জাতীয় উন্নতি ও প্রগতির পরিচায়ক।

রুশ-বাঙলা অভিধান

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, শীঘ্রই সোভিয়েত এনসাইক্লোপীডিয়া প্রকাশ ভবন থেকে একটি প্রামাণ্য রুশ-বাঙলা অভিধান প্রকাশিত হবে। প্রখ্যাত ভাষাবিৎ ও বাঙলা-সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ ডক্টর ভ্যাক্ 'লটন এই অভিধানটী সম্পাদনা করছেন। এরূপ একটী বিশদ অভিধান সঙ্কলনের প্রচেষ্টা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম। সমগ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশ করবার পর রাশিয়ায় এই সাধু প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

• ক্রীড়া-জগৎ •

—শ্রীখেলোয়াড়

অর্জুন পুরস্কার

এ-বছর সাত জন খেলোয়াড় অর্জুন পুরস্কার লাভ করেছেন। প্রতি বছর খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ফুটবলে বাঙলাদেশ, ক্রিকেটে বোম্বাই এবং হকিতে পাঞ্জাবের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। ইংরাজ আমলের মতন আজও এই তিনটি রাজ্যের যুবকরা এই বিশেষ তিন ধরণের খেলায় পারদর্শী। তাই যখনই অলিম্পিক ফুটবলের জন্য ভারতীয় দল গঠন করা হয় তখন কলকাতার অনেক খেলোয়াড় দলে স্থান পান। টেষ্ট খেলার জন্য দল গঠন করতে হলে নির্বাচকরা সবচেয়ে বেশি খেলোয়াড় বাছাই করেন বোম্বাই রাজ্য থেকে। আর হকির নাম করলে চোখের সামনে ভেসে উঠবে পাঞ্জাবের যুবকদের ছবি। এবারও অর্জুন পুরস্কার আর একবার এই সত্য প্রমাণ করল।

ফুটবলে অর্জুন পুরস্কার পেয়েছেন অরুণ ঘোষ, ক্রিকেটে বিজয় মঞ্জরেকার, হকিতে উধম সিং, ব্যাডমিন্টনে দীনেশ খান্না, মহিলাদের হকিতে কুমারী এলভেরা ব্রিটা, ভারোত্তোলনে বলবীর সিং, এথলেটিকস্-এ কে. পাওয়েল। ভারতীয় অলিম্পিক দলের টপার এবং বি-এন-আর দলের নিয়মিত খেলোয়াড় অরুণ ঘোষ একজন প্রতিভা-ধর ফুটবলার। বিজয় মঞ্জরেকার প্রাক্তন টেষ্ট খেলোয়াড়। বোম্বাই রাজ্য ছেড়ে এখন তিনি রাজস্থান দলে খেলছেন। উধম সিং অলিম্পিক হকি দলের লেফট-ইনার, তাঁর স্টিক ওয়ার্ক দুর্দমনীয়। গত বছর ব্যাডমিন্টনে এশীয় হয়েছিলেন দীনেশ খান্না। তরুণ খেলোয়াড় খান্না ভারতীয় দলের গৌরব। কুমারী ব্রিটা ভারতীয় মহিলা হকিদলের অন্যতমা। মধ্য-পাল্লার দৌড়-বীর কেন পাওয়েল ভারতের ভবিষ্যৎ আশা। বলবীর সিংও তরুণ ভারোত্তোলনকারী।

বহিরাগত খেলোয়াড়

লীগ ফুটবলে এবার উঠানামা বড় —উত্তেজনা কম। তবু বড় বড় ক্লাবগুলো এ বছরও বাঙলার বাইরে থেকে খেলোয়াড় আমদানি করেছেন কলকাতার মাঠে। এবারও জন পনের খেলোয়াড় আসছেন। এঁদের মধ্যে আসাম থেকে আসছেন বাঙালী খেলোয়াড় রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, দীপক ব্যানার্জি, বাদল সেনগুপ্ত। আবার কলকাতা থেকেও কয়েকজন যাচ্ছেন আসামে। মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং দল এবছরও জন তিনেক করে অবাঙালী খেলোয়াড় নিয়ে দল পুষ্ট করছেন। এই সব ক্লাবের কর্মকর্তাদের ধারণা যে, অবাঙালী খেলোয়াড় আমদানি করলেই দল বেশি শক্তিশালী হবে। আর তা' যদি হ'ত ত' গত দশ বছর ধরে মহমেডান স্পোর্টিং দল কলকাতা ময়দানের সবসেরা দল বলে পরিগণিত হত। গত বছর মোহনবাগান দলে মাত্র তিনজন অবাঙালী খেলোয়াড় ছিলেন কিন্তু তাতে কি এই দল শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল? বাঙালী খেলোয়াড়দের শৌর্যের উপর ভিত্তি করেই ত' মোহনবাগান লীগ ও ডুরাণ্ড পেয়েছে এবং আই-এফ-এ এবং রোভার্স প্রতিযোগিতায় রানার্স আপ হয়েছে। সুতরাং এই সব ক্লাবগুলো যদি বাঙালী খেলোয়াড়দের দলে নিয়ে দল তৈরী করেন তা'তে একদিকে দলের টিম-স্পিরিট গড়ে উঠবে—আবার অন্যদিকে বাঙালী খেলোয়াড়রা উৎসাহিত হবেন। কলকাতা এবং মফঃস্বল থেকে উঠতি প্রতিভা-ধর বাঙালী ফুটবল খেলোয়াড় খুঁজে বার করা কি এমনি শক্ত কাজ! মহীশূর-হায়দ্রাবাদ-মাদ্রাজ-কেরালা-বোম্বাই থেকে খেলোয়াড় আমদানি করতে যে অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় হয় তার অর্ধেক খরচ করলে বাঙালী তরুণদের সংগ্রহ করা সম্ভব। তাদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করাও যায়। এদিক দিয়ে বিচার করলে ইষ্টার্ণ রেল, এরিয়ান্স, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, জর্জ টেলিগ্রাফ প্রভৃতি ছোট ছোট ক্লাব সত্য সত্যই বাঙলার টিম, বাঙালীর টিম! জাগ্রত বাঙলার যুবকদের উচিত এ সব দলকে সমর্থন জানান।

বিশ্ব-বিজয়ী ক্লে

বিচিত্র দেশ মার্কিণ মুলুক! হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধে রেড ডিষ্ট্রিক্ট-এর নামকরা মাস্তান সোনি লিস্টন যেদিন বিজয়ী হলেন সেদিন তামাম মার্কিণ দেশটা হৈ হৈ করে উঠেছিল। গেল —খেলাধুলার আসরের প্রতিযোগিতার স্পিরিট এতদিনে গেল! অনেক গুণ্ডামীতে হাত পাকিয়ে লিস্টন এবার বিশ্ব-বিজয়ী নাম কিনে সমাজের উপরতলায় উঠবার স্বপ্ন দেখছে! আর পয়সা? এক একটা লড়াইয়ে হাজার হাজার ডলার লাভ করা একটুও শক্ত নয় মার্কিণ মুলুকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য সোনি লিস্টনের! তার বিশ্ব-বিজয়ীর খেতাব কেড়ে নিল তরুণ মুষ্টি-যোদ্ধা ক্যাসিয়াস ক্লে। অলিম্পিক স্বর্ণ পদক বিজয়ী ক্লে কোন লড়াইয়ে পরাজিত হয় নি! লিস্টন-ক্লের প্রথম লড়াইয়ে সবাই ভেবেছিলেন যে, লিস্টন নিশ্চয় বিজয়ী হবেন। বাচাল ক্লে হেরে যাবেন। কিন্তু ক্যাসিয়াস বিজয়ী হয়ে তামাম বিশ্বকে হতবাক করে দিলেন। মার্কিণ মুলুকের একদল

দর্শকের মনে সন্দেহের বীজ দেখা দিল—এর ভিতর নিশ্চয় কিছু একটা আছে। আবার লড়াই হল ক্যাসিয়াস ক্লে ও সোনি লিস্টনের মধ্যে। কিন্তু আবারও জিতলেন ক্লে। এ যেন মার্কিণ মুষ্টিযুদ্ধের মস্তি-প্রিয় দর্শকদের ভেংচি কাটলেন বিশ্ব-বিজয়ী ক্যাসিয়াস ক্লে।

গত ৩০শে মার্চ ক্যাসিয়াস ক্লে আবার লড়েছেন কানাডার জর্জ চুভালোর বিরুদ্ধে। মুষ্টি যুদ্ধের আসর বসেছিল টরেন্টো শহরে। জর্জ চুভালোও নামকরা বক্সার। এর আগে আটচল্লিশবার লড়াই করেছেন, কিন্তু নক আউট হন নি। পনের রাউণ্ড লড়াই হল। ক্লের ঘুষিতে চুভালোর মুখের চামড়া ছিঁড়ে গেল—রক্তাক্ত হল। ক্লে পয়েণ্টে বিজয়ী হলেন। পেশাদার হওয়ার পর ক্লে তেইশটি লড়াইতে বিজয়ী হয়েছেন। বিশ্ব বিজয়ী ক্যাসিয়াস ক্লে'র শ্রেষ্ঠত্ব আজ অনস্বীকার্য।

রাশিয়া সফর

কেবলমাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রে নয় খেলাধূলার ক্ষেত্রেও ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার রয়েছে এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। দিনে দিনে এই সম্পর্ক আরও দৃঢ় হচ্ছে। গতবছর রাশিয়ার একদল তরুণ ফুটবল খেলোয়াড় ভারত সফরে এসেছিলেন। সব ক'টি টেস্টে সেই সফরকারী দল বিজয়ী হয়েছিলো। এবার ভারতীয় একটি ফুটবল দল রাশিয়া সফরে যাচ্ছে। আগামী জুন-জুলাই মাসে এই দল যাত্রা করবে।

গত বছর উজবেকিস্তানের কয়েকজন তরুণ এ্যাথলীট এসেছিলেন ভারত সফরে। এবার ভারতীয় এ্যাথলীটরা যাচ্ছেন রাশিয়া। সাতচল্লিশজন এ্যাথলীট নিয়ে পাতিয়ালায় জাতীয় শিক্ষা-শিবিরে শিক্ষার আসর বসছে। শিক্ষা-শিবিরে আটজন মহিলা যোগ দিয়েছেন। আঠারজন পুরুষ ও মহিলা এ্যাথলীট নিয়ে ভারতীয় দল গঠিত হবে।

• রঙ্গ-জগৎ •

নাট্য-সম্মেলন

[নাট্য-সম্মেলন সমাপ্ত হয়েছে। নাট্যামোদী জনসাধারণের উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করে এবং বর্তমান বাংলা নাটকের গতি প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য আমরা উক্ত সম্মেলনে অভিনীত কয়েকটি নাটক সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা ক'রব। বর্তমান পর্যায়ে "মিলতারা ছন্দ" ও "এবং ইন্দ্রজিৎ" এই নাটক দু'খানি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন আমাদের সমালোচক গোষ্ঠীর অন্যতম সভ্য বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়। —'সম্']

বর্তমানে আমাদের দেশে নবনাট্য আন্দোলনের যে ঢেউ এসেছে তাকে ছোট বড় নামী দামী সব সংস্থাই সচেষ্ট হয়ে এগিয়ে এসেছেন নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক নাটকের মাধ্যমে তাঁদের বক্তব্য জানাতে। উপস্থাপনার কারিগরী প্রয়োগ কুশলতা, বিচিত্র আঙ্গিকের সহায়তায় পুষ্ট নাটকগুলি বক্তব্যের দিক থেকে যে সব সময় গভীর বা আর্টের তরফ থেকে মনোত্তীর্ণ সে কথা বলা যায় না। সহজ বুদ্ধি দিয়েই বিচার বিশ্লেষণ ক'রে কোন কোন নাটকের মূল সুরের ছোঁয়া পেতে যেমন বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না, আবার অনেক বুদ্ধি খরচ করেও মাথা কচ্‌কচিয়ে সতীর্থদের সাথে তর্কে লিপ্ত হয়েও অনেক নাটকের প্রকৃত উপসংহারে পৌছানো যায় না একথাও ঠিক। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি যে ভাবে সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে তাকে রোধ করতে হলে নাটকই যে একমাত্র মাধ্যম তা নিঃসন্দেহে আজকের দিনে প্রমাণিত। সামাজিক অবক্ষয়, জনজীবনের নৈতিক অবনতি প্রভৃতি রোধ করতে হলে নাটকই এখন শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "মিলতারা ছন্দ" সমাজ জীবনের নৈতিক অধঃপতনের কথাই বলেছে। বলেছে সহায় সম্বলহীনা একটি স্কুল শিক্ষয়িত্রীর কথা—যার পদে পদে লাঞ্ছনার ছাপ ছড়ান। সুস্থ এবং স্বাভাবিক হ'য়ে বেঁচে থাকার সুযোগ নেই। স্কুলের সেক্রেটারীর লোলুপ দৃষ্টি থেকে রক্ষা পেলেও পাড়ার ছেলেদের কাছ থেকে রেহাই পাওয়া ভার হ'য়ে পড়ে তার। নাটকের পরিসমাপ্তিটি গভীর ভাবে মনকে নাড়া দেয়। স্কুল শিক্ষয়িত্রী অনিমার শেষ পর্যন্ত আশ্রিত জগাইকে স্বামীত্বে বেছে নেওয়ার মধ্যে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের প্রতি যেন সপাটে চাবুক মারা হয়েছে।

অভিনয়ের দিক থেকে বিচার করতে হলে শিক্ষয়িত্রী অনিমার ভূমিকায় চিত্রা মুখোপাধ্যায়ের নাম সর্ব প্রথম উল্লেখ করতে হয়। জগাইয়ের ভূমিকায় শঙ্কু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাটিও সুন্দর, তবে দৃশ্য বিশেষে একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য চরিত্র সম্পর্কে উল্লেখ বিশেষ কিছু নেই।

সামগ্রিক বিচারে অ্যামেচার ইউনিটের প্রচেষ্টাটি সার্থক বলা যেতে পারে।

সৌভনিক প্রযোজিত এবং বাদল সরকার রচিত "এবং ইন্দ্রজিৎ" নাটকটি সম্পূর্ণ পরীক্ষামূলক বলা চলে এবং বোধকরি এটি সর্ব প্রথম অ্যাবসার্ড নাটক। নাটকটি একটি চরিত্রকেই কেন্দ্র ক'রে গড়ে ওঠেনি, অর্থাৎ কিম্বা নায়ক-কেন্দ্রিক নয়। ধরাবাঁধা জীবনের একঘেয়েমী থেকে কিছুক্ষণের জন্যে মনকে সরিয়ে এমন ঘটনার মধ্যে নিয়ে ফেলে দেয় যেখানে যুক্তি বা তর্ক দিয়ে সব কিছুর সমাধান করা সম্ভব নয়। নাটকটির উপস্থাপনা বা সামগ্রিক পরিকল্পনাটি সৌভনিক সম্প্রদায় নিষ্ঠার সঙ্গেই করেছেন।

পর্দা থেকে রাজপথে

সাম্প্রতিক ছায়াযুদ্ধ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে চিত্র ও মঞ্চ জগতের শিল্পীরা রাজপথে নেমে এসেছেন। দক্ষিণ থেকে উত্তরে তাঁরা পথ-পরিক্রমা করেছেন। হাতে তাঁদের ভিক্ষাপাত্র। লক্ষ লক্ষ মানুষ ছুটে এসেছে সাহায্য করতে। যদিও শিল্পীদের সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ (টাঃ ১০,১৪২-২২ পঃ) আশাতীত হয়নি তবুও তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে যে সাহায্য বা সহযোগিতা পেয়েছেন তা অতুলনীয়। দৃষ্টির অন্তরালে থেকে যাঁরা এক পৃথক জগতে বাস করেন আজ তাঁরা নেমে এসেছেন সাধারণ মানুষের মাঝে। দেশবাসীর বেদনায় তাঁরা ব্যথিত। নিজেদের তাঁরা মুক্ত করেছেন সর্বপ্রকার আবরণ থেকে। প্রচণ্ড সূর্যালোক তাঁদের উৎসাহকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। দীর্ঘ পথক্রমে ক্লান্ত হলেও তাঁরা বিশ্রাম নেননি। পরিচালক, অভিনেতা অভিনেত্রী, সংগীত শিল্পী, কলাকুশলী প্রভৃতি সবাই এ পথ-পরিক্রমায় যোগ দিয়েছিলেন। সংগৃহীত অর্থ জনসেবায় নিয়োগ করা হবে বলে প্রকাশ।

শিল্পীরা যে সংস্থা গড়েছেন তার নাম দেওয়া হয়েছে "আর্টিস্ট্ এবং টেকনিশিয়ান রিলিফ ফাণ্ড কমিটি"। এর সভাপতি, যুগ্ম-সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষরূপে নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে সত্যজিৎ রায়, অরুণ কুমার ও সুনীলবাম এবং বিমল দে।

আমরা সংশ্লিষ্ট শিল্পী-কর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে অনুরোধ করবো যাতে তাঁরা এই সেবাব্রতকে সর্বপ্রকার রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখেন।

আর, ডি. বনশল প্রযোজিত ও সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "নায়ক" ছবির নায়ক চরিত্রে উত্তমকুমার

• বিবিধ •

দু'জন মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রমাণ পেয়েছেন যে, চন্দ্র ছাড়া পৃথিবীর আরও দু'টি উপগ্রহ রয়েছে। এরা মোটামুটি চন্দ্রের পথ ধরেই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। মহাজাগতিক বাষ্পপুঞ্জে গঠিত এ দু'টি চন্দ্রকে খালি চোখে দেখা যায় না। ১৭৭২ সালে একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিকও আর দু'টি উপগ্রহের অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৬১ সালে দু'জন পোলিশ বিজ্ঞানীও চন্দ্রের আশেপাশে আর দু'টি উপগ্রহের চলাফেরা লক্ষ্য করেছিলেন।

* * *

ভারতীয় রেলওয়েজ্ রেল চলাচল ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি অতি আধুনিক পদ্ধতি চালু করেছে। এই সেন্ট্রালাইজড্ ট্রাফিক কন্ট্রোলের দ্বারা রেল চলাচল দ্বিগুণিত হবে। দূরবর্তী কেন্দ্র থেকে বৈদ্যুতিক সুইচ ও সিগন্যালের সাহায্যে ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রিত হয়। একটি ক্ষুদ্রাকৃতি নকল রেলপথের উপর নজর রেখে একজন লোক সমস্ত সেকশনের রেল চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। ঐ নকল রেলপথের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি বাতি থাকে। ঐ বাতিগুলি দেখে কোন গাড়ী কতদূর গেল এবং কোথায় আছে তা ধরা যায়। বোতাম টিপে এবং লিভার ঘুরিয়ে কয়েক শত মাইল দূরের গাড়ী চলাচল নির্দেশ দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থাটা এর দ্বারা গাড়ীতে গাড়ীতে সংঘর্ষ হওয়া অসম্ভব। লক্ষ্ণৌ আসাম রেলপথের গোরখপুর-চাপরা সেকশনে এই ব্যবস্থা প্রথম চালু করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার বার্ষিক পত্রে প্রকাশ, ১৯৬৪-৬৫ সালে জাতীয় আয় দাঁড়িয়েছে ১৫,০৫০ কোটি টাকায়। এই আয় ১৯৬৩-৬৪ সালে ছিল ১১,৯৭০ কোটি টাকা।

* * *

পরিবহন ও অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রকের এক সমীক্ষায় প্রকাশ ১৯৬৬ সালের দেড়মাসের মধ্যে ভারতে ৬টি বড় রকমের বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছে। ১৯৬৫ সালে মোট বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল ১৭টি। ১৯৬৬ সালের ২টি দুর্ঘটনায় ১৫ জন বৈমানিক ও ১৩১ জন যাত্রী মারা যায়। ১৯৬৫ সালে ৫টি দুর্ঘটনায় মারা যায় মোট ১৮ জন। ১৯৬৫ সালে ১৭টি দুর্ঘটনার মধ্যে ছয়টি ক্ষেত্রে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় পড়ে।

* * *

তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ভারতে বেকারের সংখ্যা ছিল ১২ মিলিয়ন। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে তা' বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ১৫ মিলিয়ন।

* * *

রাষ্ট্রপতি ভবনের ঘোষণায় বলা হয়েছে শ্রী এ, কে, রায়ের কার্যকাল শেষ হলে শ্রীএস, রঙ্গনাথন ভারতের কম্পট্রোলার ও অডিটার জেনারেলের পদে কাজ করবেন। শ্রীরঙ্গনাথন বর্তমানে কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রকের সচিব। তিনি একজন আই, সি, এস, বয়স ৫৭। তিনি কয়েকবার বিদেশে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

* * *

শ্রীমতী মমতা খান এই বৎসরে 'কলিকাতা সুন্দরী' নির্বাচিতা হয়েছেন। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি 'ভারত সুন্দরী' প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য বোম্বাই যাবেন। বৎসরের শেষ দিকে 'বিশ্ব সুন্দরী' প্রতিযোগিতায় যোগদান করবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে রওনা হবেন।

যুদ্ধে ভারতের ক্ষয়-ক্ষতি

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধে যে ব্যয় ও ক্ষতি হয়েছে, ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বার্ষিক রিপোর্টে তা প্রকাশ পেয়েছে। যুদ্ধে ভারতের প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। রিপোর্টে যে হিসাব দেওয়া হয়েছে, তাতে অসামরিক লোকজনের জীবনহানি ও সম্পত্তির ক্ষতি ধরা হয় নি।

আজ পর্যন্ত ভারতীয় হতাহতের হিসাব :

নিহত ২,৭৬৩, আহত ৮,৪৪৪, নিখোঁজ ১,৫০৭ জন।

নিখোঁজদের মধ্যে ১,০০৫ জন পাকিস্তানে যুদ্ধবন্দী থাকার পর ফিরে এসেছেন।

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে হতাহত : নিহত ২,৭৩৫, আহত ৮,২২৫ (এর মধ্যে ৪৪৮ জন অফিসার)।

ভারত ৮০টি ট্যাঙ্ক হারিয়েছে।

পাকিস্তানের নিহত হয়েছে ৫,৮০০ জন। পাকিস্তান ট্যাঙ্ক হারিয়েছে ৪৭৫টি, ভারত বিমান হারিয়েছে ৩৫ খানি। পাকিস্তান বিমান হারিয়েছে ৬৫ থেকে ৭০ খানি।

সাহিত্য-বার্তা

বীট কবিদের কথা

(সঙ্কলন)

বীটদের প্রচলিত নাম বীটনিক। পৃথিবীতে বীটনিক কথাটা প্রচলিত—ছন্নছাড়া, বাউণ্ডুলে, নোংরা পোশাক, দাড়ি কামানো নেই, চুলে চিরুনি নেই—এমন ছেলেমেয়ে সবই আজ বীটনিক।

বীটদের আন্দোলন প্রথম শুরু হয় শিল্প-সাহিত্যকে কেন্দ্র করে, সানফ্রানসিসকো শহরে। বছর দশ বারো আগে আমেরিকার কিছু তরুণ লেখক শিল্পী মনে করেছিল, আমেরিকার অত্যধিক আর্থিক সচ্ছলতা এবং বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি শিল্প-সাহিত্যসৃষ্টির পরিপন্থী। এজন্য তারা বিদ্রোহ করেছিল। চাকরি-বাকরিতে সময় নষ্ট না করে, জীবনের অধিকাংশ সময় শিল্প-সাধনায় ব্যয় করতে চেয়েছিল। খুব সস্তায় জীবন যাপনের জন্য যেটুকু দরকার তার বেশী কিছু না।

এমন বীট লেখকদের মধ্যে প্রধান হিসাবে পাঁচজনের নাম করা যায়—জ্যাক কেরুয়াক, উইলিয়াম বারোজ, অ্যালেন গীন্সবার্গ, লরেন্স ফেরলিংগেটি এবং গ্রেগরি কর্সো।

বিদ্রোহী বীটরা নিজেদের ভেবেছিল লাঞ্ছিত, পরাজিত—তাদের সারা জীবন লুকিয়ে কাটাতে হবে, অপমান সইতে হবে। তার বদলে, দেশে দেশে এঁদের হাজার হাজার অনুকারক তৈরী হয়ে গেল, ভ্রমণকারীরা দেখতে আসে এঁদের আস্তানা, নানা প্রতিষ্ঠান এঁদের অর্থ-সাহায্য করার জন্য উদ্গ্রীব। প্রতিষ্ঠা মানেই সামাজিক যোগাযোগ, তখন আর পুরো অসামাজিক জীবনযাপন করা এঁদের পক্ষে সম্ভব কী করে? আর পৃথিবীর নানা দেশের (আমেরিকাতেই বেশী) অসাহিত্যিক অশিল্পী ছেলেমেয়েরা যে বিনা কারণে শখ করে নোংরা পোশাক, এক মুখ দাড়ি, ছেঁড়া জুতোয় সাজতে লাগলো—যাদের আন্তর্জাতিক নাম হয়ে গেল বীটনিক, তাঁদের বদনামের ভাগও নিতে হলো আসল বীটদের।

প্রথম আমলে বীটদের লেখা কেউ ছাপতো না। লরেন্স ফেরলিংগেটি সান-ফ্রানসিসকো শহরে একটি ছোট্ট প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান খুললেন নিজেদেরই দলবলের লেখা ছাপাবার জন্য। এখন সেই দোকান একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান, প্রচুর বই, লক্ষ লক্ষ টাকা আয়। বিদ্রোহী কবির বদলে ফেরলিংগেটি এখন একটি বইয়ের ব্যবসাদার। এখনও নিজেদের লেখাই ছাপছেন। অ্যালেন গীন্সবার্গের একটি কবিতার বই-ই বিক্রী হয়েছে এক লক্ষের বেশী।

ফেরলিংগেটি বই ব্যবসার নানান্ দিক নিয়ে কিছুটা বিব্রত। এখন আর কোনো নেশা নেই, হৈ-হল্লার জীবন নেই, সংসারী মানুষ।

জ্যাক কেরুয়াকের ডাক নাম ছিল আধুনিক বুদ্ধ। এখন তিনি আমেরিকাতে প্রায় নির্বাসিত। কেরুয়াকের সার্থকতা এসেছিল সব থেকে আগে। ওঁর নাটকীয় কীর্তিকলাপের ফটোগ্রাফ ওঁকে অনতিবিলম্বে জনপ্রিয় করে তোলে; বই বিক্রী হয় লক্ষ লক্ষ, টাকা আসতে থাকে অনর্গল। একটা চটি বই লিখলেই যদি প্রচুর টাকা পাওয়া যায়, তাই বাজে লেখার লোভ সংবরণ করতে কেরুয়াকও পারেননি। অনবরত বাজে লিখছেন এবং প্রচুর টাকা পাচ্ছেন। ওঁর বন্ধু-বান্ধবরা ওঁর ওপরে চটা। সেইজন্য কেরুয়াক বন্ধুদের আড্ডা থেকে পালিয়ে আছেন।

গ্রেগরী কর্সোর দুর্দান্তপনা অনেক দিন টিঁকে ছিল। অশিক্ষিত, পাগলাটে বদমাস গ্রেগরী কিন্তু সত্যিকারের ভালো কবি। কিন্তু এখন শান্ত। বউ-ছেলে ফেলে পালিয়ে এসেছেন অ্যালেন গীন্সবার্গের আস্তানায়। অনেক লেখা গ্রেগরীর ললাট-লিপি। নানান্ কাগজ ওঁর লেখা পাবার জন্য উন্মুখ। টাইমস্ লিটারারি সাপ্লিমেন্টের মত কাগজও ওঁর লেখা ঘন ঘন ছাপতে চায় এবং লিখলেই যথেষ্ট পয়সা।

একমাত্র অ্যালেন গীন্সবার্গই শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকার চেষ্টায় আছেন। এখন ওঁর মেজাজ অনেকটা ঠাণ্ডা। অন্যের মধ্যে বীটসুলভ নাটকীয়তা করবার দিকে আর তাঁর ঝোঁক নেই, কিন্তু বীটদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হবার তাঁর প্রাণপণ চেষ্টা আছে। বিয়ে করে শান্ত সুখী হবার দিকে মন নেই, এখনও সামান্যতম ব্যয়ে জীবনযাপন, এখনও সব জায়গা থেকে লেখার আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেন। শুধু লেখার জন্য ধ্যান করার তাঁর সময় কোথায়? সব সময়েই ভক্তদের ভিড় লেগে আছে। সামাজিক জীবনে এখনও তিনি প্রতিষ্ঠিত হতে চাননি, কিন্তু তাঁর অবস্থা এখন অনেকটা সর্বজনের মতো। তাই অস্বস্তি ওঁর মনে আছে, কিন্তু মুক্তি পাবার পথ পাচ্ছেন না।

—নীল উপাধ্যায়

(আনন্দবাজার পত্রিকা)

সংবাদ-বিচিত্রা

দেশীয়

বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থা যে তথ্য প্রকাশ করেছেন, তা থেকে জানা যায় যে ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত কুড়ি বছরে দিল্লীর লোকসংখ্যা দ্বিগুণ এবং বোম্বাই-এর লোকসংখ্যা তিনগুণ বেড়েছে। এই সময়ের মধ্যে পিকিং এবং করাচীর লোকসংখ্যাও দ্বিগুণ বেড়েছে। বিশ্বের লোকসংখ্যা ৩০০ কোটি, তারই মধ্যে শহরের লোকসংখ্যা ১০০ কোটি। এই শতাব্দীর মধ্যেই শহরবাসীর সংখ্যা বিশ্বের মোট জন সংখ্যার ৬০ ভাগেরও বেশী হবে বলে অনুমিত হচ্ছে।

•　　•　　•

আয়কর দপ্তরের খবরে প্রকাশ যে, কলিকাতায় ১৫ হাজার লোকের কাছে ৩১ কোটি গোপন টাকা আছে। স্বেচ্ছায় অঘোষিত আয়-প্রকাশের শেষ তারিখ ছিল ৩১এ মার্চ। ঐ দিন ৪ হাজারের বেশী দরখাস্ত পড়ে এবং সাত কোটিরও বেশী গোপন টাকা প্রকাশ করা হয়।

•　　•　　•

২৭এ মার্চ ব্যাঙ্গালোরে জলের দাবীতে একটি মিছিল হয়। এই মিছিলে মহিলাদের মাথায় ছিল শূন্য কলসী, কোলে বাচ্চা। আর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাদের বাবারাও কালো ব্যাজ পরে এই মিছিলে ছিল। জলের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে এই নিয়ে তিনবার মিছিল বার হল। সরকার দাবী মেনে না নিলে প্রতি সপ্তাহে এরূপ মিছিল বেরোবে।

•　　•　　•

১৯৬৫ সালে ২০.২ কোটি টাকা মূল্যের ৫৭ হাজার মেট্রিক টনেরও বেশী মশলা ভারত বিদেশে রপ্তানি করে একটা রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। কেবল গোলমরিচই রপ্তানি করা হয়েছে ১০ কোটি টাকার। গোলমরিচের ক্রেতা হল সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশসমূহ।

•　　•　　•

১৯৬৫ সালে দশটিরও বেশী দেশে ভারত ৪৬ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা মূল্যের মানুষের চুল রপ্তানি করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, জাপান ও ইতালী নিয়েছে মোট ১২,৯৫৭ কিলোগ্রাম। মানুষের চুল দিয়ে ছোট-বড় পরচুলা তৈরীর জন্য মাদ্রাজে একটি কারখানা স্থাপিত হয়েছে, অন্ধ্র প্রদেশেও একটি কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে।

বিদেশীয়

উইনস্টন চার্চিল অঙ্কিত 'কালো হাঁস' নামে একটি চিত্র প্যারীতে পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রীত হয়। জনৈকা মার্কিণ মহিলা এটী নিয়ে এসেছিলেন।

•　　•　　•

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমেরিকায় রক্ষিত মুসোলিনীর মস্তিষ্কের অংশগুলি তাঁর বিধবা পত্নীর নিকট সম্প্রতি ফেরত দেওয়া হয়েছে।

•　　•　　•

সোভিয়েত রাশিয়া এমন একটা বিমানপোত তৈরী করছে যার গতিবেগ ঘণ্টায় ১৪৬০ হতে ১৯০০ মাইল হবে। এই গতি শব্দের গতির দ্বিগুণের চেয়েও বেশী এবং ইঙ্গ-ফরাসী প্রচেষ্টায় যে সর্বাধিক শক্তিসম্পন্ন বিমান নির্মিত হয়েছে তারও অধিক। টাসের 'রেড স্টার' পত্রে অন্যতম প্রধান বিমান পরিকল্পনাকারী কর্নেল জেনারেল আলেকজান্ডার ইয়াকোভলেভ বলেছেন যে, এই বিমান যাত্রী ও মাল উভয়ই বহন করতে পারবে।

•　　•　　•

বিশ হাজার পাউণ্ডের অধিকারিণী ৬৫ বৎসর বয়স্কা এক মহিলাকে ব্রাইটনে এক দোকান হতে একটা প্যাকেট চুরি করবার চেষ্টার অপরাধে এক হাজার পাউণ্ড জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়াও আর একটা দোকান হতে এক জোড়া মোজা চুরির জন্য তাকে তিন বছর নজরবন্দিনী থাকতে হবে এবং এক বছর হাসপাতালে হাজিরা দিতে হবে। চোর এবং শাস্তি উভয়েরই অভিনবত্ব আছে।

•　　•　　•

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিগত ২৮-এ মার্চ ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা মূল্যের তিনখানি দুষ্প্রাপ্য বই চুরি গেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। এই বইগুলি প্রখ্যাতনামা ইংরেজ কবি জন মিল্টনের কাছে ছিল বলে প্রকাশ।

• সাপ্তাহিকী •

২৭ মার্চ :

পরীক্ষা বর্জন সিদ্ধান্তে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ এখনও অটল আছেন।

● চীনা রাষ্ট্রপ্রধান শ্রীলিউ শাও চি বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সাহায্য করার কথা পুনরায় রাওয়ালপিণ্ডিতে ঘোষণা করেন।

● পাকিস্তান জম্মু ও শিয়ালকোট অঞ্চলে সৈন্যসমাবেশ করছে।

● ইন্দোনেশিয়ার নূতন মন্ত্রীসভার অধিনায়কত্ব করার জন্ত প্রেসিডেন্ট সুকার্ন ছয়জনের এক সভাপতিমণ্ডলী গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন। ডাঃ জোহানস্ লিমেনাকে প্রথম সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও সভাপতিমণ্ডলীর প্রধান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী কমিউনিষ্ট-বর্জিত।

● কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ সাম্প্রতিক সমস্যাবলী সমীক্ষার জন্ত একটি কমিটি এবং সাংগঠনিক সমস্যা সমীক্ষার জন্ত একটি প্যানেল নিয়োগ করেছেন।

২৮ মার্চ :

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে হোয়াইট হাউসে স্বাগত জানিয়ে প্রেসিডেন্ট জনসন বলেন, ভারত তার অর্থনৈতিক সমস্যাবলী দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করবে এবং আমেরিকা তাকে সহায়তা করবে। ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে ভারত শান্তি চায় এবং নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়।

● বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যসভার নির্বাচনে ৭১টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৫৩টি আসন পেয়েছে।

● চীন পাকিস্তানকে ৫০টি মিগ বিমান এবং ৫০টি ট্যাঙ্ক বিনামূল্যে উপহার দিয়েছে।

● সকল বিদেশী খৃষ্টান মিশনারীকে ঐ বছরের মধ্যে চলে যাবার জন্ত ব্রহ্ম সরকার নির্দেশ দিয়েছেন।

● কলকাতা ও হাওড়ার কিছু কিছু স্কুল আবার খুলেছে।

● কানাডা সরকার ভারতকে পাঁচ কোটি আট লক্ষ ডলারের খাদ্যশস্য সাহায্য দেবার প্রস্তাব করেছে।

২৯ মার্চ :

মুখ্যমন্ত্রীর সর্বশেষ চিঠিতে বামফ্রন্টের নেতারা সন্তুষ্ট হতে না পেরে ঘোষণা করেছেন—আন্দোলন চলবে, ৬ই এপ্রিল চব্বিশঘন্টাব্যাপী শান্তিপূর্ণ হরতাল ও সাধারণ ধর্মঘট হবে ; সরকার জোর জুলুম করলে হরতালের মেয়াদ আরও চব্বিশ ঘন্টা।

● কলকাতা, শহরতলী এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে 'ধিক্কার দিবস' পালিত হয় ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

● 'ইনকা'র খবরে প্রকাশ কাশ্মীরে যুদ্ধ-বিরতি রেখা পেরিয়ে পাকিস্তান অন্তর্ঘাতী লোকজন পাঠাচ্ছে।

● প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচ্যবন বলেন, ভারতের বিরুদ্ধে পাক-চীন যৌথ আক্রমণের সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না এবং ভারত তার মোকাবিলা করবার জন্ত প্রস্তুত।

● শ্রীমতী গান্ধী ও প্রেসিডেন্ট জনসনের মধ্যে আলোচনার সূচনা শুভ বলে প্রকাশ।

● প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ২রা এপ্রিল লণ্ডন থেকে মস্কো যাবেন, ৩রা এপ্রিল মস্কো থেকে দিল্লী ফিরবেন।

● উত্তর সীমান্তে চীনা তৎপরতা ক্রমবর্ধমান।

● চীনা রাষ্ট্রপ্রধান ও পাক প্রেসিডেন্টের মধ্যে ইসলামাবাদে ঘরোয়া শলা-পরামর্শ চলে।

৩০ মার্চ :

লোকসভায় বস্তারের ঘটনা সম্পর্কে মুলতুবি প্রস্তাব তোলার অনুমতি না দেওয়ায় তুমুল গণ্ডগোল হয়। অধ্যক্ষ ১০ মিনিট পূর্বেই সভা মুলতুবি করে দিয়ে চলে যান। ১৯ বৎসরের ইতিহাসে এটা একটা নতুন নজীর।

● প্রেসিডেন্ট জনসন ভারতকে ৩৫ লক্ষ টন খাদ্য পাঠাতে মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদন চেয়েছেন।

● নূতন আমদানী নীতিতে কড়াকড়ি কিছুটা শিথিল করা হয়েছে।

● স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ আদেশ বাতিল হবে না।

৩১ মার্চ :

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্ত : অবস্থা স্বাভাবিক থাকলে ১১ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্লাশ খুলবে এবং ত্রিবার্ষিক ডিগ্রী কোর্সের পার্ট টু-এর পরীক্ষা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী থাকবে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার পক্ষে সহায়ক বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বন্দী ছাত্রদের মুক্তির জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও হরতাল সম্পর্কে মিটমাটের কোন আশা দেখা যাচ্ছে না।

● রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির ২৩তম কংগ্রেসের অধিবেশনে পূর্ব ইউরোপের কমিউনিষ্ট নেতারা মস্কো-পিকিং বিরোধের ব্যাপারে চীনকে ধিক্কার দেন এবং ভিয়েৎনাম সম্পর্কে রাশিয়াকে সমর্থন জানান। প্রকাশ, পাক-নেতাদের ভারত বিরোধী উক্তিতে রুশ-নেতারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছেন।

● পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের সীমান্ত স্থায়ীভাবে খোলার জন্য ভারতের প্রস্তাবে পাকিস্তান রাজী হয়নি।

১ এপ্রিল :

নিউইয়র্ক : প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী তাঁর সম্মানার্থে আয়োজিত এক সভায় বলেন যে ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিতীয়বার ভারত বিভাগ বরদাস্ত করা হবে না। গণভোটের কথাও বলার আর সময় নেই এবং চীনের বিরুদ্ধে লাদাকে ভারতের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে কাশ্মীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

● পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা 'কাল ব্যাজ' প'রে মহার্ঘ ভাতার সরকারী সিদ্ধান্ত ও তাদের দাবী সম্বন্ধে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।

● ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিকদল রক্ষণশীল দলকে ভীষণভাবে হারিয়ে দিয়েছে। ১৯৪৫ সালের পর তাদের এত বড় জয় আর হয়নি।

● বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীশঙ্কর দাস ব্যানার্জী, বার-এট ল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হয়েছেন।

২ এপ্রিল :

● বৃটীশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীউইলসন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন, এবং আলোচনা করেন। শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে বৃটেন ভারতের মনোভাব আরও স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে। নতুন বৃটীশ সরকার ভারতকে অর্থনৈতিক সমস্যার মোকাবিলা করবার জন্য জরুরী ভিত্তিতে দ্রুত সহায়তার কথা বিবেচনা করবেন।

● ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী মস্কো পৌচেছেন। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী তাঁকে সম্ভাষণ জানান।

● বৃটীশ পার্লামেন্টের নির্বাচনে শ্রমিক দল ৩৬৩, রক্ষণশীল দল ২৫৩, উদারনৈতিক দল ১২, অন্যান্য ১ ভোট পেয়েছেন এবং দলনিরপেক্ষ স্পীকার ১ ভোট।

শ্রীবীরেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক ১৩৮।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬, যুগশক্তি প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক ৫০, বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪ হইতে প্রকাশিত।

প্রথম বর্ষ • একাদশ সংখ্যা

শুক্রবার, ২৩শে বৈশাখ, ১৩৭৩
Friday, 6th May, 1966

সম্পাদক — শ্রী বিবেকরঞ্জন চক্রবর্তী

• চয়ন •

আমি মানুষ চাই—চাই মানুষ—মানুষ খুঁজিতে আমি সারা ভারতবর্ষ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। আমি ভারতবর্ষের লোককে মানুষের ভিতর হইতে মানুষ হইতে দেখিতে চাই, দেবতা দেখিতে চাই না। দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে দময়ন্তীলাভের জন্ত দেবশ্রেষ্ঠগণ আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু দময়ন্তী বলিলেন, আমি নারী, নর চাই, দেবতায় আমার কোনো প্রয়োজন নাই। আমিও তেমনি দেবতা চাই না, মানুষ চাই। তন্ত্রে-মন্ত্রে কোনো কাজ উদ্ধার করিতে চাই না। মানুষের মত সকল কাজ করিতে চাই। যে সর্বজনহিতকামী গভীর পবিত্র অন্তঃকরণ হইতে একথা উঠিয়াছিল, তাহা কি ব্যর্থ হইয়াছে? দেশ তাহার উত্তর দিবে। দেশ বলিবে, মানুষ মানুষের মত সহ্য করিতে শিখিয়াছে কিনা? মানুষ মানুষের মত কাঁদিতে শিখিয়াছে কিনা? মানুষ মানুষের মত সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে কিনা? সর্ববিষয়ে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছে কিনা?

—স্বামী বিবেকানন্দ

১ম বর্ষ

১১শ সংখ্যা

Friday, 6th May, 1966 : শুক্রবার, ২২শে বৈশাখ, ১৩৭৩ : 50 Paise

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি :

নাম ও ঠিকানা-সহ স্পষ্টাক্ষরে কাগজের এক দিকে লিখিত রচনার পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নিকট পাঠান আবশ্যক। কোন মনোনীত রচনা কোন বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট পাঠালে ফেরত পাঠান হবে।

গ্রাহকদের প্রতি :

সপ্তাহের প্রতি শুক্রবারে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে কুড়ি পয়সার ডাকটিকিট-সহ অতিরিক্ত কপির জন্য জানাতে হবে। ঠিকানার পরিবর্তন হলে, পনেরো দিন আগে জানাতে হবে। ভিঃ পিঃ-তে পত্রিকা পাঠান হয় না। চিঠি-পত্রে ও কুপনে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করা দরকার।

এজেন্টদের প্রতি :

এজেন্সীর নিয়মাবলী পত্রিকার কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি :

পত্রিকার কার্যালয়ে পত্র দিলে বিজ্ঞাপনের মূল্য, নিয়মাবলী ইত্যাদি জানান হয়।

চাঁদার হার :

ডাকসহ বার্ষিক	২৪·০০ টাকা ;
ষাণ্মাসিক	১২·০০ টাকা ;
ত্রৈমাসিক	৬·০০ টাকা ;
প্রতি সংখ্যা	০·৫০ পয়সা ;

ম্যানেজার, ধৃতিদীপা
৪০, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট?

৪০, বজীদাস টেম্পল স্ট্রীট
কলিকাতা-৪
ফোন : ৩৫-৪২৯৭

পূর্ব-সীমান্তের অশান্তি

ভারতের পূর্বসীমান্তে পর্বতীয় নাগাদের উপদ্রবজনিত অশান্তি ও রাজদ্রোহ দীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। বাহিরের শত্রুভাবাপন্ন দেশগুলি তাহাদের উস্কানী দিয়াছে, সাহায্য করিয়াছে। তাহারা এখন যথেষ্ট প্রস্তুত, অন্তর্ঘাতী কার্যে নিঃশঙ্ক দ্বিধাহীন। আজ তাহারা স্পর্ধিত, স্বতন্ত্র নাগারাজ্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী।

আজ পর্যন্ত এই চরম বিদ্রোহী নাগাদের যথোপযুক্ত শায়েস্তা করিবার ব্যবস্থা হয় নাই, তাহাদের জিঘাংসাবৃত্তি কঠোর হস্তে দমিত হয় নাই। তাহাদের হত্যা, লুণ্ঠন ও নাশকতার কার্য অবাধে চলিয়াছে। অপরিণামদর্শী অকর্মণ্য আঞ্চলিক রাজ্যসরকারের দায়িত্বের কথা তুলিয়া লাভ নাই, তবে কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা বা উদারতা আছে অথবা অসুবিধার কারণ আছে কিনা জানি না, কিন্তু প্রশ্ন করিব এই অবাধ প্রশ্রয়ের কারণ কি? এই বিরাট গণতান্ত্রিক আদর্শ কল্যাণরাষ্ট্রের সামরিক শক্তিসামর্থ্যের তো অভাব নাই,—সীমান্তপারে সমাবেশিত দুর্দান্ত চীনের আক্রমণ সম্ভাবনা প্রতিহত করিবার স্পর্ধা এই দেশের আছে—পরদত্ত সমরসম্ভারে স্ফীত মদমত্ত পাকিস্তান তাহার কাছে তুচ্ছ। সেই রাজ্যেরই প্রত্যন্তসীমার মধ্যে বিস্ফোটকের মত একটা বিপত্তির সৃষ্টি হইয়াছে, উহাকে অনতিবিলম্বে সমূলে উৎপাটিত করিবার মত দৃষ্টিভঙ্গী কেন যে সংহত হয় নাই ভাবিয়া বিস্মিত হইয়াছি।

প্রমাণ মিলিয়াছে, রীতিমত দুরভিসন্ধি লইয়া চীন ও পাকিস্তান এই নাগাদের এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী মিজোদের সাহায্য করিতেছে, গেরিলা-যুদ্ধের শিক্ষা দিতেছে—একটা সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাদেরই দেওয়া প্লাস্টিক টাইম-বোমায় সম্প্রতি আসামের পর পর তিনটি ট্রেনে নৃশংস বিধ্বংসী কার্য ঘটিয়াছে। তবুও এই বিদ্রোহীদের নেতৃগণের সহিত সরকারের শান্তি-বৈঠকের প্রহসন হয়। আর, মাইকেল স্কট নামে মিশনারীকুলের কলঙ্ক যে ইংরেজ-পুঙ্গবটী তাহাদের হইয়া স্বার্থসম্পন্ন বহির্দেশগুলিতে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া প্রচারযন্ত্রের কার্য করিতেছে, সেই ভদ্রলোকটীকে নির্বিচারে ও নিঃশঙ্কচিত্তে ভারতভূমিতে ঘুরিতে ও শান্তি-বৈঠকে যোগ দিতে দেওয়া হয়—তাহার প্রতি কঠোর আদেশ-নির্দেশ নাই, আন্তর্জাতিক আইনে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কঠোরতম শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা হয় নাই।

নাগা ও মিজোদের ব্যাপার লইয়া লোকসভায় তুমুল আলোড়ন হইয়াছে—আসমুদ্রহিমাচল ভারতের কোটি কোটি মানবের বেদনার্ত বিক্ষোভের কথা গভীরভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে, বহু অবাঞ্ছিত সত্য সেখানে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। সরকার বিব্রত বোধ করিয়াছেন, এই ব্যাপারটীর দ্রুত অবসানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু তাহাই কি যথেষ্ট? সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা না হইলে ভারতের জনমানস সন্তুষ্ট হইবে না।

ঋজু

—গৌরগোপাল দেব

নৌকাটা চলুক না
যেমন চলছিল সহজভাবে,
ঝড় তুফান মাঝে মাঝে উঠবেই,
নৌকাটা যদি টলে যায় ক্ষতি কি ?
এমন ত অনেক হয় আর স্বাভাবিক—
নৌকাটাকে চালাতে হবে ঠিক পথে,
যেমন চলছিল সহজভাবে
জল সেঁচে হাল্‌কা ক'রে নিতে হবে—
দূরে পাড়ি জমাতে হ'লে,
এম্‌নি করে দৃঢ় হাতে হাল ধরে
চালাতে হবে সহজভাবে
যেমন চলছিল।
মাঝ দরিয়া ছেড়ে বাহির গাঙে গেলেও
ক্ষতি কি ?
সেখানে অনেক জলের ভীড়ে
নৌকাটাকে চালাতে হবে সোজা
জল আর আকাশের
সীমানা ঘেঁসে বরাবর।
সন্ধ্যাতারাও ফুটবে—
অন্ধকার হাতড়িয়ে চালাতে হবে—
সহজভাবে উষার সীমানায়
যেমন চল্‌ছিল তেম্‌নি ক'রে।

মানব

—অপূর্বকুমার মৈত্র

অতীতের গাঢ়তম কুহেলিকা ভেদি' ঊর্দ্ধমাঝে
সমুন্নত শির কার সর্ব্ব-উচ্চে আজিও বিরাজে।
কার বাণী যুগে যুগে মুমূর্ষু মানব-চিত্তখানি
আঁধারের তীর হতে আলোকে এনেছে টানি' টানি'।
শুনায়েছে মন্ত্রস্বরে জীবনের পূর্ণ জয়গান
প্রাণের আড়াল হতে খুঁজিয়া এনেছে মহাপ্রাণ।
পশ্চাতের দূরাকাশে কার জ্ঞানজ্যোতিক-শিখায়
নিকটের নভোলোকে কোটি তারা ম্লান হয়ে যায়।
থামায়ে রথের গতি কার পর্ণ-কুটিরের দ্বারে
রাজার ঐশ্বর্য্য-শির হেঁট হয়ে গেছে বারে বারে।
অস্থি কার বজ্র গড়ে কার হাসি ভুবন মাতায়.
সে মানব যুগে যুগে ভারতের বনানীর ছায়,
নদীর নির্জ্জন তীরে গ'ড়ে তোলে পাতার কুটির
ধরার সম্পদ্‌-রিক্ত মহাধনে ভরে ক্ষুদ্র নীড়।
আমাদের বক্ষমাঝে সে ত্যাগীর ক্ষীণ রক্তকণা
অন্ধকারে বন্দী থাকি' হারায়েছে শক্তির সাধনা।
তবু আজো থাকি' থাকি' জাগে তার চঞ্চল স্পন্দন
অন্তরেতে মন্ত্র ওঠে 'ছিন্ন কর সকল বন্ধন।'

গোপনীয়

[নন্দিনী-কে]

—শচীন বসু

যে কথা বলোনি সেই অসম্ভব কথাটুকু ঘিরে
কতো সূর্য-পরিক্রমা, কতো নীল মেঘ
বর্ষা-বসন্তের ঋতুপথে আসে যায়
অন্ধকার চিরে।

ঝরা পাতা বাঁধে গান
তাদে গান ক্ষুব্ধ চৈত্র মাস.
সব কিছু মিলে মিশে কয়ক্ষতি বলো

কতো তুচ্ছ বলো……
জাগে যদি জীবনের নিরঙ্কু গভীরে
নম্র নীল শান্ত অবকাশ।

কথাটুকু ঘিরে……
কতো পূজারতি নিত্য দিন, রাত্রি দিন
দু'টি পদ্ম-পবিত্র হৃদয়-মন্দিরে।

শিল্পাচার্য নন্দলাল

—শ্রীঅজিত ঘোষ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা তখনো বেজে ওঠেনি—তখনো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জীবিত। সেবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল না। হেমন্তের প্রভাতবেলা, তখনো শীতের সমাগম হয়নি—শিশিরসিক্ত বাতাসে কিছুটা ঠাণ্ডা আমেজ ছিল, গাছের পাতাগুলিতে শিশিরবিন্দু টলটল করছে; পূর্বগগনে অরুণোদয়ের রক্তিম আভা তখন নিঃশেষ হয়ে গেছে।

বোলপুরের নিকটবর্তী গ্রাম তালতড়ির জমিদারবাবুদের ছোটকর্তা শ্রীপশুপতি ঘোষের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়ে হাজির হলাম। গেটের বাইরে মোটর রেখে আমরা পদব্রজে চললাম। চীনভবন পার হয়ে, নির্মীয়মান চা-ঘর পাশে রেখে চলতে চলতে চোখে পড়ল উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝে দূরে ও অদূরে বড় বড় গাছের ছায়াশীতল আশ্রয়ে আশ্রমবাসী ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস বসে গেছে, অধ্যাপকেরা তাঁদের অধ্যাপনা শুরু করেছেন। কবির বাসভবন 'উত্তরায়ন'-এর সামনে এসে কবিপুত্র শ্রদ্ধেয় রথীবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কবি তখন সেখানে ছিলেন না, কলিকাতায় ছিলেন। সুতরাং তাঁর কাছে উপস্থিত হবার প্রশ্ন ছিল না। সঙ্গী পশুপতিবাবুর বন্ধু রথীবাবু। রথীবাবু চা-পানের আমন্ত্রণ জানালেন। ফেরবার পথে তাঁর আমন্ত্রণের সৌভাগ্য গ্রহণ করব জানিয়ে অগ্রসর হলাম। এবার দেখা হলো "বঙ্গীয় শব্দকোষ" অভিধানগ্রন্থের প্রণেতা পরলোকগত শ্রদ্ধাস্পদ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁকে প্রণামান্তে দু'চারটী কথাবার্তার পর বিদায় নিলাম। তাঁরও আদেশ হলো ফেরবার আগে তাঁর লাইব্রেরী পুঁথিঘরে দেখা করে যেতে হবে।

ক্রমে সঙ্গীতভবন, শিল্পভবন ও শিক্ষভবন হয়ে ঘুরতে ঘুরতে শেষে আমরা শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর বাটীর সামনে এসে উপস্থিত হলাম। বোধ হয় এইটাই আমার লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আচার্যের বাটীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণটীতে একটা বিরাট্ কিসের যেন মূর্তি তৈয়ারীর ব্যবস্থা হয়েছে—দেখবার উপায় নাই, আগাগোড়া কাপড়ে মোড়া। নীচে মূর্তিটীর মুখোমুখী একটী চেয়ারে আচার্য বসে আছেন সমাধিস্থ ধ্যানযোগীর মত। প্রভাতসূর্যের কিরণছটা কিছু কিছু তাঁর গায়ের উপর এসে পড়েছে। ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়ালাম। তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হলো; হঠাৎ একজন কাছে এসে দাঁড়াতে চকিত হয়ে আমার দিকে চাইলেন, তার পর স্মিতহাস্যে বললেন—"এসো এসো, হঠাৎ এমন সময় কেন?" প্রণাম করে তাঁর কাছেই মাটিতে বসে পড়লাম।

তারপর অনেক কথা হলো। দীর্ঘকাল পরে আজ সব কথা মনে নাই। মনে আছে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মূর্তিটী কিসের? তিনি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—"এখনো ঠিক করিনি; তা ছাড়া মুখে বলবো কেন—তৈরী হলে, তোমরা আন্দাজ ব্যাখ্যা করবে।"

লজ্জিত হলাম, বললাম, "আপনার স্নেহ আমার চিরকালের উৎসাহের উৎস হয়ে থাকবে। আমি একজন শিল্পের গুণগ্রাহী মাত্র, শিল্পী নই। আপনার শিষ্য না হয়েও আপনার স্নেহ ও উপদেশ লাভ করে ধন্য হয়েছি। আপনার যে শিল্পসৃষ্টি, তার ব্যাখ্যা করবার মত শিক্ষা ও উপদেশ আপনার কাছেই নেবো।"

হেসে বললেন—"শিল্পকলাকে তুমি ভালোবাসো, তুমি হলে সাহিত্যিক। যে-পথে তুমি কাজ করছ সেটা খুবই ভালো। আমাদের দেশের প্রাচীন শিল্পকলায় অনেক জিনিস আছে। প্রাচীন কালের যে-সমস্ত শিল্পশাস্ত্র পাওয়া গেছে, যথাসম্ভব সেগুলির সাহায্য নিয়ে শিল্পবিচার করতে পারলে যথেষ্ট লাভ হবে। "বঙ্গীয় মহাকোষে" তোমার "অজন্তা" পড়লাম। বেশ হয়েছে, অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়েছো। অজন্টার চিত্রগুলি আমি অনেক আগ্রহ নিয়ে দেখেছি—প্রতিচিত্রণ নেবার সময় স্তম্ভিত হয়েছি; কি অসীম সাধনা, শিল্পবোধ জাগলা

ছিল সে-যুগের শিল্পীদের—সে-দিনের শিল্পোদ্যোগের কি যে বিরাট্ ব্যবস্থা ছিল, ভাবতে ভাবতে বিভোর হয়ে গেছি। সেই শক্তিশালী আত্মভোলা শিল্পীদের নাম আমরা জানি না, কিন্তু পরিচয় পেয়েছি তাঁদের শিল্প-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। তাঁদের শিল্পশৈলী অপূর্ব, তাঁদের শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্যের তুলনা নাই। ভিত্তিচিত্রে সে-যুগের রীতি ইতালীর fresco buano-র রীতির চেয়ে যে অনেক উন্নত সে-কথা ঠিক,—তুমিও তা বলেছ। এত দিন এত অনাদর ও অবহেলার মধ্যে পড়ে থেকেও, এখনো দেখ সেগুলি কত সুন্দর অটুট হয়ে রয়েছে—শিল্পের জগতে সেগুলি বিস্ময় হয়ে আছে। এই সমস্ত শিল্পের ব্যাপারে তোমাকে আরো অনেক-কিছু জানতে হবে, আরো অনেক কথা বলতে হবে।''

এখানেই আচার্য নন্দলালের পরিচয়। একজন বিরাট্ প্রতিভাধর ও শক্তিশালী শিল্পী হয়েও এমনই আত্মাভিমানবর্জিত আত্মভোলা মনীষী ছিলেন তিনি। যেভাবে তিনি উৎসাহ দিতেন এমনটা খুব কম লোকের কাছেই পেয়েছি। তাঁর স্নেহনিষিক্ত প্রেরণা ও মূল্যবান্ পথনির্দেশ অনেকেই পেয়েছেন। তাঁর শিষ্যদের অনেকেই প্রতিষ্ঠাবান্, শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁরা প্রখ্যাত হয়েছেন। শুধু এই শিল্পীরা ন'ন, তাঁর সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, যাঁরা তাঁর উপদেশ ও পরামর্শ পেয়েছেন, তাঁরা জানেন এই ঋষিকল্প শিল্পসাধক কত বড় শিল্পচেতনার উৎস ছিলেন, কতখানি আন্তরিকতা দিয়ে তিনি উৎসাহ দিতে পারতেন।

বললাম, গান্ধার-শিল্পকলা নিয়ে আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই। গান্ধারের ভাস্কর্য-শিল্পে গ্রেকো-হেলেনিক প্রভাবের কথাই বেশ বড় করে বলা হয়। কিন্তু সত্য কি তাই? রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটীর বোম্বাই শাখার মুখপত্রে এ-বিষয়ে হেরাস্ সাহেব সুচিন্তিত গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখেছেন। আমারও মনে হচ্ছে, এই শিল্পটি সম্পূর্ণ ভারতীয়—এতে কোন বিদেশী প্রভাব নেই। মার্শাল, ভিন্সেন্ট স্মিথ, গ্রুন্‌ভেডেল প্রমুখ পণ্ডিতেরাই যত গোল বাধিয়েছেন। তাঁরা গ্রীক প্রভাবের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এ-ব্যাপারে আমার কয়েকটা যুক্তি আছে। শ্রদ্ধেয় অর্ধেন্দ্রবাবুকে (বিশ্ব-বিখ্যাত শিল্পরসিক শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়) আমার এই চিন্তার কথা বলেছি। তিনিও আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। এখন আপনার উপদেশটুকু আমার প্রয়োজন। আমার পরিপ্রেক্ষিত কি হবে আপনি বলুন।

আচার্যদেব আমার চিন্তার অনুকূলে মত দিয়েছিলেন,—অবশ্য বলেছিলেন—"তোমার লেখা না দেখে সব কথা বলব না।" এবারে বললাম—"শিশু-ভবনের দেওয়ালে আঁকা জীবজন্তুর ছবিগুলির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আপনি দিয়েছেন, এ-রকম চিত্রের মূল্য অনেক।"

বললেন—"শিশুমনে ছাপ দেওয়া যতটা সহজ এতটা অন্য কিছুতে সম্ভব নয়। সব-কিছুরই একটা ধর্ম আছে। শিশুর ধর্ম জানবার ইচ্ছা। দেওয়ালের গায়ে সব সময় সে ছবিগুলি দেখছে, সেগুলির ছাপ মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গেছে। তারপর কোন্‌টার কি নাম সে জেনে নেয়। কোন্‌টা কি জন্তু তার একটা পাকাপাকি জ্ঞান তার হয়ে থাকে। চিত্রে ফ্রেস্কোর মূল্য অনেক, উন্মুক্ত ছবিগুলি চোখে পড়তে পড়তে তার ভাবনা দীর্ঘস্থায়ী হয়। আমাদের কলাভবনে দেখবে কত ফ্রেস্কোর ধুম লেগেছে—তাতে ইতালীয়ান ফ্রেস্কো বুয়ানোর সুর আছে; জয়পুরের ফ্রেস্কোয় সুর নেওয়া হয়নি। আমার আরো একটা উদ্দেশ্য আছে জানবে। ছেলেছোকরারা কুঁড়ে, অথচ আমি দেখ এখনো কাজ করতে চাই। ওদের আর বসে বসে ছবি আঁকতে দেবো না। তাই ওরা দেওয়ালের গায়ে ছবি আঁকছে।"

তারপর আরো কিছু কিছু কথা হলো, সব কথা মনে নাই। তাঁকে প্রণাম করে বিদায় নিলাম। এর আগে ও পরে আরো অনেকবার তাঁর কাছে গিয়েছি, তাঁর উপদেশ নিয়েছি। তবে এই দিনটা আমার মনে সর্বাধিক গভীর ছাপ রেখে গেছে। তাঁর যে পরিচয় পেয়েছি তাতে মনে হয়েছে এরূপ শিল্পমনীষা, শিল্পচেতনার এত বড় উৎস সুদুর্লভ।

আচার্য নন্দলালের দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের শিল্পজগতে একটা মহিমময় যুগের অবসান হয়ে গেল। শিল্পাচার্যদ্বয় অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল—গুরু ও শিষ্য দুই রূপকার এক অপরিমিত শক্তি ও শিল্প-সৌকর্যের প্রেরণা নিয়ে ভারতশিল্পের নবজাগরণ এনে দিয়েছেন। যে শিল্পশৈলীর উদ্বোধন অবনীন্দ্রনাথ করেছিলেন, নন্দলাল তার পূর্ণ বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছেন। এই দুই প্রতিভাধর রূপ-শিল্পী সত্য শিব ও সুন্দরের সাধনায় ভারতীয় সংস্কৃতির নূতন অধ্যায় রচনা করে গেছেন। ভারতের শাশ্বত শিল্পের অনুধ্যানে, ভারতীয় শিল্পেরই সম্যক্ দৃষ্টি ও আভ্যাসিক নিয়ে আচার্য নন্দলাল শিল্পসাধনা করেছিলেন। পুরাতনকে নূতনে প্রতিষ্ঠা করে তিনি তাঁর শিল্পসৃষ্টির প্রতিষ্ঠা করেছেন। অরূপকে রূপায়তনে পর্যবসিত করবার বিশ্বজনীন আবেদনের সন্ধান আমরা তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে পেয়েছি। অবনীন্দ্র-নাথ ও নন্দলাল এই দুই বিরাট্ রস-বেত্তা শিল্পী রঙ ও রেখার ছন্দে যে ভাষার সৃষ্টি করেছেন, সেই ভাষা ও শিল্পকৃতির পরিপূর্ণ মূল্যায়ন এখনও হয়নি। রূপকলার ভঙ্গী, রীতি ও সৌষ্ঠবে ভারতীয়ত্বের যে অভিনব চেতনা ও ভাবরসের উৎসারণ তাঁরা করেছেন তার মূল্য সাধারণ নয়। অনন্যসাধারণ শক্তিতে তাঁরা আপনাদের মহিমায় অমরত্ব লাভ করেছেন। নন্দলালের বৈশিষ্ট্য, মানব-মনের অন্তর্নিহিত বেদনাকে তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর রঙ ও তুলির সাহায্যে। প্রাণধর্মী শিল্পানুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে যে আনন্দ, স্রষ্টা নন্দলাল সেখানেই আত্মসমাহিত হয়ে-ছিলেন। এজন্যই তাঁর সৃষ্টি অভিনব ঐশ্বর্যে মহান্ হয়েছে—আগামী দিনের শিল্পজগতে তিনি চিরকালের আদর্শ ও প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দিনগুলো বেশ কাটছিল।

সকালে ওঠার পর থেকে নানান্ ব্যস্ততা, কাজকর্ম, তারপর রোগী, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি করে সময় ঠিক কেটে যাচ্ছিল যন্ত্রের মত।

একটু ভোরে উঠে সেদিন বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। শীত এরই মধ্যে কমে আসছে। আবহাওয়ার সে ধোঁয়া ধোঁয়া ভাবও নেই। সামনের বাগানে চন্দ্রমল্লিকার পাপড়িগুলো লালচে হয়ে উঠেছে। মৌসুমী ফুলের রাশ ঝুঁকে পড়েছে মাটির টানে। বাঁ দিকে সিঁড়ির দেওয়ালে একটা ফটো দেখা যাচ্ছিল। ফটোর দিকে চেয়ে মনে পড়ল পিয়ার্সন সাহেবের কথা—ওয়ান অব দি গ্রেটেস্ট লেডীজ অব হার টাইম্‌স্। সেই গ্রেট লেডী ডরোথী পিয়ার্সনের ছবি।

তিনি বেঁচে থাকলে হয়ত' বাগানের এই লালচে চন্দ্রমল্লিকার জন্তে কত পরিশ্রমই না করতেন! সে স্থূলকায়া মমতাময়ী দেহটি ঘর্মসিক্ত হয়ে উঠত বাগান পরিচর্যার পরিশ্রমে।

পিয়ার্সন সাহেব সত্যিই ভাগ্যবান স্বামী। আর ডরোথীও ছিলেন ভাগ্যবতী, পিয়ার্সন সাহেবের মত এমন প্রেমময় স্বামী পেয়েছিলেন জীবনে।

হঠাৎ পিছন থেকে মিস্ প্যাট্রিকের অস্ফুট গলার আওয়াজ পেলাম—মর্নিং।

পিছন ফিরে আমিও শুভকামনা জানালাম।

মিস্ প্যাট্রিক হেসে বললেন—সকলে আপনার প্রশংসা করলাম।

একটু বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম—আমার? কেন?

—কেন! আপনার কাজকর্ম সকলের ভাল লাগছে। সমস্ত রোগীরা বলছে আপনার কর্তব্যে কোথাও শৈথিল্য নেই। মিঃ পিয়ার্সন পর্যন্ত আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

—কি করে বুঝলেন? পিয়ার্সন সাহেব আপনাকে বলেছেন সে-কথা?

—আমাকে বলেননি। ফাদার বিশপকে বলেছেন।

—ফাদার বিশপ? নতুন নাম শুনে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কে?

—সেই সেদিন যিনি বাইবেল পাঠ করলেন, উনি ফাদার বিশপ। উনিও এই হোমের একজন শুভানুধ্যায়ী। বোর্ডেরও উনি একজন মেম্বার।

আস্তে আস্তে সে-বলিষ্ঠ দৃঢ়চেতা মানুষটিকে স্মরণ করলাম। কি কাঠিন্য-মাখা মুখমণ্ডল। শ্রী আর সংযমের এক আশ্চর্য মিলনক্ষেত্র।

মিস্ প্যাট্রিককে বললাম—নিজেকে ধন্য মনে করছি।

—সো কাইণ্ড অফ ইউ; মিস্ প্যাট্রিক এগিয়ে গেলেন মিসেস্ ওয়েবারের ঘরের দিকে।

সামনের পরিষ্কার নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম কি সব চরিত্রের মানুষ এখানে! ঘর ফেলে, দেশ ফেলে, আত্মীয়পরিজন ফেলে কতজন এখানে আছেন। এদেশের মাটিকে করেছেন কর্মক্ষেত্র, সেবার ক্ষেত্র। আর্ত পীড়িতের কি আত্মি আছে! মহামতি গেহত সাহেবের

কথা মনে পড়ল। আর্ত পীড়িত সব দেশ-জাতির ঊর্দ্ধে।

রেলিং-চেয়ারে বসিয়ে মিসেস্ ওয়েজারকে প্যাট্রিক বাইরে নিয়ে এলেন।

লোলচর্মা বৃদ্ধা ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন —গুড্ মর্নিং! আজ বেশ গরম লাগছে, না?

হ্যাঁ শীতটা একটু কমেছে, মিসেস্ ওয়েজারের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলাম।

মিসেস্ ওয়েজারের চেয়ার বারান্দার ধারে আনা হ'ল। মুখটা ঘুরিয়ে তিনি আমাকে বললেন— আপনিও এখানে বসুন।

আমি চেয়ার আনার আগেই মিস্ প্যাট্রিক একটা বেতের চেয়ার এগিয়ে দিলেন। তারপর হেসে বললেন— কি পাঠাব? চা, না কফি?

—আমার চা—আমি বললাম।

—আমারও। মিসেস্ ওয়েজার উত্তর দিলেন।

মিস্ প্যাট্রিক নীচে নেমে গেলেন। ওঁর দিক থেকে চোখ ফেরাতে গিয়ে আর একবার ডরোথী পিয়ার্সনের ফটোটা চোখে পড়ল।

মিসেস্ ওয়েজারকে বললাম— ডরোথী পিয়ার্সন আপনার বান্ধবী ছিলেন, না?

অত্যন্ত শান্ত ক্ষীণভাবে মিসেস্ ওয়েজার বললেন—হ্যাঁ, একরকম তাই। তবে বয়সে ও অনেক ছোট ছিল আমার চেয়ে। অথচ ও-ই আগে চলে গেছে। আমি পড়ে রইলাম। এই পড়ে থাকা যে কি বিড়ম্বনা, তা আপনি বুঝতে পারবেন না।

মনে মনে ভাবলাম বুঝতে পারব না-ই বা কেন? বাড়িতে ঠাকুমা পিসিমার শেষ জীবন দেখেছি। সেই মৃত্যুর পথ চেয়ে থাকা দিন-গুলো ত' তাদের দেখেছি। কি কষ্ট! কি অস্বস্তির! মানুষের জীবন একদিক থেকে এক। যে দেশেই জন্ম হোক না কেন, জীবনের মূল সুর সেই এক ছন্দে গাঁথা! শুধু ভাষার তফাৎ, আচরণে পার্থক্য।

মিসেস্ ওয়েজার কম্পিত-হস্তে একটা সিগারেট ধরালেন; তারপর আমার দিকে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—ডু ইউ স্মোক্?

—নাঃ। নন্-স্মোকার। আমি উত্তর দিলাম।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে মিসেস্ ওয়েজার জিজ্ঞেস করলেন— হাউ ডু ইউ ফিল হিয়ার? আপনার ভাল লাগছে ত'? এ অথর্ব পঙ্গুর রাজত্বে থাকতে আপনার তারুণ্য বাধা দিচ্ছে না ত'?

—না, না আমার ত' ভালই লাগছে।

মিসেস্ ওয়েজার একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আবার বললেন—আপনাকে এখানে কে এনেছেন? মিঃ পিয়ার্সন, না?

—হ্যাঁ।

—জীবনের এ দিকটা আপনার কেমন লাগে?

—এ দিক মানে? আমি প্রশ্ন করলাম।

—এই সব সেবাধর্মের দিক।

—এ সব আবার ভাল না লাগে! এ দিক তো ঈশ্বর-সেবার দিক।

—তা বটে। তবে কি জানেন মিঃ দত্ত, ওসব অনেকে মুখে বলে,, বইতেও লেখে। কিন্তু যখন সে-পথকে বেছে নিতে হয় জীবনের একমাত্র পথ হিসেবে, তখনই ঠিক যাচাই হয়।

—সেটা ঠিক। আমি সমর্থন জানালাম।

মিস্ প্যাট্রিক নিজেই একটা ট্রে-তে দু'কাপ চা নিয়ে এলেন। মিসেস্ ওয়েজারের হাতে এক কাপ তুলে দিয়ে নিজে এক কাপ হাতে নিলাম।

মিস্ প্যাট্রিক চলে যাবার পর এক চুমুক চা খেয়ে মিসেস্ ওয়েজার বললেন—সি ইজ এ ফাইন লেডী। ভেরী স্মার্ট এণ্ড জেনারাস্!

মৃদুকণ্ঠে তাঁর কথায় সায় দিলাম।

চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে মিসেস্ ওয়েজার সিগারেটে আর একটা টান দিলেন। তারপর বললেন —এ ধরনের লোক না হ'লে কি হোম চলে? ত্যাগ চাই, না হ'লে এ প্রতিষ্ঠান চালাবেন কি করে!

—সে ত' বটেই, মিসেস্ ওয়েজারের সমর্থনে বললাম।

—যখন এ হোম খোলার পরি-কল্পনা আমাকে বললেন মিঃ ওয়েজার, তখন আমি এ দিকটা ভেবে দেখতে বলেছিলাম। বলে-ছিলাম—তুমি, আমি না হয় এ হোম চালাবার মত উদারতা নিয়ে নেমেছি, কিন্তু আর যারা আসবে, তারা যদি এমন উদার না হয়? তাদের যদি ত্যাগ ব'লে কিছু না থাকে! মিঃ ওয়েজার গভীর স্বরে বলেছিলেন—নিশ্চয়ই পাব সে রকম লোক। না হ'লে বাইবেল যে মিথ্যে হয়ে যাবে। বাইবেলে দেখো নি— প্রভু বলেছেন,—সীক্ অ্যাণ্ড ই স্যাল্ ফাইণ্ড। ওয়াণ্ট্ অ্যাণ্ড ইট্ স্যাল্ বি গিভ্ন্ ইউ। নক্ অ্যাণ্ড দি ডোর উইল্ বি ওপ্ন্ আণ্টু ইউ। মিঃ ওয়েজার এই বিশ্বাসে নেমেছিলেন। খুঁজলেই পাওয়া যাবে। চাইলেই তিনি দেবেন। দরজায় করাঘাত করলে দরজা ঠিক খুলে

দেবেন। উঃ মিঃ ওয়েজারের কি দৃঢ়তা ছিল! সে-দৃঢ়তার জন্যেই ত' তিনি শেষ পর্যন্ত অসাধ্য সাধন করলেন। একটা বিস্ময়কর কাজ এটা!

—নিশ্চয়ই বিস্ময়কর! মিসেস্ ওয়েজারকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করে বললাম—এ জগতে এ-ধরণের প্রচেষ্টা! কোনো লোকে ত' বিশ্বাসই করতে চাইবে না। আমি নিজেই ত' প্রথমটায় অবাক হয়ে গেছলাম এ-ধরণের একটা হোমের কথা শুনে।

—আমিও এতটা আশা করিনি। চল্লিশ বছরে কত উন্নতি হ'ল! মিঃ ওয়েজার দেখতে পেলেন না! একটা কথা কি জানেন মিঃ দত্ত—মিঃ ওয়েজারের মত আশাবাদী লোকেরা সব সময়ে জয়ী হয়। জীবনে দেখেছি সবকাজেই তিনি জয়লাভ করেছেন।

—নিশ্চয় নিষ্ঠা ছিল তাঁর সব কাজেতে। অনুমান করে আমি বললাম।

—হাঁ নিশ্চয়ই, নিষ্ঠা ত' ছিলই—তাছাড়া আরও গুণ ছিল তাঁর। বাইবেল তাঁকে অদম্য মনোবল দিয়েছে, আর দিয়েছে প্রেরণা। আপনি কি বাইবেল বিশ্বাস করেন না?

—হ্যাঁ, বিশ্বাস করি না তা নয়।

—বাইবেলকে শুধু ধর্মগ্রন্থ ব'লে সরিয়ে রাখলে চলবে না, ওটিকে একটি শক্তির উৎস বলে মনে করুন, দেখবেন আপনি অদম্য শক্তি পাচ্ছেন। বাইবেলের ওই একটা কথা—সীক্ এ্যাণ্ড ই স্যাল্ ফাইণ্ড—এর তুলনা নেই। আপনার জীবনে যে কোন কাজকর্মে এই বাণীটিকে মেনে চলবেন দেখবেন কখনও হার হবে না। কখনও ব্যর্থ হবে না আপনার প্রচেষ্টা।

নিশ্চুপ হয়ে মিসেস্ ওয়েজারের কথা শুনছিলাম। এমন প্রেরণার বাণী আমি অল্প লোকের কাছেই শুনেছি।

মিসেস্ ওয়েজার দু একবার কাশলেন। তারপর বুকের জামার ওপর বাঁ হাতটা রেখে অত্যন্ত সাবধানে বললেন—আমিও সব কাজেই সিদ্ধিলাভ করেছি। সব কামনা-বাসনাই আমার চরিতার্থ হয়েছে বলা যায়। শুধু একটা বাসনা পরিপূর্ণ হ'ল না জীবনে। হয় ত' আমার কবর মিঃ ওয়েজারের কবরের পাশে খোঁড়া সম্ভব হবে না। এই একটি বাসনাই আমি জীবনে পূর্ণ করতে পারলাম না। রোগই আমার প্রতিবন্ধকতা করল। মিঃ ওয়েজারের শেষ সময়ে কাছে থাকতে পারি নি, এটা দুঃখের হলেও মেনে নিতাম যদি মৃত্যুর পর আমরা কাছাকাছি থাকতে পারতাম।

মিসেস্ ওয়েজার একটু থামলেন। তারপর বেশ গভীর স্বরে বললেন—অবশ্য এ হোমেতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেও কিছুটা শান্তি আছে। মিঃ ওয়েজার ত' এখানেও আছেন। দেহ হয়ত' তাঁর ওয়ারশ-এর মাটিতে, কিন্তু তাঁর প্রাণ যে এখানে। সমস্ত জীবনের স্বপ্ন যে তাঁর এখানকার মাটিতে। সেদিক থেকে কিন্তু আমি তাঁর কাছাকাছিই থাকব। তাই না মিঃ দত্ত?

মিসেস্ ওয়েজারের জীবনের দর্শন আর তা' মেনে নেওয়ার স্বাভাবিক উদারতা দেখে মুগ্ধ হচ্ছিলাম মনে মনে। কি এঁদের মানসিক চিন্তাধারা! হঠাৎ ওঁর প্রশ্নে চমকে উঠে বললাম—হাঁ তা ত' বটেই। কর্মের মধ্যেই ত' মানুষের প্রাণস্পন্দন থাকে। সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টা চিরকাল বেঁচে থাকে।

আমার কথার কোনও জবাব না দিয়ে মিসেস্ ওয়েজার বাইরের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

ওঁর সে লোলচর্ম-মুখটা দেখলাম। বয়সের আর রোগভোগের অজস্র বলিরেখা কপোলদুটির লাল চামড়াটি খণ্ডিত করে তুলেছে। তবু তার ফাঁকে এককালের সদ্য ফোটা গোলাপের রঙ এখনও দেখা যায়। চুল প্রায় সাদা হয়ে গেছে, তবু তার মাঝখানে অনুমান করা যায় এককালে সে-চুলে লোহিত সাগরের উদ্দাম ঢেউ অজগরের মত লেলিহান হয়ে থাকত। চোখদুটি বয়স আর ক্লান্তির ভারে করুণ। কিন্তু সেই গভীর নীল-মণিতে অল্প বয়সের চাপল্যের রেশ আজও পাওয়া যায়। ডাক্তারী জীবনের সে প্রেমবিহ্বল আয়ত-চোখদুটি দেখে মিঃ ওয়েজার হয়ত' তাঁর কর্মে প্রেরণা পেতেন। বাইবেল তাঁকে হয়ত' দীক্ষা দিয়েছিল কর্মে, কিন্তু পত্নীর প্রেমবিহ্বল স্থির নয়ন হয়ত' সে দীক্ষা সফল করার প্রেরণা দিয়েছিল।

মিসেস্ ওয়েজারের ক্ষীণকায় শরীরের ওপর চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা আপনার শরীর কবে থেকে ভাঙতে আরম্ভ করে? এদেশে আসার পর থেকেই?

মাথাটা এদিক ওদিক দুবার নেড়ে মিসেস্ ওয়েজার বললেন—এদেশে আসার কুড়ি বছর পরে। এই ত' সেদিন। আমি এখনও সেদিন মনে করতে পারি। ভারতবর্ষে 'এ্যাসিস্ হোম্'-এর কেন্দ্র খোলার জন্যে মিঃ ওয়েজার সারাদিন ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নানা জায়গায় খোলা হবার পর তাঁর স্মরণ হ'ল বাংলা দেশের কথা। বাংলা দেশে কি ক'রে সে-আশ্রম খোলা যায়!

আমিও তখন তাঁর সঙ্গে এদিক ওদিক ঘুরছি, আজ এখানে কাল সেখানে। কখনও হোটেলে, কখনও স্টেশনের প্লাটফরমে, কখনও আবার

ফুটপাতে রাত কাটাতে হয়েছে। কখনও পেটভরে খেতে পেয়েছি, কখনও ছুদিন হয়ত খাওয়াও হয় নি। মিঃ ওয়েল্সার এসব ভ্রূক্ষেপই করতেন না। আমিও ভুলে থাকতাম।

তারপরে একদিন তিনি চলে গেলেন। ওখানে আরও বেশি তাঁকে দরকার। তিনি চলে যাবার পর আমাকে বলে গেলেন—আমি ফিরে যেন দেখি নতুন হোম চালু হয়ে গেছে। তুমি ডাক্তার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ রোগীদের বিছানার পাশে পাশে!

অশ্রুসজল চোখে তাঁকে প্লেনে তুলে দিয়ে এসে সে কথাটা ভুলতে পারিনি। একা হ'লেও দ্বিগুণ উৎসাহে লেগেছি একটা স্থান সংগ্রহ করার জন্যে। তার ওপর ফাণ্ড। ট্রাস্ট থেকে যা পাওয়া যায়, সে অর্থের সমান টাকা ফাণ্ড করে তুলতে হয়।

বুঝতেই পাচ্ছেন কি কষ্টকর ব্যাপার! তখনও পর্যন্ত একজন সহযোগীও পাইনি। তবু ওয়েল্সারকে আমি কথা দিয়েছি, আমি চুপ করে থাকতে পারি না।

এমনি সময় আমার মনে পড়ল ডরোথীর কথা। ওর সঙ্গে তখন যোগাযোগ করি। ডরোথী আমার ডাকে সাড়া দেয়। তারপর সেও এগিয়ে আসে আমার সঙ্গে।

কিন্তু ডরোথী রসাহায্য পাবার আগে পর্যন্ত আমাকে ভীষণ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। এদেশের গরম আবহাওয়া তখন আমার শরীরের সবটুকু জীবনী-শক্তি শুষে শুষে খেয়ে ফেলেছে। তারপর একদিন হোম খোলা হ'ল। কিন্তু তার পরেই আমি শয্যা নিলাম। সে সময়ে ডরোথী এসে আমার হাত থেকে সব ভার তুলে নিল নিজের হাতে।

মিঃ ওয়েল্সারকে জানানো হ'ল। তিনি আসবার দিন ঠিক করলেন। কিন্তু বিধির কি নিদারুণ পরিহাস—সেদিনেই বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেলেন ওয়েল্সার!

তারপরেই আমার জীবন শুকিয়ে আসতে লাগল। মনে হ'ল জীবনটা শেষ হয়ে গেলেই ভাল। ওখান থেকে ছেলেমেয়েরা বার বার চিঠি লিখতে লাগল—মা তুমি ফিরে এসো। অক্স-ফোর্ড থেকে নাতি লিখলে—ঠাকুমা তোমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। তুমি এবার দেশে ফিরে এসো। এবার যা করার আমরা করব।

কিন্তু তাও হ'ল না। ডাক্তাররা নিষেধ করলেন। হয়ত' তখন জোর করে চলে গেলে ভাল করতাম। যাওয়া হ'ত হয়ত'! কিন্তু আরও অপেক্ষা করতে গিয়ে উল্টো হ'ল। গোল্যাণ্ডের দরজা বন্ধ হয়ে গেল আমার জন্যে!

—আপনার ছেলেমেয়েরা আপনাকে দেখতে চান না?—আমি প্রশ্ন করলাম।

—হ্যাঁ তারা মাঝে মাঝে আসে। এই ত' গত বছরে এসেছিল। তাদেরও ত' কাজকর্ম আছে, তাছাড়া দূরত্ব!

—তা বটে।

রোদটা আস্তে আস্তে বাড়ছিল বলে মিস্ প্যাট্রিক নিজে থেকেই উঠে এসে মিসেস্ ওয়েল্সারকে ঘরে নিয়ে যেতে চাইলেন। আমিও ওর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে গেলাম। ছোট একটি স্বতন্ত্র ঘর—মিসেস ওয়েল্সারের জন্যে। সবুজ রঙের দেওয়ালটি দুচারটে ফটো দিয়ে সাজানো। একপাশে ওয়েল্সারের আবক্ষ মূর্তি। সেই বলিষ্ঠ স্নেহময় মুখশ্রী! এককোণে একটি খাঁচা দেখে কৌতুহল হ'ল। এগিয়ে গিয়ে দেখি দু'তিনটি ছোট পাখি, সবুজ আর কি সুন্দর!

মিসেস্ ওয়েল্সারকে জিজ্ঞেস করলাম—আপনার বুঝি পাখির শখ আছে?

বালিশে মাথাটা হেলান দিয়ে মিসেস্ ওয়েল্সার নিঃশব্দে মাথাটা নাড়লেন—নাঃ। ওয়েল্সারের ভীষণ পাখীপোষার বাতিক ছিল। তারপর ডরোথী সে অভ্যেসটা বাঁচিয়ে রাখে। মাঝখানে মিসেস্ অ্যাব্রাহাম কিছুদিন কাজকর্ম চালিয়েছিলেন। উনিও খাঁচাটা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। এখন মিস্ প্যাট্রিক আবার ওদের দেখা-শোনা করছেন।

মিসেস্ ওয়েল্সারের কথাগুলো বড় ভাল লাগল। প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখার মন্ত্রটি ওঁরা কেমন পরম্পরায় তুলে নিয়েছেন।

এদিক ওদিক দেখতে দেখতে টেবিলে একটা বইএর পাতা ওল্টা-চ্ছিলাম। রঙচঙে একটা ছবির বই। ছবিগুলো দু একটা দেখার পর মিসেস্ ওয়েল্সারের দিকে নজর পড়ল। দেখলাম ওঁর ক্লান্তিভরা নিষ্প্রভ চোখ দুটি বুজে আছে। হয়ত' ঘুম বা শ্রান্তির ছাপ।

আর ওঁকে বিব্রত করা ঠিক হবে না ভেবে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নামছি, রান্নাঘর থেকে মিস্ প্যাট্রিক বলে উঠলেন—আজকের ব্রেকফাষ্টটা দেখে যান। রুটি, আলু সিদ্ধ আর কলা!

—ও আর আমার দেখার কি আছে! বলে আমি সেখানে ঢুকলাম। একজন পাচিকা মাথা নামিয়ে নমস্কার করে পাশে সরে দাঁড়াল।

গণেশ কোমরের অ্যাপ্রোণে ময়লা হাত দুটো মুছে একমুখ হেসে বলল—

ক্তিগুলো আমি করেছি তার! দেখুন ঠিক বেকারীর মত হয়েছে!

হেসে তার কথায় সায় দিলাম। মিস্ প্যাট্রিক সব প্লেটগুলো এক একটা ট্রেতে সাজাতে সাজাতে বললেন—মিঃ সান্যালের আজ একটা ইন্‌জেকশন দেওয়া দরকার, ডাক্তারকে খবর দেব?

আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করবেন। আমার এতে সব সময় সম্মতি আছে।

মিস্ প্যাট্রিক হাসতে হাসতে একটা ট্রে নিয়ে চলে গেলেন। ওর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবছিলাম—কি বস্তু দিয়ে যে গড়া এঁদের দেহ-মন! কখনও কোন কাজে শৈথিল্য নেই, শরীরে অবসাদ নেই। কখনও ভুলেও মনে করেন না যে তিনি এখানকার একজন বেতনভুক কর্মচারী মাত্র! মাহিনার টাকাটা যেন একটা গৌণ ব্যাপার; মানুষকে সেবাযত্ন আর কর্তব্য সাধন করা—এই হ'ল মুখ্য উদ্দেশ্য ওঁর। তা না হ'লে কি আর এমন সম্ভব।

অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে হাঁটতে রোগীদের ঘরে চলে এলাম। প্রথমেই পিটারের বেড। কটিটা মুখে দিয়েই সে বাঁ হাত দিয়ে সম্মান জানাল। আমি কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলাম—আপনার কোমরের ব্যথাটা একটু কমেছে?

—কালকের চেয়ে একটু কম। ব্যাণ্ডেজে হাত দিতে দিতে পিটার উত্তর দিল।

—ও ভাল হয়ে যাবে শীঘ্রি; কিছুটা আশ্বাস দিয়ে ও বেডটা পেরিয়ে গেলাম।

অনসন সমস্ত শরীরটা দুলিয়ে কোনও রকমে দুটো হাত জড়ো করে আমার দিকে তাকাল। কৃতজ্ঞতা স্বীকারের কি অপরিসীম ভদ্রতা! অথচ এ কৃতজ্ঞতা স্বীকার আমার কাছে করা নিরর্থক, আমি যোগ্যও নই। আমি ত' এখানকার একজন মাইনে-করা কর্মচারী মাত্র। আমার যেটুকু কাজ তাতে সেবার দিকে নজর দেওয়ার সুযোগ আছে, কিন্তু অন্য কোনও ভাবে সরাসরি সেবা করার কোনও সুযোগ নেই ত'।

ওর কাছ থেকে অনেকগুলো বেড পেরিয়ে গিয়ে একবারে শেষ বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালাম। সেই বাঙালী যুবকটির বিছানা। বিপ্লব সান্যাল—সত্যই সার্থক নাম। ভদ্রলোকের চোখে মুখে কোথায় যেন একটি বিপ্লবীর ছবি রয়েছে।

কাছে এসে শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলাম—কেমন আছেন? কোন অসুবিধা হচ্ছে না ত?

—না। আমার চেয়েও শান্তভাবে জবাব দিয়ে বিপ্লববাবু আমার দিকে সমস্ত দেহটা ফেরালেন।

—আপনাকে আজ একটা ইন্‌জেকশন দেওয়া হবে। আর দু একটা দিলেই বোধহয় মিটে যায়!

ম্লানভাবে হেসে সান্যাল আমাকে বসতে বললেন।

আমি পাশের চেয়ারে বসলাম। তারপর বললাম—আপনার সঙ্গে ঠিক ভালমত আলাপ হয় নি।

—বেশ ত' বিকেলে আসুন। আপনার কথা বলবেন, শুনব।

—শুধু আমার কথা কেন? আপনার কথাও শুনব।

—আমার কোন কথা নেই। শুধু ব্যথা আছে।

—সে ত' আছেই, তার চিকিৎসা হচ্ছে ও আস্তে আস্তে ভাল হয়ে যাবে। আপনি কিছু ভাববেন না।

—না আমি এ ব্যথার জন্তে ভাবি না। আমি ভাবি আমার মানসিক ব্যথার জন্তে।

—মানসিক ব্যথা আবার কিসের! আপনারা সৈন্যবাহিনীর লোক। আপনাদের আবার মন বলে কিছু আছে নাকি? আমি ত' শুনেছি সৈন্য-বাহিনীতে থাকতে হ'লে ও বস্তুটিকে ত্যাগ করতে হয়।

—হাঁ আমিও তাই শুনেছিলাম। সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার একটা উদ্দেশ্যও আমার এই অভিপ্রায়ে। কিন্তু কোথায়? মনকে ত' আমি বাংলাদেশ থেকে দূরে রাখতে পারিনি। অসহ্য গরম, প্রতিকূল আবহাওয়া, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা—কর্তব্য পালনের কঠোর নিয়মাবলী—সবকিছু ত' আমি ভুলতে চেয়েছি—কিন্তু পারিনি। কেন বলুন ত'? আকুলভাবে সান্যাল আমার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ল।

সান্যালের কথা কিছুটা শুনেছিলাম। মানসিক রোগগ্রস্ত রোগীকে উত্তেজনা জোগাতে নেই। একটু অপ্রস্তুত হয়ে তাই আমতা আমতা করে ওকে এ প্রসঙ্গ থেকে সরাবার চেষ্টা করলাম—ঠিক আছে ওসব শুনব একদিন। আপনি ইন্‌জেকশন নেওয়ার পর কেমন থাকেন জানাবেন। ডাক্তার মজুমদারকে সেই মত ব্যবস্থা করতে বলতে হবে ত!

সান্যাল আমার কথার কোনও জবাব দিলেন না। শুধু ম্লানভাবে তাকিয়ে মাথাটা একদিকে একটু হেলালেন।

মিস্ প্যাট্রিক দেখি তখনই ডাক্তার মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে আসছেন। কিছুটা স্বস্তিবোধ করলাম। ডাক্তার মজুমদারকে চেয়ারটা ছেড়ে দিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

সান্যাল বিবর্ণ মুখটা তুলে আবার আমার দিকে তাকাল, বলল—বিকেলের দিকে আসবেন কিন্তু।

—আচ্ছা। সময় পেলে নিশ্চয় আসব। সান্যালের কাছ থেকে তখনকার মত বিদায় নিয়ে চলে এলাম। (ক্রমশঃ)

শিক্ষাজগতে সংকট ও আদর্শ শিক্ষার বনিয়াদ *

—শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু

শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করবার পূর্বে আমি আমার ব্যক্তিগত কয়েকটি কথা সকলের সামনে নিবেদন করছি। এই দেওঘরের মাটি বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে বহুকাল পূর্ব হতে জড়িত। আমি ইতিপূর্বে কয়েকবার দেওঘরে এসেছি কিন্তু আজকের মত এমন পবিত্র শান্তিময় স্থানে আসার সৌভাগ্য কখনো হয়নি। আজ এখানে এসে আমি এক অসাধারণ ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁর শিষ্যদের সাথে আলাপ করে ও মিলেমিশে আমি যে তৃপ্তি ও আনন্দলাভ করেছি তা' কখনো ভোলবার নয়। সকলের কাছ থেকে যে শুদ্ধ আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতা ও প্রেমপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছি তা' আমার জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে। এখানে এসে আমি আমার অনেক প্রাক্তন ছাত্র দেখতে পাচ্ছি। শিক্ষকের এক বিচিত্র অনুভূতি, শিক্ষাজগতের সাথে সংশ্লিষ্ট যারা তারা সকলেই জানেন। তা এই যে, প্রাক্তন ছাত্রদের সামনে এলে শিক্ষকের বুক আনন্দ ও গৌরবে ফুলে ওঠে। এই গৌরব ও আনন্দ এবং সর্বোপরি এই সংগঠনের প্রাণ-পুরুষের মর্মস্পর্শী অবিস্মরণীয় স্মৃতি নিয়েই আমি কলিকাতায় ফিরে যাব।

আমি শিক্ষাবিদ্ বা শিক্ষাব্রতী একথা বলতে চাই না। আমি আজীবন শিক্ষকরূপে কাজ করবার সৌভাগ্য পেয়েছি। সামান্য দু-চারিটি কথায় আমি আমার বক্তব্য শেষ করব।

মনে পড়ে প্রাচীন গ্রীসদেশের কথা। তখনকার গ্রীসদেশের কথা যদি চিন্তা করি তবে সেখানে কি আদর্শ দেখতে পাই? আদর্শ ছিল, প্রথমতঃ নাগরিক বোধসম্পন্ন মানুষ তৈরী করা, দ্বিতীয়তঃ তাদের মানব-সেবায় নিয়োজিত করা, তৃতীয়তঃ মানুষকে স্বাধীন চিন্তার দিকে ঠেলে দেওয়া। কিন্তু, পাশাপাশি বর্তমানের আমাদের শিক্ষার লক্ষ্যকে তুলে ধরলে কি দেখবো? শিক্ষা বলতেই প্রথমতঃ বুঝবো 'অর্থকরী' শিক্ষা, দ্বিতীয় বুঝবো রাজনৈতিক দাবাখেলার ঘুঁটি হিসাবে নিজেদের কি ভাবে নিযুক্ত করা যায়। গ্রীসীয় শিক্ষার লক্ষ্য ছিল নিয়মানুবর্তিতার দ্বারা মানসিক নিয়ন্ত্রণ, বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধন, চরিত্রের ভিতর সংযম ও শৃঙ্খলাবোধ আনয়ন, নাগরিক চেতনার উদ্বোধন, ব্যক্তি চেতনার অবদমনের দ্বারা যথাসম্ভব সমষ্টি চেতনাকে গড়ে তোলা। পরিপূর্ণ নাগরিক মানুষ, রাষ্ট্রের মানুষ তৈরী করবার জন্য কত প্রচেষ্টা ছিল প্রাচীন গ্রীসের।

ভারতে পাই কর্মযোগীর আদর্শ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আছে কর্মযোগী মানুষের কথা—যে মানুষ বীতরাগ, কিন্তু অনলস কর্মী, সুখে বিগতস্পৃহ দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা, শ্রদ্ধাবান, জিতেন্দ্রিয়। গীতায় এঁদের 'স্থিতপ্রজ্ঞ' বলা হয়েছে। কিন্তু এঁরাই হলেন মানবসমাজে প্রকৃত শিক্ষক। বর্তমান গতিশীলতার যুগে আমরা গতিটাকে যতটা আঁকড়ে ধরেছি, লক্ষ্য বা গতির উদ্দেশ্যের প্রতি অনুরাগ তত কম। আমরা মানসিক পরিপূর্ণতার কথা চিন্তাও করি না। আত্মিক ও নৈতিক শক্তিকে কি করে গড়তে হবে সে প্রচেষ্টা আমরা শিক্ষাজগৎ হতে সম্পূর্ণ বাদ দিতে বসেছি। গ্রীসে বা আর্যভারতে শিক্ষার এরকম ব্যবস্থা আদৌ ছিল না। গ্রীসের culture-এর মূল কথা এসেছে যেই শব্দ থেকে তার মানে নাগরিকতা, সমষ্টি চেতনা, মানসিক উৎকর্ষতা ও মানুষের সেবা, চরিত্র ও বুদ্ধির উন্নয়ন। Culture-এর বর্তমান অবস্থা গ্রীক আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। মূল আদর্শ ও প্রেরণা থেকে বিচ্যুতির ফলেই আজ সমাজে এত সমস্যা।

* বিগত ২রা বৈশাখ "সৎসঙ্গ" নববর্ষ উৎসব-উপলক্ষে দেওঘরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত সহস্র সহস্র সৎসঙ্গ-অনুরাগী জ্ঞানী, গুণী ও বিদ্বজ্জনের যে বিরাট সমাবেশ হইয়াছিল তাঁহাদের সমক্ষে অনুষ্ঠিত শিক্ষা-সম্মেলনের প্রধান অতিথিরূপে কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু মহাশয় এবং সভাপতিরূপে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ শ্রী কে. কে. দত্ত যে সুচিন্তিত অভিভাষণ প্রদান করেন, উহাদের সারাংশ এখানে সৎসঙ্গের অনুমতিক্রমে প্রকাশ করা হইল।

—সম্পাদক, দ্যুতিদীপা।

আমাদের ধারণা পোশাকদুরস্ত চেহারায় মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোক এই নিয়েই culture গঠিত হয়। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিক্ষিপ্তভাই এ ধরণের মনোভাবের পরিণতি। বর্তমান culture-এর ফলশ্রুতি দেখেই একজন মনীষী বলেছেন, "A man of learning is more or less a corpse." কিন্তু গ্রীসে বা প্রাচীন ভারতে যে শিক্ষার ধারা প্রচলিত ছিল তা মানুষকে এভাবে জ্যান্তে মৃত করত না। তাদের সবল মেরুদণ্ডের কখনো অপলাপ করেনি, বরং তা' তাদের প্রাণের দ্বার: খুলে দিয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি শিক্ষার ধারা ঠিক করতে হয় তবে আত্মিক বোধ, নৈতিক শক্তিকে মূলে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তা যেখানে না হয়, সে শিক্ষা প্রাণের ভিতর কোন সাড়া আনতে পারে না, মনের অন্ধকার দূর করতে পারে না। তার পেছনে যত টাকাই ঢালা হোক না কেন তা কোনদিনই আমাদের পথ দেখাতে পারবে না।

আমার কলেজের এক বিশেষ দিনের কথা আমার জীবনের পাতায় চিরকাল আঁকা হয়ে থাকবে। একটি অতি দুরন্ত ছাত্র—তাকে বাগ মানানো বরাবরই কঠিন হতো। একদিন তাকে জোড় করে ধরে নিয়ে এল আমাদের কলেজের ইলেকট্রিশিয়ান। আমার ঘরে তাকে টেনে নিয়ে এসে অভিযোগ করল যে, ছাত্রটি কলেজের তিনটি পাখা ঢুকে নষ্ট করে দিয়েছে। আমি তাকে কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করলাম যে সে এমন অসৎ কাজ করেছে কেন। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র প্রতিবাদ করে তা' সে অস্বীকার করল। পুনরায় তাকে পরীক্ষা থেকে চিরদিনের মত suspend করার ও তাড়িয়ে দেবার ভয় দেখালাম। তবু ছাত্রটি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলল যে, ব্যক্তিগত কোন ক্ষোভের কারণে ইলেকট্রিশিয়ান তার বিরুদ্ধে মিথ্যা করে রটনা করেছে। তখন আমি অন্য উপায় গ্রহণ করলাম। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালাম। ছাত্রটির সামনে দু'পা এগিয়ে গিয়ে এক-হাতে আলগোছাভাবে তার গলা জড়িয়ে ধরলাম, আর এক হাতে তার বুক স্পর্শ করে বললাম, "তুমি যদি আমার কলেজের সমস্ত পাখা নষ্ট করে দিয়ে অন্যায় স্বীকার করতে তবে বুঝতাম তোমার হিম্মত আছে। ছেলেরা অন্যায় করে, আবার তারাই স্বীকার করে সংশোধনের পথে আসে। এখন বল, সত্যিই তুমি এ অপরাধ করেছ কিনা।" ছাত্রটি দু' তিন মিনিট ধরে অবাক্‌বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর দু'চোখে দরদর ধারায় অশ্রুবর্ষণ করে তৎক্ষণাৎ আমার দু'পা জড়িয়ে ধরে বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে বলল, "স্যর্, আমায় ক্ষমা করুন, এজন্য আমায় যে কোন শাস্তি দেবেন আমি মাথা পেতে নিব।" ছাত্রটির ব্যবহারে হঠাৎ এই পরিবর্তনে আমিও মুহ্যমান হয়ে পড়লাম। তাকে টেনে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম, "তুমি যে বীরত্ব দেখিয়েছ তার তুলনা হয় না। তোমার কোন ভয় নেই, কেউ তোমায় কিছু বলতে পারবে না।" দেখলাম সে দিনের ভালবাসার স্পর্শে ছেলেটির দুরন্ত স্বভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে।

মনে পড়ে ভারতের চতুরাশ্রমের কথা। প্রথম আশ্রম ব্রহ্মচর্য। অর্থাৎ যে আচরণে ছাত্ররা বৃত্তির শিক্ষা পেত। ছাত্ররা বাস করতো গুরুর সান্নিধ্যে, তাঁরই অনুরাগ-রঞ্জিত তত্ত্বাবধানে বিদ্যা শিখতো, যোগ্যতায় পারদর্শী হয়ে উঠতো শ্রদ্ধা ভক্তি ও সদাচরণের মধ্য দিয়ে। আজ আমরা শিক্ষক—কিন্তু সে গুরুর গুরুত্বের দাবী করি না। আমাদের কাছে ছাত্ররা আসে, বলে, "স্যর্, এমন কয়েকটি suggestion দিন যাতে পরীক্ষায় পাশটা করে যেতে পারি।" কোথায় এর মধ্যে শ্রদ্ধাভক্তির স্থান? আমি নিজেকেই প্রশ্ন করি, আমি কি কখনো ভেবেছি যে ছাত্রদের ভিতর কোন্ শিক্ষার সঞ্চার করলে তাদের সত্যিকারের কল্যাণ হয়? স্বামিজী বলতেন, আগে ছাত্রদের মনের স্তরে নেমে যেতে হবে। আমরা তাদের মরমী হয়ে শিক্ষা-দানের কথা ভাবি কোথায়? ছাত্ররা এম. এ. পাশ করে সম্মানের সাথে চাকুরীর টাকার অঙ্ক বাড়বে বলে। ডি. ফিল. দের বড় রকমের সার্টিফিকেট, সম্মান ও বেতন লাভের প্রত্যাশায়। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সরস ব্যবহার ক্রমে লোপ পেতে বসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'বছর ফেল করলে কিছু এসে যায় না, কিন্তু নীতিবোধ নিয়ে কোন ছাত্র যদি সমাজে পেছিয়ে যায় তবে শিক্ষার দিক থেকে তা বহুগুণে ভাল। শুধু চাকুরীর নেশায় বা সওদাগরী অফিসে বড় মসনদের আশায় বিদ্যালাভ সমাজ বা রাষ্ট্রের কোন কল্যাণ করে না।

আজ সংঘের আশ্রমে এক অভাবনীয় প্রাণবন্ততার লক্ষ্য করলাম। এখানে দেখলাম শিক্ষার সাথে ধর্ম, কর্ম ও মর্মের এক

আন্তরিক কোলাকোলি রয়েছে। পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর শিক্ষার এক পূর্ণতমরূপে উদ্ভাসিত। যুগে যুগে এমন মানুষ এসেই আমাদের সঠিক পথের সন্ধান দেন। আমাদের মাঝে ভগবানকে জাগিয়ে তোলেন। শিক্ষারও পরিপূর্ণতা ঐখানেই।

(২)

শ্রী কে. কে. দত্ত

শিক্ষা সম্মেলনের সভাপতিরূপে আমাকে বরণ করার জন্ম আমি আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। মানুষ ভৌগলিক ব্যবধানে যত দূরেই থাকুক না কেন, অন্তরের টান তাদের পরস্পরকে নিকটে টেনে আনে। মানুষের সাথে মানুষের মিল যত গাঢ়তর হয় ততই আত্মাভিমান দূর হয়, কূপমণ্ডূকতা দূরে যায়। যাঁরা ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস ঠিকভাবে অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরা জানেন, ভারতের মৌলিক অবদান—আধ্যাত্মিকতা। প্রকৃত শিক্ষার মূল লক্ষ্য হ'ল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন। অবশ্য আমাদের বহুরূপে অর্থনৈতিক উন্নতিও দরকার। তার জন্ম project, plan করতে হবে। কিন্তু যদি এটাই আমাদের চরম লক্ষ্য হয় তবে সব plan, সব অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। বাইবেলে আছে—Man does not live by bread alone. শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক এই তিনটি অবস্থা সব মানুষেই অল্পাধিক বর্তমান। শেষোক্ত দুটির উন্নয়ন শুধুমাত্র 'রুটি'র উপর নির্ভরশীল নয়। তার জন্ম ভিন্ন 'রুটি'র শিক্ষার প্রয়োজন। ১৮৩৫ সাল থেকে ভারতের বুকে শিক্ষা ব্যাপারে অনেক Seminar, অনেক সম্মেলন হয়েছে—তথাপি আজও শিক্ষার ক্ষেত্রে পুঞ্জীভূত ব্যভিচার আমরা লক্ষ্য করছি। শুধু Plan ও Commission-এর দ্বারা শিক্ষা সমস্যার সমাধান হয় না।

"প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য সম্যক্ বিকাশের সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য যাতে নষ্ট না হয়, তার জন্ম বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষকদের প্রকৃত স্বাধীন চিন্তার খোরাক দেওয়া প্রয়োজন।" বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষকদের উপরে যদি অবৈধভাবে উপর থেকে চাপ দেওয়া হয় তবে শিক্ষকদের একদিকে যেমন স্বাধীন চিন্তার স্ফুরণ হয় না, অন্যদিকে তা'রা পড়িয়ে কোন আনন্দ পান না। পঠন ও পাঠন উভয়ই সে-ক্ষেত্রে গতানুগতিক ধারায় চলতে থাকে। কিন্তু স্বাধীনতার সাথে সাথে আমি এটাও উল্লেখ করতে চাই যে, প্রকৃত স্বাধীনতার সাথে প্রকৃত অনুশাসনও চাই। "প্রকৃত শিক্ষাই আমাদের যথার্থ স্বাধীনতা দেয়," কিন্তু তা' অনুশাসনকে মেনে নিয়ে—অস্বীকার করে নয়। শিক্ষার দিক দিয়ে বিশিষ্ট মনীষীরা সকলে এ কথাই বলেছেন। শিক্ষক-ছাত্র সকলেরই বিনয়ী ও শিষ্টাচারসম্পন্ন হতে হবে। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"—এই বাণী মুহুর্মুহুঃ শিক্ষক-ছাত্রের স্মৃতিতে জাগ্রত রাখা উচিত। মনে হয়, এ ভাব যদি শিক্ষার জগতে ফিরে আসে তবে বর্তমান অনৈক্য ও অরাজকতা দূর হবে শিক্ষা শান্তি ও কল্যাণকে আবাহন করবে।"

শ্রীশ্রীঠাকুর যে দেওঘরের বুকে শাণ্ডিল্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেছেন তা অবশ্যই কার্যকরী হবে বলে বিশ্বাস করি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিক থেকে আমার আন্তরিক সহযোগিতা সব সময় থাকবে। যাঁরা এতে উদ্যোগী হয়েছেন তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্ম কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করছি। যেমন, শিক্ষক ও ছাত্রের সংখ্যার এমন একটা নির্দিষ্ট অনুপাত থাকা বাঞ্ছনীয় যাতে শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক মধুর হয়, পারস্পরিক নৈকট্য আরো নিবিড় হয় এবং শিক্ষক ছাত্রদের প্রতি অধিক নজর দিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষক যেন জ্ঞানবান ও চরিত্রবান হন। তৃতীয়তঃ যে সব শিক্ষক নিযুক্ত হবেন, তাঁরা যেন সমাজে তাঁদের ন্যায্য অধিকার পান। দুঃখ এই যে, আজকাল অন্যান্যদের তুলনায় শিক্ষকরা সমাজে তাঁদের ন্যায্য অধিকার পান না। চতুর্থতঃ শিক্ষার সুষ্ঠু বিকাশের জন্ম নিশ্চয়ই বিভিন্ন department গঠিত হবে এবং প্রত্যেক department-এর জন্ম যেন উপযুক্ত গ্রন্থাগার থাকে। পঞ্চমতঃ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করবার পূর্বেই যেন ছাত্রদের থাকবার মত উপযুক্ত আবাসস্থল তৈরী করা হয়। ষষ্ঠতঃ ছাত্রদের পঠন পাঠনের সাথে সাথে তাদের চরিত্রের বিকাশের যেন উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ সুবিধা থাকে। আশা করি, প্রাণ-পুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুরের পরিকল্পনায় যে বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হতে চলেছে তার দ্বারা প্রচারিত ভাবসম্পদরাজি শিক্ষাক্ষেত্রে দেশের বর্তমান দৈন্য ও বিশৃঙ্খলা দূর করে দেশকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয়তঃ বলিষ্ঠ করে তুলবে।

অল বেঙ্গল ফাদার্স-ইন্-ল এ্যাসোসিয়েশন্

—শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

রবিবারে বিপুল উত্তেজনা। আন্দোলনহীন স্তিমিত মহানগরী নেতাদের চেষ্টায় জনপ্রাণে সাড়া এনে দিয়েছে। জনমন উদ্বেলিত অথচ তা'রা জানে না, তা'রাই আজ লক্ষ্যবস্তু, নেতাদের ভাগের ভাগে ঠিকই তা'রা পৌঁছে যাবে।

বেলা ড়'টো নাগাদ নানা রঙের পতাকা, লাল শালু আর প্রচার-বাণীতে রাজপথ ছেয়ে গেছে। বিপুলায়তন ড়'টি দল দলপতিদের সামনে নিয়ে আর তাদের তৈল-চিত্রিত মূর্তি শিরোধার্য করে ড়'ধার থেকে আসছে। মির্জাপুর আর কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে দুইদলে প্রায় সামনা-সামনি এসে গেছে। শোভাযাত্রীরা আপন আপন ধ্বনি তুলে চ'লেছে—জুলুমবাজি চলবে না! ইনকিলাব, জিন্দাবাদ! নেতাজীকি জয়! বন্দেমাতরম্!

জামাইদলের কতকগুলি আবার প্রাবৃনে জামাই। মাত্র এই শ্রাবন মাঝে জীবনে তাদের প্রথম সাহানা রাগিণী বেজেছিল। কিন্তু হায়, ভাগ্যের ঘঁ্যাচড়াপনা! আগের আগের জামাইরা তবু কিছু পেয়েছে, এরা এই ভাদ্রে টানের প্রথমেই হা'ভাত! তাই আজ তাদের মুসড়ে পড়া প্রাণে ক্ষিপ্ততা বড়ই করুণ, কিন্তু অতীব প্রখর। জান-কবুল ক'রে তা'রা সুর তোলে, চীৎকার ক'রে বলে, তত্ত্ব—অ—অ—

সজীরা সমর্থনের ঐকতানে বলে চা-আ-ই! সমবেত কণ্ঠে রাস্তা কেঁপে উঠলো।

তৎক্ষণাৎ শ্বশুরদলে রব উঠলো, তত্ত্ব—অ—অ—

না—আ—ই! শ্বশুরকণ্ঠের গগন-ভেদী হুঙ্কারে শহর থর থর।

জামাইদল যতই প্রাণশক্তির শেষ কোঠায় স্বর তুলে বলে, তত্ত্ব চাই! শ্বশুরগণ ততই দুই হাতের ড়'টী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বলে, তত্ত্ব নাই!

তাড়াতাড়ি হোলো না, কারণ পুলিশ মোটা মোটা লাঠি হাতে পাহারা দিয়ে চলেছে বলে।

ড়'টীদল আপন আপন গন্তব্যে পৌঁছে গেল।

জামাইদল একের পর এক খেদোক্তি জানানোর পর স্বামিজী উঠলেন।—বন্ধুগণ, খাঁটি দেশ-প্রেমিকের, আজকাল বড়ই অভাব। তাই আজ আমাদের এই অধঃপতন। যা জলের মত সহজ তাকেই দুর্বোধ্য করার প্রাণান্ত অপচেষ্টা। বন্ধুগণ, আসল বিবাহ মানে কি? শ্বশুরের আর নিজের যৌথ ব্যবস্থায় একটা নতুন নীড় রচনা। এতো আমাদের একক দায়িত্ব নয়। তোমাদের মেয়ে কোনো কালে আমাদের কেউ ছিলও না। নিতান্তই পর। সারা বছর তাদের খাওয়া পরার জন্যে তোমাদের কাছে কিছু চাইতেও যাই না। কিন্তু বছরে ড়' তিনবার তত্ত্ব দিয়ে তোমরা আমাদের খুশি করবে, এতো তোমাদের নিজের বিবেচনা, নিজেদের ভালর জন্যেই করো। আমরা তোমাদের মেয়ের জন্যে দানসত্র খুলিনি। আমাদের দাবী, প্রথম তিন বছর আমাদের সমস্ত জামা কাপড় তোমাদিকেই দিতে হবে। এমন কি দাড়ি কামানোর পয়সাটিও তোমাদেরই দেয়। আজ তোমরা দালালদের কথায় আমাদের খাতির-টুকুও ভুলে গেছ। তাই দাবী যদি তোমরা সহজে না মেটাও তো আমরা সর্বদুঃখ বরণে প্রস্তুত। দেশের সনাতন ঐতিহ্য এভাবে লাঞ্ছিত হতে আমরা দেবো না।

ক্রমেই ক্রোধান্ধ স্বামিজী রিপু সংবরণে অসমর্থ হলেন—বন্ধুগণ, আমি আবার বলছি, দেশে দেশপ্রেমিকের লেশগন্ধ নেই। তাই সুবিচারের আশাও বাতুলতা মাত্র। ভিক্ষায় কোনো দাবী পূরণ হয় না বন্ধু, শক্তির দ্বারা তত্ত্ব আমরা অর্জন ক'রবো। অতএব আজ এখন থেকেই আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করলুম।

অমনি চারদিক থেকে ইটপাটি-কেল আর পালটা মারামারি। জামাইদল বাছা বাছা কয়েকটা বয়স্ক ভদ্রলোককে ধরে বেদম প্রহার দিল। ফলে পাঁচ-ছ'জনার অঙ্গহানি, একজনার প্রাণনাশ।

একটা সমস্যা দেখতে এমনি একাই, কিন্তু তার গর্ভে রাতারাতি কত না সমস্যা জন্মগ্রহণ করে।

খবর পেয়ে পাঁচকড়ি লাফিয়ে উঠলো, 'মার্ দিয়া কেল্লা! এবার এসো হে চাঁদ' ব'লেই ভজুকে নির্দেশ দিলেন, 'ভজু খুব হঁশিয়ার, তাদের ব'লে রেখো, বেশী না—মোটা পাঁচেক জামাই—বেশী না—বুঝেছ?'

কিন্তু পাঁচুদা, এযে ভীষণ কাণ্ড। দাঙ্গা বেধে গেছে। লোক চলাচল

প্রায় বন্ধ। আমি ত সাহস পাচ্ছি না দাদা, আমি যা শুনেছি গোটা পাঁচেক শত্তুর সাফ হয়ে গেছে।'

'ঠিক জানো, পাঁচটা ?'

'ভুলো নিজ চোখে দেখে এসেছে। তুমি পাঁচুদা একটা মিটমাটের ব্যবস্থা করো।'

'চোপ রও!' গর্জে উঠলো পাঁচকড়ি 'তোমার দ্বারা নেতা হওয়া কোনো দিনই হবে না। তোমার মধ্যে দেশপ্রেমের এত অভাব জানতুম না। নির্বোধ, নেতাদের জীবন কুলীশ-কঠোর। ধ'রে নিতে হবে পাঁচটা লোক মানে পাঁচটা পোকা! পাঁচটা পোকা মারা গেলে কি হয়? অমন দু'দশটা মারা না গেলে কেউ আন্দোলিত হয় না। তাছাড়া লোক এত অকৃতজ্ঞ, আমার এত পরিশ্রম কিছুতে মনে রাখে না। দাগ রেখে যাব ভজু, গর্ত ক'রে দোবো, দেশপ্রেমিক কাকে বলে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দোবো।'

ভজু মাঝে মাঝে কেমন অবুঝের মত হ'য়ে যায়। আবার ব'লে ফেললো, 'মানুষকে পোকা ভাববো, আর সংসারগুলো সব শেষ হ'য়ে যাক!'

'যাক! তার চেয়ে ভেবে দ্যাখো তুমি দেশকে ভালবাসো কিনা। মরার হিসেব করলে কোনো দিনই নেতা হ'তে পারতুম না। মরবে মরুক, শুকনো পাতার মত ঝরে যাক! তাকাবে না! দেখবে যে ক'টা আছে তার মধ্যে আর ক'টা গেলে তোমার সুবিধে হয়। কারণ দেশের দাবী তোমার আমার ক'রতে হবে; নেতৃত্বে যেন তোমার ভুল না হয়। তবেই তোমার ভবিষ্যৎ, তবেই দেশের কাজ হোলো।'

'কি যে বলো তুমি, কিছুই বুঝি না।' ভজু তবুও বলে, 'মানুষগুলো সব মরে গেলে'—

'আঃ ভজু!' পাঁচকড়ি ধমকে দিল, 'যা বলি তাই করো। যখন সব মিটে যাবে, মনোযোগ দিয়ে দেখো, খবরের কাগজে বিবৃতি দেবে, যে সব পরিবারে লোকক্ষয় হয়েছে তার জন্যে আমরা দুঃখিত। এটা আমাদের অবশ্য-কর্তব্য। সে রকম হ'লে দু'দশ গ্যালন তেল খরচ করে নিশ্চয় বাড়ী বাড়ী ঘুরে আসবো। তা হলেই খুশি ত? আচ্ছা শেষে না হয় একটা ফাণ্ড খুলবো, ওদের টাকা ওদিকেই দোব। যাক সে, তুমি ভুলো-কে না পারো মানকে-কে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, আমি নিজেই সব বলে দিচ্ছি।'

ওদিকে স্বামিজীও দেশের কথা যথেষ্ট ভাবেন। সাকরেদ অচ্যুত-কে ব'লছেন, 'জানো হে অচ্যুত, দেশের কথা যারা ভুলিয়ে রাখে, জয় তাদের হবেই। ঐ পেঁচো ব্যাটা, সে-বারে ঠেলাগাড়ীর ভাড়া বাড়াতে গিয়েছিল, কেমন সব ঠাণ্ডা ক'রে দিলুম, মনে আছে? এবারেও চালাও, দেশকে দেখাও আমরা আসল জাতের দেশপ্রেমিক কিনা। গোটা দশেক শত্তুর, বেশী না, তুমি চোখা আর ওকাকে ব'লো। বলো, আমি আছি হ্যাঁ, আর কোনো রকমে গোটা কয়েক স্কুল কলেজের ছেলেদের খেপিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো, তারপর আর তোমায় ভাবতে হবে না।'

'আজ্ঞে'—অচ্যুত একটু আমতা আমতা করে, 'আজ্ঞে' এবারে আর ওদের নিয়ে কাজ নেই। ওরা সব লেখাপড়া করে, এদিকে মতিগতি এলে ছেলেরা মুখ্যু হ'য়ে সারাজীবন গুণ্ডামো ক'রে বেড়াবে। গেলবারে যে-সব ছোঁড়াদের আমরা খেপিয়ে দিলুম, তাদের কতকগুলো একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। সন্ধের পর পার্কের পায়ে-পাশে হ্যাংলা কুকুরের মত মেয়েদের গন্ধ শুঁকে বেড়ায়, চোখের সামনে যা খুশি করে, ভাবে ওরাই নেতা হ'য়ে গেছে।'

'তাতে তোমার কি? মূর্খের মত না বুঝে কথা বলো!' স্বামিজী ক্রুদ্ধ হলেন, 'ওরাই হোলো দেশের সবচেয়ে ধারালো অস্ত্র, জীবন যুদ্ধের একনিষ্ঠ সৈনিক, দেশের হৃৎপিণ্ড ওরা। ওদিককে না নিলে দেশের আন্দোলন ব্যর্থ। ভুলে যেও না, দেশ আগে। আর লেখাপড়া? যার কপালে নেই, তার হলো না। তুমি কাউকে টলিয়ে দিতে নিশ্চয় পারো না! কিন্তু লেখাপড়া না শিখেও ওরা দেশের যা কাজ করে তা তুমি আমি ক'রতে পারি না। দেশমাতার আসল পূজারী হ'ল ওরা, দেশের জন্যে লড়তে এসে ওদের বাদ দেওয়া যায়?' একটু থেমে স্বামিজী আবার ব'ললেন, 'তাছাড়া সবাই লেখাপড়া শিখলে, এদিকে যদি না ভেড়ে তবে আমরা কম-জোরী হ'য়ে যাব। ওরা যা খুশি করুক, দেশকে ওরা ভালবাসে কিনা? বরং কর্মহীন জীবন ওদের, ডাকমাত্র ছুটে এসেছে। দেশপ্রেম ওদের সহজাত। আর কেউ আসতো এমন দেশের জন্যে প্রাণ দিতে?'

স্বামিজী আবার একটু থামলেন, বললেন, 'হ্যাঁ, ওদের একটু ফূর্তি-টূর্তি করাটা মোটেই দোষের নয়। আমি ভেবে দেখেছি, জীবন ধারণের জন্যে ওটাও দরকার। আমি ত ওই জন্যেই ওদের জামীন দিয়ে ছাড়িয়ে আনি। আমি কি একেবারেই বোকা মনে করো? দেশের আসল সন্তান ওরা। যাও যাও, ও নিয়ে আর মাথা ঘামিও না। ওদের না হ'লে আমাদের এক বেলাও চ'লবে না।'

অচ্যুত আবার মাথা চুলকে

ব'ললো, 'কিন্তু ওদের ভবিষ্যৎ, ওদের মা বাপ কত বিপন্ন'—কিন্তু তার অচ্যুত কথায় শেষ ক'রতে পারে না।

'মূর্খ, দেশই যদি তোমার আগে, দেশের ভবিষ্যৎটাই আগে ভাববে না? আমাদের কী ভীষণ দায়িত্ব ভাবতে পারো? বেশতো, বাপেরা আটকে রাখুক! তা পারবে না, করবেও না, কারণ তারা তোমার মত গণ্ডমূর্খ নয়, তাদের দেশভক্তি বলে এখনো কিছু আছে। তাছাড়া কি দিয়ে আটকাবে? পয়সা আছে সকলের? পড়তে অনেক টাকা লাগে অচ্যুত, সেটা অনেকেরই নেই। অথচ ঐ সব জলন্ত দেশপ্রদীপ তেলের অভাবে নিভে যাবে? আমরা না দেখে থাকতে পারি? দেশ ওদের চায়!'

স্বামিজী আরো কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। তারপর আবার ব'লতে শুরু ক'রলেন, 'এই সব দেশ-প্রেমিকরা দলে থাকলে কত সহজে কাজ হয় ভেবে দেখেছো? এক পেট খাওয়া, কি এক আধটা টাকার বদলে সারা রাত, পোস্টার বাজি, বিজ্ঞাপন আর বই যাতে কেমন কাজ করে ভাখো না? এর পর শহীদ চাই না? সংসারী লোক কখনো ছুটে গিয়ে বন্দুকের সামনে দাঁড়াতে পারে? ওরাই হোলো দেশবন্ধুর দল! দেশের জন্যে যদি কখনো তোমার প্রাণ কেঁদে থাকে, ওদিককে অমন চোখে দেখো না। বেশী সময় নষ্ট না ক'রে, কিসে দেশকে বাঁচানো যায় সেই চেষ্টা করো। তার জন্যে চাই দেশপ্রেমিক, বুঝেছ?'

ওদিকে ভজু উন্মাদ হ'য়ে ছুটে এসে জানালো, 'পাঁচুদা, পাঁচ-ছটা জামাই শেষ হ'য়ে গেছে, এখন উপায়?'

'গ্যাছে?' পাঁচকড়ি জোড়হাত মাথায় ঠেকিয়ে আকাশের দিকে চাইলো, 'বাঃ, মঙ্গলময়ি!'

পরমুহূর্তেই ভজুর দিকে মুখ ফেরালো, 'হ্যাঁ, কি যেন ব'লছিলে ভজু?'

'পাঁচ-ছ'টা খুন হ'য়ে গেল, আমি ত' আর—'

'দূর হ'য়ে যাও!' পাঁচু ধমক দিল, 'এতদিন পর একটা শুভ লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে আর অমনি তুমি কাতর? নেতা-জীবনের এ হোলো অগ্নি-পরীক্ষা। দেশসেবা ক'রতে এসে এ সইতে না পারা মানেই দেশদ্রোহিতা করা।'

মুখ কাচুমাচু ক'রে ভজু ব'ললো, —'মানে বিশ্রী একটা—।'

'ওরে গর্দভ, ভাল করে শিখে রাখ, এর নাম হোলো আন্দোলন। এ না হ'লে আন্দোলন চ'লোই না। দু'দশটা খুনই যদি না সইতে পারলে ত' নেতৃত্বের কোনো মূল্যই নেই। দেশের ভাল ক'রতে হ'লে এরকম হবেই। মাতৃ-ভূমির প্রাচীনতম ব্যাধির মূলোৎপাটন করতে হলে আমাদের অনেক সইতে হবে।'

'কিন্তু পাঁচুদা', ভজু আবার বলে, 'তুমিই ভেবে দ্যাখো, কি বীভৎস ব্যাপার, তাজা জোয়ান ছেলেগুলো, কারো পেটে, কারো বুকে ছুরি চালিয়ে —ভাবলেও কি রকম—'

'আঃ ভাবো কেন? ভেবো না! দেশের সমস্যায়, দেশমাতৃকার প্রয়োজনে, একটা প্রাণ অতি নগণ্য! দেশপ্রেমের আবেগে নিজেদের চাড়ে নিজেরাই খুনোখুনি ক'রছে। তা'রা যেটা জানতো না, বুঝতো না, আমরা সেটাই বুঝিয়ে দিয়েছি। আমাদের কোনো হাত নেই! এবার নিজেদের সমস্যা নিজেরা যেভাবে পারে মীমাংসা করুক। আমরা কেবল হাল ধরে থাকবো, লক্ষ্য রাখবো। যা হবার ঠিকই হবে। তা ছাড়া, তোমার কোনো ক্ষতি হয়েছে?'

'না না, আমার কথা বলছি না, আমার মেয়ে-জামাই ভালই আছে'—ভজু ঢোক গিলে বলে 'মানে যারা খুন ক'রলো, তা'রা তো—?' 'তা'রাও দেশের লোক, দেশের জন্যে লড়ছে! আমাদের কোনো দোষ নেই।' পাঁচকড়ি এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন।

'বেশ' ভজু ব'ললো, বেশ, তাই যদি হয়, চলো থামিয়ে দেবে চলো, বাকী লোকগুলো অন্ততঃ বাঁচুক!'

'যাবো, নিশ্চয়ই যাবো'—পাঁচকড়ি ধোঁয়া ছাড়লেন, হাই ফেললেন, 'যাওয়া আমাদের উচিত।' হ্যাঁ, এটাও ভাল ক'রে বুঝে দেখার জিনিস। যাবোই আমরা, কিন্তু এখন নয়। ওরা নিজের জিনিস নিজেদের হাতে নাড়া-চাড়া ক'রে নিজেরাই খানিকটা এগিয়ে যাক, খানিটা ক্লান্ত হোক, ঝোঁক কমুক, তখন যাবো। কিংবা যদি ভাখো, পুলিশ ধরপাকড় শুরু করেছে, খবর দিও, তখন যাব। দেশের জন্যে জীবন অঙ্গীকার করেছি, নিশ্চয়ই জেলে যাব। কিন্তু এখন ওদের সে চোখ নেই, আমাদিকে চিনতে পারবে না, আমাদিকেই সাফ ক'রে দেবে।'

পাঁচকড়ি সিগারেটের লম্বাটানে আবার একটু সামলে নিয়ে বললো, 'প্রসবের আগে যে যন্ত্রণা, এটা তাই। দেশের জন্যে এটা তোমাকে সইতেই হবে, ভজু। অন্তরে দেশপ্রেমের অভাব হলে তোমার মত কেঁদেকেটে দেশটাকে ডোবাতে পারতুম। এসব বুঝতে—তোমার এখনো অনেক সময় দরকার।'

ব'লেই পাঁচকড়ি যেন কথার মোড় ফেরালো, 'তুমি ভজু বরং টাকা পয়সা কিছু যদি ফুরিয়ে থাকে ত নিয়ে যাও, এ বেলাটা একটু বিশ্রাম করোগে, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সেই ভাল। পাচুদার মূল্যবান কথার মর্মার্থ ভজু সব সময় ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। সত্যিই তো একটা নেতার মাথায় দেশের কত নিদারুণ চিন্তার বোঝা। দেশকে মনে প্রাণে ভালবাসা, কেবল ভালবাসি ব'ললেই হয় না, দিগ্দারি অনেক। নাঃ পাচু-দাকে এখন বিরক্ত না করাই যুক্তি-যুক্ত। পাচুদা বাড়লে তবেই ভজুর ভবিষ্যৎ।

টাকা হাতে নিয়ে চিন্তিত মুখে ভজু বাড়ী ফিরলো। সত্যি দেশের দুঃখে পাচুদা শেষ হ'য়ে গেল।

এক রাত্রে শহরের মূর্তি এমন বদলে যাবে কে জানতো। সকাল থেকে মারমুখী শহর। ক্ষিপ্ত জনতা যেখানে সেখানে খণ্ড যুদ্ধ বাধিয়ে রেখেছে। নিশ্চিন্ত পথচলা দূরের কথা, ঘর থেকে বাজার, সেখান থেকে ফিরে আবার বাড়ী, ভাগ্যের আঙুল গণনায় শূন্য ছাড়া সবই অনিশ্চিত।

স্কুল কলেজ বন্ধ। তাদের অনেকে আন্দোলনের পুরোভাগে। দেশের দুর্দিন, দাদা-নেতাদের জ্বালাময়ী বক্তৃতা, দেহের রক্ত উথলে ওঠে। অলিতে গলিতে গেরিলা যুদ্ধের সৈনিক তা'রা। তা'রাই হোলো সক্রিয় শক্তি!

অসংখ্য সিকি-নেতা, আধা-নেতা, সাড়ে-নেতাদের তেজাংশ আহুত হয়ে শহরময় ছুঁচোবাজির স্ফুলিঙ্গের মত আন্দোলনে জলন্ত-সলতে ঠিকই লেগে আছে।

স্বামিজীর চেষ্টা কিছুটা ফলবতী হয়েছে। চিন্তাভারে মাথা ঝুঁকিয়ে পেছনে হাত-জোড়া আটকে রেখে স্বামিজী পদচারণা করেন, যেন নেতৃত্বের পাশাখেলায় ভাগ্যদেবী রওনা হওয়ার সংবাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন, স্বামিজী তাই অপেক্ষমান।

এবার স্বামিজী স্থিরভাবে কমীদের মনে শক্তি সঞ্চারণ করলেন,—'হ্যাঁ, তাহলে এবার তোমাদিগকে বেছে নিতে হবে, কারা শত্রু। আনুমানিক পঁয়ত্রিশ বছর বয়স ব'লে যাদের মনে হবে আর তার অধিক, সবাই শত্রু-সম অপরাধী, তাদিকেই ধরবে। আর যারা ত্রিশের কাছাকাছি, তাদিকে যে ভাবে হোক দলে টেনে নেবে। শত্রুদের যদি তিন দিন ঘরে আটকে রাখতে পারো, বাবা বলে ছুটে আসবে।'

স্বামিজী আবার একটু পদচারণা করে আবার থামলেন।—'আজ তোমরা দেশসেবা করার যে সুযোগ পেয়েছ, এ সুযোগ সকলের ভাগ্যে আসে না। এ সৌভাগ্য তোমরা হারিও না। দেশভক্তি দেখাও, এইই তার শুভলগ্ন। দেশের কাজে দেশ-ভক্তিই একমাত্র অস্ত্র। অচ্যুত, জিনিসটা ভাল করে ওদের বুঝিয়ে দাও। আমার পূজা-আহ্নিক এখনো বাকী আছে। হ্যাঁ, নারীর মর্যাদা যেন কোনো রকমে ক্ষুণ্ণ না হয়। এমন কলঙ্ক আমাদিগকে যেন স্পর্শ করতে না পারে। মনে রেখো নারীরা মায়ের জাত, আমরা তাদের সন্তান!' বঙ্গনারীর কল্যাণে জোড়হাতে আকাশের দিকে আবেদন পাঠিয়ে পূজায় রত স্বামিজী গৃহমধ্যে অন্তর্হিত হলেন।

স্বামিজীর উপদেশ মাথায় নিয়ে দলের সব চলে গেল।

কিন্তু পেটের দায় যে ভীষণ। খেটে যাদের পেট চলে তাদের বেরোতেই হবে। সকলেরই নিদারুণ অন্নচিন্তা। পথ যদি এমনি বিপজ্জনক হয়, জীবিকা আসবে কিসে?

কোনোরকমে পেট চালানোর কথাটাই সাধারণে বেশী ভাবে। ভাবে, কোন অসাধারণ উপায়ে পেট-পূরণের নতুন পথ খুঁজে বের করা যায়। তারপর চোখের সামনে যা পায়, তাই ধরে হন্যে হয়ে তাক তুলে ছোটে।

দলবদ্ধ শত্রুসমাজ পাঁচকড়ির নির্দেশ চায়,—পেটের পন্থা বাৎলে দাও, বাঁচার মত যে কোনো একটা উপায়।

চিন্তা-মেঘাবৃত জলছবি পাঁচকড়ির মুখ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কি উপায়ে এই দুর্লঙ্ঘ্য সমস্যার ওপারে যাওয়া যাবে। শত্রুগণ স্বগৃহে প্রায় বন্দী হয়ে আটকে আছে।

'ওঃ এই কথা? ও কিছু না!' পাঁচকড়ি একটা অতি সহজ অবহেলায় নিজের এক ফুট পরিমিত শিখাটি খুলে ফেললেন। আবার শিখাটি সযত্নে গুছিয়ে গুছিয়ে বাঁধলেন। এবার এক পৌরাণিক গাম্ভীর্যে একখানি মীমাংসা-দর্শন হাতে তুলিয়ে বললেন, বেশ পরিবর্তন করো! তোমরা সকলেই শাড়ী পরে নারী বেশ ধারণ করবে। বুঝলে ভজু, স্ত্রীলোক সাজতে হবে!'

'মেয়েছেলে সাজবো? শাড়ী পরবো?' ভজুর বোধ হয় মরদেহে এই প্রথম স্বপ্নলোক দর্শন হোলো, 'কিন্তু দাড়ি গোঁফ জোড়া—?'

'কামিয়ে ফেলো। আবার কামাও, কোনো সমস্যাই নয়।'

'কিন্তু মেয়ে সাজতে হ'লে, মানে, —ভজু ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারে না, 'মানে মেয়ে সাজতে হ'লে—'

'বললুম তো, গোঁফদাড়ি কামিয়ে, শাড়ী পরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ো, কেউ কিছুই করতে পারবে না।'

'না না, তা নয় হোলো—' তবু ভজু নিজের মাথা চুলকেও গুছিয়ে বলতে পারে না, 'মানে স্ত্রীলোক সাজা, মানে আর কি, স্ত্রী-অঙ্গের প্রকাশ,—মানে বুঝলে না, ওপর থেকে স্ত্রীলোকের মত দেখানো—'

'অর্বাচীন! তোমায় ভাবতে হবে না! যে সাজবে তার ভাবনা! ভাল করে পাউডার, পর চুলো, এই সব আর কি, তারপর লিপষ্টিক, ও জিনিসটা পথে ঘাটে দেখলেই আমার পক্ক বিম্বফলের কথা মনে হয়। কবি-বাক্য মিথ্যা নয়, স্ত্রীলোকের রঞ্জিত ওষ্ঠাধর সত্যই মনোরম। তা ছাড়া রাস্তায় দেখেছি, মেয়েরা নিশ্চয়ই কাজল অথবা সুরমা ব্যবহার করেন। তাতেও যথেষ্ট নয়ন মন আকৃষ্ট হয়। ওসব তোমরাও ব্যবহার ক'রতে পারো। ওতে কোনো দোষ নাই। আত্মরক্ষাই স্বধর্ম। হ্যাঁ, আর তুমি যা বলছিলে, স্ত্রী-অঙ্গ, ও তোমার ধরো, সহজ উপায়ে স্বল্পব্যয়ে কাগজের কিংবা ন্যাকড়ার ছোট ছোট পুঁটলি পাকিয়ে—ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না। আগে আমার নির্দেশ প্রচারের সত্বর ব্যবস্থা করো, নইলে সবই ভেস্তে যাবে।'

এত বড় একটা বিপদকে এভাবে এত সহজে বোকা বানাতে পারে, শ্বশুর-মণ্ডলী কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবেনি। বাঁচবার এমন সহজ ফন্দি নেতা ছাড়া আর কে দেখাতে পারে! আনন্দের কাকলী তুলে নতুন করে বাঁচার সুখে বিভোর হয়ে শ্বশুরগণ বাড়ী ফিরলো।

হেলে দুলে রাস্তা দিয়ে শাড়ী আর পর চুলায় কলির তাড়কা-ধূমাবতীরা চলেছেন কোনো গ্রহ উপগ্রহের নতুন আমদানী জীবের মত। চলেছেন অফিস, চলেছেন ট্রামে-বাসে।

নেতাদের আদেশ মেনে নিলে কত সহজে প্রাণ ত বাঁচেই, চাকরীও টিকে যায়, পেটও চালু থাকে। ক'টা দিন মেয়ে সাজায় আপত্তি করা বোকামো। কেন না অফিসে এসে পোশাক বদলে নিলেই মিটে যায়।

জনগণ এবার হাঁক ছেড়ে বাঁচলো। তারা কোনো রকমে বাঁচতেই চায়। এর চেয়ে সহজ আশ্রয় তাদের মগজে আসে না। এই বাঁচায় আশায় আজ জামাই-বাহিনীও এই অভিনব অস্ত্রে প্রলুব্ধ হয়ে শাড়ী-সজ্জায় নারীরূপে পথে নেমেছে। আগে পেট চলুক!

কে জানতো এমন দুঃস্বপ্ন দিনের আলোয় চোখ মেলে দেখতে হবে। চোখের সামনে চলছে গোদা গোদা পা, কেঠো কেঠো হাত, মোটা মোটা ঠোঁট, অথচ পরনে রঙ-বেরঙের শাড়ী। মহানগরীর পথে ঢুমড়ুমিয়ে চলছে মদ্দা মেয়ের দল, চলেছে নারীদের সকল মানস চিহ্ন মুছে দিয়ে, সিগারেট বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে।

এমন অশ্রুতপূর্ব নারী কণ্ঠস্বর, এ হেন গাঁক-গাঁক গাও-গাও,—শ্রোতারও অচিন্তিত। পাঁচকড়ির সার্থক নেতামীর এই মসৃণ অবদান ভূগোল-ইতিহাস ম্লান ক'রে দিল।

স্বামিজী এবারে একটু প্যাঁচে পড়লেন। শ্বশুরদের বন্দী করা গেল না। জামাইদের ত্রস্ত আদায় একদিনে সাত মাইল পিছিয়ে গেছে। স্বামিজীর গৈরিক বসন ঘর্মাক্ত, শিরস্ত্রাণ করধৃত, অচ্যুত চিন্তাক্লিষ্ট অধোবদন।

স্বামিজীর গম্ভীর কণ্ঠে নিনাদিত হোলো, 'বাধা! দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করো। শ্বশুরদের সর্বতোভাবে বিপর্যস্ত করো। পুরুষ-স্তনধারীদের শাড়ী-পরা অবস্থাতেই ধরে ধোলাই দাও। এমন কি আসল স্ত্রীলোকদের নানা উপায়ে উত্যক্ত করো, তাদের সহজ জীবন অসম্ভব করো, মানে ট্রামে-বাসে একটু আধটু—বুঝেছ—?'

'আজ্ঞে স্বামিজী, আপনি সেদিন ব'ললেন মাতৃজাতির অবমাননা—।'

'তখন তার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যুদ্ধের মুখ ফিরেছে, কাজেই সে উপদেশের মৃত্যু হয়েছে। যুদ্ধের উদ্দেশ্য জয়, তা সে যেভাবেই হোক। এখানে কোনো নিয়ম নেই। মা-ভাই কিছু না। একমাত্র কাম্য হ'ল জয়।'

অচ্যুত তবুও যেন দুঃসাহসের প্ররোচনায় বলে 'তবু নারীজাতি মাতৃ-সমা—'

'নির্বোধ, সবাগ্রে দেশ! দেশ সেবায় এ সব মোটেই দূষণীয় নয়। অজ্ঞ তোমরা, তাই মাতৃভূমির অবমাননায় ব্যথিত হও না। ভীরু, কাপুরুষ, দেশপ্রেম আয়ত্ত করো। যাও, হুঙ্কার দিয়ে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ো।'

অচ্যুত মনোবল ফিরে পেয়েছে। স্বামিজীর বাণী নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

শাড়ী! শাড়ী! শাড়ী। শাড়ীময় মহানগরীর ধুতির চাষ বুঝি নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু দিনের আলোয় রাজ-পথে মেয়েতে মেয়েতে দ্বৈরথ, যা কয়েক হাজার বছরের পিঠ-চাপড়ানো প্রগতিও সম্ভব করতে পারেনি না, স্বামিজীর চেষ্টায় তাও চালু হয়ে গেছে।

কিন্তু যুদ্ধে তেমন জোর নেই। পেট-প্রধান জনগণ শাড়ীর অন্তঃস্থলে জীবন সংকেত শুনেছে। মারামারির প্রবৃত্তি যেন মাথা তুল ক'রে পেটমুখো পা চালায়। ওঃ যা হোক ক'রে আজ পেট চলে, এ বাঁচা কি কম বাঁচা! কিন্তু একনিষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকেরা বাতাস ধূমায়িত ক'রে রাখে নেতাদের আপ্রাণ চেষ্টায়। সেবাব্রত তাদের অবিচল, অসাধারণ মনোবলের অধিকারী তাঁরা। তাই আন্দোলন তবুও বিস্তৃতি লাভ করে।

শাড়ীর মহিমায় তবুও খুনোখুনি খানিকটা কমেছে, কিন্তু দেশের মহাসমস্যার কোনো মীমাংসাই হয়নি।

দিনে দিনে দেশের চেহারা বদলে

যায়। পুরুষ মুক্তি বুঝি অধিল হবে। অথচ এমন বদাকার স্ত্রীলোক দেখে নিজের চোখ নিজেকে গালাগালি ক'রে বিদ্রোহ করে।

এদিকে কত পেন্ট-পরচুলার দোকান, ওদিকে নিত্য নূতন কত প্রসাধন কারখানা, সেদিকে কত শাড়ী ছাপার কারবার, কত স্ত্রী চরণের পাদুকা সদন চারিদিকে গজিয়ে উঠে পুরোদমে চলছে। সবচেয়ে অবাক, বিশালায়তন বিকট-ললনার দল দর্জির দোকানে ব্লাউজের মাপ দিতে পা'রন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। গলির মোড়ে রোয়াকে বসে পুং-স্ত্রীদের অভিনয় রণবাজির বর্ণনাতীত অঙ্গভঙ্গী বুঝি হতভাগা ভগবানের পাগলামির সৃজন

দিন যায়, দিন আসে, আন্দোলনের অভিশাপ নিয়ে পেট চলে।

কত ভুঁইফোড় জীবন সন্ধানী কত সুযোগ-সাধক ব্যবসা বিস্তারের অনুকূল স্রোতে কিলবিল করে। শাড়ী যেন আজ সমাদৃত নিরাপদ অবলম্বন। শাড়ী আজ মনেও বেশ মানিয়ে গেছে। চোখও অরাজি নয়, দিনও বেশ চলে। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন এমন কি বিবাহও আটকে নেই। নিত্য নূতন ঘটনার প্রবাহ ছেয়ে যায় পাড়া থেকে বে-পাড়ায়, শহরের প্রান্ত ছাড়িয়ে।

এমনি এক বিয়ের বাসরঘর যখন নিশা শেষের তন্দ্রায় অচেতন, নব-দম্পতি ভীরু প্রেম নিবেদনের প্রথম চেষ্টায় চমকে উঠলো, 'তার মানে ?'

—'তার মানে ?'

তারপর গোটা কয়েক 'তার মানে'র পর ধস্তাধস্তি। জালিয়াত ঘটকের অপচেষ্টায় ছেলেতে ছেলেতে বিয়ে হয়ে গেছে! এমনতর অঘটনেরও অভাব নেই।

নেতাদের মনোবল অটুট, পদক্ষেপ সুদৃঢ়। অনশন আপন মহিমায় পত্রাঙ্কশক্তিক।

দেখতে দেখতে ট্রামে-বাসে মহিলাদের নির্দিষ্ট আসন উঠে গেল। পরিবর্তে হোলো 'কেবলমাত্র পুরুষ।' কারণ দু'একটী অবাঙালী পুরুষ-যাত্রীর আসন পৃথক না হ'লে মেয়েদের ভীড়ে তা'রা দাঁড়াবার জায়গাটুকুও পায় না। মেয়েরা উঠল একটু ঘেঁষ-ঘর্ষণের আশায়, কেউ আর পথ-ছেড়ে পথ-আগলে দাঁড়ায় না। চোখ-চাটা হয়ে মেয়েদিকে আর চোখ বাঁচাতে হয় না, পুরুষই এখন যাত্রী-চোখের ভারকেন্দ্র। প্রেমলোলুপ চাতক চাতকী অপূর্ব সুযোগ পেয়ে পাশাপাশিই বসে, চাওয়া চোখের সামনেই মন চালান দেয় গেরুয়াধারী গুণ্ডার মত।

'লেডীজ স্পেশ্যাল্' ট্রামগুলো আজ নেতাদের বেগার খাটে মনের দুঃখে, কারণ তারাও যে আজ কৃষ্ণযৌবন 'জেণ্টস্ স্পেশ্যাল্।' আরও অবাক মেয়েরা আজ চলন্ত ট্রাম-বাস থেকে কেমন তড়াক তড়াক লাফ দিয়ে নামে, কিন্তু পুরুষদের বেলায় 'একদম বাঁধকে।'

এহেন সময়ে আর এক নিদারুণ সমস্যা মাথা উঁচিয়ে কখন বেড়ে উঠেছে। আসল মেয়ে-যাত্রীদের হয়েছে এক অনির্বচনীয় বিড়ম্বনা। নকল মেয়েদের সঙ্গে একাসনে বসতে হবে, কিংবা সমস্থানে মুঠোয় ধরে একান্তে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কিন্তু যারা ধরে, তারা ঠিকই ধরে, পোষাক বদলালেই স্বভাব বদলায় না। তার ওপর খাকিজী-সেবকরা লেগেই আছে।

মেয়েদের দুশ্চিন্তার এপার-ওপার দেখা যায় না। ভেবে তারা কূল পায় না কোন্ গুণের অধিকারী হলে জন্মভূমি তারা ফিরে পাবেন।

নারীজাতির এহেন শোচনীয়তা আবার কোনো নেতা-নেত্রীকে আছড়ে প'ড়ে নীরবতা নষ্ট না ক'রে পারে না, অন্ততঃ যিনি এখনো এ আন্দোলনে যোগ-সুযোগের অপেক্ষায় বেকার জীবনের আবরণে চাপা আছেন।

জনসমস্যা আপন নেতৃত্ব কৌশলে অযুক্ত বাচ্চাদায়িনী। একাধিক সমস্যা-শাসক মায়ের পেটের সন্তান, ততোধিক জননায়ক মায়ের পরমাত্মজ।

ভাবছেন, চিন্তাহরণ সমস্যার মশায়। চোখ মন একত্র করে চলচ্চিত্র নজরেই রেখেছেন। স্থির মস্তিষ্কে লক্ষ্য ক'রছেন ঘটনার গতিপথ। শৈশব থেকে নেতৃত্বের ঘূর্ণিস্রোতে সাঁতার কেটে এসেছেন, এই বিদ্রোহী শিশু চিন্তাহরণ। নারীজাতির তথা দেশ-মাতৃকার সেবায় উৎসর্গীকৃত জীবন, নায়ক-চিন্তাহরণ আজ নেতৃত্বের মন ভাগে ব'সে সবকিছুই দেখতে পান। জামাইদের অহেতুক হাংলামো, শ্বশুরদের জের, মাঝে পড়ে নারীসম্পদ নিপীড়িত। আর মানসচক্ষে দেখেন, দেশে আজ প্রকৃত দেশপ্রেমিকের কি ভয়াবহ অনটন।

তখন দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আন্দোলনের তরঙ্গ-চূড়ায়। এসেই বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, দশদফা যুদ্ধসূচী। প্রথমেই তুলে ধরলেন, রোমকখ্যাপিত 'অনশন'।

আমদানী ক'রলেন কিছু স-বৎসা পত্নী-নিবন্ধনাদের। এইবার, মাত্র একটী ঢিলে দু'টী নেতাকে ঠিকরে সরিয়ে দিয়ে জনগণের মন-সিংহাসন দখল ক'রে বসে থাকবেন। পূর্ব-অভিজ্ঞতার তীক্ষ্ণতম অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মাত্র দশটী স্বেচ্ছাসেবিকাকে সিনেট হলের সামনে অনশনের খাঁচিতে জুড়ে দিলেন। দাবী—পুরুষদের নারী-বেশ ছাড়তে হবে!

কী ভয়ঙ্কর আঘাত!

টনক নড়ে উঠলো পাঁচকড়ির।

স্বামিজীও টলটলায়মান।

মাত্র পাঁচ দিনের দিন অনশনের আসর থেকে একজন স্বেচ্ছাসেবিকা বিস্ময়করভাবে অপহৃতা হলেন, প্রচার হোলো শ্বশুর-জামাই-এর গুপ্ত চক্রান্ত বলে। সমজদার মশার কপালে চিন্তার বলীরেখা প্রকটিত করলেন। বাড়ী ফিরে মৃদু স্বরে জগদ্দলকে ডেকে বললেন, 'দেখিস জগা, মেয়েটার যেন খোঁজ না পাওয়া যায়!'

'ঠিক আছে।'

নাঃ আর একটা দিনও অপেক্ষা করা চলে না। শাড়ী চাপা দিয়ে তবু যাহোক চলছিল, সমজদারের এক দমকা চালে সব ভেসে যায়। পাঁচকড়ি হাবুডুবু—স্বামিজী থৈ-থৈ!

সংগ্রামের একটি পথ এখনো খোলা আছে, স্বামিজী আর পাঁচকড়ি যদি এখন সংঘবদ্ধ হতে পারে। কিন্তু সমবেত চেষ্টাই যদি কাজে লাগানো হবে তবে নিজেদের নেতৃত্বের কি গতি হবে! নেতাজীবনের উজ্জ্বলতা ম্লান হবে, দল ভেঙে যাবে, নেতাগিরির অপমৃত্যু হবে। অবশেষে এতদিনের দেশনেতা বেকার হয়ে রামা-শ্যামার মত চায়ের দোকানে ডবল-হাফ কাপে ডুবড়ি উড়িয়ে লর্ডস্ মাঠের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের গালাগালি পাঠাবে, আর সিগারেট ফুঁকবে। আর আয়ের খিড়কিদ্বার সহসা ক্যাচ করে বন্ধ হয়ে মানঘাতী ও প্রাণঘাতীরূপে দেখা দেবে। অতএব এ পথ সর্বথা পরিত্যাজ্য।

শেষ পথ আপোষ।

তার পরিণতি প্রায় একই। আপোষের বিকল্প অর্থ সগর্বানে পরাজয়। এখন হয়ত ছাপাখানার দৌলতে চীৎকার ছড়িয়ে এ অপবাদ চাপা দেওয়া সম্ভব, কিন্তু ভবিষ্যতে অর্থাৎ নির্বাচনের লীলাক্ষেত্রে এ গ্লানি সংবাদমূলপত্রে গাঁজিয়ে উঠবে। তা হলেই নেতৃত্ব খাসরোধে ওষ্ঠাগত-প্রাণ।

অতএব আপোষ অভাবিতব্য।

শ্বশুর-জামাই আজ সমভাবে চিন্তান্বিত। পেটে হাত পড়েছে, সাধারণের সাধারণ ব্যাধি!

পাঁচকড়ির অনলবর্ষী ঘোষণা হোলো,—'মাত্র ক'টা স্ত্রীলোকের জন্যে দেশ রসাতলে যাবে এমন কথা দেশপ্রেমের খাতায় লেখা নেই। দেশপ্রেমিকের খোলস প'রে যত ভণ্ড নেতা সেজে ছুটে আসে, তাই এহেন উৎপাত। কিন্তু দেশকে যদি মনেপ্রাণে ভালবেসে থাকি, আমরা এটুকুতেই টলবোনা, নিজের কথাও ভাববো না, কিন্তু জামাই-তোষণের মত কালিমামগ্ন কদাচার আমরা চিরতরে মুছে দোব। তোমরাও অনশন শুরু করো, এই সিনেটের সামনের পার্কে যে খোলা জায়গা আছে, ওখানেই তোমরা অনশন শুরু করো। আজ থেকেই শুরু করো।'

নেতার আদেশের বিরোধিতা না করেও শ্বশুররা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। পাঁচকড়ি ফুলে উঠে বললেন, 'দেশপ্রেমহীন কাপুরুষ মৃত্যুকে ভয় করে, কিন্তু আমি জানি আমার সমর্থকদের মধ্যে এমন একটা প্রাণীও নেই যে দেশের জন্যে মরতে পারে না।'

আর কথাটি নেই। দেশপ্রেমের উক্ত প্রস্রবণে শ্বশুরদের মনোবল শত গুণ বর্দ্ধিত হ'য়েছে। অনশনের উচ্চাশা নিয়ে তারা ফিরে গেল। এইবার পাঁচকড়ি ভজুকে বুঝিয়ে দিলেন, 'বুঝেছ ভজু, মেয়েদের নামে ভয় খাবার কিছু নেই, যে দলে অনশনে আগে প্রাণহানি হবে তাদের দিকেই জনসাধারণ বেশী আকৃষ্ট হবে। বেছে বেছে এমন জনকয়েক দেশপ্রেমান্ধ বৃদ্ধ যোগাড় কর যারা তিনদিন উপোস করেই সিঙে ফুঁকে দেবে। হপ্তা খানেকের ভেতর যদি তেমন কোনো ফল না হয় তখন আমি তার ব্যবস্থা ক'রে দোব।'

ভজহরিও আজকাল সহজেই বুঝতে পারে, কারণ পাঁচুদার অবর্তমানে ভজুকেই হাল ধরতে হবে।

ওদিকে জামাইরাও স্বামিজীর কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়লো, 'আমরা এত কাণ্ড ক'রে কিছু তো পেলুমই না, এখন যদি আবার শাড়ী ছাড়তে হয়, তার চেয়ে শ্বশুররা যে যা খুশি দিক, নয় পরের বছরই দেবে কিংবা যদি এক-আধখানা গামছা—'

'স্তব্ধ হও।' স্বামিজী অগ্নোদ্গার ক'রলেন—'আপোষ মানে আত্মহত্যা। কেবল অর্বাচীনই ও কথা চিন্তা করে।'

কেউ আর মুখ তুলে চাইতে পারে না। স্বভাবতই স্বামিজীর উষ্মা কিছুটা প্রশমিত হয়েছে। বললেন, 'বোকার দল, বৌগুলা এখনো আমাদের হাতেই আছে। দাবী যদি না মেটায়, পালের পাল বৌগুলো তাড়িয়ে দোব, বাবা ব'লে তত্ত্ব পাঠিয়ে দেবে।'

'সেকি স্বামিজী বৌদের তাড়িয়ে দোব?'

'নিশ্চয়! দেশের জন্যে আজ আমরা আত্মবলি দিতে প্রস্তুত, পত্নী সেখানে অতি তুচ্ছ। অমৃতের সন্তান তোমরাই,—না রক্তহীন মাংসপিণ্ডের দল? কবে বুঝতে শিখবে সকলের আগে দেশ! সবই নশ্বরশীল। দেহ পঞ্চভূতে লীন হয়ে যাবে, পশ্চাতে প'ড়ে থাকবে পুত্তিগন্ধভরা দেশদ্রোহিতার কলঙ্ক। ওরে পত্নীবিলাসীর দল, ইতিহাস ঘোষণা ক'রবে তোমাদের আসক্তির কথা। আগামী সমাজ অবজ্ঞায় মুখ ফেরাবে বিশ্বাসঘাতক বলে। আজো কি তোমরা বোঝো না, জন্মভূমি স্বর্গের চেয়ে বড়? পত্নী-

শুধু সেখানে পান্থশালার ক্ষণিক সাথী ছাড়া কিছু না!'

স্বামিজী একটু থেমে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেন, জামাইদল যেন প্রশ্নগুচ্ছির কোলে বাক্যহারা অভিভূত। স্বামিজী আবার বললেন, 'বেশ, আমি অবিবাহিত ব'লে যদি তোমাদের কোনো খেদ থাকে, আজই আমার বিবাহ দাও, কালই প্রভাতে আমি পত্নী ত্যাগ ক'রে দেখিয়ে দোবো, স্ত্রীলোক আমাদের জীবনে পথের সঙ্গীর মত, পথেই তাকে অতি সহজে ত্যাগ করা যায়।' বাক্যহীন জামাতা-বৃন্দ দুলে উঠলো স্বামিজীর দেশপ্রেমের নিষ্ঠা দেখে। তবু একটা ক্ষীণ জিজ্ঞাসা তাদের চোখে মুখে ঘোরাফেরা করে, সেটিকে ধুয়ে মুছে স্বামিজীর কাছে পৌঁছে দেবার শক্তিটুকুও ওরা আজ হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু স্বামিজী মন প'ড়তে পারেন, তাই এবার গলা খাটো করে ব'ললেন, 'চিন্তার কিছু নেই, এদেশের মেয়েরা আজও বিধবা হয়, নিজেদের গরজে নিজেরাই তত্ত্ব আদায় ক'রে নিয়ে সুড় সুড় ক'রে ফিরে আসবে।'

জামাই আসরে মৃদু কলধ্বনি উঠলো। স্বামিজী এবার উদাত্তকণ্ঠে ব'ললেন, 'এ সুযোগ হেলায় হারিও না। দেশাত্মবোধ জাগরিত করো, মনকে সুদৃঢ় করো, দেশের সনাতন ঐতিহ্য রক্ষার জন্য আত্ম-বলিদানে প্রস্তুত হও। তোমাতে তোমার কোনো অধিকার নেই। তুমি দেশের, তোমার প্রাণ দেশের, তোমার সর্বস্ব দেশের সম্পদ।'

জামাইদলে আবার গুঞ্জরণ শোনা গেল। স্বামিজী এবার একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু এখনই আমি চাইনা তোমরা পত্নী ত্যাগ করো, ওটা আমাদের শেষ অস্ত্র এবং অমোঘ! রাত্রি প্রভাত হ'লেই তোমরা প্রায়োপবেশন শুরু করো, তিনটা কেন্দ্রে—ওই সিনেটের সামনে ফুটপাথের ওপর ছাউনী করে, টালায় আর টালিগঞ্জে। কিন্তু প্রত্যেকেই গোপনে শেষরাত্রে খেয়ে নেবে। অচ্যুত সে ব্যবস্থা ক'রে দেবে। তাড়াতাড়ি মরে গেলে চলবে না। দীর্ঘদিন ধ'রে লড়াই বাঁচিয়ে রাখতে হবে।'

জামাইদলে আবার কানাকানি শুরু হোলো, খেয়ে দেয়ে উপবাস, এ আবার কেমন কথা। একজন ব'ললো, 'স্বামিজী, তত্ত্বের জন্য আমরা মরতে প্রস্তুত, আমরা জলগ্রহণ করবো না।

'তা হয় না নির্বোধ. আগেই মরে যাওয়া আজকাল ফ্যাশান, ওটাও লোকের সয়ে গেছে। আমরা আন্দোলনকে বিপুলতর করবো. স্বেচ্ছাসেবকের ভীড় পথে অচলায়তন গড়ে তুলবে। তবেই দেশবাসী বুঝবে আমাদের দাবী কত জনপ্রিয়। আর যদি মরতেই হয়, আমরা একযোগে শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক একই সময়ে প্রাণত্যাগ ক'রে জনমনে হৃৎকম্প এনে দোব।'

জামাইদলে ধ্বনি উঠলো, 'তত্ত্ব কোথায়?'

—'হাতের মুঠোয়!'

স্বাভাবিক নাগরিক জীবন আবার বিপর্যস্ত। শাড়ী অবশ্য কেউই ছাড়তে পারেনি। কিন্তু হিড়িক এসে গেছে সারা শহরময় নবপরিকল্পিত অনশনের। উপবাসী জামাতা সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যায়। ইতিমধ্যে অনশন-ক্লিষ্ট অনেক শ্বশুর দেহ রেখেছে, সেদিকেও যথেষ্ট উত্তেজনা। নারীব্রতীদের একটি তরুণদায়ীর জীবনদীপ নিভে গেছে, তাদের ক্রন্দনরোলে ব্রত যেন বিমুখ-গামী। ব্রতভঙ্গের আশঙ্কায় সমজদার আতঙ্কিত, নূতন আর একটা দলের আশায় সমজদার শহর পরিক্রমা করেন বিক্ষিপ্ত মনে। এদিকে উপবাসী জামাই সংখ্যার বিস্তৃতি ফুটপাথ থেকে পথে নেমেছে।

সুখের বিষয় তবু এরই মাঝে পূজার প্যাণ্ডেল তৈরী সমাধা হ'য়েছিল। গগন-বিদারী মাইক-নিনাদও বাদ যায়নি, কিন্তু পুজোটা কতদূর কি হবে এখনো কিছুই জানা যায়নি।

হঠাৎ খবর এলো অনশন-ব্রতী শ্বশুরদের ওপর কয়েক রাউণ্ড গুলী চালনার ফলে একজন নিহত, পাঁচ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

উত্তেজনার ঝোঁকে বাড়ীর গৃহিণীরা সন্তানদের যখন শাসন করেন রাগের চোটে দুম ক'রে এক চাপড় দিয়ে বলেন, 'ওরে দুষ্টু, ডাকবো এখুনি হ্যাংলা জামাইদের?'

ফলে দেশের ব্যবস্থা-পরিষদও ঘটনা পরিপাক ক'রে দেখছেন, সত্বর কিছু একটা করা দরকার।

সভায় জনৈক সভ্য আলোচনার জন্য উঠলেন, 'বন্ধুগণ, অবস্থা দৃষ্টে আমি মনে করি, দেশে নির্ভেজাল দেশ-প্রেমিকের নিদারুণ অভাব ঘটেছে—' তখনই সভাপালের নির্দেশে আলোচনা আগামী দিনের জন্য মুলতুবী রইলো।

জাতীয় উন্নয়নে সাহিত্যের প্রভাব

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

এই পবিত্র সম্মেলনে মা-জননী ও ভ্রাতাভগিনীদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে যারপরনাই আনন্দ লাভ করেছি। আমি কবিতা লিখি, তাই বলে বক্তা নই। আজকের এই সাহিত্যবাসর সকাল থেকে সরিয়ে এনে যে সান্ধ্যকালীন শিক্ষ-সম্মেলনের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে তা কোন দুর্ঘটনা-জনিত নয়, তা' খুব সমীচীন হয়েছে বলে মনে করি। শিক্ষা ও সাহিত্য একটি অপরটির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। একটি অপরটিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

'জাতীয় অভ্যুদয়' বলতে আমরা পূর্বে অন্য জিনিস বুঝতাম। স্বাধীনতা 'পাওয়া'টা স্বাধীনতার পূর্বভাগে আমাদের অন্যতম কামনা ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর দেশে নানারূপ সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় লক্ষ্য করে বোধ হচ্ছে যে স্বাধীনতা পাওয়ার চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা আরও কঠিন। ওতে আরো বেশী তপস্যার প্রয়োজন। তপস্যার ভিতর দিয়েই স্বাধীনতা রক্ষার প্রকৃত বল, ও মানুষ, সম্পদ আহরণ অপরিহার্য্য। আমরা ভারতের শাশ্বত সম্পদ রামায়ণ মহাভারতের কথা যখন চিন্তা করি, তখন মনে হয়, ব্যক্তি হিসাবে আমরা যতখানি জীবন্ত, রামায়ণ-মহাভারতের রাম-সীতা প্রভৃতির এবং কৃষ্ণ অর্জুনের চরিত্র তার চাইতে কম জীবন্ত নয়। আমরা এই জীবনে যে ভূমিকা পালন করি তার চাইতে অনেক বড় ভূমিকা তাঁরা ভারতীয় জীবনে পালন করেছেন।

সাহিত্য সমাজের দর্পণ ঠিকই। তাই ঐ জাতীয় সাহিত্য আমাদের জানিয়ে রাম-লক্ষ্মণ, কি কৃষ্ণার্জুন স্বাধীনতা রক্ষায়, কৃষ্টির প্রতিষ্ঠায় আমাদের চাইতে কত অধিক মজবুত ছিলেন। তাই তো আমরা এ-সব চরিত্রের ধ্যান করে আদর্শকে ঠিক করে নিতে চাই। জীবন যখন রয়েছে, তার বিবর্তন ও উদ্বর্তন চলবেই। কিন্তু তা থেকেই বিবর্তনের অন্তঃস্থ প্রেরণাকে বুঝে নিতে হবে। যে জানে সে ঠিকই বোঝে এই প্রেরণা মানুষকে ডোবায় না, বরং জাগ্রত করে তোলে, জীবনের নানা বৈচিত্র্যকে মহাচেতনার দিকে বিকাশোন্মুখ করে তোলে। যেখানে এই প্রেরণা কাজ করে সেখানে সাহিত্যের গতি ও মান নিম্নাভিমুখী হতে পারে না।

কোন সাহিত্য সাময়িক কাজ মিটিয়ে অদৃশ্য হয়। আবার কোন কোন সাহিত্য যুগ যুগ ধরে বহু বিপর্যয় অতিক্রম করে শাশ্বত অস্তিত্বের দাবী করতে পারে। আজ আপনাদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এমন এক চৌম্বক শক্তি যার প্রেরণায় আপনারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে এখানে সমবেত হয়েছেন। এই চৌম্বক শক্তিই সাহিত্যের সবচেয়ে বড় প্রেরণা। আমরা সাহিত্যিক গোষ্ঠী বহু আয়াসে যা বলি বা লিখি, এই চৌম্বক শক্তির কেন্দ্রস্বরূপ যাঁরা তাঁরা অতি সহজেই তা মানুষের মাঝে সঞ্চারিত করতে পারেন। কিন্তু কত সহজে মানুষের প্রাণের কথা বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা-প্রয়োগ কত সুন্দর ও বিস্ময়কর। শেক্সপীয়রের উপমার বহু-বিচিত্রতা সমগ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগৎকে স্তম্ভিত করেছে। আবার কবি কালিদাস ছিলেন উপমার এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। আমরা সাহিত্যিকরা যেখানে পৌঁছতে কত আঁকুলি-বিকুলি করি তাঁরা সোজা অতি সহজে সেখানে পৌঁছে যান। মহৎ সাহিত্যের সবচেয়ে বড় দিক এই যে, এ ধরনের মহামানব যাঁরা আসেন তাঁদের বাস্তব ও সত্যি-কারের পরিচয়দান এবং মানব-সমাজের বুকে তাঁদের স্পন্দিত ছন্দোবদ্ধ পদচারণার ব্যঞ্জনানির্ণয়। 'জাতীয় অভ্যুদয়ের পথে সাহিত্য আমাদের চেতনায় সেই দরজা খুলে দিক যাতে আমরা মহৎকে জানতে পারি, বরণ করতে পারি।

যে নবজাগরণের স্পৃহা আমাদের মনে, এখানে আজ যা দেখেছি তা তারই যেন এক প্রোজ্জ্বল বাস্তব নিদর্শন। আজ এখানে যে অদ্ভুত প্রেম-স্বরূপ দেখছি তা শুধু উপরের ঢেউ মাত্র নয়, এর মূল গভীরে অন্তস্তলে প্রবিষ্ট। এই প্রেম-তরঙ্গ ও কর্মচাঞ্চল্য, এই আন্তরিকতা ও ব্যবহারে সহজ স্বাভাবিক ভাব আমাকে এক নূতন চেতনার তীরে পৌঁছে দিল—এই পরিতৃপ্তি ও সুষমা স্মৃতি নিয়েই আমি এখান থেকে ফিরে যাব।

• বিগত ২রা বৈশাখ "সৎসঙ্গ" নববর্ষ উৎসব উপলক্ষে দেওঘরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত সহস্র সহস্র সৎসঙ্গ-অনুরাগী জ্ঞানী, গুণী ও বিদ্বজ্জনের যে বিরাট সমাবেশ হইয়াছিল তাঁহাদের সমক্ষে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতিরূপে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র সুচিন্তিত অভিভাষণ প্রদান করেন; উহার সারাংশ এখানে সৎসঙ্গের অনুমতিক্রমে প্রকাশ করা হইল।—সম্পাদক, দ্যুতিদীপা।

• সংবাদ-বিচিত্রা •

দেশীয়

কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎসরবরাহ মন্ত্রী শ্রী কে. এল. রাও লোকসভায় বলেছেন যে, ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বৃদ্ধি অস্ট্রেলিয়া, সিংহল ও সুদানের জনসংখ্যার সমান। এই বৃদ্ধির জন্য সঙ্গতি রাখবার জন্য ভারতের প্রতি বৎসর ২০ লক্ষ একর জমি সেচ দ্বারা চাষের উপযোগী করবার প্রয়োজন হয়েছে। প্রতিটি শিশু জন্মিলেই তার পোষণের জন্য সেচকার্যে ১০০৲ টাকার ব্যবস্থা না রেখে উপায় নাই।

• • • •

লোকসভায় উত্থাপিত একটি বেসরকারী বিলে বলা হয়েছে, হিন্দু বিপত্নীকদের কুমারী কন্যা বিবাহ বন্ধ করা হোক। যারা বিবাহ-বিচ্ছেদ করেছেন তাঁদের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রযুক্ত হবে।

বিলটি উত্থাপন করেন পঞ্জাবের নির্দলীয় সদস্য শ্রীজগদেব সিং সিদ্ধান্তী। বিলটির উদ্দেশ্য, হিন্দু বিধবাদের দুঃখ মোচন এবং সেই সঙ্গে তাদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

• • • •

বৎসরাধিক কাল অমীমাংসিত অবস্থায় হাইকোর্টে ও সুপ্রীম কোর্টে পড়ে থাকা মামলার সংখ্যা ১ লক্ষ ৬০ হাজার। গত ডিসেম্বর মাসে যে বছর শেষ হয়েছে তার হিসাব এই। এর মধ্যে সুপ্রীম কোর্টে ৮৮৫, এলাহাবাদ হাইকোর্টে ৪৪,৬৭৭, কলকাতায় ৩১,৪৮০, পঞ্জাবে ১৪,৭৭৯, অন্ধ্রপ্রদেশে ১১,৩৬৭, মাদ্রাজে ১২,১৮৯, বোম্বাইএ ১১,৫৩৯। সরকার, সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে কয়েকবার কয়েক রকমের প্রস্তাব করেছিলেন। হাইকোর্টের ছুটি কিছু কমানো হয়েছে কিন্তু মামলার সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে অনেক বেশী।

• • • •

গত তিন মাসে রেলের হাওড়া-রামকৃষ্ণপুর মালগুদাম থেকে ১০,০০০ কেজি চাল, ৪,৩৭৭ কেজি ডাল, ১,৪৩৯ কেজি বাদাম এবং ৬০০ কেজি চিনি প্রভৃতি দ্রব্য নষ্ট হয়েছে বা খোয়া গিয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। এই মালের জন্য রেলকে মালের মালিকদের উপযুক্ত খেসারত দিতে হবে। প্রতি মাসেই রেলের এ-রকম বহু টাকা খেসারত যায়।

বিদেশীয়

নয়াদিল্লীতে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত অফিসের জনৈক মুখপাত্র বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে এখন সাত কোটি টেলিভিশন যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। তুলনায় সেখানকার যাবতীয় সংবাদ-পত্রের প্রচারসংখ্যা ছয় কোটি। যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ এখন রেডিয়োকে সর্বাধুনিক ও সর্বাপেক্ষা দ্রুত সংবাদ-প্রচারক বলে মনে করে।

• • • •

ব্রিটেনে ১৮ই এপ্রিল হতে রেলগাড়ীর গতি ঘণ্টায় ১০০ মাইল পর্যন্ত করা হয়েছে। লণ্ডন হতে ম্যাঞ্চেস্টার ও লিভারপুলে এইরূপ গতিসম্পন্ন ট্রেন চালানো হচ্ছে। বিলাস-ট্রেনগুলিকে ছ' হাজার অশ্বশক্তির সাহায্যে ঘণ্টায় ৭৪ মাইল বেগে ছোটানোর ব্যবস্থা হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতে ট্রেনের সর্বাধিক গতি ঘণ্টায় ৬০ মাইলের বেশী নয়।

• • • •

সোনিয়াকে "ব্রিটেনের সবচেয়ে নিখুঁত নারী" বলে ঘোষণা করা মাত্র চার্লির বিরুদ্ধে মেয়েরা তো ক্ষেপে লাল। সঙ্গে সঙ্গে তারা "এক চোখো" "এক চোখো" বলে চারদিকে গালাগাল দিতে শুরু করে দিল। চার্লি কিন্তু নির্বিকার। অমানুষ চার্লি।

অষ্টাদশী সোনিয়া অবশ্য খুবই খুশী। তার মতে, "চার্লি ঠিকই রায় দিয়েছে। আমার কাছে এই রায়ই পাকা।"

চার্লি আসলে ইলেকট্রনিক মস্তিষ্কওয়ালা একটি যন্ত্র। যন্ত্রের সাহায্যে সুন্দরী নির্বাচন ব্রিটেনে এই প্রথম।

• • • •

একশত পৃষ্ঠার একটি নতুন বই আজ বাজারে বেরিয়েছে—"নোবেল প্রাইজ"। সারা বইয়ে যতি-চিহ্নগুলি ছাড়া কিছুই লেখা নেই। বইটির লেখক কার্ল ফ্রেডরিক রবটার্সওয়ার্ড-এর বক্তব্য: পাছে আমার পাঠকদের মধ্যে বিতর্ক বাধে, তাই এই নতুন টেকনিক বেছে নিয়েছি।

বইটির দাম সাড়ে চল্লিশ ক্রাউন অর্থাৎ প্রায় পাঁচ ডলার—পঁচিশ টাকার মত।

আত্মিক

—শ্রীঅমিয় গোস্বামী

স্টেশনের বাইরে পা দিলো সঞ্জীব। সেই গর্জনশীল জনসমুদ্রের উত্তাল-তরংগ-বিক্ষুব্ধ সঞ্জীব উপকূলস্থ হ'লো। একটু মুক্তির, একটু স্বস্তির আস্বাদ পেলো সে। বাতাসের স্নিগ্ধতা অভ্যর্থনা জানালো, আর সকালের সেই মিঠে রোদটা যেন আবাহন ক'রলো তাকে। সমুদ্রের ঢেউ যেমন বেলাভূমিতে আছড়ে প'ড়ে খান্‌খান্ হ'য়েও বেশ একটু এগিয়ে আসে, তেমনি প্ল্যাটফরমের জনতা, কুলি, চা-বিড়ি-সিগারেট, চানা-চুরওয়ালা আর ইঞ্জিনের ঐক্যতান স্টেশনের বাইরে এখানেও এসে পৌঁছোতে থাকে।

দীর্ঘকাল পরে সঞ্জীব দেশের মাটির স্পর্শ পেলো, সুদীর্ঘ চার-চারটে বছর প্রবাসে কাটানোর পর। সেই প্রবাসজীবন আজ অবসিত। তার উচ্চশিক্ষার স্বপ্নকে সে সফল ক'রতে সমর্থ হ'য়েছে, সে আজ সিদ্ধকাম। কৃতার্থতার উজ্জ্বলতা নিয়েই তার প্রত্যাগমন ঘটেছে। দীর্ঘ অদর্শনের পর সে আজ মাতৃ-সন্দর্শনে ধন্য হবে, তৃপ্ত হবে। খুশির দীপ্তিতে ঝলমল করে তার মুখমণ্ডল। 'মা, মা'—অস্ফুটে উচ্চারণ করে সঞ্জীব।

অতীতের সেইসব বিস্মৃতপ্রায় নানান্ গুরুত্বপূর্ণ আর গুরুত্বহীন ছবি ভীড় ক'রে আসে ওর মনে। বন্ধু-বান্ধবদের সংগে হাসি-হুল্লোড়ে ভরা সেই আবেগ-চঞ্চল দিন, মায়ের স্নেহ আর শাসন; অধ্যাপকবৃন্দের উপদেশ; ছোটখাটো মান-অভিমান-ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব—বিচিত্র সেই দিনচিত্র।

চিন্তা ব্যাহত হ'লো। প্রত্যাশী মন হৈ হৈ ক'রে উঠলো। কই, কোনো পরিচিত মুখ তো হাসিমুখে তার প্রত্যাগমনে এগিয়ে এলো না এখনো। তার এই প্রত্যাবর্তন তো গ্লানিমুক্ত, অনাকাংখিত নয়। অথচ, সে আজ সাথী-হীন—একা। তবে—তবে কি টেলিগ্রাম পায় নি? অবশ্য দোষ ওরই। একেবারে শেষ সময়ে, পথে বেরিয়ে ও টেলিগ্রাম ক'রেছে। তাছাড়া বন্ধুত্ব রেখেছেই বা কার সংগে! এই সুদীর্ঘ চার বছরে কাকেই বা সে কটা চিঠি দিয়েছে। এমন কি মায়ের খবরাখবরই বা রেখেছে কই—মা কেমন আছেন কে জানে।—অবশ্য মাকে চিঠি দেওয়া খুব সার্থক মনে করেনি সঞ্জীব। কি হবে মাকে চিঠি দিয়ে! নিজে তো প'ড়তে পারেন না। অপরকে দিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে। পড়াতে গিয়ে কার বিরক্তি-ভাজন হবেন। তার চেয়ে—

এই মায়ের একান্ত আগ্রহই সঞ্জীবকে বিদ্যার্জনের প্রেরণা দিয়ে দেশান্তরিত হ'তে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। আজ সেই মাতৃমন্দিরে উপনীত হবে সে। দুটি নয়ন ভ'রে মাকে দেখবে। তাঁর কপোত আলিংগনে ধন্য হবে। কৃতার্থ হবে তার এই দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা। তৃপ্ত হবে তার পরিশ্রম। মাতৃস্নেহনিষিক্ত জীবনই তার পরম শ্রেয়। সেই মাতৃ-সন্নিধানে ফিরে আসছে সে। মনে মনে মাতৃমন্ত্র জপ করে সঞ্জীব। 'মা, মা'...কি মধুর, কি সুষমামণ্ডিত ধ্বনি! 'মা, মা'...

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘটলো ঘটনাটা।

সেই অনাকাংখিত, অবাঞ্ছিত ও ক্ষোভোদ্রেককারী ঘটনাটা,—যা তার উপচীয়মান উৎফুল্ল মানসিকতাকে অবদমিত করে দিলো।

একটা ট্যাক্সি ডাকলো সে। তার পা-দানে একটা পা দিয়েছে কি দেয় নি, এমন সময় এক পাগলিনী ভিখারিণী তার গতিরোধ ক'রলো: খোকা, ফিরে এলি বাবা। অমৃতনিস্যন্দী কথাটা কর্ণকুহরে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে তার প্রত্যাবর্তনশীল পুলকিত অন্তরকে তৃপ্ত ক'রলো। মাতৃহৃদয়ের স্নেহসুধা স্মরণ ক'রে বিনম্রকণ্ঠে সে উত্তর দিলো: হ্যাঁ, মা, ফিরে এলাম। প্রশ্রয় পেলো পাগলী। তার জামা ধ'রে আটকালো: তোর জন্যে আমি কতো দিন অপেক্ষা ক'রে আছি।

হি হি ক'রে হেসে উঠলো সর্বশরীর। ড্রাইভারটা কি ভাবছে। সঞ্জীবের মনে হ'লো আশপাশের লোকজন সব হাঁ ক'রে উপভোগ ক'রছে ব্যাপারটা। তা'রা বুঝি হাসছে। আর তাদের সেই হাসির মধ্যে প্রচ্ছন্ন র'য়েছে বিদ্রূপ। মুহূর্তে ঘটনাটা ঘটে গেলো। এক ঝটকায় ওকে সরিয়ে দিয়ে সঞ্জীব মোটরে উঠে বসলো। মোটর চলতে সুরু ক'রলো। পাগলীটাও গাড়ীর সংগে সংগে ছুটতে থাকলো। ব্যাকুল-ভাবে ডাকতে লাগলো: খোকা, খোকা—আমায় ফেলে যাস্ নি। শোন—

খিঁচড়ে গেলো মনটা। চলন্ত গাড়ীর সংগে ধাওয়া ক'রে আসতে লাগলো সেই শব্দ-তরংগ: খোকা, খোকা—শোন। এবং সঞ্জীবের চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকলো ভিখারিণীর আকুলতা। অথচ মায়ের মুখটা কিছুতেই মনে আনতে পারলো না। হায়, একি স্মৃতি-বিভ্রম! ভাবলো: দীর্ঘদিন মায়ের কোন খবর না নেওয়া একান্ত অনুচিত হয়েছে।

বিলম্ব অসহনীয় হয়ে ওঠে। ক্রমে ধৈর্যও তার চরম শিখরে উপনীত হলো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার মনের বিক্ষোভ শুরু হ'লো। চালকের প্রশ্নে সংবিৎ ফিরে পেলো। সামান্য একটু পথ বাকী। কিন্তু তবু সইছে না সঞ্জীবের। নেমে পড়লো ট্যাক্সি থেকে। হনহন্ ক'রে এগিয়ে চললো বাড়ীর দিকে।

'ভোঁ-ও-ও—পিপ্—পিপ্'—

সময় অতিক্রম ক'রে এগিয়ে যাবে সঞ্জীব,এমন সময় একটা পাঁচ ছ' বছরের ছেলে তার ছোট্ট দুহাতে একটা লাঠি হুইলের মতো ধ'রে মোটর-চালনার ভংগীতে এসে থমকে দাঁড়ালো ওর সামনে। শুধালো,: কাকে খুঁজছেন ?

তার কচি কণ্ঠস্বর ভারি মিষ্টি লাগলো সঞ্জীবের। ব'ললো : মাকে। আমার মাকে।—তুমি কোথায় থাকো ?

—এটা আমাদের বাড়ী।

—বটে! কদ্দিন আছো এখানে ?

ততক্ষণে এক বর্ষীয়সী মহিলা বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর সংগে প্রশ্নোত্তরে ও বিমূঢ় হ'য়ে পড়ে। এ কী শুনছে সে। এবাড়ী আর তাদের নয়! দেনার দায়ে নীলাম হ'য়ে গেছে! তাদের আত্মীয়-স্বজন তো কেউ নেই! তবে মা কোথায় ? মা—মা'র খবর তার কেউ জানে না। মা—মাগো!—

একছুটে সে বেরিয়ে আসে। সবে ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ীতে স্টার্ট দিয়েছে আর ও ফিরে আসে। আচ্ছন্নের মতো গাড়ীতে উঠে পড়ে। একটু এসে ড্রাইভার প্রশ্ন করে : কোথায় যাবো ? অস্ফুট কি একটা উত্তর দেয় সঞ্জীব বোঝা যায় না। ট্যাক্সি ফিরে আসে স্টেশনে। নেমে পড়ে সঞ্জীব। এগিয়ে চলে কাউন্টারের দিকে। ভাড়া চায় ট্যাক্সি-চালক। চমকে ওঠে সঞ্জীব। জ্রুত পার্স খুলে ভাড়া মেটায়। তারপর উদ্‌ভ্রান্ত-দৃষ্টি মেলে যেন কাকে খুঁজতে থাকে। দেখা হ'য়ে যায় সহপাঠী বন্ধু অমলের সংগে। অমল স্থানীয় হাসপাতালের ডাক্তার। কিছুতেই ছাড়লো না, সঞ্জীবকে টেনে নিয়ে গেলো ওর কর্মক্ষেত্রেই। সঞ্জীবও একটা প্রীতির অবলম্বন পেয়ে একটু স্বস্তি বোধ করে।

একটা ঘরে ওকে বসিয়ে অমল বেরিয়ে যায় রোগী-পরিদর্শনে। একটু স্বাভাবিক হ'তে চেষ্টা করে সঞ্জীব। খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে পড়তে থাকে। একসময় তার মধ্যে সে নিবিষ্টচিত্ত হ'য়ে পড়ে।

অমল ফিরে আসে। একজন কর্মচারী কিছু মিষ্টি এবং উভয়ের জন্যে সরবৎ এনে সামনে ধরে। সরবতের একটা গ্লাস টেনে নিয়ে অমল বলে, ওটুকু খেয়ে ফেল, সঞ্জীব। খেতে খেতে নানান্ গল্পে ওরা মেতে ওঠে।

এমন সময় একজন নার্স ছুটে আসে হন্তদন্ত হ'য়ে। একটু আগে যে পেশেন্টটি এসেছে, সে কি রকম ক'রছে। ডাক্তার তাকে টুকিটাকি উপদেশ দেন, সে চলে যায়। ডাক্তারও উঠে দাঁড়ায়। বলে : ভ্রান্তি! যত সব পাগলের আড্ডা হ'য়েছে এ শহরটা। ঘন্টাখানেক আগে স্টেশনের ধারে একটা পাগলী সবী চাপা প'ড়েছে। তাকে নিয়েই টানাটানি। রীতিমতো জখম হ'য়েছে। বাঁচবে না। তবু—অদ্ভুত একটা হাসি ফোটে অমলের মুখে।

কেন যেন মোচড় দিয়ে ওঠে সঞ্জীবের বুকটা। বলে : তোর সংগে যেতে পারি ?

অমল একটু বিস্মিত হয়, বারণ করে : সে বীভৎস দৃশ্য তুই দেখতে পারবি না, সঞ্জীব!

—তবু একবার দেখতে চাই। সঞ্জীবের কণ্ঠে কাকুতি।

বিস্ময় বাড়ে অমলের। কি ভেবে সে সম্মতি দেয় : বেশ,—আয়।

ওরা আসে পেশেন্টের কাছে। রক্তে মাখা রোগিনী। মাঝে মাঝে চমকে উঠে শূন্য-দৃষ্টি মেলে কাকে খুঁজছে। মৃদু অস্ফুটকণ্ঠে, 'খোকা, এলি'—ব'লে তারপর হতাশ হয়ে আবার জ্ঞান হারাচ্ছে। সঞ্জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হ'য়ে ওঠে। স্টেশনের সেই পাগলী। হ্যাঁ, সেই পাগলী। পাগলী ? না, এক পুত্র-বিয়োগবেদনাবিধুরা নারী। আর সে—

পাগলীটার আবার জ্ঞান ফিরে আসে। সঞ্জীবের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় তার মুখে একটা তৃপ্তির হাসি ফোটে। বলে : এসেছিস বাবা—

সঞ্জীবের উত্তেজনা তখন চরম সীমায়। নিজের মায়ের স্বরূপ সে প্রতিফলিত দেখে পাগলীর মধ্যে। কি জানি, হয়তো এই পাগলীই তার মা। আর তার জন্যেই এই দশা। থাকতে পারে না সঞ্জীব, 'মা, মাগো' ব'লে আকুলভাবে ডেকে উঠে জ্ঞান হারিয়ে সঞ্জীব সেই পাগলীর বুকে লুটিয়ে পড়ে।

গল্প হলেও সত্যি

—সচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী

১৮৯৪ সাল। এর মাত্র কয়েক মাস আগে আমেরিকার শিকাগো শহরে মহাসমারোহে 'বিশ্বধর্ম-মহাসভা'র অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে গেছে। 'হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে ভাষণ দিয়ে ভারতের এক গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসী সভায় সকলকে চমকিত করে দিয়েছেন। শুধু চমকিত করেছেন বললেও বোধহয় ঠিক বলা হয় না—যেন সমাগত সমস্ত দেশের প্রতিনিধিগণের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত দিয়ে নতুন একটা সুরের আলোড়ন তুলে দিয়েছেন—যে-সুরের মূর্ছনা দেশ থেকে দেশান্তরে অনুরণিত হয়ে চলেছে। সমগ্র বিশ্বের সুধী সমাজ যেন একটা নতুন চিন্তার অভূতপূর্ব আলোক-রশ্মির সন্ধান পেয়েছেন। বিশেষতঃ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যক্তিগণ যাঁরা তাঁর সাক্ষাৎ সান্নিধ্যলাভ করার বা তাঁর শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করার সৌভাগ্যলাভ করেছেন তাঁরা সকলেই নিজেদের ধন্য মনে করছেন। আবার যাঁরা অধিকতর গুণগ্রাহী তাঁরা ঐ সৌম্যদর্শন প্রজ্ঞাবান্ সন্ন্যাসীকে নিজেদের গৃহে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর প্রতি অন্তরের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও সমাদরের পরিচয় দিচ্ছেন। এই সময়েই শিকাগোর এক ধনী ব্যবসায়ীর আমন্ত্রণে ভারতীয় সন্ন্যাসী তাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। ঐ ধনী ব্যক্তিটির এক বিত্তশালী বন্ধু এবং তাঁরই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অংশীদার এই সন্ন্যাসীর কথা সহযোগীর মুখে কয়েকবার শুনেও বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। তাঁর মনের এই আপাতদৃষ্ট অনমনীয়তা ও সন্ন্যাসীর প্রতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে তিনি আর ঐ ভদ্রলোককে পুনরায় সন্ন্যাসী সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত করা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না।

কিন্তু কয়েকদিন অতিবাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। ভারতীয় সন্ন্যাসীর দর্শনলাভে অনিচ্ছুক সেই ভদ্রলোকটি একদিন নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন একটা অদৃশ্য শক্তির চালনায় বন্ধুর গৃহে এসে উপস্থিত হলেন এবং বাড়ীর পরিচারকদের দৃঢ় ভর্ৎসনা করে সেই হিন্দু সন্ন্যাসী ঐ গৃহের যে অংশটিতে অবস্থান করছেন সরাসরি সেখানে তাঁকে নিয়ে যেতে বাধ্য করলেন। সন্ন্যাসী তখন তাঁর নিভৃত পাঠকক্ষের টেবিলের অপর দিকে আসীন হয়ে অতিশয় নিবিষ্ট-মনে কি যেন লিখে চলেছেন। তাঁর কক্ষে যাঁকে নিয়ে যাওয়া হ'ল তাঁর উপস্থিতি তিনি আদৌ অনুভব করছেন না। এই দৃশ্য দেখে ভদ্রলোকটি খুবই বিস্মিত হলেন। তাঁর বিস্ময় আরও বেড়ে গেল যখন তিনি দেখলেন যে ঐ সন্ন্যাসী তাঁরই অতীত জীবনের অতিশয় গূঢ় কথা—যা কেবলমাত্র তাঁর নিজের ছাড়া আর সকলেরই নিকট অজ্ঞাত—এই রকম তথ্য তিনি প্রকাশ করে দিচ্ছেন। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তিনি সন্ন্যাসীর কথা-গুলি শুনলেন। সন্ন্যাসী তাঁকে স্পষ্ট-ভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে যে-ঐশ্বর্য তিনি পুঁজি করে রাখছেন তা কেবল তাঁর নিজের ভোগের জন্যই নয়—কেন না তিনি ঐ সম্পদের একজন নৈমিত্তিক অধিকারী মাত্র—এবং তাঁর কর্তব্য হবে এই সম্পদকে বহুমানুষের সেবায় নিয়োজিত করে সার্থক করে তোলা। কারণ ভগবান তাঁকে যে ধনী করেছেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য হল তাঁকে মানুষের হিতসাধন করার সুযোগ দেওয়া। নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করার এই উপদেশ শুনে ধনী ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি বিশেষ বিরক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং বিদায়কালীন শিষ্টাচার প্রদর্শন না করেই সেই স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন।

এক সপ্তাহ পার হবার আগেই তিনি আবার একদিন সন্ন্যাসীকে কোন খবর না দিয়েই তাঁর কক্ষে এসে প্রবেশ করলেন। পূর্বদিনের মত এদিনেও দেখলেন যে সন্ন্যাসী গভীর অভিনিবেশসহকারে লেখনী চালনা করছেন এবং ঐ ভদ্রলোকের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারছেন না। ধনী ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি কিন্তু কোনও ভূমিকা না করেই সন্ন্যাসীর টেবিলের ওপর কাগজের একটা মোড়ক ছুঁড়ে দিলেন এবং পরে জানালেন যে ঐটির মধ্যে তাঁরই প্রদত্ত প্রচুর অর্থ সাহায্যে একটি জনসাধারণের সংস্থার পরি-কল্পনার কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর সগর্বে সন্ন্যাসীকে শুনিয়ে বলতে থাকলেন: "এই নিন, এখন আপনি খুশী হলেন ত? এবার কিন্তু আমাকে আপনার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।" সন্ন্যাসী টেবিলের ওপর থেকে নড়াচড়া করলেন না, চোখও তুললেন না। কাগজের মোড়কটি কেবল তুলে নিয়ে শান্তভাবে পড়লেন

এবং তারপর বললেন : "আপনারই বরং উচিত হবে আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া।"

এই ভারতীয় সন্ন্যাসীই যে স্বামী বিবেকানন্দ তা নিশ্চয়ই প্রকাশের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এই ধনী ব্যক্তির পরিচয় কি তা উল্লেখ করার নিশ্চয় প্রয়োজন আছে। ইনি বিশ্ববিখ্যাত দানবীর জন ডি. রকফেলার।

স্বামিজীর কর্মবহুল সাধনজীবনের কথা দেশ বিদেশের অসংখ্য নরনারী ভক্ত ও সুধীবৃন্দ যখন আলোচনা ক'রে তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের আয়োজন করেন সেই শুভলগ্নে উপরোক্ত ঘটনার মর্মকথা উপলব্ধি করার বিশেষ তাৎপর্য আছে।

যে-সংস্থা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সমস্ত দেশের সভ্যতার উন্নয়ন ও হিতসাধনকল্পে প্রচুর অর্থ দান করে আসছেন সেই অতুলনীয় ও অব্যাহত বদান্যতার অন্তপ্রেরণার মূলে যে ভারতের একজন কপর্দকশূন্য সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ প্রেরণা ছিল তা চিন্তা করলে স্বভাবতঃই আজ আমাদের হৃদয় আনন্দ ও গর্বে ভরপুর হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য রকফেলার সাহেবকে আমরা ধর্মপ্রাণ বলে গ্রহণ করতে না পারলেও তাঁর পুঁজীবাদী যে মন স্বামিজীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শলাভ করে রূপান্তরিত হয়ে মহানুভবতার ও মানবকল্যাণের শুভকর্মে ও উচ্চ আদর্শে ব্রতী হয়েছিল তাকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারব না। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবন-দর্শনের মধ্যে স্বামিজীর ভিন্ন চিরকাল অলক্ষ্যে অনুস্যূত হয়ে আছে তার উল্লেখ করতেও বিরত থাকব না। তিনি বলেছেন : "অর্থ সঞ্চয়ন ছাড়াও জীবনের একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে। অর্থ আমাদের কাছে শুধু খোলামকুচি মাত্র। এর অপব্যবহার পাপের নামান্তর। অপরের সেবায় আত্মনিয়োগ করাই হল জীবনের প্রধান লক্ষ্য। আমি সেইভাবেই চলতে চেষ্টা করছি।"

রকফেলার সাহেবের এই উক্তি যদি আমাদের দেশের কোনও ধনী ব্যবসায়ীর প্রাণে কিছুটা সাড়াও জাগাতে পারে তাহলে ঊর্দ্ধলোক থেকে স্বামিজীর অমর আত্মার আশীর্বাদ তাঁর ওপরও যে বর্ষিত হবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

—শ্রীসুজিৎকুমার ঘোষ

মহাকাশ সমীক্ষা

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র-সমেত মহাকাশযান মহাশূন্যে পাঠানো হয়েছে। এখন তা পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। তার কাজ বহির্বিশ্বে গ্রহ-তারকাগুলির আসল রূপ পর্যবেক্ষণ করা। বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস, পৃথিবীর বায়ুস্তরের এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যার মধ্য দিয়ে গ্রহ-তারকাসমূহের রূপ মানবদৃষ্টিতে বিকৃতভাবে উপস্থিত হয়। সুতরাং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বে উঠে সেগুলি দেখবার ব্যবস্থা হলে প্রকৃত রূপটি দেখা যাবে।

মহাকাশযানটি মানব চালিত নয় —পৃথিবী থেকে সেটি পরিচালিত হচ্ছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানাবিধ সরঞ্জামের সমন্বয়ে একটা সম্পূর্ণ মানমন্দির শূন্যে তুলে দেওয়া হয়েছে। গত মাসেই এই মানমন্দির প্রেরণের পরিকল্পনা জানা গিয়েছিল। তখনই প্রচারিত হয়েছিল যে, ছায়াপথ বা অন্য উৎস হতে যে মহাজাগতিক রশ্মি বহির্বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে তার রহস্য উদ্ঘাটন করা এই মহাশূন্যের মানমন্দিরের কাজ হবে এবং তা থেকে বহির্বিশ্বের সৃষ্টি ও বিবর্তনের সন্ধান পাওয়া যাবে। এছাড়া, যে আলো ও বেতার-তরঙ্গ অবিরাম পৃথিবীতে আসছে তারও সন্ধান হবে।

জানা গেছে, মানমন্দিরটি তার কাজ সুষ্ঠুভাবে করে চলেছে। যা-কিছু পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন, পৃথিবীর নির্দেশ মত তা দেখে নিয়ে তার তথ্যাদি এখানে পাঠানো হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে অনেক সত্য আবিষ্কৃত হবে।

A New Theory in Physics নামে একটি নবপ্রকাশিত গ্রন্থে শ্রীঅপূর্ব চৌধুরী পদার্থতত্ত্বের রূপবৈচিত্র্য ও তার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে লিখেছেন, পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা বিরাট বিশ্বের সঠিক রূপটি এখনো খুঁজে পাননি, এমন হাতিয়ার তাঁদের তৈরী করতে হবে যাতে আমাদের বৈজ্ঞানিক ধারণা সঠিক হতে পারে। অবশ্য তিনি গাণিতিক সমীকরণের সংকেত ব্যবহার উপর জোর দিয়েছেন। শ্রীচৌধুরীর এই মতবাদ নাকি পাশ্চাত্ত্যের বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক

সামরিক সামর্থ্য ও দম্ভে স্ফীত মহাচীন যে শীঘ্রই একদিন আক্রমণ করে বসবে এমন ধারণা অনেকেই পোষণ করছেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের অনেক বিশেষজ্ঞের নাকি অভিমত যে, ভারতকে কাবু করবার মত সামরিক শক্তি চীনের নাই। আবার আমেরিকার সঙ্গে তার এমন একটা সাপে-নেউলে সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে যে অন্য দিকে ক্ষুধিত দৃষ্টি দেবার অবসর তার নাই, এখন যে-সমস্ত আস্ফালন তার চলছে তা শুধু স্নায়ু-যুদ্ধের মহড়া।

এক বিশেষজ্ঞের মত, চীন কোথাও কোন বৃহৎ আক্রমণ করবে না, এমন কি আমেরিকার উপরেও নয়। আর একটি দল বলেন, আমেরিকাও চীনের সঙ্গে সোজাসুজি যুদ্ধ করবে না। অন্ততঃ দশ বৎসর উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হবে না, অনেকের বিশ্বাস। আমেরিকার হিসাবে, বিমান, সমুদ্র ও স্থলে চীনের সৈন্য-সংখ্যা ২৭ লক্ষ, আমেরিকার ২৮ লক্ষ ও রাশিয়ার ৩২ লক্ষ। সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর অনুরূপ চীনের মিলিশিয়ার সংখ্যা প্রায় এক কোটি। চীনের ১৫০ ডিভিসন সৈন্যদলের মধ্যে ৪।৫টি মাত্র আর্মার্ড, ২।৩টি বিমান ও ৩টি অশ্বারোহী। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তাইওয়ানের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য সে ১০ লক্ষ সৈন্য মোতায়েন রেখেছে, ভিয়েতনাম, লাওস ও ব্রহ্ম-সীমান্তে ৩।৪ লক্ষ, ভারত-সীমান্তে ৭৫ হাজার। এছাড়া, পিকিঙ অঞ্চল ও মঙ্গোলিয়ায় ৫ লক্ষ এবং সোভিয়েত সীমান্ত, সিঙ্কিয়াঙ ও মাঞ্চুরিয়ায় তার ৪½ লক্ষ সৈন্য আছে। স্থলসৈন্যের কাছে অটোমেটিক রাইফেল, সাবমেশিনগান, মর্টার ও রকেট ভালভাবেই আছে, তবে ট্যাঙ্ক প্রয়োজনানুরূপ নয়। বিমানবাহিনীতে আছে সওয়া লক্ষ সৈন্য, ৪টি ডেস্ট্রয়ার, ৪টি যুদ্ধজাহাজ ৩০।৪০টি সাবমেরিন ও ৭০০ ছোট জাহাজের বাহিনী। বিমানবাহিনীতে আছে ১৬০০ জেট যুদ্ধবিমান, ৩০০ বোমারু ও ৭০০ অন্যান্য বিমান। এ-সব দিক দিয়ে আমেরিকার শক্তি-সামর্থ্য বহুগুণ বেশী।

কিন্তু স্থলযুদ্ধে সে চীনের মত অমিত-বিক্রম নয়। আমেরিকারই সামরিক নেতৃবৃন্দ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেতাদের সকল সময়ের স্থলযুদ্ধে চীনের সঙ্গে মোকাবিলা করতে নিষেধ করছেন। একটা প্রধান কারণ গেরিলা যুদ্ধে চীন অদ্বিতীয় এবং সম্মুখযুদ্ধে সে তার অপরিমিত জনসংখ্যার সুযোগ গ্রহণ করে। বিগত ভারত আক্রমণের সময় এর নজীর পাওয়া গেছে।

ইউরোপের জিপ্‌সী রাজা

সম্প্রতি পশ্চিম ইউরোপের রাজ্য-হীন জিপ্‌সীদের একচ্ছত্র রাজা ক্রিস্‌টিয়ান মভেস্ট-এর মৃত্যু হয়েছে। আর একজন জিপ্‌সী রাজা অকুটাভে পেটেরোস জীবিত আছে। কিছুকাল আগে বেলজিয়ামে মভেস্ট অসুস্থ হয়ে পড়ে, আর সেই খবর পেয়ে ইউরোপের নানা দেশ থেকে জিপ্‌সী বেদের দল এসে বেলজিয়ামের লুভাঁ শহরে জমায়েত হতে থাকে। বহু ক্যারাভান, ঘোড়া, ভাঙ্গা গাড়ী ও তাঁবুতে লুভাঁর চারপাশ ভরে যায়। মভেস্ট ছিল হাসপাতালে। সেখানে জিপ্‌সীরা ঢুকতে যায় কিন্তু পুলিশ তা করতে দেয়নি। জিপ্‌সী বেদেরা হাসপাতালের দরজা ভাঙবার চেষ্টা করেও সফল হয়নি। এদিকে মভেস্টের মৃত্যু হলো। জিপ্‌সীদের রীতি, কোন মুমূর্ষু রাজার হাত যে আগে গিয়ে ধরে থাকতে পারবে সে-ই হবে রাজ-উত্তরাধিকারী। এবারে তা আর সম্ভব হলো না। মভেস্টের মৃতদেহ স্বর্গে পাঠানো হলো। একান্ত হতাশার মধ্যে জিপ্‌সীরা স্থির করলো, এবার আর তাদের রাজা থাকবে না। বলা বাহুল্য, অপর রাজা পেটেরোস এখন হতে সারা ইউরোপের জিপ্‌সীদের একচ্ছত্র অধিপতি হলো।

আমেরিকায় কবির লড়াই

আমাদের দেশে বিশেষতঃ বাঙলায় কবির লড়াইএর একটা ঐতিহ্য আছে। এ-রকম কবির লড়াই আজকাল আমেরিকায় হচ্ছে। কিছুকাল আগে নিউ ইয়র্কে বীট কবিদের কবিতা পরিষদের এক বৈঠকে পিতা-পুত্রে কবির লড়াই হয়েছে। পিতা প্রখ্যাত বীট কবি লুই গীন্‌সবার্গ, সত্তর বছর তাঁর বয়স—পরিচ্ছন্ন পোশাক, সৌম্য চেহারা, কেতাদুরস্ত ভদ্রব্যবহার। এখন ছন্দে মিল রেখে তিনি কবিতা লেখেন। অপরপক্ষে পুত্র অ্যালেন গীন্‌সবার্গ বিশ্ববিখ্যাত বীট কবি। এই তরুণ কবির পোশাক ও আচার আচরণে পরিচ্ছন্নতা নাই। এক-মুখ দাড়ি গোঁফ, বিপর্যস্ত চুল ও ছেঁড়া পোশাক। কবিতায় ছন্দ মিলের বালাই নাই, কোন রচনাশৈলীর রীতি নাই।

'কবিতার ছন্দে হাস্য-বিদ্রূপের মধ্যে পিতা আক্রমণ করলেন পুত্রকে ও তরুণ বীটদের—ছেলের রচনাকে যথেষ্ট ব্যঙ্গ করা হলো, তার আচার, বেশভূষা ও অপরিচ্ছন্নতাকে কটাক্ষ করা হলো। তিনি বললেন, Not every beard is a bard, but with Allen, it grows on you. পুত্র উত্তর দিতে উঠলেন, তাঁর কোমরে মোটা দড়িতে বাঁধা অনেকগুলি ঘণ্টী সুমধুর ধ্বনিতে বেজে উঠল। তিনি কিন্তু পিতাকে আক্রমণ করলেন না, তরুণ বীটদের পক্ষে একটি কথাও বললেন না। শুধু স্নিগ্ধ ও গভীরকণ্ঠে নিজের মা'র উপর রচিত একটি কবিতা পাঠ করলেন। শ্রোতারা তাঁর কাছে অনেক কিছুই আশা করেছিল, কিন্তু কিছুই পেলো না। তারা নিরাশ হলো।' তাদের মধ্যে একজন মহিলা শুধু বলে উঠলেন—আহা, ছেলেটার মুখ কি কোমল।

ইংলণ্ডের সর্বপ্রধান নরহত্যাকারী

ইংলণ্ডের সর্বাধিক কুখ্যাত নরহত্যা-কারীর নাম জ্যাক্ দি রিপার। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে সে যত হত্যালীলা ইংলণ্ডে করেছিল ব্রিটিশ ইতিহাসে তার তুলনা নাই। লণ্ডনের পুলিশকে সে গর্বভরে লিখে জানাতো, পরবর্তী হত্যাকাণ্ড কোথায় অনুষ্ঠিত হবে। সে যথেষ্ট কৌশলী ছিল, যেখানে সে তার হত্যালীলা চালাবে তার কথা না বলে অন্যত্র মিথ্যা হদিশ দিয়ে সে পুলিশকে বিভ্রান্ত করতো। বিশেষতঃ লণ্ডনের ইস্ট এণ্ড-এ বারবনিতাদের সে বেশী হত্যা করেছিল।

জ্যাক্ দি রিপারের পুলিশকে লেখা চিঠিগুলি স্যাকাবার পত্রাবলী নামে প্রসিদ্ধ। একজন গবেষকের অনুসন্ধানে লণ্ডনের একটি হাসপাতাল হতে এরূপ অনেক পত্র আবিষ্কৃত হয়। সম্প্রতি মেডিকাল ছাত্রদের দ্বারা এই চিঠিগুলি সর্বপ্রথম লণ্ডনের হস্‌পিট্যাল গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। তৎকালীন নিশান-শাস্ত্রজ্ঞদের জ্যাকের দ্বারা নিহত নারীদের সম্পর্কিত রিপোর্ট হতে এবং হাসপাতালের অন্যান্য সূত্রে যে সমস্ত তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকে জানা যায়, এই সমস্ত হত্যাকাণ্ড যেমন নারকীয় তেমনি বীভৎস। আশ্চর্য যে, এমন একটি সমাজের কলঙ্কস্বরূপ হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি—ইতিহাসে জ্যাক দি রিপার রহস্যময় হয়ে আছে। জ্যাকের স্যাকাবার পত্রগুলির যথেষ্ট ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে বলে প্রকাশ।
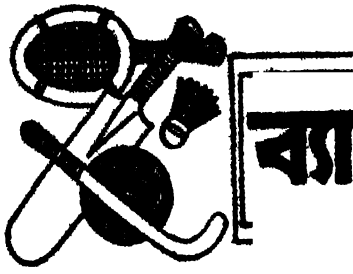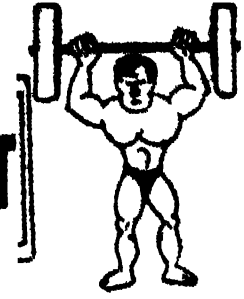
—শ্রীখেলোয়াড়

খেলার মাঠে দুর্নীতি

দুর্নীতি সংক্রামক ব্যাধির মতন সবসময় ছড়িয়ে পড়ে। একবার শুরু হলে তাকে প্রতিরোধ করাও সহজ-সাধ্য হয় না। তা'ছাড়া এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলাও সময়-সাপেক্ষ। পশ্চিমবঙ্গের খেলাধূলার আসরে এই দুর্নীতি দিনের পর দিন ছড়িয়ে পড়ছে এবং ক্রমশঃ ব্যাপক হয়ে উঠছে।

এই দুর্নীতি দ্বিমুখী। প্রথমতঃ ক্লাব-পরিচালকরা দুর্নীতিগ্রস্ত হতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ দর্শকরা দুর্নীতিকে আশ্রয় করতে পারেন। এর মধ্যে পরিচালকরা দুর্নীতিপরায়ণ হলে খুব শীঘ্রই ক্লাবটীর পরমায়ু শেষ হয়।

নানা খাতে অর্থের অপচয় ঘটিয়ে কিংবা সোজাসুজি তহবিল তছরূপ করে এক শ্রেণীর ক্লাব-পরিচালকরা দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। এঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রশংসার যোগ্য। সাধারণ সভ্য এবং খেলোয়াড়-মহলে এঁরা এত বেশী জনপ্রিয় যে বছরের পর বছর এঁরাই পরিচালক গোষ্ঠীতে স্থানলাভ করেন। বার্ষিক অডিট করা হিসাবের মধ্যেও কারচুপি করতে এঁদের অসুবিধা হয় না। বছর দুয়েক হল কর্তব্য কর্মে অবহেলা করবার জন্য এবং যার ফলে আই-এফ-এ'র আশী হাজার টাকার তহবিল তছরূপ হয়েছিল—এই দায়ে আই-এফ-এ'র মাহিনা-করা সচিব চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। মাননীয় আদালত তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তছরূপের টাকা ত' তাঁর কাছ থেকে আদায় হয়ই নি—উপরন্তু আই-এফ-এ'র কাছে তাঁর প্রাপ্য হাজার চল্লিশেক টাকাও তাঁকে তাড়াতাড়ি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভদ্রলোকের প্রভাব কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। তিনি এখনও একটা কেন্দ্রীয় সংস্থার সভাপতি। তা'ছাড়া এবছর আই-এফ-এ'র বিভিন্ন দপ্তরে তিনি নিজের লোকদের ঢুকিয়ে দিয়েছেন। দলাদলিকে যত জীইয়ে রাখা যায় এইসব দুর্নীতিগ্রস্ত পরিচালকদের ততই সুবিধা। বড় ক্লাব হলে ছোট ছোট কয়েকটা ক্লাব নিয়ে তাঁরা দল তৈরী করেন। তাঁদের মধ্যে সমঝোতা থাকে। দরকার পড়লে এঁরা বড় দলের কথা শুনে পকেট ছাড়েন, সভায় হাত তোলেন। এই ক্লিক বা চক্রের ছড়াছড়ি আজ গড়ের মাঠে। সব চেয়ে বেশি দুর্নীতি চলে চ্যারিটি খেলার টিকিট নিয়ে। কলকাতার সব ক্লাবের জন্য এক একটা কোটা নির্দিষ্ট আছে। চ্যারিটি ম্যাচের আগে তাঁরা সেই কোটা অনুযায়ী টিকিট পান। কিন্তু সেই সাধারণ টিকিটে দল বা প্রভাব রাখা যায় না। ফলে তাঁরা ছোটেন গুপ্ত-চক্রের কাছে। সেখানে মাথা ও সম্মান বিকিয়ে তাঁরা টিকিট ক্রয় করেন। এ-ও দুর্নীতি। দুষ্ট লোকেরা অবশ্য বলাবলি করে যে, চ্যারিটি খেলার মাতব্বররা কালো-বাজারের দরে টিকিটের লেন-দেন করার কাজে সাহায্য করে থাকেন। অবশ্য এর কোন প্রমাণ নেই। তবে যা রটে তার কিছু ত বটে।

দর্শকরা দুর্নীতিপরায়ণ হন নিজেদের ক্লাব-প্রীতি বজায় রাখার জন্য। আজকাল ত' সমর্থনশক্তির মূল্য অনেক। দর্শকরাও তা' বোঝেন। তাই প্রিয় ক্লাব খেলায় হেরে গেলে কিংবা রেফারির সিদ্ধান্ত ক্লাবের বিপক্ষে গেলে তাঁরা রে-রে করে তেড়ে মাঠে নেমে পড়েন। অস্ত্র তাঁদের ইট, সোডার বোতল আর ছেঁড়া জুতো। খেলার মাঠে তাঁরা তুলকালাম বাধিয়ে বসেন। গায়ের জোরে কিংবা সমর্থনশক্তি দ্বারা খেলার ফলাফল নিজেদের অনুকূলে আনবার প্রচেষ্টা নিশ্চয় দুর্নীতির একটা অঙ্গ।

খেলার মাঠগুলো থেকে এ-ধরনের দুর্নীতি অচিরে দূর করা প্রয়োজন। কারণ, দুর্নীতি অবনতিরই সহায়ক।

আগা খাঁ ট্রফি

ভারতের অন্যতম প্রাচীন হকি প্রতিযোগিতা হচ্ছে বোম্বাইএর আগা খাঁ হকি ট্রফি। এটির বয়স এখন একাত্তর। প্রতি বছর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে শক্তিশালী হকি

দলগুলো এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। এ-বছর কলকাতার কোন দল আগা খাঁ হকিতে সুবিধা করতে পারেনি। পাঞ্জাব পুলিশ আর ইণ্ডিয়ান নেভি দল ফাইন্যালে উঠেছিল। পাঞ্জাব পুলিশ দলে অনেক অলিম্পিক হকি খেলোয়াড় খেলে থাকেন। বিগত দু'বছর পাঞ্জাব পুলিশ দল আগা খাঁ ট্রফি লাভ করেছে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, ইণ্ডিয়ান নেভি দল ফাইন্যালে নবাগত।

প্রথম দু'দিনের ফাইন্যাল খেলায় পাঞ্জাব পুলিশ বিজয়ী হতে পারেনি। নবাগত ইণ্ডিয়ান নেভি দল শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সঙ্গে সমান সমান লড়াই চালিয়েছিল। পাঞ্জাব পুলিশ দলের পাঁচজন শক্তিধর খেলোয়াড় ভারতীয় হকি দলে স্থানলাভ করে বিদেশ সফরে গিয়েছেন। দল তাই কিছুটা শক্তিহীন। তৃতীয় দিনে অবশ্য পাঞ্জাব পুলিশ দল ভাল খেলে বিজয়ী হল। প্রাক্তন অলিম্পিক খেলোয়াড় উধম সিং অনবদ্য ক্রীড়ার নজীর স্থাপন করে দলকে বিজয়ী হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। দলের একমাত্র গোল দিয়েছিলেন রাইট আউট মদনমোহন সিং।

এই বিজয়ের ফলে পাঞ্জাব পুলিশ দল নূতন নজীর স্থাপন করেছে। ভারতীয় দলগুলোর মধ্যে চতুর্থ দল হিসাবে পাঞ্জাব পুলিশ পর পর তিনবার আগা খাঁ ট্রফি লাভ করল।

ক্রিকেট লীগ চ্যাম্পিয়ান

মোহনবাগান দল এ-বছরও ক্রিকেট লীগের সিনিয়র ডিভিসনে চ্যাম্পিয়ানসীপ অর্জন করল। এর আগে একটানা চার বছর ধরে মোহনবাগান দল লীগে বিজয়ী হচ্ছে।

খেলা ছিল মোহনবাগান ও বি এন আর দলের মধ্যে। কলকাতার গড়ের মাঠে সাম্প্রতিক কালে মোহনবাগান দলের যোগ্য প্রতিপক্ষ হচ্ছে বি-এন আর দল। ফুটবল হকি ক্রিকেট প্রত্যেকটি খেলায় এই দুটি দলের খেলায় মাঠে যথেষ্ট উদ্দীপনা ও উৎসাহের এবং মাঝে মাঝে উত্তেজনারও সৃষ্টি হচ্ছে। এই ত এ-বছরই মোহনবাগান দলকে এক পয়েণ্টের ব্যবধানে হারিয়ে বি-এন-আর দল হকি লীগ বিজয়ী হয়েছে।

বৈশাখের রুদ্র দিনে উন্নত ধরনের ক্রিকেট খেলা সম্ভব নয়। তবু বি-এন-আর দল উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বিরত হয়নি। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বি-এন-আর দল সব উইকেট হারিয়ে ২৭৩ রান করে। সুজিত বসুর ৭৪ রান এবং কল্যাণ ঘোষের ৬৪ রান উল্লেখযোগ্য। মোহনবাগান দলের তরুণ বোলার অলি সরকার ২৭ রানের বিনিময়ে ৫টি উইকেট লাভ করেন। মোহনবাগান দলের ব্যাটস্‌ম্যানরা ভাল খেলে নয় উইকেটে ২৭৪ রান কুড়োন। উঠতি ব্যাটস্‌ম্যান্ সেখ মুস্তাফি সেঞ্চুরি করেছেন (১২৫ রান)। বি-এন-আর দলের এস কুণ্ড, এস. ঘোষাল এবং পি. বসু প্রত্যেকে দু'টি করে উইকেট লাভ করেছেন।

এ বছর সি-এ-বি পরিচালিত নক-আউট ক্রিকেটে বিজয়ী হয়েছে স্পোর্টিং ইউনিয়ন দল। দ্বিতীয় ডিভিসন ক্রিকেট লীগে বিজয়ী হয়েছে ইষ্টার্ন রেল দল। আর বি এন-আর দল নক-আউট ও সিনিয়র ডিভিসন লীগে রানার্স আপ লাভ করেছে।

অভিনয় উৎসারণা

চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার

প্রতি বছর কেন্দ্রীয় সরকার চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভিত্তিতে গঠিত কমিটি-গুলি বিভিন্ন অঞ্চলের ছবিগুলি সম্পর্কে সুপারিশ করে থাকেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সংবাদে জানা যায়—এ বছর বাংলাদেশ থেকে যে দুটি ছবি সর্বভারতীয় পুরস্কারের মনোনয়ন লাভ করেছে সে দুটী হ'ল "অতিথি" (পরিচালনা: তপন সিংহ) এবং "আকাশ কুসুম" (পরিচালনা: মৃণাল সেন)। আঞ্চলিক পুরস্কারের সুপারিশ পেয়েছে—"রাজা রামমোহন" এবং "সুবর্ণরেখা।"

নির্বাচিত বা পুরস্কৃত ছবি সম্পর্কে ভিন্নমত থাকা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু যখন এই নির্বাচন সর্বপ্রকার সীমার বাইরে চলে যায় তখনই সদস্যদের উপযুক্ততা বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয়। এ বছরের "অতিথি" সম্পর্কে আমাদের কিছু বলার নেই কিন্তু অন্য তিনখানি ছবি সম্পর্কেই আমরা ভিন্নমত পোষণ করি। কারণ এ বছর আরও এমন কয়েকখানি ছবি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল যেগুলি ঐ নির্বাচিত তিনখানি ছবি অপেক্ষা সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। প্রসঙ্গতঃ "কাচকাটা হীরে" এবং "একই অঙ্গে এতরূপ" ছবি দুখানির নাম করা যেতে পারে।

যে সব সদস্যরা আঞ্চলিক কমিটিতে মনোনীত হন, তাঁদের যোগ্যতা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কোনরূপ অনুসন্ধান করেন কি? এখানে যোগ্যতা বলতে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ছাপ' নয়—এ যোগ্যতা হ'ল ছবি বুঝবার ক্ষমতা। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয়, এবছর কোনও চিত্র-সাংবাদিককে উক্ত কমিটিতে গ্রহণ করা হয়নি অথচ ছবির মান নির্ণয়ে চিত্র-সাংবাদিকদের ক্ষমতা অনস্বীকার্য। তাছাড়া এই কমিটিতে এমন একজন সভ্য রয়েছেন যার কন্যা প্রতিযোগী দুখানা ছবিতে নায়িকা চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন। দুখানি ছবিই আঞ্চলিক কমিটির প্রাথমিক নির্বাচনে স্থানলাভ করে। নৈতিক বিচারের দিক থেকে এরূপ ব্যক্তিকে সদস্যরূপে মনোনীত করা ঠিক হয়েছে কি?

কোন্ অদৃশ্য শক্তির সুপারিশে এইসব সদস্যদের নির্বাচিত করা হয়—আমরা তা জানি না। কিন্তু বিস্ময় লাগে এই ভেবে যে বাংলাদেশে ছায়া-ছবির মান সর্বশ্রেষ্ঠ হলেও কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত আঞ্চলিক কমিটির চলচ্চিত্র-জ্ঞান সে পর্যায়ে পৌঁছুতে পারে না।

আমরা মনে করি এ বছরের এই নির্বাচন প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। এ নির্বাচন নাকচ করে নতুন কমিটি গঠন করা হোক এবং প্রতিযোগিতা নতুনভাবে আহ্বান করা হোক।

—'শর'

রাষ্ট্রীয় পুরস্কার সংবাদ

নিউদিল্লী থেকে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায় যে এ বছর সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেছে মলয়ালম্ ভাষায় নির্মিত ছবি "ছিম্মিন"। রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক উক্ত ছবিকে প্রদান করা হবে। কেরলের একজন ধীবরের জীবন কাহিনী নিয়ে রচিত একখানি জনপ্রিয় উপন্যাস এ ছবির বিষয় বস্তু।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে বাংলা ছবি "অতিথি"। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন তপন সিংহ।

সংবাদে আরও জানা যায় যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে একখানি হিন্দী ছবি। এই পুরস্কারগুলি ১৯৬৫ সালের জন্য দেওয়া হবে এবং এ-বিষয়ে সরকারী ঘোষণা শীঘ্রই জানা যাবে।

আজকের ছবি

এ সপ্তাহে দুখানি বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করছে। একখানি হ'ল সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "নায়ক" এবং অপরখানি কনক মুখার্জী পরিচালিত "মায়াবিনী লেন"।

নায়ক

আর ডি. বনশল প্রযোজিত "নায়ক" সত্যশ্রষ্টা সত্যজিৎ রায়ের সর্বাধুনিক সৃষ্টি। পর্দার বুকে যে নায়ক ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করেন—পর্দার

অন্তরালে তাঁর বিক্ষুব্ধ জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনা ঘটার অপরূপ স্পর্শে দর্শকের সামনে উপস্থিত হবে। "নায়ক" ছবির নায়ক চরিত্রে রূপদান করেছেন বাংলা ছবির অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক উত্তমকুমার। অন্যান্য ভূমিকায় রয়েছেন শর্মিলা ঠাকুর, ভারতী দেবী, সুমিতা সান্যাল, বমুনা সিংহ, সুস্মিতা মুখার্জী, লালি চৌধুরী, প্রেমাংশু বোস, বীরেশ্বর সেন, সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, সৌমেন বসু, রণজিৎ সেন, কামু মুখোপাধ্যায়, গোপাল দে, যোগেশ চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র প্রভৃতি। শ্রীরায় এ ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন এবং তিনিই এ ছবির সুরকার। ছবিখানির পরিবেশক আর. ডি. বি এণ্ড কোং।

'নায়ক' ছবির মহিলা সাংবাদিক 'অদিতি সেনগুপ্ত' চরিত্রে শর্মিলা ঠাকুর।

মায়াবিনী লেন

কণক মুখার্জী প্রযোজিত "মায়াবিনী লেন" একটী সমাজচিত্র। কাহিনী রচনা ও পরিচালনা করেছেন প্রযোজক স্বয়ং। সুরসৃষ্টি করেছেন অমল চ্যাটার্জী। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন সন্ধ্যারাণী, সুলতা চৌধুরী, কল্যাণী, বিকাশ রায়, অনুপকুমার, নির্মলকুমার, কালী ব্যানার্জী, পাহাড়ী সান্যাল, ভানু ব্যানার্জী, জহর রায়, প্রবীরকুমার, নৃপতি চ্যাটার্জী, সুখেন দাশ, শক্তর প্রভৃতি। পরিবেশক: বিজয়া ফিল্মস্ এন্টারপ্রাইজ।

বৃন্দাবনধামে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

এবার বৃন্দাবনধামে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ৩১তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মূল সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাতনামা সংবাদপত্রসেবী ও সাহিত্যিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। বিগত ৮ই বৈশাখ অপরাহ্ণে তিন দিনব্যাপী সুবিখ্যাত রঙ্গনাথজীর মনোরম উদ্যান-মন্দিরে এই অখিল ভারতীয় সম্মেলন আরম্ভ হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে বহু সাহিত্যিক ও প্রতিনিধি এতে যোগ দিয়েছিলেন।

এবারকার অধিবেশন আড়ম্বরপূর্ণ হলেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হবে না এরূপ আশঙ্কা আমাদের পূর্বাহ্ণেই হয়েছিল। বৈশাখের এই প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যে বৃন্দাবনে সম্মেলনের অনুষ্ঠান করা কতটা সমীচীন হয়েছে জানি না, তবে বরাবরের সময়ের ধারাটি ব্যাহত হওয়ায় আমরা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম। বৃন্দাবন বা ব্রজভূম পরম তীর্থস্থান—বহুকাল ধরে এখানকার সঙ্গে বাঙালীর একটা অন্তরের যোগসূত্র আছে। গ্রীষ্মের প্রখরতা না থাকলে অন্যান্য বারের মত এবারও যে সম্মেলন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতো সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন লালাবাবুর বংশধর শ্রীজগদীশ চন্দ্র সিংহ। সাহিত্যে শান্তি ও সুষমার যে বাণী অন্তর্নিহিত আছে তার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উল্লেখ করেন। সভার উদ্বোধন করবার কথা ছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিংএর, তিনি উপস্থিত হতে না পারায় শ্রীসিংহের উপর এই ভার পড়েছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি আচার্য শ্রীবিশ্বম্ভর গোস্বামী তাঁর ভাষণে বলেন, বাঙলাদেশ ও বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনধামের যোগ খুবই নিবিড় ও অনেকদিনের। মহাপ্রভুর আগেও এই যোগাযোগ ছিল, তবে তাঁর আবির্ভাবের পর বৈষ্ণবধর্মের জনপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তা সুদৃঢ় হয়েছে। স্থায়ী সভাপতি শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশও মহাপ্রভুর অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, মহান্ বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রধান প্রেরণাদাতা শ্রীচৈতন্য। সেই সাহিত্যের উৎকর্ষে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের উর্বরতা এনেছে। মূল সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ তাঁর অভিভাষণে সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয় সংহতি-সাধনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী উপস্থিত হতে পারেননি, তাঁর প্রেরিত ভাষণে বলা হয়েছে যে, বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন ভারতীয় জনগণের এক বিরাট অংশে ধর্মীয় ও কাব্যানন্দে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে এবং যার ভাবধারা ও রসলোক বাঙলা-সাহিত্যকে মহিমান্বিত করেছে, সেই বৈষ্ণবদর্শনের পীঠভূমি বৃন্দাবনে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান হওয়ার তাৎপর্য আছে। ভারতের জনসমাজ এখন ঐতিহাসিক বিবর্তনের তীর্থযাত্রী। বর্তমান জগতের প্রগতিতে জনগণের ভাব ও আদর্শের বেদনাগুলিকে রূপ দেওয়াই এখন সাহিত্যিকের কর্তব্য। সম্মেলন শান্তিকামী সাহিত্যিকের চিন্তার পথ প্রশস্ত করবে। বর্তমানের বিজ্ঞান ও শিল্পপ্রগতির সঙ্গতি নিয়ে প্রগতি-পন্থীরা সাহিত্যের বিচার করবেন।

পরলোকগত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের জন্মশতবার্ষিকীও সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দুটি সভায় যথাক্রমে সভাপতিত্ব করেন এলাহাবাদের শ্রী বি. এন. পাণ্ডে এবং কলিকাতার শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়।

রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে ত্রুটি

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর আঠারো বছর পার হয়ে গেছে। বিদেশী শাসনের অবসানে জাতীয় সরকার শাসনকার্য পরিচালনা করছেন। দিল্লীর তখ্‌ত্‌-এ ও রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসরাজ বহাল-তবিয়তে বিরাজ করছেন। ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের সমাপ্তি ঘটেছে, তার স্থানে স্বদেশী আমলাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক কল্যাণ-রাষ্ট্রে বহু বিঘোষিত কল্যাণের দাপাদাপি আছে; ভারতের প্রশাসন-ব্যবস্থায় বিচ্যুতি হচ্ছে—আইনসভাদের বক্তৃতায় দিকবিদিক আলোড়িত হচ্ছে। ভারতের বিরাট

নিম্ন ও মধ্যবিত্ত সমাজের জনসাধারণ এমন সৌভাগ্যের মধ্যেও ভ্রান্তিবিলাসে মগ্ন, তাই তাদের প্রাণান্ত হবার উপক্রম। সরকারী মহলে মন্ত্রণা হয় অনেক, কিন্তু তার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় সাধারণ জনসমাজকে। প্রশাসনিক স্তরে পদদের সীমা-পরিসীমা নাই, কিন্তু উর্ধ্ব হতে নীচ সকল স্তরের আমলার আত্মমহিমা অনেক—অপরে স্বীকার না করলেও নিজেরা তাঁরা মনে করেন।

এদিকে সংসদের এষ্টিমেট্‌স কমিটী যে রিপোর্ট পেশ করেছেন তাতে বলা হয়েছে, ব্রিটিশ আমলে যা ছিল পুলিশীরাষ্ট্র, এখন তা কল্যাণরাষ্ট্র বটে কিন্তু প্রশাসন-ব্যবস্থায় কল্যাণজনক আদর্শ সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়নি। আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই নীতি চলতে থাকলে উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হবে এবং তার ফলে সামাজিক বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে। সুতরাং যে সকল ক্ষেত্রে ক্ষোভের প্রকাশ পেয়েছে, সে-সমস্ত ব্যাপারে এই ত্রুটির কারণ আছে। জনসাধারণের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ সহানুভূতিশীল যোগ-রক্ষার অভাবেও এর অব্যবস্থা প্রকাশ পেয়েছে। সরকারী কর্মচারীদের উচিত জনসাধারণের অভাব-অভিযোগগুলির অবিলম্বে সন্ধান করা। অবশ্য তাদের প্রশাসনিক অকর্মণ্যতা কম নয় এবং তজ্জনিত অনর্থও যথেষ্ট, কিন্তু তাঁদের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, ঔদাসীন্য ও অসৌজন্য জন-সাধারণের সঙ্গে ব্যবধান অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। যত শীঘ্র সম্ভব এরূপ অবস্থার অবসান হওয়া দরকার। যাদের নিয়ে রাষ্ট্র এবং যাদের মঙ্গলব্যবস্থায় সরকার, তাদের স্বার্থ উপেক্ষা করে আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা চলতে পারে না। প্রশাসনে সংস্কারের প্রশ্ন নিশ্চয়ই গুরুতর বিষয়, কিন্তু সে ব্যাপারে মস্তকের শুধু চক্কানিনাদেই কোন ফল হবে না, প্রকৃত সংস্কারে সর্বাগ্রে প্রয়োজন গভীর মমত্ববোধ ও সততা।

এষ্টিমেট্‌ কমিটী বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে নিদারুণ বিশৃঙ্খলার কথারও উল্লেখ করেছেন। কমিটীর মতে, বহুকাল ধরে দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার যথেষ্ট উন্নতি-সাধনের একান্ত প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অবস্থা এখনও শোচনীয় হয়ে আছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ সরকারী বিভাগগুলির সমন্বয়ের ভিত্তিতে এবং বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-গবেষণা পরিষদের সক্রিয় সহযোগিতার পরিকল্পনা-সংক্রান্ত গবেষণার ব্যাপারে এক ধরনের অনিচ্ছার ভাব গড়ে উঠেছে। বর্তমানে এরূপ অসন্তোষ-জনক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তাই কমিটী পরামর্শ দিয়েছেন, বিভিন্ন ব্যাপার বিচার করে সমন্বয়ের ভিত্তিতে যাতে গবেষণার কাজ চলতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। এই সমন্বয়-সাধনের জন্য অবশ্য কেন্দ্রীয় সমন্বয়-সাধক সংস্থা গঠন করা দরকার। আমাদের মনে হয়, যত সংস্থাই গঠিত হোক না কেন এবং যত অদলবদলই ব্যবস্থা হোক, মূল গলদ দূর করতে না পারলে কোন উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা ফলদায়ক হবে না।

খাদ্যসমস্যার সমাধান-প্রচেষ্টা

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে খাদ্যসমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর এক বৈঠক হয়ে গেছে। এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলে স্বীকৃত হয়েছে। ভারত সরকারের দেশের বিভিন্ন স্থানে খাদ্যাঞ্চল গঠনের যে নীতি ছিল, তার ফলে দেশের যে-সমস্ত রাজ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় সেগুলির সঙ্গে খাদ্যোৎপাদনে ঘাটতি অঞ্চল এক বা একাধিক রাজ্য জুড়ে দিয়ে কয়েকটী খাদ্যাঞ্চল গঠিত হয়েছিল। যেমন, খাদ্যশস্য উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ বরাবরই ঘাটতি রাজ্য, এজন্য পাশের উদ্বৃত্ত রাজ্য উড়িষ্যাকে জুড়ে দিয়ে একটী অঞ্চল হয় এবং তার ফলে উড়িষ্যাকে বৎসরে চার লক্ষ টন চাল পশ্চিমবঙ্গকে দিতে হতো। দেশের বিভিন্ন অংশে এরূপ খাদ্যাঞ্চল গঠন সকলের সন্তোষের কারণ হয়নি, এই বাধ্যতামূলক ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত রাজ্যের জনগণ সুখী হতে পারেনি। সুতরাং এই ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায়। উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যশস্য আমদানীতে এখন তাই যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং অবাধ বেচাকেনার অনু ‘ল খাদ্যাঞ্চলের নীতি তুলে দেওয়াই এখন প্রশস্ত। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, অবাধ আন্তঃ-রাজ্য বাণিজ্য চললে মজুতদার কালোবাজারীরা সক্রিয় হয়ে উঠবে, এবং চাষীরাও উপযুক্ত মূল্য হতে বঞ্চিত হবে। খাদ্যাঞ্চল উঠে গেলে সরকারী সতর্কতার রীতিমত প্রয়োজন হবে, সর্ব উপায়ে সরকার কালোবাজারী মজুতদারদের সংহত রাখবেন এবং চাষীদের স্বার্থসংরক্ষণে তৎপর হবেন। এ-ব্যাপারে দেশবাসীকেও যথেষ্ট সাবধান হতে হবে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিয়োজিত এফ. এ. ও. অর্থাৎ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে, বর্তমানে ভারতে যে চালের সঙ্কট দেখা দিয়েছে তার মূল কারণ খাদ্যাঞ্চল গঠন। পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী চাউলভোজী, কিন্তু যতখানি চাউলের প্রয়োজন তত উৎপাদন নাই, বরং যে-হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে-হারে চালের উৎপাদন

বাড়ছে না। একই সঙ্গে অন্যান্য কৃষিপণ্যের চাহিদা বিদেশের বাজারে কমা হলেও চালের চাহিদা তেজী হয়ে আছে। সুতরাং চালের ব্যাপারে ভারতকে বিদেশের উপর নির্ভর করলে ভুল হবে। এফ. এ. ও. বলছেন, ভারতে চালের অভাব তীব্র হলেও নিজেদের দেশের উৎপাদনের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নাই।

এই সমস্ত কারণে চতুর্থ যোজনায় প্রথম বৎসর বা বর্তমান বর্ষের ব্যয়-বরাদ্দে কৃষির উন্নয়নে যে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে তা খুবই যুক্তিসঙ্গত ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে মনে হয়। এই বৎসরের মোট ব্যয়-বরাদ্দ ২,০৮১ কোটি টাকার মধ্যে ৩০২ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা এবং ৪৬৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা সেচ ও বিদ্যুতের খাতে ব্যয় করা হবে স্থির হয়েছে। জানা গেছে, বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশী জমিতে চাষ করা হবে এবং উন্নত বীজ ও সার ব্যবহার করা হবে। এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত ও পরিকল্পিত তৎপরতায় যথাযোগ্য পরিচালিত হলে যে উপযুক্ত ফল দেবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ-ব্যাপারে চাষীদের দেয় কৃষি ঋণেরও যাতে সুসঙ্গত ব্যবস্থা হতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সমবায় ঋণদান সমিতি বা সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণদানের পদ্ধতি কার্যকরী হবে বলে মনে হয় না। নগদ টাকায় ঋণ দিয়ে সুদ-সমেত আদায়ের ব্যবস্থা থাকলে সেই টাকা অন্য কোন লাভজনক ব্যবসায় নিয়োজিত করবার সম্ভাবনা থাকবে। মোট কথা, যথোপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা করে উন্নত সার ও উত্তম পর্যায়ের বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা হলে যথেষ্ট সুফলের আশা থাকবে।

কলিকাতার সমস্যা

কলিকাতা মহানগরী ভারতের বৃহত্তম শহর, বাঙলার তথা ভারতের প্রাণকেন্দ্র। এই শহরের ঐতিহ্য, বৈশিষ্ট্য ও অবদানের এমন একটা বিশেষত্ব আছে যার ফলে শুধু স্বদেশে নয়, বিদেশেও তার প্রভাব ও সুনাম অনন্যসাধারণ—এক কথায় ভারতের গৌরব বলা যেতে পারে। অথচ এই কলিকাতা আজ এক অভাবনীয় দুর্গতির সম্মুখীন হয়েছে। ব্রিটিশ আমল হতেই বাঙলার বাইরে একটা কলিকাতা-বিরোধী মনোভাব আছে, আগে তা প্রচ্ছন্ন ছিল, এখন বাস্তবতায় প্রকট হয়েছে। এমন কি, কিছুকাল আগে এই শহরকে কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত শহরে পরিণত করবার একটা অপচেষ্টাও হয়েছিল।

অথচ এই কলিকাতাতেই বাঙালীর জীবন-মৃত্যুর সমস্যা কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে। সেই বাঙালীই আজ নানা অবস্থার মধ্যে এই শহরে ও বৃহত্তর অঞ্চলে কোণঠাসা হয়ে গেছে। বাঙলার বাইরের যে ৬০ লক্ষ লোক বাঙলায় এসে রুজি-রোজগার করছে তাদের অধিকাংশই থাকে কলিকাতা অঞ্চলে। তারা এ-রাজ্যের বাসিন্দা নয়—তারা কর্পোরেশনকে কর দেয় না অথবা যেটুকু দেয় তা নগণ্য, কিন্তু সুখ-সুবিধা ভোগ করে পুরাপুরি। কর না দিলেও তাদের খাদ্য যোগানের দায়িত্ব রাজ্যসরকারের। পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার ও বসবাসের ব্যাপারে যথাসম্ভব কৃচ্ছ্রতা-সাধন করে আয়ের অধিকাংশ অর্থই তারা নিজেদের দেশে পাঠিয়ে দেয়। কলকারখানাতেই তাদের সংখ্যা বেশী, সেখানে বাঙালীর স্থান অতি সামান্য. নেই বললেই হয়। অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন জীবনধারায় তারা শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিকে রোগপূর্ণ ও বিষাক্ত করে রেখেছে। সেই বিষাক্ত পরিবেশ সংস্কারের দায়িত্ব কর্পোরেশন, পৌর-সভাগুলি ও রাজ্যসরকারের—রোগের চিকিৎসার ও ঔষধ-পথ্যাদি (হাসপাতালসমূহ মারফত) সরবরাহের দায়িত্ব প্রধানতঃ রাজ্যসরকারের।

দেখা গেছে, বাঙলার বাহিরের এই শ্রমিকগোষ্ঠি ১৯৬০-৬১ সালে নিজ নিজ বাসভূমিতে মনিঅর্ডার করেছিল ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। এর উপর ক্ষেতিপাড়ির সময় এলেই দেশে যাওয়ার জন্ত ছুটির হিড়িক পড়ে যায়। তখন সঙ্গে করে তারা যে সঞ্চিত টাকা নিয়ে যায় তার পরিমাণও কম নয়। যে ১৩ লক্ষ একর জমি পাটচাষের জন্ত পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে দিয়েছে তাতে ৮০ লক্ষ মণ ধান উৎপাদন হতো। এই পাট উৎপাদন করে পাটকল চালিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বৎসরে দেড়শ' কোটি বিদেশী টাকা আয় করছে, আর কলগুলির প্রায় সমস্ত শ্রমিকই অবাঙালী। এই সমস্ত শ্রমিকগোষ্ঠির কলিকাতার উপর কোনো দরদ নাই, মমত্ববোধ নাই।

দেশে ও বিদেশে এই কলিকাতার নিন্দাবাদ প্রচুর। বিদেশী ভ্রমণকারী এসে বলে যান, কলিকাতা অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন শহর—এখানে স্যাঁতসেঁতিপূর্ণ বস্তী অনেক, আবর্জনা পরিষ্কার হয় না। দায়িত্ব নিশ্চয়ই রাজ্য-সরকার ও পৌর সংস্থার আছে, কিন্তু সরকার ও পৌরসংস্থার যদিও বা পুরাপুরি কল্যাণমূলক তৎপরতা আছে, জনগণের সহযোগিতা ছাড়া কোনো উদ্যোগই ফলদায়ক হতে পারে না। কেন্দ্রের কলিকাতা-বিদ্বেষ কম-বেশী আছে এবং মেট্রোপোলিটান পরিকল্পনা বানচাল হওয়া তাঁদের বাঞ্ছনীয় স্বীকার করব, কিন্তু আমরা বলব সমস্ত বাঙালী সমাজ, সংস্থা ও জাতীয় প্রতিষ্ঠার

সুসংবদ্ধ হলে কেন্দ্রের কোন বিরূপ অভিপ্রায় টিঁকতে পারবে না। কেন্দ্রের পশ্চিমবাঙলার প্রতি একটা ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞার ভাব আছে। দুর্বলতা থাকলেই অপরপক্ষ অবহেলার সুযোগ পায়। এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠাই বাঙালীর প্রথম ও প্রধান কাজ নয় কি?

এবার গৃহসমস্যার কথা ধরা যাক। যাঁরা নিজেরা বাড়ী তৈরী করে বা উত্তরাধিকারসূত্রে নিজেদের বাড়ীতে বাস করছেন তাঁদের কথা ধরি না, কিন্তু শহরের সংখ্যাগরিষ্ঠ যে বাঙালী সমাজ তাঁদের তিন-চতুর্থাংশেরও অনেক বেশী অথবা শতকরা ৮৩ ভাগ ভাড়া-করা বাড়ী, ফ্ল্যাট বা ঘরে বাস করেন। শতকরা চারটী পরিবার থাকেন কোয়ার্টারে এবং শতকরা আটটী পরিবারের নিজেদের বাড়ী আছে, আবার অনেকাংশে নিজ-বাটীর অংশ-বিশেষ ভাড়া-দেওয়া। বৃহত্তর কলিকাতায় যেখানে বৎসরে ৫০।৬০ হাজার নূতন বাড়ীর প্রয়োজন সেখানে তৈরীর সংখ্যা মাত্র ৬ হতে ৯ হাজার। শ্রমিক ও নিম্ন আয়ের পরিবারদের জন্য বস্তী অপসারণ করে তৃতীয় যোজনায় রাজ্যসরকারের ১৮,০৩৬টী বাসগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল, সেখানে নির্মিত হয়েছে ১৭,১০৯টী। চতুর্থ যোজনায় নূতন বাসগৃহের লক্ষ্য ২৮,০০০। সরকারী হিসাবে বলা হয়েছে, মেট্রোপোলিটান পরিকল্পনায় এলাকায় ১৯৮৬ সালের মধ্যে বর্তমান জনবৃদ্ধির হারে যে লোকসংখ্যা দাঁড়াবে তাতে ২৫ লক্ষ নূতন বাড়ীর প্রয়োজন হবে; বর্তমান গৃহহীনদের বাসস্থান দিতে গেলে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার ঘরের প্রয়োজন আছে। ঘর-প্রতি লোকসংখ্যা ধরা হয়েছে আড়াই জন। সুতরাং সমস্যা যে কি-রকম ভয়াবহ তা সহজেই অনুমেয়।

১৯৬১ সালের সেন্সাসে দেখা গেছে, কলিকাতার ২৯,২৭,২৮৯ জন লোকের বাসগৃহের সংখ্যা ৫,৫৭,৫২৩টী। অবশ্য দুই-তৃতীয়াংশ লোকই থাকে কাঁচা বাড়ীতে। তবুও আশ্চর্য এখানে ৩১,১১২টী বাড়ী খালি পড়ে আছে। ব্যবসা ও থাকা একসঙ্গে চলছে কলিকাতায় এ রকম বাড়ীর সংখ্যা ২৮,২২৩। সাধারণতঃ বাড়ী ভাড়া করে থাকেন তাঁরা যাঁদের মাসিক আয় একশ' হতে দু'শ টাকার মধ্যে—তাঁরা শতকরা ৭৮ জন; এঁদের শতকরা দু'জন মাত্র কোয়ার্টার পান। ২০০৲ হতে ৩৫০৲ টাকা আয়ের পরিবার শতকরা ৭৬ জন এবং ৩৫০৲ হতে ৭৫০৲ টাকা আয়ের লোক শতকরা ৪৪ জন ভাড়াবাড়ীতে থাকেন। দেখা গেছে, ১৯০১ সালে যেখানে লোকসংখ্যা ছিল ১১ লক্ষ ৩০ হাজার সেখানে এখন ৪০ বর্গমাইল অঞ্চলে জনসংখ্যা ৩০ লক্ষের বেশী অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ৭৫ হাজার। অথচ বোম্বাইএ প্রতি বর্গমাইলের জনবসতি ৩০,২০০, টোকিওতে ৩৭,২১৬, লণ্ডনে ২৮,৩১৮ এবং মস্কোয় ৪০,৮০০। মেট্রোপোলিটান পরিকল্পনায় আগামী বিশ বছরে কলিকাতায় লোকসংখ্যা দাঁড়াবে ১ কোটি ২০ লক্ষের মত। সেদিনের অবস্থা সত্যই আতঙ্কজনক।

এদিকে সাধারণ বাড়ীওয়ালাদের লোভের সীমা-পরিসীমা নেই। ঘুষ আছে, সেলামী আছে, আবার ভাড়া ন্যায্য হিসাবে একশ' স্থানে দু'শ নিতে দ্বিধা নাই। ভাড়াটিয়াদের প্রাণান্তকর অবস্থা। সেদিকে সরকারের কোন কঠোর আইন নাই। উদ্বাস্তু সমাগম ও ভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের আগমনে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকারের মাথা-ব্যথা নাই। অথচ বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা বলে গেছেন, কলিকাতার এই সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা বলে ধরতেই হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেদিকে নিস্পৃহ ও নির্বিকার—একটী আশু চরম অবস্থায় মোকাবিলা করবার প্রয়োজনবোধ এখনও তাদের আসেনি।

সাপ্তাহিকী

২৪ এপ্রিল ঃ

সাম্প্রতিক হাঙ্গামার জন্য অনেকদিন স্থগিত থাকবার পর পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৭,৪৫৭ জন।

● কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত পাটনা সিটি স্টেশনের নাম হবে 'পাটনা সাহেব'। পাটনা শহর দশম শেষ গুরু গুরুগোবিন্দ সিং-এর জন্মস্থান।

● হিমালয় পর্বতারোহণ সংস্থার অধ্যক্ষ কর্নেল বি এন. জয়সওয়াল আজ বলেছেন, কুমারী পুষ্প আটাভেলের নেতৃত্বে একদল পর্বতাভিযাত্রী ১৮ই এপ্রিল বেলা ১১-৪৫ মিঃ-এ পশ্চিম সিকিমের ২০,১৬৬ ফুট উচ্চ কোকটাং শৃঙ্গ জয় করেছেন।

● আজকের খবর, গতকাল ২৩এ এপ্রিল শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা নাগার্জুনকোণ্ডায় জলবেষ্টিত পাহাড়ের উপর একটী প্রত্নশালার উদ্বোধন করেছেন। ভারতের প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষা বিভাগ এটী তৈরী করেছেন।

● পাকিস্তানের ইসলামাবাদ-এ আয়ুব খাঁ ও সৌদি আরবের রাজা ফৈজলের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

২৫ এপ্রিল :

আসামে পর পর দুটী অন্তর্ঘাতমূলক ট্রেন বিপর্যয়ের পর প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ও রেলমন্ত্রী শ্রীপাতিল লোকসভায় খুনী নাগাদের শায়েস্তা করবার দ্রুত ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছেন।

● লোকসভায় শ্রীহেম বড়ুয়া জানান যে, চীন বিদ্রোহী মিজো ও নাগাদের অস্ত্র সাহায্য দেবে বলে জানিয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচ্যবনও জানিয়েছেন নাগারা পাকিস্তান থেকে অস্ত্র পাচ্ছে।

● কলিকাতা পৌরসভায় ডাঃ শ্রীতিকুমার রায়চৌধুরী ও শ্রীমিহিরলাল গঙ্গোপাধ্যায় পুনরায় যথাক্রমে মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন।

● নর্দার্ন রেলওয়ের এলাহাবাদ-বারাণসী শাখায় বোম্বাইগামী বারাণসী এক্সপ্রেসের একটী বগীতে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৪ জন নিহত ও ৩০ জন (তন্মধ্যে ৪ জন গুরুতর) আহত হয়েছে।

● ভারতে ভূতপূর্ব মার্কিন রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক গলব্রেথ ওয়াশিংটনে সেনেটের সভায় বলেছেন, মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের ফলেই পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে।

● আজ প্রকাশ, গত সপ্তাহে আসাম-সীমান্তে পাক দুর্বৃত্তেরা দলবদ্ধভাবে অনুপ্রবেশ করে এবং ডাকাতি ও লুটপাট করে পালিয়ে যায়।

● এলাহাবাদ হতে ৩৮ মাইল দূরে মানদার অধিবাসীরা পরলোকগত লালবাহাদুর শাস্ত্রীর পত্নীকে একটী বাড়ী ও তিন শ' বিঘা জমি উপহার দিয়াছে।

২৬ এপ্রিল :

দক্ষিণ ভারতের অমরাবতীতে একটী তুলাবীজ হতে তেল নিষ্কাশনের কারখানায় বিস্ফোরণের ফলে ৩৫ জন নিহত হয়েছে এবং আহতদের মধ্যে ২৩ জনের অবস্থা খুব খারাপ।

● লোকসভায় কেন্দ্রীয় ব্যয় বরাদ্দ কমিটী, কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কেন্দ্রীয় প্রশাসনে আনবার সুপারিশ করেছেন।

● ইন্দোনেশিয় চীনারা পূর্ব জাভার সুরাবায়ার চীনা কনস্যুলেট দখল করেছে।

● কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীমনুভাই শাহ বোম্বাইএ বলেছেন, স্বাধীনোত্তর ভারতে ক্রোড়পতি ও লক্ষপতির সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেছে এবং ক্রমে তা বেড়েই চলেছে।

● সংসদে পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বর্ণ সিং জানিয়েছেন, চীন ও পাকিস্তানের সামরিক জোটে আবদ্ধ হয়ে গভীর চক্রান্তে লিপ্ত হওয়ার অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে।

● বোম্বাইএ হকি-প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাব পুলিশদল পর পর তৃতীয় বার আগা খাঁ ট্রফি লাভ করেছে।

২৭ এপ্রিল :

লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দ ঘোষণা করেন, ভারত-রক্ষা বিধির জরুরী অবস্থা কয়েকটী সীমান্ত এলাকায় প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে সীমাবদ্ধ থাকবে।

● অনেক দিন স্থগিত থাকবার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী কোর্সের পার্ট ওয়ান পরীক্ষা শুরু হয়েছে।

● সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট ও বাহিনীর সংগ্রাম সমিতি জানিয়েছেন, তাঁদের নবরচিত ৪০টী দাবী-সম্বলিত দাবী-পত্রের সুরাহা না হলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ হবে।

● প্রকাশ তাসখন্দ চুক্তির পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন-সংযোগ পুনঃ স্থাপিত হবার পর পাকিস্তান হ'তে আবার তা অচল করে দেওয়া হয়েছে।

● আসামের সাইজল এলাকায় কিছু সংখ্যক মিজোর সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলি-বিনিময় হয়েছে।

● চারদিনের সফরে ভূটানের রাজা নয়াদিল্লীতে উপস্থিত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীইন্দিরা গান্ধী তাঁকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা করেন।

● ওয়াশিংটনের খবরে প্রকাশ, পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে নূতন মার্কিন নীতি স্থির হবে।

২৮ এপ্রিল :

লোকসভায় শ্রীহেম বড়ুয়া অভিযোগ করেছেন, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বৈরী নাগাদের রেলপথে সন্ত্রাসের ষড়যন্ত্র সরকার জানতেন, তবুও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেননি। এ-ব্যাপারে সংসদে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে।

● অনিয়মিত ট্রেন চলাচলের জন্ত হাওড়া ও উত্তরপাড়া স্টেশনে ভীষণ যাত্রিবিক্ষোভ হয়। ফলে হাওড়া-ব্যাণ্ডেল লাইনে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত ট্রেন-চলাচল বন্ধ থাকে।

● বিটেন ও রোডেশিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

● পূর্ব জাভায় এক ভীষণ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে। আশপাশের গ্রামে গলিত লাভা ধাবিত হচ্ছে, একটী গ্রাম লাভা-প্রবাহে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। একটী শহরও বিপন্ন হয়েছে। অন্ততঃ ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে প্রকাশ।

● লণ্ডনের কূটনৈতিক মহলে গুজব, ভিয়েতনামের যুদ্ধ চীনের মূল ভূখণ্ডে বিস্তৃতির আশঙ্কায় মাও-সে-তুঙ ও চীনের সৈন্তাধ্যক্ষ জেঃ লো জিন চিঙ ক্ষমতা হতে অপসৃত হয়েছেন।

● জরুরী অবস্থা বজায় রাখায় লোকসভায় তীব্র বিতর্ক উঠেছে—এতে সরকার ও বিরোধীপক্ষ দু দলেরই বহুজনা যোগ দিয়েছেন।

● শিয়ালকোটে যে ৩৬ একর ভারতীয় ভূমি পাকিস্তান দখল করে আছে তা ছেড়ে দেওয়া হবে না বলে শ্রীচ্যবন জানিয়েছেন।

২৯ এপ্রিল :

লোকসভায় অর্থমন্ত্রী শ্রীশচীন চৌধুরী নূতন অর্থ বিলের কয়েকটী ধারায় নব-ব্যবস্থা ঘোষণা করেছেন। এতে নিম্ন-উপার্জনকারীদের কিছুটা সুবিধা দেওয়া হয়েছে এবং শিল্পোদ্যোগ বৃদ্ধি পাবে।

● হাওড়া স্টেশনে পুনরায় অনিয়মিত ট্রেন-চলাচলের জন্ত ক্রুদ্ধ যাত্রীদের দ্বারা হাঙ্গামার উৎপত্তি হয়।

● রোডেশিয়া ও ভিয়েতনাম-সংক্রান্ত ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল শ্রী উ. থান্ট লণ্ডনে উপস্থিত হয়েছেন।

● মার্কিন বিমান ভিয়েতকঙদের একটী গুরুত্বপূর্ণ রাডার-স্টেশনে বোমাবর্ষণ করেছে, তাদের কয়েকটী সরবরাহ-কেন্দ্রও আক্রমণ করা হয়েছে।

● পূর্ব জাভার কেলাদ আগ্নেয় গিরিগহ্বর হতে বহির্গত লাভাস্রোতে অন্ততঃ ৫০ জন নিহত ও ১০০ জন নিখোঁজ বলে প্রকাশ করা হয়েছে।

● ভূটানরাজের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। আগামী কালও আলোচনা চলবে। ভূটানরাজের সঙ্গে শ্রীচ্যবন ও সেনাধ্যক্ষ জেঃ চৌধুরীও সাক্ষাৎ করে আলোচনা করেছেন।

৩০ এপ্রিল :

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ পার্ট ওয়ান পরীক্ষার্থী-দের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেওয়ায় বিষম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে।

● ভারতীয় প্রকল্পের উদ্যোগগুলিতে বৈদেশিক অর্থবিনিয়োগ-ব্যাপারে পরিকল্পনামন্ত্রী শ্রীঅশোক মেহতা নিউইয়র্কে ব্যবসায়ীদের সমক্ষে বক্তৃতা করেন।

● বিদায়ী সৈন্তাধ্যক্ষ জেঃ জে. এন. চৌধুরী কানাডায় ভারতের হাই কমিশনার নিযুক্ত হয়েছেন।

● গৌহাটী হতে ১৭ মাইল দূরে পানিখাটী স্টেশনে পুনঃ দুর্ঘটনায় ডাউন আপ আসাম মেল লাইনচ্যুত হয়। ২৬ জন আহত হয়েছে।

● নয়াদিল্লীর খবর, সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৬৬ সালে ভারতকে সাত লক্ষ টন কেরোসিন সরবরাহে সম্মত হয়েছে।

শ্রীধীরেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক ১৯০/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬, স্মৃতি প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং
তৎকর্তৃক ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত।

• চয়ন •

"....কেমন করে ত্যাগ করব? সংসারের মাঝখানে থেকে অন্তত একটা মঙ্গলের যজ্ঞ আরম্ভ করে দাও। সেই মঙ্গল যজ্ঞের জন্ম তোমার ভাণ্ডারের একটা অতি ছোটো দরজাও যদি খুলে রাখ তা হলে দেখবে, আজ যে অনভ্যাসের দ্বারে একটু টান দিতে গেলেই আর্তনাদ করে উঠছে, যার মরচেপড়া তালায় চাবি ঘুরছে না, ক্রমেই তা খোলা অতি সহজ ব্যাপারের মতো হয়ে উঠবে—একটি শুভ উপলক্ষে ত্যাগ আরম্ভ হয়ে তা ক্রমশই বিস্তৃত হতে থাকবে। সংসারকে তো আমরা অহোরাত্র সমস্তই দিই, ভগবানকেও কিছু দাও—প্রতিদিন একবার অন্তত মুষ্টিভিক্ষা দাও—সেই নিস্পৃহ ভিখারি তাঁর ভিক্ষাপাত্রটি হাতে হাসিমুখে প্রতিদিনই আমাদের দ্বারে আসছেন এবং প্রতিদিনই ফিরে যাচ্ছেন। তাঁকে যদি একমুঠো করে দান করা আমরা অভ্যাস করি তবে সেই দানই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠবে। ক্রমে সে আর আমাদের মুঠোয় ধরবে না, ক্রমেই কিছুই আর হাতে রাখতে পারব না। কিন্তু তাঁকে যেটুকু দেব সেটুকু গোপনে দিতে হবে, তার জন্যে কোন মানুষের কাছে এতটুকু খ্যাতি চাইলে চলবে না। কেননা লোককে দেখিয়ে দেওয়া, সেটুকু একরকম করে দিয়ে অন্যরকম করে হরণ করা। সেই মহাভিক্ষুককে যা দিতে হবে তা অল্প হলেও নিঃশেষে দেওয়া চাই। তার হিসেব রাখলে হবে না, তার রসিদ চাইলে চলবে না। দিনের মধ্যে আমাদের একটা কোনো দান যেন এইরূপ পরিপূর্ণ দান হতে পারে—সে যেন সেই পরিপূর্ণ স্বরূপের কাছে পরিপূর্ণ ত্যাগ হয় এবং সংসারের মধ্যে এইটুকু ব্যাপারে কেবল তাঁরই সঙ্গে একাকী আমার প্রত্যহ একটি গোপন সাক্ষাতের অবকাশ ঘটে।"

—রবীন্দ্রনাথ

১ম বর্ষ

১২শ সংখ্যা

Friday, 13th May, 1966 : শুক্রবার, ২৯শে বৈশাখ, ১৩৭৩ : 50 Paise

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি :

নাম ও ঠিকানা-সহ স্পষ্টাক্ষরে কাগজের এক দিকে লিখিত রচনার পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নিকট পাঠান আবশ্যক। কোন মনোনীত রচনা কোন বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট পাঠালে ফেরত পাঠান হবে।

গ্রাহকদের প্রতি :

সপ্তাহের প্রতি শুক্রবারে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে কুড়ি পয়সার ডাকটিকিট-সহ অতিরিক্ত কপির জন্য জানাতে হবে। ঠিকানার পরিবর্তন হলে, পনেরো দিন আগে জানাতে হবে। ভিঃ পিঃ-তে পত্রিকা পাঠান হয় না। চিঠি-পত্রে ও কুপনে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করা দরকার।

এজেন্টদের প্রতি :

এজেন্সীর নিয়মাবলী পত্রিকার কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি :

পত্রিকার কার্যালয়ে পত্র দিলে বিজ্ঞাপনের মূল্য, নিয়মাবলী ইত্যাদি জানান হয়।

চাঁদার হার :

ডাকসহ বার্ষিক ২৪-০০ টাকা ;
ষান্মাষিক ১২-০০ টাকা ;
ত্রৈমাসিক ৬-০০ টাকা ;
প্রতি সংখ্যা ০-৫০ পয়সা ;

ম্যানেজার, ধৃতিদীপা
৪০, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট
কলিকাতা-৪
ফোন : ৩৫-৪২৯৭

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

উত্তরপাড়া

[illegible]

এটা কবি-পক্ষ।

বাঙলা ও বাঙালীর জীবনের সর্বাপেক্ষা আনন্দঘন একটি কাল। আজ থেকে একশ পাঁচ বছর আগে বাঙলার এক সংস্কৃতিবান্, নব-আলোক-প্রদীপ্ত ঘরে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যিনি উত্তরজীবনে আপন প্রতিভার ভাস্বরতায় দেশ-জাতি-কালের মুখ সমুজ্জ্বল করেছেন, জাতির ইতিহাসে অক্ষয় স্বাক্ষর রেখে গেছেন, যাঁকে নিজেদের মধ্যে লাভ করে বাঙালী গর্বিত, ভারত গর্বিত, এশিয়া গর্বিত, এমনকি সমগ্র মানব-জাতি গর্বিত—সেই কালজয়ী প্রতিভাধর শিল্পী কবিগুরুর জন্ম-পক্ষ এ'টা। বাঙলার আকাশে বাতাসে কান পাতলে শোনা যাবে এখন শুধু তাঁর রচিত সঙ্গীত, তাঁর বাণী। সভায় সভায় আলোচিত হবে তাঁর সৃষ্টি-কর্মের। বাঙালী ভাববে কবিগুরুর ভাবনা, গাইবে তাঁর গান। কারণ বিংশ-শতাব্দীর বাঙলা চিহ্নিত আজ রবীন্দ্র-আবির্ভাবে। উদার দানে কবিগুরু বাঙালীর চিন্তা-ভাণ্ডারকে ভরে রেখে গেছেন। সে দান শুধু সম্পদশালী নয়—অফুরন্তও বটে।

প্রতি বছরের পঁচিশে বৈশাখ বাঙালীর জীবনে এক মহত্তম লগ্ন। এ দিনটিকে আরও পবিত্রতর-ভাবে এবং অনুরাগের সঙ্গে পালন করা প্রয়োজন। কেবলমাত্র কবিতা পাঠ বা তাঁর রচিত গান গাইলেই হবে না—তাঁর আদর্শকে সামনে তুলে ধরতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে তাঁর আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। সে আদর্শ সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্-এর আদর্শ। ধর্মোজ্জ্বল আদর্শপরায়ণ জীবন গড়ে তুলতে পারলেই একমাত্র ব্যক্তির মঙ্গল, জাতির মঙ্গল, দেশের মঙ্গল হবে। যেদিন কবিগুরুর আদর্শ মনে-প্রাণে সমস্ত বাঙালী গ্রহণ করবে সেদিন নূতন দেশ গঠিত হবে।

রবীন্দ্র-প্রতিভা ব্যাপক এবং সর্বতোমুখী। সাহিত্যের প্রতিটি শাখাই তাঁর প্রতিভার আলোকে উদ্দীপ্ত হয়েছে। কাব্য-নাট্য, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ—সর্ব বিভাগে তিনি তাঁর শক্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বহু বছর ধরে তিনি সাধনায় রত ছিলেন। বিশ্বের এবং বাঙলাদেশের সাহিত্যাকাশে বার বার যে ভাঙাগড়া দেখা দিয়েছিল তার সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। কাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনেরও পরিবর্তন ঘটেছে; আর সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের আদর্শ ও ধ্যান-ধারণাও। কবি-গুরু পরিবর্তনশীল কালের সঙ্গে তাল রেখে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে তাই এত বৈচিত্র্য। তাঁর সৃষ্ট রচনা তাই জনচিত্তে এত আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। আরও হাজার বছর ধরে বাঙালী তাঁর সৃষ্টিসুধা পান করবে—তবুও সে সুধা ফুরোবে না। তার রসমাধুর্য্যও নষ্ট হবে না।

রবীন্দ্রনাথ শুধু সাহিত্যক্ষেত্রেই 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'-এর আদর্শকে সীমিত করে রাখেননি। যেখানেই তিনি এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছেন—যেখানেই দেখেছেন মানবতার অবমাননা, আগ্রয়ের ইঙ্গিত, সেখানেই তিনি স্বভাবতই গর্জে উঠেছেন। রাজনীতি, সমাজ-সংগঠন, শিক্ষা, অর্থনীতি—কোন ক্ষেত্রেই তাঁর কণ্ঠ এবং লেখনী নীরব থাকেনি—নাম, যশ ও অর্থের মোহ তাঁকে এতটুকুও দুর্বল করতে পারেনি।

রবীন্দ্র-আদর্শ সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে তুলুক—রবীন্দ্র জন্মোৎসব-লগ্নে এই-ই অন্তরের কামনা। 'স্মৃতিদীপা' কবিগুরুর জন্মোৎসব পালন করে গর্ব বোধ করছে।

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসচ্চিদানন্দ গোস্বামী

বাংলার কবি উজ্জ্বল রবি ভারতের গৌরব,
বিশ্বে ছড়াল আলোকরশ্মি অমরার বৈভব।
ভানুসিংহের লিপি-কৌশল
কৈশোরে কবি লিখে অবিচল,
শৈশব হ'তে চির-উজ্জ্বল জীবনের কলরব।

বাংলার কবি উজ্জ্বল রবি ঋষি মহামহীয়ান্,
আহ্বান যার জীবন ধরার ক'রে তোলে গরীয়ান্।
নিরখি' ত্রিকাল কবির লেখনী
প্রকাশিল মহা যুগ-বিবরণী,
শির নত করে বিপুল ধরণী, ত্যজে তার অভিমান।

বাংলার কবি উজ্জ্বল রবি জ্ঞানের দীপ্ত শিখা,
সকল সৃষ্টি, ত্রিলোক-দৃষ্টি তাহার ললাটে লিখা।
প্রথম সৃষ্টি হ'তে শেষ দিন
যা ছিল জগতে অজানা অচিন,
ঘুচাল আঁধার, পাইল মানব মহামিলনের দেখা।

বাংলার কবি উজ্জ্বল রবি দেবতার বিস্ময়,
কণ্ঠে তাহার অভয় মন্ত্র, তোলে জাতি বাণী তয়।
যা' কিছু মানিবা খুয়ে মুছে দিয়ে
মহাভারতের মহাজাতি নিয়ে
জাগাতে পৃথিবী দাঁড়াল সাধক, নাহি মনে সংশয়।

বাংলার কবি উজ্জ্বল রবি শাশ্বত ভাস্বর,
আনিল বার্তা, 'জীবের সত্তা চির-অবিনশ্বর'।
কবির অমিয় আশীষধারায়
মহাভারতের সাগর-বেলায়
হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, শিখ মিলায়েছে সবে ঘর।

বাংলার কবি সত্যের ছবি ভক্ত সাধক বীর,
পিতার স্মৃতির পূজায় জন্ম এ বিশ্বভারতীর।
ঋষি জনকেরে করিয়া প্রণতি
তৃপ্ত হৃদয়ে পূজিল ভারতী,
গঠনতন্ত্রে করিল আরতি মন্ত্রণা মুকতির।

রবি-তর্পণ

শ্রীসুধাংশুশেখর দত্ত

নক্ষত্র-আলোক-স্নাতা নিশার তিমিরে
দূরিতে উদয় তব ভারত-আকাশে,—
সত্য-শিব-শুভ-দ্যুতি হেরিয়া উল্লাসে
লভিল পরমানন্দ বিশ্ব-চরাচরে।

তীব্রতেজে নিকষি' দূষিত-পবনে
বহাইলে দশদিশি বিশুদ্ধ সমীর ;
সর্বজ্ঞান-জলা শুষি' প্রভা-আকর্ষণে
সৃজি' মেঘ বাজাইয়া বর্ষার মঞ্জীর
কাব্য-কথা-লতা-অঙ্গে সঞ্জীবনী দানে
সঞ্জীবিলে কত 'ভাবে' প্রকৃতি-সাহিত্যে !
রাঙাইলে দশদিশ জীবন-সায়াহ্নে
নিঃশেষি' আত্ম-প্রেম অনন্ত-মাহাত্ম্যে।
সৌর-রবি শ্রেষ্ঠ বটে জ্যোতিষ্মান্ হ'লে—
শ্রেষ্ঠ তুমি বঙ্গ-রবি বিশ্বকবি-কুলে।

সেক্সপীয়রের ১৩০নং সনেট

অনুবাদ—লেখক গুপ্ত

সূর্যের মতন নয় জ্যোতির্ময় আঁখি দু'টি আমার প্রিয়ার
প্রবালের মত নয় রক্তরাগ অধর তাহার ;
তুষার-শুভ্র যদি, আপিংগল পয়োধর তার,
সোনালী পশম নয়, কেশদাম মেঘ-অন্ধকার।
বুটীদার গোলাপ দেখেছি, লাল সাদা এক অংশে শোভিত,
কিন্তু তার কপোল তো দেখিনিকো গোলাপের
পেলব-রাগ ;
এবং নিঃশ্বাস তার, যখন সে হৃদয়ের বড় কাছে নিত
সুগন্ধী সামগ্রী বুঝি তার চেয়ে সুরভি উত্তম।
তার সেই কলকণ্ঠ ভালবাসি, শুনি তবু জানি এ নিশ্চয়,
সংগীত মূর্চ্ছনা তোলে তার চেয়ে সুর সুমধুর ;
স্বীকারোক্তি এ আমার, চলমান দেবী কোনো করিনি
প্রত্যয় :
মাটিতে চরণছন্দ অনুভব করেছি মধুর।
তবুও আমার প্রেম, আমি মনে করি এক দুর্লভ রতন
মিথ্যা প্রশংসায় ঘেরা মনোলোভা নারীর মতন।

হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোন্‌খানে

—অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রকাব্যের সীমাতিশায়ী মনোভাব এবং চরাচরমগ্নতাকে রবীন্দ্র-কাব্যের ধাতুগত উপাদান বলা যায়। কবির অভিপ্রায়কে 'ধাতু' বললে বস্তুতান্ত্রিক বিড়ম্বনাকে অতিক্রম করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু বস্তুর আকার এবং প্রকৃতির পিছনে ধাতুর মৌল ভিত্তিকে স্বীকৃতি দেওয়ার আর্টই প্রাথমিক ভিত্তি-স্তরটিকে স্বীকার করে নেওয়া। রবীন্দ্রকাব্যে স্থান এবং পরিবেশগত উৎকণ্ঠা এমনই এক প্রাথমিক সত্যের ইঙ্গিত দেয়। রুদ্ধশ্বাস জীবনের হতাশা এবং নৈরাশ্য কবির আজীবন মানসিক সঙ্কোচনের কারণ। কবির অন্তরাত্মা বিহঙ্গ-বিহঙ্গের মত কেবলই মানস মহলের মুক্তিসন্ধানে উদ্যোগী হয়ে উঠেছিল। কখনও হিমালয়ে, কখনও গাজিপুরে, কখনও শিলাইদহ-সাজাদপুরের তীর-ছোঁয়া পদ্মাবক্ষে, কখনও বোলপুরের অতিপ্রিয় শান্তির আবাসে আবার কখনও বা পেনিটির বাগানে অথবা চন্দননগরের গঙ্গাতীরে কবি কেবলই শান্তির সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কবির এই শান্তিসন্ধান তাঁর কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে একেবারে নিরর্থক নয়। বরং বলা যায়, সীমাতিক্রমী আত্মবেদের পিছনে ঐ একটি খোঁচাই সদা সক্রিয় ছিল। আর একটু এগিয়ে বলতে পারি, রবীন্দ্রমানস সদা অতৃপ্ত এবং নিয়ত বিক্ষুব্ধ। নিজেকে নিয়ে কবি কখনই সন্তুষ্ট নন। সম্ভবতঃ এই কারণেই রবীন্দ্রকাব্যে কূপমণ্ডুকতার অভিযোগ কোন দিন ওঠেনি। অতৃপ্তি এবং অশান্তিকে রোমান্টিক কবির মানস লক্ষণ ধরে নিলে, রবীন্দ্রনাথকে রোমান্টিক কবি বলতে বাধা নেই। Complete isolation বা বিশুদ্ধ আত্মমোক্ষণের লক্ষ্যপথে রোমান্টিক কবির সদা অতৃপ্ত অভিযান রবীন্দ্র-কাব্যচক্রকেও প্রভাবিত করে তুলেছে। মানসিক ভাবস্ফীতির মাহেন্দ্র-ক্ষণেই কবি দীর্ঘদিন ধরে য়ুরোপ ভ্রমণ করে এলেন। ওখানকার ভোগৈশ্বর্যকে ছাপিয়ে জীবনের উদ্দীপিত জীবনধারা কবির মুক্তি-পিয়াসী মনকে পরিতৃপ্তি দান করল। ফিরে এসে বাঙালী জীবনের সীমাবদ্ধ জীবন-আকুতি এবং নিশ্চেষ্টতার সঙ্গে তাল মেলাতে পারলেন না। সম্ভবতঃ কবি আগেও তা খুঁজে পাননি। শুধুমাত্র সমর্থনের আশায় ছিলেন। আরো আশ্চর্যের কথা, কবির এই অসহনীয় চিত্তবেগ তাঁকে ক্রমাগত জীবনের বন্ধুর পথের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। আত্মশান্তিকামী মনের মোহাচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠে কবি তাই অকপটে কর্মস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছেন। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞান লাভের জন্যে কবির এই ব্যগ্র অভিপ্রায়কে তাঁর মনের কোন সচেতন পরিবর্তনশীল চেতনা মনে করার কারণ নেই। বরং একই ধাতুময় উপাদান হ'তে জাত বলা যায়। 'দুরন্ত আশা'র কবি আরব-বেদুইনের দোসর হবার জন্য মরুপথযাত্রী হতেও দ্বিধা করেননি। অথচ তাবতে অবাক লাগে অবরুদ্ধতা এবং সমৃদ্ধির মধ্যে আজন্ম কাটিয়ে এসে কবি সত্যই সেই জীবনজ্বালার বশবর্তী হ'তে পারেন কিনা। এই আকাঙ্ক্ষার সত্যাসত্য নিয়ে প্রশ্ন না তুলে কবির আত্মমোক্ষণের অভিলাষকেই তাঁর কাব্যসাধনার প্রাণশক্তি বলা যায়। কবি অনেক সময়েই এই অভিলাষের দিক্‌নির্ণয় করে উঠতে পারেননি। তাই পশ্চাদ্‌বর্তী আবেগের ঠেলাকে জীবনদেবতার রহস্যময় নির্দেশ ভেবে সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছেন।

কবির স্থান-পরিবেশগত এই উদ্ভ্রান্তির সারমর্ম বুঝতে গেলে দু'টি প্রতীক-চিত্রের সাহায্য নিতে হয়। একদিকে 'ডাকঘর'এর অমল, আর একদিকে 'অতিথি'র তারাপদ চরিত্র। প্রকৃতির বর্ণরহস্যময়তার প্রতি সদা উন্মুখতা অমলের অবরুদ্ধ চিত্তকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল, আর তারাপদ জীবনের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে সংসারের ঘাটে ঘাটে—মুক্তির সন্ধান করে বেড়িয়েছে। প্রথমটি কবির কৈশোরের চিত্র, দ্বিতীয়টি তাঁর মানসিক পরিণতিলাভের পরবর্তী চিত্র। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের এই সীমাতিশায়ী মনোভাবকে শুধু অভিজ্ঞতা অর্জনের ছাড়পত্র মনে করলে ভুল করা হবে। কবি বৃহত্তর বিশ্বাসের বন্ধনে অচঞ্চলভাবে ধরা দেবার জন্যও সদাচঞ্চল মানসমুক্তির পথে এগিয়ে গেছেন। তিনি যদি ভাব এবং রূপের বৈচিত্র্যে অবগাহন করে বিশ্বরহস্যকে মথিত করে না বেড়াতেন, তাহ'লে বিশ্ববিধানের কেন্দ্র-সত্যে পৌঁছানোর অনেক বিলম্ব ঘটতো, এমনকি তা' আদৌ ঘটতো কিনা তাতেও সংশয়

রয়েছে। মর্ত্যের সৌন্দর্যের প্রতি নিঃসংশয় অনুরাগ নিয়ে কবি জগৎ থেকে যে অরূপের বিশ্বাসে পৌঁছেছেন, তার পশ্চাতে জগতের বাহ্য সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর মোহরঞ্জনী দৃষ্টির ভূমিকা নেই, একথা বলা যায় না। পরিবর্তনশীল রূপের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কবি ইন্দ্রিয়পথ রোধ করায় আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মানসরাজ্যের একাকার অবস্থায় মুক্তির জন্য কবির আন্তরিক ব্যাকুলতা দেখেই মনে হয়েছে, কবি আস্বাদনের দ্বারপথ ইন্দ্রিয়-চেতনাকে সর্বাংশে অস্বীকার করতে চান না। কবির গতিশীলতার পিছনে তাই একই সঙ্গে সৌন্দর্যসন্ধানী মনোবৃত্তি এবং সত্যের আশ্রয়লাভের সদিচ্ছা বজায় রয়েছে। ত্যাগবাদী জীবনের উচ্চাদর্শ এবং উপনিষদের 'চরৈবেতি'র নির্দেশ 'বলাকা' কাব্যের মুক্তিবাদী পাদপীঠ রচনা করে দিয়েছিল; এই কাব্যের গতিসঞ্চারী মনোবৃত্তি তাই আকস্মিক তীব্রতা লাভ করেছে। কিন্তু তরুণ পুরুষের বন্ধনচ্ছেদী নির্লিপ্ততা কবির আকাঙ্ক্ষায় পূর্বেও ধ্বনিত হয়ে এসেছে। 'প্রভাতসঙ্গীত'এর কবির নব-উন্মীলিত জিজ্ঞাসু হৃদয় জগৎ-স্রোতের লক্ষ্যপথে নব-উত্তেজনায় ধাবমান হ'তে চেয়েছিল, 'বসুন্ধরা'র কবির মর্ম-উদ্বেগ মহাজীবনের স্রোতে উন্মুখ হয়ে চরাচরগামী হয়ে উঠেছিল, 'কল্পনা'র কবি যুগান্তরের বিশ্বরূপদর্শনে উদ্যোগী হয়ে মৃত্যুরূপী শ্যেনকে আহ্বান করেছিলেন, 'উৎসর্গ'-র কবি সৃষ্টিচক্রের অন্তরালবর্তী প্রকম্পিত মৌন মহিমাকে অনুভব করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং দ্বিধায় একথা বলা যায়, রবীন্দ্রকাব্যের গতিময় উদ্ভাবনা কোন মানবিকতা-প্রসূত ব্যাপার নয়, বরং রবীন্দ্রনাথের মানসোৎকর্ষের নিত্য যোগসূত্র। রূপ হ'তে রূপান্তরে, ভাব হ'তে ভাবনায় এবং স্থান হ'তে স্থানবিশেষে কবির নিত্য পরিক্রমণের এই অভিপ্রায়ই তাঁর কাব্যের সীমাতিক্রমী ব্যাপ্তির মূল উপাদান।

সুতরাং চিত্তদীপ্তির আবেগে অতৃপ্ত কবিচিত্ত যদি অনাগতের অভিসারী হয়ে ওঠেন, তবে তাকে কৈশোরের কল্পলালিত হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন প্রতিক্রিয়া বলতে দ্বিধা নেই। আর তাই যদি বলা যায়, তবে রবীন্দ্রনাথের কল্পবক্ষ হৃদয়ের দাবিকেই রবীন্দ্রকাব্যের শক্তিশালী প্রেরণা বলে মনে হয়।

গল্প নয়

—শ্রীঅজিতানন্দ চক্রবর্তী

কিংশুক রায় একজন নামকরা কবি। অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এমন কোনও পাঠক নেই যে কিংশুক রায়ের প্রগতিশীল কাব্য পাঠ করেনি বা তার সঙ্গে পরিচিত নয়। তার অসংখ্য ভক্ত এবং পাঠকমণ্ডলীর কথা স্মরণ করে সে যেমন গর্ব অনুভব করে তেমনি তাদের উপযুক্ত চাহিদা মেটা-বার জন্যে তাকে যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয় সে কথা চিন্তা করে নিজের অবসরহীন জীবনে একটা অস্বস্তিও ভোগ করে। সম্প্রতি তার জীবন শুধু দুর্বিষহ হয়নি, প্রায় বিপন্ন হয়ে উঠেছে। অবস্থার এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী কতকগুলি পত্রিকার সম্পাদক, যাঁরা আগামী পূজা উপলক্ষে তাদের পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার জন্য দলে দলে এসে কিংশুক রায়ের বাড়ীতে ভিড় লাগিয়ে দিয়েছেন এবং কবিতা না পেলে বা কবিতার প্রতিশ্রুতি না পেলে তাকে অতিষ্ঠ করে মারছেন। প্রত্যহ সকালে ঘুম থেকে ওঠবার আগেই শুনতে পায় একজন লোক তার জন্যে অপেক্ষা করছে। তাদের বিদায় করে প্রাতরাশ সেরে ক্ষৌরকর্ম আরম্ভ করার আগেই আর একজন এসে হাজির হয়। তারপর স্নান সেরে তাড়াতাড়ি যা হয় কিছু খেয়ে অফিস যাবার পথে জন-কয়েক ধাওয়া করে। সওদাগরী অফিসের চাকরী, সেখানে নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই, তবু তারই মধ্যে দু'একজন এসে কবিতার [illegible] টেনে নিয়ে [illegible] করতে লেগে যায়। অফিসের পর সরাসরি সে বাড়ী আসে না তাই রক্ষা। একটি টিউশনি সেরে আর এক বন্ধুর বাড়ীতে কিছুক্ষণ সাহিত্যিক আড্ডায় আলোচনার পর রাত সাড়ে নটা নাগাদ বাড়ী ফেরে। এক এক সময় তার মনে এই প্রশ্ন আগে যে এতখানি কবি প্রতিভা নিয়ে সে বাঙলাদেশে জন্মাল কেন? যদি বিলেত বা আমেরিকায় জন্মাত তাহলে এই উদয়াস্ত পরিশ্রম না করেই তার চলে যেত। সে যখন আমেরিকার কবিদের পারিশ্রমিকের সঙ্গে নিজের দেশের তুলনা করে তখনই এই চিন্তা তাকে ব্যথিত করে তোলে। যাই হোক পূজার মরশুমটা বাঙলা দেশের মন্দ নয়। আর কিছু না হোক ছুটিতে পশ্চিম বেড়াতে যাবার খরচাটা উঠে আসে। অন্য বছরের তুলনায় এবছর আবার তার ভাগ্য আরও ভালো। একটা নতুন পত্রিকার কাছ থেকে একটি বড় কবিতার পারিশ্রমিক বাবদ একটা মোটা অফার পেয়েছে। সর্ত এই, কবিতাটি রীতিমত আধুনিক হওয়া চাই এবং তার মধ্যে বিপ্লবের কল্পনার সঙ্গে প্রেমেরও স্পর্শ থাকা চাই। আজ সন্ধ্যায় তাই ছাত্রকে সকাল সকাল ছুটি দিয়ে কিংশুক সোজা বাড়ী ফিরেছে এবং তাড়াতাড়ি আহার সেরে নিয়ে টেবিলে লিখতে বসেছে। কিন্তু একঘন্টা চিন্তার পর একটি লাইনও লিখতে পারল না। অথচ কাল সকালেই কবিতাটি পত্রিকার সম্পাদককে দিয়ে দিতে হবে। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকার পর আর ভালো লাগল না। মনে মনে ক্ষোভ ও বিরক্তির উদ্রেক হল। তবে কি কাব্যলক্ষ্মী তার সঙ্গে ছলনা করছেন? অন্য দিন একবেলায় তার তিন চারটি কবিতা হয়ে যায়, আর আজ একটি লাইনও লিখতে পারছে না। [illegible] মনে মনে নতুন কলম আর কবি-প্রতিভাকে [illegible] তাকে [illegible] তবু কাজ না সেরে উঠবে না। এক হাতে কলম ধরে কবিতার খাতায় নিব ঠেকিয়ে রেখে আর এক হাতে টেবিলে রাখা এক একখানি বই খুলে দেখতে থাকল। প্রথমে নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা'টা টেনে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই মুড়ে রাখল। তারপর প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা'টা খুলে এক-পাতা পড়ল—কবিতার খাতায় দু' লাইন কি যেন লিখল, তারপর বইটি মুড়ে সুধীন দত্তের 'ক্রন্দসী'টা টেনে নিল। সেটা থেকে এক স্তবক পড়ে— নিজের খাতায় আরও দু'লাইন যোগ করল। বলে রাখা ভালো যে এই কায়দাটি সে কলেজে পড়ার সময় তার এক সতীর্থ তরুণ কবির কাছে শিখেছিল। ঐ কবির উপদেশের মূলে ছিল ইংরাজী সেই প্রবচন— Thought provokes thought অর্থাৎ চিন্তা থেকেই চিন্তার উদ্ভব। এইভাবে একের পর এক বুদ্ধদেব বসুর 'এক পয়সায় একটি', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'নূতন রাধা', জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক'—সব পড়া শেষ করেও বারো লাইনের বেশী লিখতে পারল না। হতাশা আর ব্যর্থতাবোধের আক্র-[illegible] মন যখন নিরাশায় আচ্ছন্ন তখন টেবিল ছেড়ে উঠে গিয়ে সে আলমারী থেকে আধুনিক ইংরেজ কবিদের কাব্যসংগ্রহটি বার করল এবং ফিরে এসে বসে পাতা ওল্টাতে থাকল। প্রথমেই নজরে পড়ল ইয়েটস্-এর একটি কবিতা। পছন্দ না হওয়ায় সেটি বাদ দিয়ে পরের কবিতায় মন দিল। এটির রচয়িতা অডেন। এক-বার, দুবার কবিতাটি পড়েও তার

দুর্বোধ্যতা দূর হল না দেখে সেটিকে ত্যাগ করল। তারপর কয়েকটি পাতা উল্টিয়ে দেখল এজরা পাউণ্ড। এক-বার পড়ে মনটা একটু উৎফুল্ল হল। খস্ খস্ করে ছ'লাইন হুবহু বাংলা করে গেল। কাব্য রচনার এই আর্টটি সে তার এক অধ্যাপক কবির কাছ থেকে শিখেছে। গুরু অবশ্য টানা অনুবাদ করতে বলে দেননি। তবে ঠেকায় পড়লে বিদেশী কবির ভাব ও ভাষায় অনুকরণ করাটা নাকি তাঁর মতে দোষণীয় নয়। তাতে সৃষ্টির মৌলিকতা ব্যাহত হয় না অথচ কুম্ভীলকবৃত্তির অভিযোগও কেউ দিতে পারে না। কিংশুক গুরুর এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা মূঢ়তা মনে করে। তাই সে একেবারে গুরুমারা বিদ্যা আয়ত্ত করতে প্রয়াসী হয়েছে। যাই হোক, ছ'লাইন লেখার পর আবার সে একের পর এক এলিয়ট, কামিংস্, স্পেণ্ডার, ডেলুই, সিট্‌ওয়েল, নিউবি, রস্-প্রমুখ কবির কাব্য থেকে অংশ-বিশেষ ভাষান্তরিত করেও দেখল যে লেখা আশানুরূপ অগ্রসর হয়নি—মোট আটাশ লাইনে দাঁড়িয়েছে। এরপর আরও অন্ততঃ বাইশ লাইন যোগ দিতে না পারলে তো সমাপ্তির পূর্ণচ্ছেদ টানা যাবে না—অন্ততঃ সম্পাদকের সঙ্গে দীর্ঘ কবিতার সর্তরক্ষা করা যাবে না। কিন্তু উপায় কি,—এখন ছ'লাইন বসানো তার কাছে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে,—বাইশ লাইন তো দূরের কথা!

কিংশুক মনের অস্থিরতাকে আর কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে পারল না। উঠে খানিক বারান্দায় পায়চারী করল। তারপর কি যেন ভেবে নিয়ে টেবিলে ফিরে এসে বসল। বাঙলা কবিতার বইগুলির একেবারে নীচে একটা 'সঞ্চয়িতা'র ষষ্ঠ সংস্করণ প্রায় অনাদরে পড়েছিল। সেটি তুলে নিয়ে তার চারধারে জমাট ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে স্বগতভাবে বলল: এই থেকে একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ফেলতেই হবে। বই খুলেই প্রথমে ভাবল: 'সোনারতরী' থেকে 'পূরবী' পর্যন্ত বাদ দিতে হবে। ওগুলোর সব সেকেলে ধরণের কবিতা যা তার ভক্ত পাঠকদের জানা না থাকলেও সম্পাদকগুলো নিশ্চয়ই জেনে রেখেছে। অতএব ওখান থেকে সুবিধা হবে না। তার চেয়ে বরং 'পুনশ্চ' থেকে 'শেষ লেখা' অবধি যার অধিকাংশই অনেকের এমন কি সম্পাদকদেরও জানা নেই এবং তাই থেকেই কাজ হাসিল করা যাক। চোখ বুজে বইয়ের শেষদিকের একটা পাতা খুলে চেয়ে দেখল 'পৃথিবী'। ঠিক করে নিল এখান থেকেই আরম্ভ করবে। কবিতাটা অবশ্য কলেজে পড়া এবং কবি যশঃ-প্রার্থী তরুণ কবির অতি পরিচিত ও মডেল-স্বরূপ। তবু তার অতি চমকপ্রদ শব্দ বিন্যাস, যেমন—'নীলাম্বুরাশির অতন্দ্র তরঙ্গে কলমন্দ্র মুখরা পৃথিবী' কিম্বা 'জলহীন ফলহীন আতঙ্ক পাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে পরিকীর্ণ পশু-কঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য' ইত্যাদি নিশ্চয়ই কোনও পাঠকের স্মৃতিতে স্থায়ীভাবে গাঁথা নেই।

কিন্তু কিংশুক বাবুর ভাগ্য আজ আদৌ সুপ্রসন্ন নয়। দু' তিনবার 'পৃথিবী' কবিতাটা পড়েও কিছু সুবিধা করতে পারল না। তারপর পাতা উল্টিয়ে 'আফ্রিকা' কবিতাটা একবার মন দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিল এবং অতিকষ্টে ছ'লাইন তার খাতায় বসাতে পারল। এত সাধ্যসাধনায় মাত্র ত্রিশ লাইন লেখা হয়েছে। আজ রাত্রে আরও কুড়ি লাইন লেখার কথা ভাবতে গিয়ে তার মাথাঘুরে পড়বার উপক্রম হল। মনে হল তেনজিং-এর এভারেস্ট জয়ও তার চেয়ে ঢের সহজ ব্যাপার। নাঃ, আর পারছে না। কপালের শিরগুলো দপ্ দপ্ করছে, ঘুমে চোখ বুজে আসছে। হাত-পা যেন এলিয়ে পড়ছে। তবু রেহাই সে সহজে পাচ্ছে না। নিজের সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে হলে কাল সকালেই প্রতিশ্রুত কবিতাটি সম্পাদকের হাতে তুলে দিতে হবেই। না পারলে এই কথাই রটবে যে, অনায়াসে কবিতা রচনা করার মত প্রতিভার অধিকারী সে নয়। কেবল ইনিয়ে-বিনিয়ে কষ্টকল্পনা বলেই সে কবিতা লেখে, স্বভাবগত সৃজনীর স্ফুরণ তার নেই। অপরে যা ভাবে ভাবুক, বর্তমানে তার একটু বিশ্রাম বিশেষ প্রয়োজন। নইলে তার মূর্চ্ছা হবার সম্ভাবনা। কলমটা দোয়াত-দানীতে রেখে দিয়ে সে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখবুজে বিরক্ত মনে কবিগুরুর উদ্দেশে বলতে থাকল: তোমার কবিতা এযুগে অচল। তা নাহলে এত নাড়াচাড়া করেও দু' লাইনের বেশী নেওয়া গেল না। অথচ সর্বজনীনতার এবং চিরন্তন কালের গ্রহণযোগ্য বস্তু বলে কত লোকই না একে প্রশংসাপত্র দিয়েছে। ক্লান্ত শরীর একটু আরাম পেয়েই অল্পক্ষণে তন্দ্রাচ্ছন্ন হল। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া শব্দের তাল-লয় সৃষ্টি করে তার অতিপরিমিত গতিতে নাসারন্ধ্রের পথে যাতায়াত করতে থাকল। তন্দ্রাময় কিংশুকের সমস্ত উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা এক স্বপ্নের অতলগভীরে প'ড়ে বিলীন হয়ে গেল।

(২)

কবি কিংশুক রায় স্বপ্ন দেখছে। তার পঞ্চাশ লাইনের কবিতাকে সে এক'শ পঞ্চাশ লাইনে দাঁড় করিয়ে সম্পাদককে দিয়েছে। কবিতা ছাপা

মৃত্যুর পর সাহিত্য-জগতে একটা সাড়া পড়ে গেছে। প্রতিদিন রাশি রাশি অভিনন্দন-পত্র তার নামে আসছে। প্রগতিশীল সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি একযোগে তাকে সম্বর্ধনার আয়োজন করেছে। সেই সভায় ঐ কবিতাটি তার মুখ থেকে শোনবার জন্যে সবাই ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। ভক্তদের ইচ্ছা অপূর্ণ না রেখে অতি আবেগপূর্ণ কণ্ঠে সে কবিতাটি পড়ে শুনিয়েছে। সভার শেষে দৈনিক পত্রিকার ফটোগ্রাফাররা একাধিক ছবি তুলে নিয়েছে। পরদিন সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে সভার খবরের সঙ্গে তার ছবিও ছাপা হল। সম্পাদকীয় স্তম্ভে তার কবিতার সমাদর করে প্রবন্ধ লেখা হল। তাকে বাংলার হিতৈষী গুণগ্রাহী বলে বর্ণনা করা হল। কেউ কেউ এমন মন্তব্য প্রকাশ করল যে কিংশুক রায় শুধু রবীন্দ্রোত্তর যুগের মৌলিক কবি নয়, তার কাব্য সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্র প্রভাব-বর্জিত। তার নিজেরও এই ধারণা বদ্ধমূল হল যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য যদি অমরত্ব দাবী করতে পারে তবে তার কবিতারও মৃত্যুহীনতা সুনিশ্চিত। সে ঠিক করে ফেলল যে ইহলোক ত্যাগ করে অমরধামে যখন যাবে সেই সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাব্যের কাল অতিক্রমের অক্ষমতা সম্বন্ধে বুঝিয়ে দেবে এবং আজ তাঁর কিছু কিছু পাঠক ও অনুরক্ত থাকলেও ভবিষ্যতে যখন প্রগতির যুগ পরিপূর্ণভাবে কায়েম হবে তখন কেউই যে তাঁর কাব্যের সন্ধান রাখবে না এ সংবাদটিও পৌঁছে দেবে।…

কিংশুকের স্বপ্নের প্রথম পর্যায় শেষ হয়ে দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হয়েছে।…

খ্যাতনামা কবি কিংশুক রায় ইহলোক ত্যাগ করে অমরধামে যাত্রা করেছে। সেখানকার প্রবেশপত্র স্বরূপ হাতে নিয়েছে সেই একশ পঞ্চাশ লাইনের কবিতাটি। অনেক কষ্টে 'অমরধাম'-এর সন্ধান পেলেও তার প্রবেশপথ দেখতে পেল না। এক জায়গায় প্রাচীরের মাঝে একটা ফাঁক দেখতে পেল। তার অদূরে প্রহরী দিবানিদ্রায় মগ্ন। তাকে জাগাবার চেষ্টা না করে কিংশুক নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল। ভেতরে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই পাশাপাশি একই ধরণের কতকগুলি বাড়ী দেখতে পেল। প্রথম দর্শনে মনে হবে যেন আশ্রয়-প্রার্থীদের জন্য প্রস্তুত কোন সরকারী কলোনী। কারণ বাড়ীগুলি দেখতে যেমন নতুন তেমনি তাদের মধ্যে বাহুল্য বা জাঁকজমক কিছু নেই। তবে তফাৎ এই যে সমস্তটাই যেন নিস্তব্ধ পুরী। সেই বাড়ীর বাসিন্দাদের কাউকে দেখা গেল না বা তাদের গলার কোনও আওয়াজ পাওয়া গেল না। ঐ বাড়ীগুলির কোনটিতে ঢোকা উচিত হবে কিনা বুঝতে না পেরে সে আরও কিছুদূর এগিয়ে গেল এবং তারপর এককোণে দূরে যে বাড়ীটি দেখতে পেল তার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে অনুমান করল যে ঐ বাড়ীটিতেই নিশ্চয় কবিগুরু অবস্থান করেন। বাড়ীটি শান্তিনিকেতনের 'উত্তরায়ণ'-এর উত্তম সংস্করণ। তার চারিদিকের মাঠ, ফুলবাগান প্রকৃতির বিস্তৃত লীলানিকেতন কবির চির-বাঞ্ছিত পরিবেশের পরিচায়ক। শরতের অপরাহ্ণ বেলা। আকাশের নীলিমা আর উজ্জ্বল আলোক ছুঁয়ে মিলে জায়গাটি এক মনোরম শোভা ধারণ করেছে। কিংশুক রায় শান্ত পদক্ষেপে উত্তরায়ণ-এর অনুরূপ বাড়ীটির কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর সেখানকার সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়ে বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতামটা টিপল। অল্পক্ষণের মধ্যেই একজন ভদ্রলোক এসে দরজা খুলে দাঁড়ালেন। তাঁর পরিপাটী পোষাক, মাথার টাক ইত্যাদির দিকে কিছুক্ষণ তাকাবার পর কিংশুকের বুঝতে বাকী রইল না যে ইনি কবিগুরুর ব্যক্তিগত সেক্রেটারী। তাকে দেখামাত্র তিনি বুঝতে পারলেন যে কবিগুরুর সাক্ষাৎ-প্রার্থী হয়ে সে উপস্থিত হয়েছে। তাই বৃথা বাক্যব্যয় না করে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেলেন এবং একটি ঘরে বসতে বললেন। ঘরটি যেমন আসবাবের বাহুল্যবর্জিত তেমনি সুরুচির পরিচায়ক। একপাশে একটি টেবিলে ফুলদানীতে রজনীগন্ধার ডাঁটা রাখা হয়েছে। ঘরের জানলাগুলি যেমন প্রশস্ত তেমনি উন্মুক্ত। বাইরের আলো বাতাসকে যেন সর্বদাই আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। দেওয়ালের একপাশে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একটি অপূর্ব সুন্দর ছবি ঝুলছে, অপরদিকে গান্ধীজী, এণ্ডরুজ ও রোলাঁর প্রতিকৃতি। কিংশুক কবিগুরুর আগমনের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে রয়েছে আর কেমনভাবে কথাটা পাড়বে তাই মনে মনে গড়ছে আর ভাঙছে। মনে হল সে যেন সব গুলিয়ে ফেলেছে। যে-উগ্রতা এবং যে-তীক্ষ্ণতা নিয়ে সে রবীন্দ্রনাথের সম্মুখীন হবে ভেবেছিল, এখন যেন তার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। তাই যতই সময় অতিবাহিত হচ্ছে ততই সে মনের বল হারিয়ে ফেলছে। এই ভাবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। তবু কবির দেখা নেই দেখে সে সুধাকান্তবাবুর খোঁজে পাশের ঘরে উঁকি মেরে দেখতে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের পেছন-দিককার পর্দা সরিয়ে কবিগুরু প্রবেশ করলেন এবং কিংশুককে হাত তুলে সুস্বাগতম্ জানিয়ে বসতে বললেন। কিংশুক থতমত খেয়ে অজ্ঞানমন্ত্রভাবে

কবির পদধূলি গ্রহণ করে নিজের জায়গায় বসে পড়ল।

(৩)

[কবি কিংশুক রায়ের স্বপ্ন তৃতীয় পর্যায়ে আরম্ভ হয়েছে। অমরধামে উত্তরায়ণ-এর অনুরূপ গৃহে কবিগুরুর সামনে একটি বেতের চেয়ারে সে বসে আছে। কবিগুরুর জন্য একটি বিশিষ্ট আসন আগে থেকেই রাখা আছে। এখানে বসে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তিনি সাক্ষাৎপ্রার্থী ব্যক্তিদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেন। কিংশুক কিন্তু অনিমেষ নয়নে এই দিব্যকান্তি পুরুষের দিকে তাকিয়ে আছে। তাঁর গৌরবর্ণে রক্তাভা ফুটে উঠছে, সাদা চুল ও দাড়ি সফেন দুধের মত দেখাচ্ছে। গরদের জোব্বা, গরদের আলখাল্লা, হরিণচর্ম্মের ঢাকা পাদুকার ভেতর দিয়ে ব্যক্তিত্বের রূপ প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁর স্বাস্থ্য যেন অন্তিমদিনের পনর বছর পূর্ব্বেকার অবস্থায় ফিরে গেছে। তাঁর মননশীল সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি, সুমিষ্ট বচনভঙ্গী, গাম্ভীর্য্যে এবং সৌন্দর্য্যে ভরা।]

কবিগুরু—তারপর তো মা র পরিচয় এবং আগমনের উদ্দেশ্য কি এইবার শুনি।

কিংশুক—(আড়ষ্টভাবে) আমি একজন অতি-আধুনিক প্রগতিশীল কবি। নাম কিংশুক রায়।

কঃ—কিংশুক! মানে—পলাশ-ফুল; খাসা নামটি ত! হাঁ, কিন্তু কি কবি বললে যেন?

কিং—অতি-আধুনিক প্রগতিশীল কবি।

কঃ—(স্বাগতভাবে) এখনও প্রগতি! আমিই ত একসময় গতির পদক্ষেপকে বাড়াবার জন্তে তার আগে 'প্র'-উপসর্গ জুড়ে দিয়ে প্রগতি শব্দের প্রচলন করি। তারপরে মর্ত্যলোক ত্যাগ করবার পূর্ব্বে আমিই আবার 'প্রগতিসংহার' করে আসি। আর এ দিনা এতদিন পরেও আ মা কে শোনাচ্ছে প্রগতি! তবে এ-প্রগতি সেই-প্রগতির প্রেতাত্মা নাকি? (প্রকাশ্যে) সেটি আবার কি বস্তু বাপু?

কিং—'প্রগতিশীল কবি ও কবিতার অর্থ কি তা আপনার না জানারই কথা। কেননা আপনি এখানে চলে আসার পর ত' প্রগতিযুগের সূচনা হয়েছে!

কঃ—আমি এখানে এসে অবধি ওখানকার খবর রাখি না এ ধারণা তোমার হল কোথা থেকে? আমার কাছে সব সংবাদই পৌছেচে। তুমিই ত' প্রথম ব্যক্তি নও যার সঙ্গে আমি দেখা করছি।

কিং—বলেন কি! আ মা র আগেও তাহলে অনেকে এসেছে। তারা এই অমরধামে প্রবেশের অনুমতি পেল কি করে? কারা সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ?

কঃ—কেমন করে ঢুকল বলা শক্ত। [স্বগতভাবে] বোধ হয় খিড়কী দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়েছে, ঠিক তোমারই ম ত। [প্রকাশ্যে] তাদের মধ্যে দু'জনের আগমন সন্দেহজনক। একজন অবশ্য নিজগুণে এসেছে, আর সদর দরজা দিয়েই এসেছে।

কিং—এখানে প্রবেশের জন্তে আবার সদর-খিড়কী আছে নাকি? খিড়কী দরজা কোন্‌টি, আর সদরই বা কোন্‌টি?

কঃ—আছে বৈকি। এই বাড়ীর সামনে দিয়ে সোজা পূর্ব্বমুখো গেলে যে দরজা পড়ে সেটিই সদর-দরজা। আর এই বাড়ীর পশ্চিমে যে ফাঁক সেটি খিড়কী।"

কিং—সেকি! আমি যে ঐ পশ্চিমদিকের দরজা দিয়েই ঢুকলাম!

কঃ—[মৃদুহাস্তে] তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছি।

কিং—তবে কি আমার আসা সরকারীভাবে সমর্থিত হবে না?

কঃ—না হলেই আর ক্ষতি কি? ঢুকে তো পড়েছ—তা সরকারীভাবেই হোক বা বেসরকারীভাবেই হোক। এখানে এলে ওসব বৈষম্য থাকে না।

কিং—[হতাশার ভাব কাটিয়ে উঠে] হাঁ, কে দু'জন খিড়কী দিয়ে ঢুকে আপনার সঙ্গে দেখা করে মর্ত্যলোকের সমস্ত সাহিত্য-সংবাদ আপনাকে জানিয়ে গেছে বল্লেন?

কঃ—তাদের একজন গণসাহিত্যিক কুজ্ঝটিকা ভাস্কর, আর একজন কংগ্রেসী সাহিত্যিক ধূম্রলোচন চন্দ্র।

কিং—ওই ছুঁচো দুটো এসে আপনাকে কি সব ভাঁওতা মেরে গেছে? ওরা ত' এক একটি রাজনৈতিক দলের অনুচর ছাড়া আর কিছু নয়। পার্টির চশমা দিয়ে দুনিয়াকে যেমন দেখে সকলের সামনে তাই তুলে ধরে, মনে করে ওদের চেয়ে বিচক্ষণ লোক বুঝি আর কেউ নেই।

কঃ—[স্বগতভাবে] হাঁ ও তা মারলেই ত' আমাকে ভোলাতে পারবে না। তোমার উদ্দেশ্যই বা কি সাধু! তাছাড়া ওরা ছাপমারা তাই গায়ের দাগ দেখামাত্রই ওদের চিনতে পারি এবং সাবধান হই। কিন্তু তুমি যে মুখোসপরা প্রচ্ছন্ন অনুচর, কি অভিসন্ধি নিয়ে ফিরছ তা বোঝা কঠিন। [প্রকাশ্যে] এক একজন এল, তাদের কথা শুনিয়ে গেল। আমার বুদ্ধিতে যেটুকু কুলোল সেটুকু বুঝলুম এবং তার জবাব দিলুম, বাকী চুপকরে কান দিয়ে শুনলুম আর ঘাড় নাড়লুম। অবশ্য তাদের সমর্থন বা বিরোধিতা করার জন্তে নয়, তাদের কথা সব যেন শুনছি এইটা জানাবার জন্তে।

কিং—আগে কে এসেছিল? সে কি শোনাল?

কঃ—আগে ঐ গণসাহিত্যিকই এসেছিল। অনেক কথা বলেছিল, তার সব মনে পড়ছে না। তবে সারভাগটুকু মনে আছে, সেটাই বলছি। আমি এখানে চলে আসার আগে 'অখ্যাতজনের নির্বাক মনের কবিকে' যে ডাক দিয়ে এসেছিলুম সেই ডাকে তারা নাকি সাড়া দিয়েছে। তাই আমার কবিতা সেখানে পৌঁছাতে পারেনি, তাদের জীবনের সঙ্গে আমার পরিচয় না থাকায় আমার গল্পের কাহিনী বা চিত্র যুগোপযোগী হয়নি বা প্রত্যক্ষ-বাস্তবকে ফোটাতে পারেনি। তাই তারা নাকি তাদের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা দিয়ে সেই সব ফাঁক ভরিয়ে দিচ্ছে। কলকারখানার শ্রমিক, কৃষাণ, বস্তীবাসী, মূক, নিঃস্ব, নিপীড়িত জনতার তারা একমাত্র মুক্তিকামী সহৃদয় শুভার্থী। তাদের মধ্যে গণচেতনা জাগিয়ে ওরা মানুষ করে তুলছে এবং একটা নবযুগ এনে দিয়েছে। রাশিয়া থেকে নাকি সস্তায় অনেক বই আসছে। সেখানকার জীবনযাত্রার ধারা ও উন্নততর মানের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে ওরা জনগণের মনে বিপ্লব এনে দেবে। তারপর জনগণ একবার জেগে উঠলে, তারা নিজেদের পাওনা-গণ্ডা ছলে-বলে আদায় করে নেবে। এইভাবে শোষক সমাজ মুছে দিয়ে শ্রেণীহীন সমাজের অভ্যুদয় হবে।

[কবিগুরু কিছুক্ষণ থেমে থেমে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কিংশুকের বাধা পেয়ে চুপ করে গেলেন।]

কিং—এসব শুনে আপনি কি বললেন?

কঃ—এর ওপর আমার কিছু বলবার থাকতেই পারে না। জন-সাধারণের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হোক, যারা জীবনের ক্ষেত্রে দূরে পেছিয়ে রয়েছে তারাও এগিয়ে আসুক—এ আমি বরাবরই চেয়েছি এবং আন্তরিকভাবে কামনা করেছি। তবে সকলেরই বুদ্ধির পরিধি বা সহজাত বৃত্তিসমূহের সাযুজ্যকরণ কি করে সম্ভব তা আমার ধারণায় আসে না। আর একটা কথা শুনলুম যে, তারা সবাই মিলে কৃষাণ শ্রমিকের জীবন নিয়ে সাহিত্য রচনা করে নবযুগ এনে দিয়েছে, সেটাও আমার বুদ্ধির অগম্য। কয়লার খনির বা পানওয়ালীদের কথা অনেকে মিলে লিখলেই কি নবযুগ আসে? অন্ততঃ এই রকমের কোনো একটা ভঙ্গিমার দ্বারা যুগান্তরকে সৃষ্টি করা যায় একথা মানতে পারব না। সাহিত্যের মত দল-নিরপেক্ষ জিনিষ আর কিছু নেই। বিশেষ একটা ছাপমারা-দলের সাহিত্যিক দেখলেই গোড়াতেই তাকে অবিশ্বাস করা উচিত। [একটু থেমে] মানব জীবনের মোটা মোটা কথাগুলো আন্তরিকভাবে সকল সময়েই সমান থাকে বটে, কিন্তু তার বাইরের আকৃতি প্রকৃতির বদল হয়। আগে হয়তো কেবল ঋষি মুনি-রাজা-বাদশা প্রভৃতির মধ্যেই মনুষ্যত্বের প্রকাশ কবিদের কাছে সীমাবদ্ধ ছিল, এখন তার পরিধি সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। সাহিত্যে ধনী বা দরিদ্রকে বিষয়বস্তু করে নিলেই তার উৎকর্ষ ঘটে না, ভাব-ভাষা-ভঙ্গী সমস্তটা জড়িয়ে একটি মূর্তি সৃষ্টি হল কিনা এইটেই লক্ষ্য করবার বিষয়।

কিং—[ব্যগ্রভাবে] আইভরি টাওয়ারে লালিত-পালিত বুর্জোয়া মন কি সহজে বদলায়? [প্রকাশ্যে] তারপর—কংগ্রেসী সাহিত্যিক কোন্ নবযুগের বার্তা বয়ে এনেছিল?

আমেরিকার কাছে পাওয়া টাকার তারা ত' সারা দেশকে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপে তৈরী আজবপুরীতে পরিণত করার স্বপ্ন দেখে, আর তাদের পোষ্যদের দিয়ে ঢাক পিটিয়ে প্রচার

কঃ—[বিস্মিতভাবে] এ তো নতুন খবর শোনালে হে! কংগ্রেসী সাহিত্যিক যে আমেরিকার টাকায় পুষ্ট হয়ে অসত্য প্রচার করছে একথা কোনদিনই বিশ্বাস করতে পারবো না। যতই হোক তার পেছনে যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার একটা বড় আদর্শকে সে কখনই জলাঞ্জলি দিতে পারে না।

কিং—[মাঝখানে বাধা দিয়ে] আদর্শ তো অনেক দিন দেউলিয়া হয়ে গেছে। অখণ্ড দেশকে যেদিন জবাই করে স্বাধীনতা নেওয়া হল তখন তার আদর্শ রইল কোথায়?

কঃ—দেশ ভাগ করা ব্যাপারটা অপরিহার্য এবং অনিবার্য হয়ে উঠেছিল বলেই ওরা সেটা মেনে নিয়েছে; যদিও আমি জেনেছি যে গান্ধীজী কখনই এ প্রস্তাবের পক্ষে মত দেননি। কিন্তু সে কথা যাক। কংগ্রেসী সাহিত্যিক এসে যা শোনাল তার সারমর্ম এই যে—বিয়াল্লিশ সালের আগষ্ট আন্দোলনে দেশের সব নেতা আর কর্মীরা যখন জেল-গারদে আটক পড়েছে সেই সময় ঐ কৃষাণ-শ্রমিক দরদীরা নাকি 'জনযুদ্ধ' নাম দিয়ে ইংরেজকে পরোক্ষে সহায়তা করে এবং সুভাষের আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের আন্দোলনকে প্রতিরোধ করবার সঙ্কল্প নেয়। সেই সময় থেকে বিভ্রান্ত দেশবাসীকে ঠিক পথে আনবার জন্যেই ঐ কংগ্রেসী সাহিত্যিকরা একটা সংস্থা গড়ে তোলে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে বলা চলে যে, এদের

উদ্দেশ্য হল গণসাহিত্যিকদের ঠেকিয়ে রাখার জন্যে তাদের শিবিরের একটা প্রতিশিবির স্থাপন করা। এরা অবশ্য বড় গলায় বলল যে, আমার সাহিত্য ও গান যাতে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নির্ভুল ভাবে প্রচারিত হয় তার যথোচিত ব্যবস্থা করছে এবং জনসাধারণের কাছে দেশের সাংস্কৃতিক ধারার ও ধর্ম সাধনার চিত্রটি অবিকৃতভাবে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে তৎপর হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন আগে মোহিতলালের কাছে যা শুনলাম তাতে ত' আশার কিছু দেখতে পাচ্ছিনে। মনে হচ্ছে ভরাডুবির সময় আসন্ন।

কিং—মোহিতলাল আবার এখানে এসেছিলেন নাকি ?

কঃ—সেই তো তৃতীয় ব্যক্তি যার সঙ্গে এখানে আমি সাক্ষাৎ করেছি। আমার পর যারা এই অমরধামে সদর-দরজা দিয়ে ঢুকতে পেয়েছে সে তাদের অন্যতম এবং আমাকে সাহিত্য-জগতের সবচেয়ে আধুনিক খবরটুকু সে দিয়েছে। এখন মনে পড়েছে, ওই আমাকে কথা-প্রসঙ্গে তোমাদের প্রগতি সাহিত্যের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে।

কিং [বিস্মিতভাবে] মোহিত-লাল তো একজন গোঁড়া রক্ষণশীল সাহিত্যিক ছিলেন, যিনি কোনদিনই মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের বাইরে কিছু থাকতে পারে তা ভাবেননি। এমনকি আপনার সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা স্বচ্ছ বা অনুকূল ছিল না। তিনি প্রগতি-সাহিত্যের কি সংবাদ দিতে পারেন ?

কঃ—[মৃদুহাস্যে] যে যাই বলুক, মোহিতলাল যে একজন শক্তিধর সাহিত্যিক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তার মত অকপট, নির্ভীক, সাহিত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি আমি অল্পই দেখেছি। রক্ত-মাংসের শরীরে তার খোঁচা খোঁচা পীড়াদায়ক হত বটে, কিন্তু নশ্বর অবস্থা কাটিয়ে আজ বুঝতে পারছি যে অন্ধভক্তি বা বীরপূজা না করালে সাহিত্যের বিচারে ন্যায্য মূল্য দেওয়া যায় না। মোহিত-লালের শক্তভাবকে আমি বরাবরই প্রশংসা করেছি। তার কাব্য সত্যিকার রসোত্তীর্ণ বস্তু, জগঝম্প-মার্কা নয় অর্থাৎ তাতে ঢাকঢোল, পাঁয়তাড়া মারা পালোয়ানী নেই। সমালোচক মোহিতলাল কঠোর হলেও সত্যিকার রসের অনাদর করেন না। তুমি বললে আমার সম্বন্ধে তার ধারণা প্রতিকূল। কিন্তু তুমি তার 'রবি-প্রদক্ষিণ' পড়লেই বুঝতে পারতে তোমার অভিযোগ ঠিক নয়। মোহিত আমাকে দুঃখ করে বলল যে, এখানে আসার আগে 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র কাব্য' নাম দিয়ে সে যে কাজটা আরম্ভ করেছিল সেটা শেষ করে আসতে পারল না।

কিং—[মৃদু কটাক্ষে] শেষ হয়নি ভালোই হয়েছে, শেষ হলে তাঁর কালা-পাহাড়ী গদায় আপনার কীর্তি হয়তো চুরমার করে দিতেন।

কঃ—মোহিতের সম্বন্ধে এরকম ধারণা তোমাদের থাকা উচিত নয়। এরকম সদালাপী স্বার্থত্যাগী সাহিত্য-ব্রতী সত্যই দুর্লভ। মানুষ হিসেবে সে বরাবরই ছিল সরল। কিন্তু পাঁচ-জন মতলববাজ মিলে তাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করেছে। শুনলাম তারাই আবার শেষ বয়সে ওকে কোণঠাসা করে গলাটিপে ধরার চেষ্টা করেছে। জীবনের ট্র্যাজেডী বুঝি এমনি করেই দেখা দেয়। সামান্য ভুলের জন্যে কি অপরিসীম দুঃখ ভোগ করতে হয়। [কিছুক্ষণ থেমে] কিন্তু তোমার কথা ত' কিছুই শোনা হল না। এবার বল শুনি।

কিং—আমার কথা ত' আপনি ইতিপূর্বেই মোহিতলালের মুখে শুনে ফেলেছেন। আর কি সেটা শোনবার থাকে ? অন্য কথা বললেও হয়তো বিশ্বাস করবেন না।

কঃ—[অপ্রতিভ হয়ে] না না—মোহিত বিশেষ কিছুই বলেনি। সে এসে বলল : অনেকদিন থেকে আপনার মুখে কিছু বিশুদ্ধ সুরের সঙ্গীত শোনবার ইচ্ছা হয়েছে। তাই এখানে এসে মনে হল একসঙ্গে আলাপ ও সঙ্গীতশ্রবণ দুই কর্মই হবে। সেই শিলাইদহে বোটের ওপর আপনার সঙ্গে যে আলাপ-আলোচনা হয়েছে তারপর ত' আর দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। আমি বললাম : কেন, আমার গান কি আর কেউ গায় না ? সবাই কি আমার কথা ভুলে গেছে ? তাতে মোহিত জবাব দিল : কমরেড আর প্রগতি-ওয়ালাদের দৌলতে আপনাকে ভোলার উপায় আছে কি ? উৎসব-অনুষ্ঠানে তারা পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে-গলিতে আপনাকে জীবন্ত করে রেখেছে। পঁচিশে বৈশাখ পালনের সে কী ঘটা, সরস্বতী পূজাও হার মেনে যায় ! তাও আবার শুধু আপনার নাম দিলে অনুষ্ঠানের ত্রুটি থেকে যায়। তাই তারা 'রবীন্দ্র-সুকান্ত-নজরুল' দিবস পালন করে আপনাদের তিনজনকে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়ে সাহিত্যরাজ্যের ধর্মহীন শ্রেণী-হীন সমাজব্যবস্থা স্থাপনের নমুনা দেয়। তাছাড়া লোকের বাড়ীর পালপার্বণ, বিয়ে, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি উপলক্ষে যাইকে আপনার যে সঙ্গীত পরিবেশিত হয় তাতে মনে হয় যেন কালবৈশাখীর ঝড় বইছে বা গোঁয়ারের চিৎকার বেরিয়েছে। এরপরও আবার বেতার থেকে (থুড়ি, আধুনিক নাম বুঝি আকাশবাণী)—সময়ে সময়ে পাঁক-চুরীর কান্নার মত সে কী আওয়াজ !

মোহিত আরও বলল: আর একটা ব্যাপারও থেকে রাখুন কবিগুরু। আপনার স্মৃতি রক্ষার্থে সরকার থেকে দুটি পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিয়মাবলীতে আছে যে, বছরের সেরা দুটি প্রতিভাকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু কার্যকালে দেখা যায়, বিচারকগণ কাব্যের চেয়ে কবিকেই বেশী দেখেন এবং অনেক স্থলে সেটা award for the merit না হয়ে compassionate gratuity হয়ে যায়। [চিন্তাক্লিষ্টভাবে একটু থেমে] সেদিন আমার গলাটা একটু খারাপ ছিল। তাছাড়া এই সব শুনে মনে খুব ব্যথাও পেয়েছিলুম। তাই নিজে না গেয়ে দীনুকে ডাকিয়ে এনেছিলুম। দীনু মানে দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। দীনু এসে মোহিতের নির্দেশ মত তিনটি গান গাইল। প্রথমে গাইল—'সে ছিল আমার স্বপনচারিণী', তারপর 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো', আর সব শেষে 'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর'। শুনে মোহিত এত উচ্ছ্বসিত হল যে তার প্রাণখোলা হাসি ও আনন্দ দেখে আমিও খুশীতে আগেকার সব কথা ভুলে গেলাম। যাক্—দেরী হয়ে যাচ্ছে, এবার তোমার কথা শোনাও। আমার আবার সন্ধ্যা-উপাসনার সময় এগিয়ে আসছে। চটপট সেরে নাও।

কিং—[প্রশান্তভাবে] কথায় বলে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। আজীবন নিন্দুক মোহিতলাল তাই এখানে এসেও তাঁর স্বভাব বদলাতে পারেননি দেখছি। আমাদের অতি-আধুনিক প্রগতি-সাহিত্যের কিছু না পড়ে, না জেনে আমাদের সম্বন্ধে এই সব মারাত্মক কথা প্রচার করেছেন এবং সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে আপনার মন এমন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে যে এখন আমি যাই কিছু বলি না তা' আপনার ভালো লাগবে না।

কং—[ঈষৎ গাম্ভীর্য নিয়ে] আধুনিকতাই বল আর প্রগতিই বল আমি শুধু এই বুঝি যে, বড়ো সাহিত্যে যে একটা গুণ থাকে সেটা হচ্ছে অপূর্বতা, ওরিজিন্যালিটি। সাহিত্য যখন বিশেষ শক্তিমান থাকে তখন সে চিরন্তনকেই নতুন করে প্রকাশ করতে পারে। এই তার আসল কাজ। একেই বলে ওরিজিন্যালিটি। যখনি সে আজগুবিকে নিয়ে গলা ভেঙে, মুখ লাল ক'রে, কপালের শিরগুলিকে ফুলিয়ে তুলে ওরিজিন্যাল হতে চেষ্টা করে, তখনি বোঝা যায় তা' শেষ দশায় এসেছে। জল যাদের ফুরিয়েছে তাদের পক্ষে আছে পাঁক। তারা বলে সাহিত্য-ধারায় নৌকা চলাচলটা অত্যন্ত সেকেলে আধুনিক উদ্ভাবনা হচ্ছে পাঁকের মাতুন, এতে মাঝিগিরির দরকার নেই—এটা তলিয়ে যাওয়া রিয়ালিটি।

কিং [অসহিষ্ণুভাবে] সামন্তযুগের সংস্কার ছাড়ান শক্ত হ'ল দেখছি। [প্রকাশ্যে] আমার কবিতার খানিকটা পড়ে শোনাই, তা না হ'লে আপনার ধারণা বদলাবে না। [অতি সন্তর্পণে পকেট থেকে কবিতাটি বার ক'রে, গলার স্বরকে উচ্চগ্রামে চড়িয়ে পড়তে লাগল]

"শ্যাওড়া গাছে দেশলাই কাঠির ডিঙে
থাকবে নয়,
তিমিঙ্গিলাসের অবিরাম অন্ধ্যলায়ে,
কিম্বা আণবিক বোমার প্রচণ্ড
বিস্ফোরণে
গলিতধাতু আর ইউরেনিয়ামের
রেখা
দুপায়ের চিহ্ন দেখি রক্তাক্ষরে লেখা

কং—[বাধাভাবে] এ কথা নীর স্তুতির অবসান করো প্রভু! [প্রকাশ্যে] সাধু, সাধু, এ যে একেবারে আমার নিবারণ চক্রবর্তীকেও হার মানিয়েছে দেখছি। বাস্তবিকই এরকম ওরিজিন্যাল্ কবিতা আমার কল্পনাতীত।

কিং—[উল্লসিত হয়ে] দেখুন, তাহলে আপনি স্বীকার করলেন যে আমার কবিতা কারও অনুকরণ নয়—রীতিমত ওরিজিন্যাল্। এই স্বীকৃতি পাবার জন্যেই আপনার সঙ্গে দেখা করা।

[কিংশুকের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কবিগুরুর সেক্রেটারী জানালেন যে তাঁর উপাসনার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।]

কিং—আচ্ছা তাহলে আসি [চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে কবিগুরুকে প্রণাম করল।]

[কবিগুরু তিনবার 'স্বস্তি-স্বস্তি-স্বস্তি' উচ্চারণ করে দাঁড়ালেন এবং প্রশান্ত গম্ভীর পদক্ষেপে অন্দরমহলে প্রবেশ করলেন। তাঁর সেক্রেটারী কিংশুকের সঙ্গে বাইরের দেউড়ী অবধি এলেন এবং বিদায় নমস্কার জানিয়ে আবার ভেতরে চলে গেলেন।]

পর পর কতকগুলি মশার কামড়ের জ্বালায় কিংশুকের তন্দ্রার গভীরতা কেটে যাওয়ায় এখানে তার স্বপ্নের ছেদ পড়ল। তন্দ্রার গভীরতার বিরতি ঘটলেও তখনও সে পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় আসেনি। হঠাৎ কিসের একটা শব্দ তাকে চমকে জাগিয়ে দিল এবং তন্দ্রাতুর চোখ রগড়াতে রগড়াতে চেয়ে দেখল মহা সর্বনাশ কাণ্ড। দোয়াতদানি থেকে কালির দোয়াতটা উল্টে গিয়ে কবিতার পাতায় গড়াগড়ি দিচ্ছে আর তার ছড়িয়ে পড়া কালিতে অত কষ্টের লেখাটুকু একেবারে মুছে

গেছে। হতভম্ব হয়ে আশে-পাশে চারদিকে তাকিয়েও বুঝতে পারল না কেমন করে এমন একটা প্রাকৃতৌতিক কাণ্ড ঘটল। কিন্তু পরক্ষণেই টেবিলের ওপর একটা টিকটিকিকে জুল্ জুল্ করে অপরাধীর মত তারই দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বুঝল যে ওপরের কড়িকাঠ থেকে সেটি ঝাঁপ খেয়ে পড়ে এই কাণ্ডটি করেছে। এখন তার কি উপায় হবে? দেওয়ালে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল রাত চারটে বেজেছে। একটা রুদ্ধ-আক্ষেপে ও ধিক্কারে সে কালিপড়া কবিতার পাতাটাকে খাতা থেকে ছিঁড়ে নিয়ে কুঁচিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল এবং চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে মাতালের মত টলতে টলতে শোবার ঘরের দিকে পা বাড়াল।

গীতার্থ-সন্ধানে

—শ্রীগণেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত

—অষ্টম পরিচ্ছেদ—

(পূর্বানুবৃত্তি)

সমগ্র জ্ঞান

অর্জুনের জিজ্ঞাসিত শ্রেয়োলাভের উপায় নির্দেশ করিতে গিয়া শ্রীভগবান্ গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত তাঁহার কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। তৎপর দেখিতে পাই জিজ্ঞাসিত না হইয়াও তিনি সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম হইতে অর্জুনকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশে প্রবৃত্ত হইলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ক্রমে তদন্তর্গত নানা জটিল তত্ত্বের অবতারণা করিলেন। বস্তুতঃ এই সকল তত্ত্বালোচনা গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় সমস্ত অবশিষ্টাংশ জুড়িয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসিত না হইয়াও তিনি হতবুদ্ধি অর্জুনকে কেন এইরূপ দীর্ঘ তত্ত্বালোচনা শুনাইতে প্রবৃত্ত হইলেন তাহা আমরা প্রণিধান করিতে চেষ্টা করিব।

অর্জুন কঠিন সমস্যায় বিব্রত। বস্তুতঃ এই সংসারে সকলেই নিজ নিজ সমস্যায় পীড়িত। এই সকল সমস্যা জীবের শান্তিলাভের অন্তরায়। ঐ অন্তরায়সমূহ দূর করিয়া সকলেই শান্তিলাভের জন্য চেষ্টিত। এজন্য মানুষ অহরহঃ ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছে, কিসে শান্তিলাভ হইবে তাহা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু শান্তি তাহার কিছুতেই মিলিতেছে না। ইহার কারণ, সে ভুলপথে চলিয়াছে; সাংসারিক বিষয়ের মধ্যেই সে শান্তির সন্ধান করিতেছে। অজ্ঞান জীব জানে না অনিত্য সাংসারিক বিষয় কোনকালেই শান্তি দিতে পারে না। বস্তুতঃ ঐ বিষয়সমূহই শান্তির অন্তরায়; উহারাই জীবের নানা সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। এই সমস্যার কবল হইতে মুক্ত হইতে হইলে সাংসারিক বিষয় হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া যাহা হইতে সংসারের উৎপত্তি, স্থিতি সেই আদি কারণের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে; সংসার-প্রপঞ্চের মূলীভূত কারণ সেই ব্রহ্মকে জানিতে হইবে; তাহাতে তন্ময় হইতে হইবে। আনন্দ-স্বরূপ সেই পরমবস্তুকে না জানা পর্যন্ত, তাহাতে যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কাহারও কোন সমস্যার আত্যন্তিক সমাধান সম্ভব নয়। আর ঐ সকল সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত জীবের আকাঙ্ক্ষিত শান্তি লাভও সম্ভব নয়। অজ্ঞান জীব একথা জানে না। সংসারের ঊর্ধ্বে তাহার দৃষ্টি নাই, ব্রহ্মবস্তু কি তাহা সে জানে না। বস্তুতঃ গুরুরূপী ভগবান কৃপা করিয়া তাহা না জানাইলে কেহ উহা জানিতেও পারে না। তাই জগদ্-গুরু শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবান প্রিয়শিষ্য অর্জুনের প্রতি একান্ত কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহাকে সেই ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; জিজ্ঞাসিত না হইয়াও সেই পরম-তত্ত্বের গূঢ়ার্থ প্রকাশ করিতে তৎপর হইলেন—কারণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হইলে অর্জুনের কোন সমস্যারই স্থায়ী সমাধান সম্ভব হইবে না।

আর্য ঋষিগণের দৃষ্টিভঙ্গীর ইহাই বৈশিষ্ট্য। সাধারণ জীবের দৃষ্টি অন্তরূপ। পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাময়িক ইত্যাদি যে সকল সমস্যা লইয়া সে

নিয়ত তাহার প্রত্যেকটিকে সে পৃথকভাবে সমাধান করিতে চায়। একের সঙ্গে অপরের কোন সম্পর্ক সে দেখিতে পায় না। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সমস্যার সহিত পারমার্থিক সমস্যার কোন সম্পর্ক সে স্বীকার করে না। প্রত্যেকটী সমস্যার পৃথক পৃথক গণ্ডীর মধ্যেই সেই সেই সমস্যার মীমাংসা সে করিতে চায় কিন্তু স্বষ্ঠু সমাধান তাহার মিলে না। [আর্য ঋষিগণের দৃষ্টি কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরূপ। তাঁহাদের মতে জীবনের সর্বপ্রকার সমস্যার আত্যন্তিক সমাধান একমাত্র আধ্যাত্মিক ভূমিতেই সম্ভব হইয়া থাকে।] সর্বপ্রকার জ্ঞানের মূলকেন্দ্রও আধ্যাত্মিকতায়। যে কোন বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান এবং যে কোন সমস্যার পূর্ণ মীমাংসা লাভ করিতে হইলে ব্রহ্মতত্ত্বের আশ্রয় লইতে হইবে। পরমবস্তুর জ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত একটী ধূলিকণারও পূর্ণজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়—ইহাই তাঁহাদের মত। (তাঁহারা বলেন এক ব্রহ্মবস্তুকে জানিলেই সব জানা হইয়া যায়; অন্যথায় কিছুই জানা যায় না।) এই ঋষিপন্থা অবলম্বন করিয়াই ভগবান অর্জুনকে সর্বজ্ঞানের মূলকেন্দ্র ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশে প্রবৃত্ত হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমেই দেখিতে পাই শ্রীভগবান বলিতেছেন "সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু" (৭।১)—সমগ্র আমাকে অর্থাৎ আমার যাবতীয় ভাবকে যেরূপে জানিতে পারিবে তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর। কিন্তু পার্থসারথি তাঁহাকে জানিবার জন্য অর্জুনকে বলিতেছেন কেন? অর্জুনের ব্রহ্মজ্ঞান প্রয়োজন হইতে পারে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার জানিবার আবশ্যকতা কি? এ প্রশ্নের সমাধান তিনি অর্জুনের নিকট পূর্বেই করিয়াছেন। সৃষ্টির আদি কারণ পরাৎপর ব্রহ্মবস্তুই যে নরদেহ পরিগ্রহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন; জন্ম-মরণ-রহিত ব্রহ্মসত্তাই যে স্বকীয় অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়াশক্তিবলে মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এ সংবাদ শ্রীভগবান পূর্বেই অর্জুনকে শুনাইয়াছেন—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানা-
মীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্ম-
মায়য়া॥" (৪।৬)

নবম অধ্যায়ে "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" ইত্যাদি মন্ত্রে (৯।১১) এবং চতুর্দশ অধ্যায়ে "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" ইত্যাদি মন্ত্রে (১৪।২৭) এই তত্ত্ব আরও বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন। বলিয়াছেন ব্রহ্মবস্তুর সহিত আমি অভিন্ন; আমিই ব্রহ্মবস্তু। সুতরাং আমার তত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব একই বস্তু। ব্রহ্মস্বরূপ আমার তত্ত্ব অবগত হও; আমাকে তত্ত্বতঃ জান, তবেই তুমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া পূর্ণজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

কোন বস্তুকে জানিতে হইলে উহার কোন বিশেষ অংশ বা খণ্ডকে জানিলেই হয় না; উহার প্রত্যেক অংশের সহিত অন্যান্য অংশের ও সমগ্র বস্তুটীর সহিত প্রতিটী অংশের সম্বন্ধ কি তাহাও সম্যক্‌ভাবে জানিতে হয়। দেহচ্যুত কোন একটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে জানিলে উহার স্বরূপ ঠিক ঠিক জানা হয় না। দেহের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় উহার আকার কি, অবস্থা কি, কার্যকারিতা কি, সমস্ত দেহযন্ত্রের সঙ্গে উহার সম্পর্ক ও প্রয়োজনীয়তা কিরূপ ইত্যাদি সমস্ত জানিলে তবেই উহার বিষয় ঠিক ঠিক জানা হয়—বিষয়টি তত্ত্বতঃ জানা যায়। বিচ্ছিন্নভাবে, খণ্ডিত অবস্থায় কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে জ্ঞান উহা জ্ঞানপদবাচ্য নহে—উহা অজ্ঞানতারই নামান্তর। আমরা কিন্তু এইরূপ খণ্ডিত জ্ঞান লইয়াই সংসারে বিচরণ করিয়া থাকি। তাই আমরা অজ্ঞানের মধ্যেই ডুবিয়া রহিয়াছি। এক অখণ্ড বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত অবস্থাতেই খণ্ডিত বস্তুর অস্তিত্বের সার্থকতা—সেই অখণ্ডবস্তু হইতে সম্পর্কহীন অবস্থায় উহা নিরর্থক ও ভ্রান্তিমূলক। [কোন বস্তুর প্রকৃত সত্তা কি, উহার স্বরূপ কি—ইহা জানিতে হইলে অখণ্ড নিত্যবস্তুর সঙ্গে উহার যে সম্পর্ক তাহা দেখিয়াই উহার বিচার করিতে হইবে।] কাজেই "সমগ্রং মাং" গোটা আমিকে গোটা ব্রহ্মবস্তুকে জানিতে হইবে—অংশ বা খণ্ড 'আমি'কে জানিলে প্রকৃত জ্ঞান হইবে না। সৃষ্টিতে যাহা কিছু দেখি, যাহা কিছু কার্য, কারণ, ভাব, প্রকাশ ইত্যাদি দেখি তাহার প্রত্যেকটীই এক একটী 'খণ্ড আমি' বা ভগবানের এক একটী ক্ষুদ্র, খণ্ডিত অভিব্যক্তি। কারণ সমস্ত বিশ্ব শ্রীভগবানের মাত্র একাংশে অবস্থিত—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" (১০।৪২)। শ্রুতিও বলিতেছেন "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি"—ভূতসকল পরমেশ্বরের এক পাদ মাত্র। কাজেই সমস্ত সৃষ্টিতে যাহা কিছু আছে তৎসমস্ত একত্র করিলেও ভগবৎ-সত্তার এক ক্ষুদ্র অংশই থাকিয়া যায়। উহার জ্ঞানও খণ্ড জ্ঞান; উহা লাভ করিলেও পূর্ণজ্ঞান লাভ হয় না। পূর্ণের সঙ্গে খণ্ডের সম্বন্ধ জানিতে হইবে—পূর্ণের পরিপ্রেক্ষিতে খণ্ডকে বুঝিতে হইবে। [ব্রহ্মবস্তু কি, সৃষ্টি কি, জীব কি, একের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক কি, সমস্ত বিস্তৃতভাবে না জানা পর্যন্ত পূর্ণজ্ঞান লাভ হইবে না।] আর তাহা না হইলে

জীবন সমস্যারও সমাধান হইবে না। অর্জুন আজ যে জীবন সমস্যায় সম্মুখীন হইয়াছেন, উহার সুষ্ঠু সমাধান করিতে হইলে সেই "সমগ্রং মাং" জানা প্রয়োজন। তাই জিজ্ঞাসিত না হইয়াও পরমদয়ালু ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ সেই জ্ঞান দানের জন্য ঐ সকল গম্ভীর তত্ত্বের অবতারণা করিলেন। এই সমস্ত তত্ত্ব অনুধাবন করিতে না পারিলে, কোন বস্তু, বিষয় বা কার্যই যে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র বস্তু নহে, সমস্তই এক বিরাট সত্তা বা কার্যের অংশ মাত্র এবং সেই বিরাটের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, ইহা বুঝিতে না পারিলে এবং সেই বিরাটের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অবস্থায় ঐ বস্তু বা বিষয়ের স্থান, মূল্য বা উপযোগিতা কি তাহা জানিতে না পারিলে ঐ বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইবে না—তথাকথিত যে জ্ঞান হইবে উহা অজ্ঞানতা মাত্র; উহা বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করিবে। এই সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে যদি কোন বিশেষ বস্তু, ভাব বা কার্যকে দেখিতে পারি, তাহা হইলেই উহার কার্যকারিতা, প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান হইবে। সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে যাহা নিষ্প্রয়োজন বা অহিতকর, তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে—যাহা অনুকূল বা হিতকর তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। আমার একটী অঙ্গুলীতে দুষ্টক্ষত হইয়াছে। চিকিৎসক বলিতেছেন অবিলম্বে অঙ্গুলীটী ছেদন করা প্রয়োজন; নতুবা প্রাণনাশ হইতে পারে। অঙ্গুলী বলিতেছে—আমাকে কাটিবে কেন? অপরের কি হইবে না হইবে আমি দেখিতে যাইব কেন? আমি স্বস্থানে থাকিতে চাই। সে নিজকেই দেখিয়াছে; যে দেহের সঙ্গে সে সংযুক্ত যাহার অস্তিত্বে তাহার অস্তিত্ব, সে দিকে তাহার দৃষ্টি নাই। গোটা দেহবিধানকে যিনি জানেন, প্রত্যেকটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে উহার কি সম্বন্ধ ও কি প্রয়োজনীয়তা তাহা যিনি জানেন, তিনি কি অঙ্গুলীর ইচ্ছামত কার্য করিবেন? অঙ্গুলী তাঁহার নিকট ত্যাজ্য। বিশ্ববিধানেও এই যুক্তি। যাহা বিশ্ববিধানের প্রতিকূল তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে—ইহাই ধর্ম। এই ব্যবস্থাতেই বিশ্ববিধান বিধৃত ও রক্ষিত হইয়া থাকে। তাই যে দুষ্কৃতিকারিগণ বিশ্ববিধানের প্রতিকূল-কর্মপরায়ণ, তাহাদের বিনাশ সাধন, সমাজরক্ষার ভার যাহার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে সেই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পাপকর্ম নহে—বরং তাহাই ধর্মকার্য।

শ্রীভগবান অর্জুনকে যে জ্ঞান উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা লাভ করিলে সব কিছু জানা হইয়া যায়; আর কিছুই জানিতে বাকী থাকে না—

"যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌
জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে" (৭।২)।

আর সেই জ্ঞানদৃষ্টিতে নিখিলজগৎকে এক অখণ্ড বস্তুর অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়—

"যেন ভূতান্যশেষাণি
দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি" (৪।৩৫)

কিন্তু এই জ্ঞান অতি দুর্লভ। হাজার হাজার মানুষের মধ্যে একজনও এই জ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টিত হয় কিনা সন্দেহ। খণ্ডজ্ঞান লইয়াই সকলে ব্যস্ত—অখণ্ড জ্ঞানের সন্ধান কেহ করে না। আর যাহারা এ বিষয়ে চেষ্টাপরায়ণ তাঁহাদের মধ্যেও অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই সেই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্
যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং
বেত্তি তত্ত্বতঃ॥" (৭।৩)

'তত্ত্বতঃ' জানাই প্রকৃত জ্ঞান। সমগ্র জ্ঞানের পটভূমিতেই বস্তুবিশেষের প্রকৃত জ্ঞান সম্ভব।

এই সমগ্র জ্ঞান কি ভাবে লাভ হইবে? যোগাবলম্বনে ধ্যানপরায়ণ হইয়া জ্ঞান লাভ করিতে হয়, একথা আমরা গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে শুনিয়াছি। সমগ্র জ্ঞান, যাহা লাভ করিলে আর কিছুই জানিতে বাকী থাকে না, তাহা কি উপায়ে লাভ হইবে? বলিতেছেন—আমাতে একান্ত আসক্তিযুক্ত হইয়া আমাকেই আশ্রয় করিয়া যোগাভ্যাস কর, সমগ্র জ্ঞান লাভ করিবে—

"ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং
যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি
তচ্ছৃণু॥" (৭।১)

লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণরূপী আমাতে একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া আমাকেই আশ্রয় করিয়া যোগ অভ্যাস করিলে, আমার ধ্যান ধারণায় নিমগ্ন থাকিলে, সৃষ্টির সমস্ত রহস্য তোমার নিকট উদ্‌ঘাটিত হইবে; ইহাতে কোনই সংশয় নাই। পুরুষোত্তমে সর্বতোভাবে যুক্ত হইয়া তাঁহারই সেবাপূজা, ধ্যান ধারণায় রত থাকিলে, তাঁহারই জন্য জীবন উৎসর্গ করিলে, সমগ্র জ্ঞান লাভ সম্ভব হইয়া থাকে। নিখিল জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশ করিবার এই গোপন সঙ্কেত প্রদান করিয়া শ্রীভগবান গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতে জ্ঞানগম্য যাবতীয় তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

[অনিবার্য কারণ বশতঃ দশম সংখ্যায় এই উপন্যাস ছাপান সম্ভব হয়নি।—সম্পাদক]

বিকেলের দিকে ইচ্ছে করেই বিপ্লববাবুর দিকে যাইনি, কি জানি যদি কোনো উত্তেজনায় বাড়াবাড়ি হয়।

আলবার্টও দেখছি ক'দিন বিশেষ আসছে না; অন্ততঃ আজ সকাল থেকেই আমার ঘরের দিকে আসেনি।

একটা শাল গায়ে দিয়ে গঙ্গার ধারের জানলাটা খুলে বসে রইলাম। বেশ একা একা মনে হচ্ছিল। কোথায় গেল সে কৈশোর, সে নানা রঙের দিনগুলি! ছাত্রজীবন শেষ হতে না হতেই এ এক বিচিত্র জীবন।

এ দু'মাসে বাড়িতে একটা চিঠিও দেওয়া হয়নি। শুধু পৌঁছানোর সংবাদটা পাঠিয়েছি। বাড়ি থেকে মা লিখেছেন—ওসব ম্লেচ্ছ জায়গায় আর চাকরী করতে হবে না। যারা যীশুর আরাধনা করে, মায়ের ধারণা, ছেলেকেও তারা ধরে-বেঁধে বিধর্মী করে তুলবে।

মনে মনে হাসি পেল। আসবার সময়ে মায়ের সে সকরুণ হাসি মনে পড়ল—সে-রকম বুঝলে কিন্তু পালিয়ে আসবি। পয়সায় দরকার নেই বাবা।

মা-কে আমার অবস্থাটা বোঝাতে পারিনি। সংসারে তাঁর যেমন দায়-দায়িত্ব আছে, আমারও যে বড় ছেলে হিসাবে কিছুটা দায়িত্ব বহন করার সময় এসেছে একথা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। আমি এখনও তাঁর সেই ছোট্ট ছেলেটিই আছি—মায়ের এ বিশ্বাস আজও বদ্ধমূল।

গঙ্গার স্রোতের দিকে চেয়ে চেয়ে মায়ের মুখখানা মনে পড়ল। গঙ্গাদেবীর তো মাতৃভাব আছে, যা হয়তো তাই ওখানেও পরিস্ফুট।

মা একদিক থেকে কথাটা অন্যায় বলেননি। ভাল না লাগলে চলে আসিস্। এবার মাকে চিঠি লিখে জানাতে হবে—মা, এখানকার মানুষগুলো তোমার ছেলেকে বিধর্মী করবার জন্যে ব্যস্ত নয়। তারা সকলেই আমাকে ভালবাসে।

এখানকার পরিবেশটা সত্যিই আমার ভাল লেগেছে। মানুষগুলো জীবনে খাই চারাক, দেউলিয়া হয়ে যায়নি। বরং ওদের উদারতা বেড়েছে। তাই হয়তো ওরা মানুষকে তার প্রাপ্য সম্মানের অতিরিক্ত পাওনা দিয়েছে।

পিয়ার্সন সাহেব, মিসেস্ গুয়েজার, মিস্ প্যাট্রিক, আলবার্ট—এরা সকলেই প্রশস্ত হৃদয়ের মানুষ। আমার এ অল্প-দিনের অভিজ্ঞতা থেকেই যে বলা তা নয়, তাঁদের জীবনের পরিধি থেকেও সে-সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র এখানে আলবার্ট। আমার ওপর ওর যেন একটা স্বাভাবিক টান হয়ে গেছে এরই মধ্যে।

সেদিন কেমন নিঃসংকোচে তার কাহিনীটি বলে গেল। সত্যিই ওর জীবন বড় রিক্ত। মিস্ প্যাট্রিক হয়তো এ ঘটনাটাকে উপেক্ষা করতে

চান, কিন্তু আলবার্ট কি তাই পারে ? বন থেকে তুলে শালফুল মাথায় দিয়েছিলাম শুকিয়ে যেতে ফেলে দিয়েছি—একথা আলবার্ট কি করে বলবে !

গতকাল এক ফাঁকে দেখা হওয়ায় আলবার্ট সেকথা আমাকে বলেছে। ওর কি সরল অন্তঃকরণ ! আমাকে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল—আপনি তো আপনার কথা বললেন না ! জীবনে কাউকে আপনি ভালবাসেননি ?

হেসে আলবার্টকে শান্ত করেছিলাম, পরে বলব বলে। আলবার্টও পীড়াপীড়ি করেনি। কিন্তু কি বলব তাকে ! আমি কি সত্যিই কাউকে ভালবাসতে পেরেছি ?

গঙ্গার দিকে চেয়ে অতীতের সেইদিনগুলো মনে করবার চেষ্টা করলাম। জীবনে কি কাউকে ভালবেসেছিলাম ?

আচ্ছা, কাজলকে কি আমি ভালবাসতে পারিনি ?

মনে পড়ল সে-সব দিনের কথাগুলো। সব যেন এক্ষণি ঘটেছে। সেদিনের কাজলকে মনে পড়ল। ছেলেবেলায় একই ছায়ায় আমরা বড় হয়েছিলাম। বোশেখের কত কাঠফাটা রোদ, শ্রাবণের কত কান্নাঝরা বিকাল, ফাল্গুনের ঝিরঝিরে হাওয়ায় কত সকাল আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি।

সকালে আমি বেড়াতে বেরোতাম আর কাজল আসত ফুল পাড়তে। সেই অল্প আলোর সকালগুলো কেটে যেত কাজলের ফুল-পাড়া দেখতে দেখতে।

দু-চারটে উপরের ডালের ফুল পাড়তে না পেরে কাজল আমার সাহায্য চাইত—দাঁড়িয়ে দেখছো, দুটো ফুল পেড়ে দাও না !

কখনও বলতাম—ফুল তুলতে দিচ্ছি এই কত না, আবার পেড়ে দিতে হবে ! কি আবদার !

আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে কাজল মুখটা এমন বিষণ্ণ করত যে, আমি তখন নিজেই বলতাম—আচ্ছা, দিচ্ছি।

অনেক ফুল পাড়া হলে ওর সেই বড় বড় কাজলটানা চোখের দিকে তাকিয়ে বলতাম—আজ এইই থাক্ কাজল, আমাদের বাড়িতেও তো পুজো হবে !

কাজল সাজি দুলিয়ে চলে যেত। আমি অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম ওর দিকে।

কখনও ভেবে দেখিনি কাজলের ওপর আমার কোন আকর্ষণ আছে কি না। বছরগুলো হুমড়ি খেয়ে চলে যাচ্ছিল। এরই মধ্যে কাজল একদিন কাপড় পরতে শুরু করল। কতই বা বয়েস ! জোর চোদ্দ কি পনের। একদিন সকালে দেখি কাজল একটা কালো ফুল-তোলা শাড়ি জড়িয়ে ফুল পাড়তে এসেছে।

আবছা আলোয় প্রথমটায় চিনতে পারিনি। পরে যখন ওর সেই স্বাভাবিক অনুরোধ শুনতে পেলাম তখন না হেসে পারিনি— বাব্বা, তোমাকে শাড়ি পরে কত বড় দেখাচ্ছে !

বড় বড় টানা চোখ দুটোকে কি যেন একটা বিচিত্র ভঙ্গিতে দুলিয়ে কাজল বলল—বড় হচ্ছি না !

সেদিন ভেবে দেখেছিলাম ; কাজল তো সত্যিই বড় হচ্ছে। তবে কি আমার ওর সঙ্গে মেশাটা এবার বন্ধ করা দরকার ! কাজল কি তার কথায় সেই ইঙ্গিতই দিয়ে গেল নাকি !

কিন্তু সে-ঘটনার শেষ সেখানেই নয়। এর পর কাজল ফুল তুলতে না এলেও পথে-ঘাটে দেখা হত। দেখা হলে দুটো কথা বলতেও যেন তৃপ্তি পেতাম।

কেন জানি না কাজলকে আমার ভাল লাগত। ওর সেই সহজ সরল মন আর হাসিখুশি মুখটা আমাকে বেশ আনন্দ দিত।

কিন্তু সে তো শুধু ভাল-লাগা, ভালবাসা তো নয় !

এরপর কয়েকটা বছর গড়িয়ে গেছে। কাজলের সঙ্গে তারপর আর ক'বারই বা দেখা হয়েছে ! এমনি দূরে থেকে দেখি ওদের ছাদে না হয় বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। পথে যেতে সাধারণ পথচারীর মতই সেই আবছা অবয়বের দিকে তাকাতাম। কখনও বুঝতে পারিনি কাজলকে আমি ভালবেসেছিলাম।

তখন সবে কলেজে ঢুকেছি। হঠাৎ অনিমেষ একদিন খবর দিল কাজলরা ওখান থেকে চলে যাচ্ছে।

প্রথমটায় বিশ্বাস করিনি। পরে সত্যিই একদিন দেখলাম ওরা মোটঘাট বেঁধে গাড়িতে চড়ে বসল। আমরা দু'বন্ধুতে তখন এদিক ওদিক ঘুরে সময় কাটাই। দেখা হল ওদের যাবার সময়।

কাজল গম্ভীর হয়ে ওর মায়ের পাশে বসেছিল। আমি অনেক আশা করেছিলাম অনিমেষের সামনে কাজল আমাকে ছোট করবে না। কিন্তু বহুক্ষণ তাকিয়েও কাজলের মুখচোখে তো কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করিনি।

কিন্তু রাস্তার বাঁকটা যখন ঘুরে গেছে তখন দেখলাম কাজল আমার দিকে চেয়ে করুণভাবে একবার হাসল। তারপর আঁচলের একটা দিক মুখে ধরে সরে গেল আমার সামনে থেকে।

সে ছবিটা আমার মনকে বেশ বিব্রত করেছিল কয়েকদিন।

কাজল কি তার রুদ্ধ আবেগকে চেপে রেখেছিল কাপড় দিয়ে? কণ্ঠে কি তার কান্না ভেঙে পড়েছিল!

কখনও তাই ভেবে কাজলকে বড় করেছি মনে মনে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছে—ওটা কান্না না হয়ে যদি উপহাসের প্রকাশভঙ্গি হয়!

এরূপ নানান্ দ্বন্দ্বে আস্তে আস্তে কাজল আমার মন থেকে খানিকটা সরে দাঁড়িয়েছিল।

অনিমেষ তারপর থেকে কাজল সম্পর্কে অনেক খবর দিত আমাকে। ওর বোনকে লেখা চিঠিতেও নাকি আমার কথা একবারও লেখেনি। শুধু তার বিয়ের কথা লেখে। ছেলে নাকি বড় ইঞ্জিনীয়ার। খুব সুপুরুষ চেহারা।

মনে মনে নিজেকে খুব ছোট ভাবতাম। সত্যিই তো, আমি কি ওর উপযুক্ত হতে পারি কোনদিন!

এ-রকম করে মনটাকে শক্ত করে ফেলেছিলাম। মনের গোপনে কোথাও যদি এতটুকু অনুভূতি ছিল কাজলের জন্তে, সেটুকুও মুছে গেল।

তারপর বেশ কয়েক বছর পরে একদিন কাজলের সঙ্গে দেখা। ও ওর স্বামীর সঙ্গে অনিমেষের বাড়িতে আসছিল। আমি ফিরছিলাম কোন একটা কাজ থেকে। চাকরীর চেষ্টায় তখন জীবনটাকে সঁপে দিয়েছি। অনিয়ম আর দুশ্চিন্তায় শরীরটা খুব কাহিল হয়ে গেছে।

কাজলকে প্রথমটায় আমি চিনতে পারিনি। টকটকে লাল সিঁদুর আলতা পরলে আর মাথায় ঘোমটা টানলে কোনও মেয়েকে যে এমন রমণীয় দেখায় তা কখনও ভেবে দেখিনি। কাজলের সে উজ্জ্বল রূপের কাছে নিজেকে আনতে চাইছিলাম না। পাশ দিয়ে প্রায় সরে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কাজলই একগাল হেসে বলে উঠল—ওমা মধুদা, না? বাব্বা, তোমাকে যে একদম চেনবার উপায় নেই! কি করছ? চাকরী-বাকরী, না টো টো কোম্পানী?

কাজলের সেদিনের রূপ দেখে যতটা আশ্চর্য হয়েছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্ময় লাগল ওর স্বভাবের পরিবর্তনে। সেই লাজুক কাজল এত উচ্ছল হয়ে উঠল কি করে? সৌভাগ্য কি মানুষকে রূপের সঙ্গে সঙ্গে এমন প্রগল্‌ভতাও দেয়!

কাজলের নিষ্প্রাণ কথাটায় নিজেকে অপ্রস্তুত মনে হল ভদ্রলোকের সামনে। সে-প্রসঙ্গ এড়িয়ে নিজেই তাই আমতা আমতা করে বললাম—কই, ভদ্র-লোকের সঙ্গে তো পরিচয় করিয়ে দিলে না?

বড় বড় কালো চোখ দুটো ভদ্রলোকের দিকে ফিরিয়ে কাজল একগাল হেসে বলল—ওঃ হো, আমি একেবারে ভুলে গেছি। ইনি আমার স্বামী মিঃ সেন। টি অ্যাণ্ড ষ্টীল ইনডাসট্রিজের ইঞ্জিনীয়ার।

ভদ্রলোক হাতদুটো তুলে নমস্কার জানালেন।

আবার একদমক হেসে কাজল এবার আমাকে দেখিয়ে বলল—ইনি হলেন আমাদের মধুদা, পাড়ার একজন সাহিত্যিক।

ভদ্রলোক হেসে বললেন—আচ্ছা।

কেমন যেন নিজেকে ছোট মনে করে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম।

কাঠের আঘাতে ছিটকে পড়া বরফের মত হেসে কাজল আমায় বলল—তুমি এখনও সে-সব কবিতা লেখো মধুদা? এবারে ওসব ছেড়ে-ছুঁড়ে দিয়ে চাকরী-বাকরী কর। কাকাবাবুর তো তুমিই বড় ছেলে?

আশ্চর্য, এই ভারী কথাটাও এতটুকু বেমানান লাগেনি কাজলের মুখে। বেশ বিব্রত হয়েই উত্তর দিয়েছিলাম—হ্যাঁ, ছেড়ে দেবোই ভাবছি, কিন্তু কি জানো…

কাজল আর সে 'কিন্তু' শোনার জন্তে অপেক্ষা করেনি। তারপর বিদায় উঠে সে বলেছে—আচ্ছা চলি মধুদা। বাউরকেল্লায় গেলে একদিন যেও।

কাজলের স্মৃতি সেই পর্য্যন্ত।

এটাকে কি ভালবাসা বলা যায়? কিন্তু কাজলের স্মৃতিই বা কেন আমার মনটাকে এমন ভারী করে রেখেছে!

অনিমেষের মুখে শুনেছি কাজলের বিয়ের দিন রাত্রে নাকি আমি ওর নাম ধরে চিৎকার করে উঠেছিলাম। ওকে আমার মা বলেছিল একথা।

কাজলকে কি তা হ'লে আমি অন্য চোখে দেখতাম?

সেই প্রেমের মীমাংসা আমি নিজেই করতে পারিনি। করতে চাইনি বলাই হয়ত' আরও সঙ্গত।

আমার এই মরুভূমির জীবনে কাজলের স্মৃতিটুকু থাক্ না একটা ওয়েসিস্ হয়ে।

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। আলবার্ট গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকল—কি ব্যাপার, অন্ধকার কেন?

—অন্ধকার। চমকে উঠে দেখি সন্ধ্যে হয়ে গেছে। একটু হেসে আলবার্টকে বললাম—না, এমনি আলো জ্বালিনি। একটু বসে বসে ভাবছিলাম।

—তাহ'লে ব্যাঘাত করলাম না ত'?

—না না, এমন কিছু নয়। এই-সব নানা আজেবাজে চিন্তা।

—যাই হো'ক। আপনি আজ সান্যালের কাছে যাবেন বলেছিলেন? আলবার্ট জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ বিকেলে যেতে বলেছিলেন উনি। দরকার কিছু নয়।

—একবার যাবেন। আ মা কে অনেকবার বলেছে।

—আচ্ছা আচ্ছা। এখন চলুন ত' একটু বাইরের দিকে যাই। হোমের কিছু জিনিস কেনবার আছে।

—চলুন। উদাসভঙ্গীতে আলবার্ট সম্মতি জানাল।

রবীন্দ্র-কাব্যে বৈচিত্র্য

—শ্রীভৈরবপ্রসাদ হালদার

এই বিশ্ব-প্রকৃতির বুকে সারাক্ষণ বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের সম্মিলন ঘটছে। ক্ষণে ক্ষণে তার রূপ বদলাচ্ছে! কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই—আবার এই সব-ক'টি অমিল একত্র গ্রথিত হয়ে জন্ম নিচ্ছে আর এক অভিনব অপরূপ রূপমাধুর্য। তাই বিশ্ব-প্রকৃতি এমন আকর্ষণে মধুর, সৃষ্টি-ধর্মে চির-উজ্জ্বল। প্রকৃতির বুকে তাই ক্লান্তি নেই—আছে চিরন্তন গতির আবেগ। নেই বিরামের আকুতি—আছে আরো আরো এগিয়ে চলার আহ্বান।

রবীন্দ্র-কাব্যেও এই বৈচিত্র্যের স্পর্শ লেগেছে।

দীর্ঘকাল ধরে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সাধনা করেছেন। বিগত শতাব্দীর সপ্তম দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্ত কবিগুরু অজস্র কাব্য-নাটক, সঙ্গীত, ছোট গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ রচনা করেছেন, এবং প্রত্যেকটি বিভাগে নিজের বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রাখতেও তিনি সফল হয়েছেন।

যুগ পরিবর্তনশীল। কারণ পরিবর্তনই যুগের ধর্ম। আর এই পরিবর্তনের সিঁড়ি ভেঙে মানব-সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। বিগত যুগের সত্য বর্তমানে অচল। আবার আজ যা' জনমনকে আচ্ছন্ন করে আছে আগামী ভবিষ্যতে তাই পরিত্যাজ্য হবে। চিরকাল ধরে এমনি হয়ে আসছে।

সৃষ্টিধর্মী রবীন্দ্রমানসও যুগধর্মের এই পরিবর্তনকে অস্বীকার করেনি। বরং এই পরিবর্তনকে মেনে নিয়ে কবি তাঁর রচনাকে যুগোপযোগী করেছেন, তাঁর কবিতাকে জনচিত্তে গ্রহণীয় করেছেন। কারণ সমসাময়িক কালের জনচিত্তে যে সাহিত্য গ্রহণীয় বলে মনে হয় না, তা কখনও কালজয়ী সৃষ্টি বলে বিবেচিত হয় না। আর জনচিত্তই একমাত্র নিরিখ যার মাধ্যমে এই বিচার সংগঠিত হয়।

ফলে রবীন্দ্র-কাব্যেও পরিবর্তনের হাওয়া বারে বারে নূতন সুর, ছন্দ ও আবেগের স্পর্শ বয়ে এনেছে। তাঁর কাব্যে তাই এত বৈচিত্র্য—এতই তা মধুর এবং আবেগধর্মী!

কারণ, সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে কবি বলেছেন যে, প্রকাশ-চেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আপন প্রয়োজনের রূপকে নয়, বিশুদ্ধ আনন্দ-রূপকে ব্যক্ত করা; সেই চেষ্টারই সাহিত্যগত ফলকে রসসাহিত্য নাম দেওয়া যায়। বিষয়টিকে উপলক্ষমাত্র করে ছন্দে বন্ধে বাক্যবিন্যাসে উপমা-সংযোগে যে একটি সমগ্র বস্তু তৈরী হয়ে উঠেছে সেইটিই হচ্ছে আসল জিনিস। সে জিনিসটি মূল বিষয়ের অতীত, তা অনির্বচনীয়।

(দুই)

বৈষ্ণব পদাবলীর রচয়িতাদের রচনাকে আদর্শ করে তাঁর কবিজীবন শুরু হয়েছে। সজ্ঞানে তিনি পদ-রচনা করেছেন। নিজের নামে নয়—ভানুসিংহ ঠাকুরের বয়ানে প্রেমময়ী রাধার মানস-সৌন্দর্যকে অপরূপ বাচন-ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। পূর্বসূরীদের অনুকরণ করেছেন ঠিকই, কিন্তু পদ-লালিত্যে তাঁর অনুকরণ মূলের সমগোত্রীয় হয়েছে। এখানে বৈষ্ণব-পদকর্তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন কবি।

দিন ফুরিয়ে আসছে। যমুনার নীল জলে সন্ধ্যার তিমির ছায়া সঘন কম্পিত দেহে দোদুল্যমান। সারা-দিনের বিরহ-জর্জর কৃষ্ণ-হৃদয় আকুল হয়ে ডাকছে—রাধা, রাধা, রাধা। বাঁশী বাজছে। আর কি ঘরে থাকতে মন চায়? উন্মন মন-পিয়াসী রাধাকে কে বাঁধবে শত বাধার দেওয়াল তুলে?

গগন সঘন অব, তিমির মগন ভব,
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘরব,
শাল তাল তরু সভয় তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর।
একলি যাওব তুঝ অভিসারে,
যাক পিয়া তুঁহু কি ভয় তাহারে,
ভয় বাধা সব অভয়-মূর্তি ধরি
পন্থ দেখাওব মোর।

তখন কবির মন রোম্যান্টিক রসে নিমজ্জিত। পরকীয়া প্রেমের মধ্যে তিনি প্রেমের মধুরতা অবলোকন করেছেন। রাধা—চিরকালের প্রেমিকা। কৃষ্ণ-প্রেমের বন্যায় তার হৃদয় কানায় কানায় ভরা। পরকীয়া প্রেমের মধ্য দিয়ে কবি স্বর্গীয় প্রেমের স্পর্শানুভূতি লাভ করতে উন্মুখ হয়েছেন।

তৃষিত আঁখি তব মুখ 'পর বিহরই,
মধুর পরশ তব রাধা শিহরই—
প্রেমরতন ভরি হৃদয় প্রাণ লই
পদতলে আপনা থোর।

প্রভাত-সঙ্গীতের কবি কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে মনের আকর্ষণ লাভ করেছেন। এমন আর কাঁদাবার বন্ধন

তাঁর কবি-মন আকুতিপ্রবণ হয়—প্রকৃতির মধ্যে তিনি আনন্দের ঝরণা দেখেছেন। প্রকৃতির অফুরন্ত রূপ-লাবণ্য তাঁর মনে সাড়া জাগিয়েছে।

জগতের পরোধীশিখর হতে
শত শত স্রোতে
উচ্ছুসিল অমিয়র বিশ্বের নির্ঝর,
স্তব্ধতার পাষাণ হৃদয়
শত ভাগে গেল বিদারিয়া।

প্রকৃতির মধ্যে কবি নিজে অভিন্ন। এখন আর নিজেকে বিলিয়ে দিতে তাঁর বাধা নেই। প্রকৃতির আনন্দের মাঝে উদ্দাম হয়ে ছুটে চলতে তাঁর মন ব্যগ্র।

আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগলপারা।

ছবি ও গানের কবিও নিছক প্রকৃতি-বিলাসী। প্রকৃতির মধ্যে তাঁর মন রূপ-রস-গন্ধের তৃষ্ণায় আকুল। কিন্তু এখানে তিনি আর একা ন'ন। প্রকৃতির অপরূপ রূপ-মাধুরীর মধ্যে আরও একজনের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। কে সে? কার আলিঙ্গন আশায় তাঁর মন এত ব্যাকুল? সে তাঁর মানসসুন্দরী।

যেন রে অকূল সাগর-মাঝারে
ডুবেছে জগৎ-তরী,
তারি মাঝে শুধু মোরা দুটি প্রাণী—
রয়েছি জড়ায়ে তোর বাহুখানি,
যুঝিস ছাড়াতে, ছাড়িব না তবু
মহাসমুদ্র পরি।

কবি-মন আরও আকুতিপ্রবণ হয়েছে 'কড়ি ও কোমলে'। তাঁর হৃদয়-আকাশ তাই আরও উদার হতে চায়। প্রকৃতির নিখিল আকাশের মাঝে সে নিজেকে বিলিয়ে দিবার প্রয়াসী।

হৃদয় উড়িতে চায় হোথায় একাকী
আঁখিতারকার দেশে করিবারে বাস।
ওই গগনেতে চেয়ে উঠিয়াছে ডাকি,
হোথায় হারাতে চায় এ গীত-উচ্ছ্বাস।

'মানসী'তে কবির মানস-ছবির দুটি দিক উন্মোচিত হয়েছে। প্রকৃতি-পূজারী কবি-মন কেবল দেখার আনন্দেই প্রীত ন'ন। তাঁর মনে দেহ-গত ভোগের লালসাও জেগে উঠেছে। বাস্তব অবস্থায় তিনি সবকিছু উপভোগ করতে চেয়েছেন। কিন্তু অমনি তাঁর নিশার স্বপ্ন ভেঙে গেছে। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাতের মায়া-কাজল নিঃশেষে মুছে গেছে। রাতে মালা ছিল, ফুল ঝরে গিয়েছে—এখন রয়েছে শুধু ডোর। যা' মনকে আকর্ষণ করে, তাকে ভোগ করতে গেলেই তা' কাঁদায়। এ চিরন্তন সত্য।

বাঁশি বেজেছিল, ধরা দিনু যেই
থামিল বাঁশি।
এখন কেবল চরণে শিকল কঠিন ফাঁসি।
মধুনিশা গেছে, স্মৃতি তারি আজ
মর্মে মর্মে হানিতেছে লাজ—
সুখ গেছে, আছে সুখের ছলনা
হৃদয়ে তোর—
প্রেম গেছে, শুধু আছে প্রাণপণ
মিছে আদর।

এবারে কবি বিশ্ব-প্রকৃতির মাঝে অতীন্দ্রিয় পুরুষের সন্ধান লাভ করেছেন। তিনি সর্বব্যাপক, অব্যয় এবং অক্ষয়।' তাঁকে অবলোকন করা যায় মনের দৃষ্টি দিয়ে। প্রকৃতির সব-কিছু জড়িয়ে তাঁর মূর্তি গঠিত। তিনি সত্যস্বরূপ।

গন্ধপুষ্প-গ্রহতারা-ভরা
নীলাম্বরে মগ্ন চরাচর,
তুমি তারি মাঝখানে
কী মূর্তি আঁকিলে প্রাণে—
কী ললাট, কী নয়ন, কী শান্ত অধর।

'সোনার তরী'র কবি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। প্রকৃতির মহা-নন্দের মধ্যেই তাঁর ঘুম ভেঙেছে।

নূতন-জাগা কুঞ্জবনে কুহরি উঠে পিক,
বসন্তের চুম্বনেতে বিবশ দশ দিক।
বাতাস ঘরে প্রবেশ করে ব্যাকুল
উচ্ছ্বাসে,
নবীন ফুলমঞ্জরীর গন্ধ লয়ে আসে।

এখন কবির মনের সবখানি জুড়ে রয়েছে প্রকৃতি। মানসবধূকে লাভ করে কবি-মন আনন্দে আকুল হয়ে উঠেছে।

বধূরে আমার পেয়েছি আবার,
ভরেছে কোল।
প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে
প্রলয় রোল।
বক্ষশোণিতে উঠেছে আবার
কী হিল্লোল!
ভিতরে বাহিরে জেগেছে
আমার কী কল্লোল॥

কেবল প্রকৃতির মধ্যেই কবি-মন নিমজ্জিত ছিল না। তাঁর পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কেও কবি সচেতন ছিলেন। তাই মানুষের কথাও কবি বলেছেন। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতনের ঘাত-প্রতিঘাতও দেখা দিয়েছে তাঁর কাব্যে। কখনও পরাধীনতার গ্লানি তাঁর কবি-মনকে ব্যথিত করেছে, কখনও স্বাধীনতা-আন্দোলনে সমর্পিত-প্রাণ যুবকদের নির্ভীক কণ্ঠে তিনি শুনিয়েছেন উদাত্ত আহ্বান, আবার কখনও বা মজুদিকার অন্তর-বেদনায় তাঁর কবি-হৃদয় ব্যথাতুর হয়েছে। হরিপদ কেরানীর না-পাওয়া জীবনের ব্যর্থ হতাশাও তাঁর কাব্যে বিধৃত হয়েছে।

ঘরেতে এল না সে তো,
মনে তার নিত্য আসা-যাওয়া—
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

এমনি তা যে রবীন্দ্র-কাব্যে বৈচিত্র্যের হাওয়া লেগেছে—তাকে কালজয়ী করে তুলেছে।

ভার্যাং মনোরমাম্

—হিমা মুখোপাধ্যায়

সারারাত্রি অসহ্য গুমোট গরমের পর ভোরের দিকে মিষ্টি ঝিরঝিরে একটা বাতাস বইছে। এপাশ ওপাশ করে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল সুবিনয়। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল—সেই স্বপ্নেরই কোন একটা অধ্যায়ে রাস্তার একটা পাগলা কুকুর হঠাৎ লাফিয়ে পড়লো ওর গায়ে। চীৎকার করে উঠলো সুবিনয়, ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখে মশারীর একটা দড়ি ছিঁড়ে পড়েছে। মশারীটা একপেশে হয়ে লুটোপুটি খাচ্ছে ওর মাথার ডান দিকটায়। বেজায় অস্বস্তিকর—উঠে টাঙিয়ে নেওয়া দরকার, কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছে না সুবিনয়ের। অথচ মুখের উপর একটা আধময়লা মশারী—যেটুক মিষ্টি বাতাস বইছে, তাকেও কেড়ে নিচ্ছে। কি করা যায়? হঠাৎ রাণুর অনুপস্থিতিটা মনে পড়ে। ও থাকলে উঠে ঠিক করে দিতো—অবশ্য গজর্ গজর্ করতো—তবু সুবিনয়কে উঠতে হোতো না। হাসি পেলো সুবিনয়ের, বিরহের এই দিকটা তো সে ভেবে দেখেনি। রাণু ক'দিনের জন্য বাপের বাড়ী গেছে—ভালোই হয়েছে। না হ'লে প্রায় অসহ্য হ'য়ে উঠছিলো—

মশারীটাও অসহ্য হয়ে উঠেছে। নাঃ এখন উঠে টাঙাতে পারবে না সুবিনয়—ঘুমের আমেজটা একদম নষ্ট হয়ে যাবে। আস্তে আস্তে মাথাটা বিছানার পায়ের দিকে করে দিলো সুবিনয়, অস্বস্তিকর মশারীর কোণটা পায়ের উপর পড়ুক, ক্ষতি নেই—মেনে নেবে। আসলে এইভাবে adjustment করেই তো চলতে হচ্ছে—বেশি অসুবিধাটা একটু কম হলেই কেমন খুশী খুশী লাগছে।

আসলে আজ ভালও লাগছে সুবিনয়ের। কেমন যেন নিজেকে কলেজের ছাত্র মনে হচ্ছে…। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে খবরের অপেক্ষা করছে। পাশ করবে জানা, পাশ করলে পুরনো কলেজেই থার্ড ইয়ারে। নিশ্চিন্ত নির্ভাবনা,—সেই রকম নিশ্চিন্ত একটা ভাব। পাশ করলেই কলেজে কলেজে হত্যে দেওয়ার কথাও চিন্তা করতে হবে না। বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে মনটা এত নিশ্চিন্ত ছিল না কারণ জানা ছিল পাশ করলেই চাকরী খুঁজতে হবে। দুটোই সমান রকমারী।

মনে করতে ভালো লাগছে—বাবা শয্যাত্যাগ করে হরিনাম করছেন আর মা রান্নাঘরে বাসি চায়ের বাসনগুলো ধুয়ে নিচ্ছেন; ঝি আসবে বেলাতে। এগুলো মায়ের দৈনন্দিন কাজ। বাবা বড় ভালোমানুষ ছিলেন, সুবিনয়ের বেলায় ঘুমভাঙার অভ্যেসটাকে উদার ক্ষমার চক্ষে দেখতেন। বিছানায় শুয়ে শুয়েই সুবিনয় শুনতে পেতো হরিনামের ফাঁকে বাবা মাকে বলছেন, "সুবু ভোরে ওঠার অভ্যেস করলে ভালোই করতো, কিন্তু অনেক রাত্রি অবধি পড়ছে—ঘুমুচ্ছে খুকু" সব ব্যাপারে এই উদার ক্ষমাটুকু পেয়ে বাবাকে বড় ভালো লাগতো সুবিনয়ের। কলেজে ঢুকে বন্ধুদের সঙ্গে সিগারেট টানতে গিয়ে বাবার কথা মনে হোতো 'বাবা মনে দুঃখ পাবেন না তো'! প্রেমে পড়েও ঐ ঝামেলা। অসবর্ণা মেয়ে বিয়ে করলে বাবা হয়তো বড় অভিমান করবেন। পিছিয়ে গেলো সুবিনয়। বন্ধুরা ওকে চিরকারী 'কাপুরুষ' আখ্যা দিয়েই ছিল কিন্তু কি করবে সুবিনয়! বাবার সেই উদার ক্ষমার কাছে কেমন যেন হতবল হয়ে যেতো সুবিনয়… …

আজ ঠিক সেই রকম মনে হচ্ছে। ছেলেমেয়েদের চীৎকার বা হৈ হৈ নেই, রাণুর রুক্ষ শাসন নেই,—অফিসগামী বাস নামক সেই চিড়িয়াখানার জুলন্ত জন্তু হবার তাগিদ নেই, নিশ্চিন্ত। সরকারের কল্যাণে রবিবারে দোকানগুলোও বন্ধ, হাজার প্রয়োজনেও আজ আর দোকানে যেতে হবে না। অন্তত রেশনের ব্যাগ বয়ে লাইন দিতে পারা যায়—সে পাট কাল বিকেলেই চুকিয়ে ফেলেছে সুবিনয়। রাণু থাকলে হয়তো দিদির বাড়ী দু'জনে যাওয়ার প্রস্তাবটা করে ফেলতো—সুবিনয়কে মেনে নিতে হতো। কারণ রাণুও চাকরী করে, তারও সপ্তাহে একটাই রবিবার আসে। তাকে 'না' বলার নৈতিক বা আর্থিক অধিকার নেই সুবিনয়ের। মনে মনে সুবিনয় বিলক্ষণ জানে রাণুর জীবনটা আরও ভারাক্রান্ত। সুবিনয়ের আর্থিক ভার লাঘব করতে গিয়ে নিজের জীবনে বিরাট একটা কপাট বন্ধ করে ফেলেছে রাণু। আধুনিকতার ছোঁয়াচ এসেছে মনে মনে, অথচ সেই পুরনো সংস্কারগুলোকে আঁকড়ে ধরে আছে; বাইরে খেটে আসবে, ঘরে এসে সেই

হাড়ি, কলসী, উনুনের ধোঁয়া, পাঁচ রকমের রান্না। তোলা লোকের হাতে তার-ভাতের উপর আর কিছু করতে রাজী নয়। রাঁধুনীর পৌনঃপৌনিক অনুপস্থিতি—সুবিনয়ের বাসন দুটো ধুয়ে নিতে গেলেই হাঁ হাঁ করে আসবে। যেন এমনি তার সমস্ত ত্যাগস্বীকার মিথ্যে হয়ে গেলো। ছুটির দিনে বাড়ীতো একটি ধোবিখানা—সেখানেও সুবিনয়ের নীরব দর্শকের ভূমিকা। লজ্জা পায় সুবিনয়—তার পৌরুষে আঘাত লাগে। হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল সুবিনয়ের। তখন তার বছর আট নয় বয়স। পাড়ার একটা মেয়ে নামটাও ঠিক মনে পড়ছে না। প্রভা না আভা কি একটা যেন। মেয়েটা বেজায় পাজী ছিল। বাড়ী থেকে কুলের আচার এনে ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে খেত। চাইলে পরে নাকীসুরে চীৎকার দিত "ও মাঁ দেঁখনা—সুঁবুঁ আমার কুঁলের আঁচার চাইছে"। সুবুর ইচ্ছে করতো—ধরে ঘুঁষা লাগিয়ে দেয় মেয়েটাকে—কিন্তু ঐ প্রভা না আভার মা ছিল নামকরা বদ-রাগী। সুবিনয় তখন ভাবতো 'বড় হয়ে প্রভাকে বিয়ে করে রোজ ঠেঙাবো,—ভারী মজা লাগতো এই কথাটা ভেবে। পাড়ার সুরেন হালদার রোজ রাত্রে বাড়ী ফিরে হল্লা করতো আর বৌকে ধরে মারতো। পাড়ার লোকে বাধা দিলে পাড়া মাৎ করে চীৎকার করতো 'আমার বিয়ে করা বৌকে আমি মারবো তোমাদের তাতে কি। ইচ্ছে হয় কোর্ট কাছারী কর।' বাবা-মা সুরেন হালদারের বাড়ী গণ্ডগোল সুরু হলেই—তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করে দিতেন। ছেলেমেয়েদের এই আবহাওয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইতেন। কিন্তু বন্ধ দরজা জানলার মধ্যে দিয়েও যে চীৎকার ভেসে আসতো মত্ত আর নারীকণ্ঠের—অদ্ভুত একটা উত্তেজনা বোধ করতো—সুবিনয়। সমস্ত চেতনাকে যেন কেন্দ্রীভূত করে দুটো শ্রবণেন্দ্রিয়ে নিয়ে আসতো সে।

অবশ্য উত্তরজীবনে প্রভার না-দেওয়া কুলের আচারের দুঃখ ভুলে গিয়েছিলো সুবিনয়। কলেজে পড়ার সময় প্রেমে পড়া—স্বর্ণাকেও প্রায় ভুলে এসেছে। ভুলে এসেছে মানে—সেদিনের সেই উত্তাল মনের প্রচণ্ড সুখ আর গভীর দুঃখবোধে যে মিলন-বিরহের আখ্যানটা জমে উঠেছিল—তার প্রভাবটা কখন যে মন থেকে সরে গেছে, তা জানতেও পারেনি সুবিনয়। নিছক একটা কৌতুহল অবশ্য এখনও আছে। কেমন আছে স্বর্ণা কে জানে?—বলা যায় না, হয়তো কোনও বিত্তবানের ঘরের অলস মধ্যাহ্নে—নিশ্চিন্ত ঘুমের মধ্যে সেই মন্দোদরী আজ বৃহদোদরী হয়ে উঠেছে। দেখলেই সুবিনয়ের হঠাৎ ভ্রাতৃভাব জেগে উঠবে। আবার এমনও হতে পারে কোনও নামকরা হোটেলের মধ্যরাত্রের প্রমোদ—স্বামী ও তার বন্ধুদের সাহচর্য্যে উপভোগ করে চলেছে কোনও মোহময়ীর দেহের লাস্যভঙ্গী। রঙীন সুরাপাত্র ঠেকেছে আরও রঙীন ঠোঁটে। দায় নেই, দায়িত্ব নেই, আছে শুধু সময়। সেটা বোঝার মতন তার জীবনের উপর পড়ে আছে। যেমন করে হোক সেই সময়কে উত্তেজিত খোরাক জুগিয়ে চলতে হবে—একঘেয়েমীর হাত থেকে বাঁচতে হবে। এই স্বর্ণা স্বাভাবিক অস্বাভাবিক নানা চেষ্টায় হয়তো তার মন্দোদরকে আরও ক্ষীণ করে রেখেছে, দেহবর্ণ হয়তো আরও উজ্জ্বল হয়েছে কিন্তু যে কোন ভাবলিলতা তার সেই উজ্জ্বল সুন্দর চোখদুটোর ভাষা কেড়ে নিয়েছে......আবার হাসি পেলো সুবিনয়ের। দূর, দূর এমনও কো হতে পারে—স্বর্ণাও আর এক রাণুতে পরিণত হয়েছে। স্বর্ণাকে হারিয়ে বহুদিন মনমরা হয়েছিল সুবিনয়। চোখের সামনে কত বন্ধু হৈ হৈ করে তাদের বধূকে নিয়ে এসেছে। কারও বা পূর্বরাগের বধূ—কারও বা অচেনা। সুবিনয়ের উপরও তাগিদ এসেছে—সংসারের তরফ থেকে। কিন্তু এখানেও সেই বাবার উদারতা অন্যায় চাপ দেননি তিনি—সুবিনয় অনেক সময় পেয়েছে। ইতিমধ্যে মা মারা গেলেন—সংসারে বিশৃঙ্খলা। বাবার যথেষ্ট বয়স হোলো, সংসারে সেবার অভাবে তাঁকে বেশ কষ্ট পেতে হোতো। কিন্তু একদিনও অনুযোগ করলেন না তিনি। সুবিনয়ই একদিন বাধ্য হয়ে এক সম্পর্কের বৌদিকে ধরলো, "ভালো একটি বৌ এনে দাও দেখি বৌদি"—বৌদি তো হেসেই কুটি কুটি—"সুবু ঠাকুরপোর দেখছি এতদিনে সুবুদ্ধি হোলো। কি করে জানবো বলো তুমি মনে মনে ভাবছো 'আর একবার সাধিলেই খাইব'। আমরা তো তোমার বিয়ের কথা ভুলেই গেছি।" প্রায়ই বাবার চণ্ডীপাঠের সময় একটা লাইন ওর কানে এসে লাগতো "ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি, মনোবৃত্তানুসারিণী" বৌদির সঙ্গে কথা বলার পর ঘুরে ফিরে ঐ ক'টা কথাই ওর মনে আসতো "ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি, মনোবৃত্তানুসারিণী"। প্রায় একরকম প্রার্থনার সুরেই ও বার বার নির্জন ঘরে বলতো এ কথাগুলি। রাণুকে দেখে, রাণুকে পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল

সুবিনয়। সত্যই মনোরমা রাণু। মেহে, সেবায়, হাস্যে, লাস্যে মুগ্ধ করে রাখলো সুবিনয়কে। তখন মনে হোতো—সুবর্ণাকে হারিয়ে যে ব্যথা সে যেন রাণুরই আসার প্রস্তুতি। ছোট দুই ভাই, একটি বোন, বৃদ্ধ পিতা আর রাণুকে নিয়ে স্ব-চ্ছন্দে চলতে লাগলো সংসার। রাণু যে এত সুগৃহিণী ভাবতেও পারেনি সুবিনয়। ছোট বোনটির বিয়ে এক রকম রাণুর চেষ্টাতেই হোলো। ভায়েরাও কলেজের পড়া সাঙ্গ করলো। এক ভাইকে চাকরী নিয়ে বিদেশে যেতে হোলো—আর এক ভাই—বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ বিয়ে করে বসলো এবং বাড়ীতে আর থাকতে চাইলো না।

রাণু প্রচণ্ড আঘাত পেলো। এই দেবর দুটির জন্য অনেক স্বার্থ ত্যাগ করেছিল সে। এই সময়েই হঠাৎ আস্তে আস্তে রাণুর পরিবর্তন আসতে লাগলো। কি যে পরিবর্তন তার সংজ্ঞা দেওয়াও যায় না অথচ সেটার উপস্থিতিও অগ্রাহ্য করা যায় না। এর পর বাবাও মারা গেলেন। ভদ্র রকম একটা পেন্‌সন্ পেতেন তিনি। সুবিনয়ের আয়ের মধ্যে সংসার চালাতে হাঁফিয়ে উঠতে লাগলো রাণু। তিনটি ছেলে মেয়েও হয়েছে ইতিমধ্যে তাদের। রাণু ছোটটিকেও একদিন একটা নামী আর দামী নার্সারী স্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়ে এলো। বাচ্চা ছেলেটাকে এই বয়সে স্কুলে পাঠাতে বেজায় আপত্তি ছিলো সুবিনয়ের। প্রণামীর টাকাটাও আপত্তিকর। কিন্তু রাণু যেন তাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলো না। তীব্র আঘাত পেয়েছিল সুবিনয় রাণুর এই একগুঁয়েমীতে। অবশ্য আসল ব্যাপারটা পরে জানা গেল। এই ক'বছরের সংসারের সেবায় যে বি. এ. ডিগ্রীটা কাজে লাগেনি রাণুর, সেইটেকে আলমারী থেকে বের করে এনেছে রাণু। চুপি চুপি দরখাস্ত করেছে নানা জায়গায়, প্রতিপত্তিশালী পরিচিত ও আত্মীয়জনকে ধরাধরি করছে। একদিন খুব উত্তেজিত চেহারা নিয়ে এসে সুবিনয়কে দেখিয়েছে একটা চিঠি, "বলো তো এটা কি?" খুলে দেখেছে সুবিনয় একটা স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর পদে রাণুর নিয়োগপত্র। কেমন যেন মিইয়ে চুপ্‌সে গেল সুবিনয়। তার অক্ষমতাকে ইঙ্গিত করছে নাকি রাণু। রাণু কিন্তু সুবিনয়কে প্রাণপণে খুশী করবার চেষ্টা করে—মাঝে মাঝে 'আজকালকার দিন' সম্পর্কে ছোটো-খাটো লেকচারও দেয়। আসলে সে যে খালি এই সাংসারিক একঘেঁয়েমী কাটাবার জন্যই এই কাজটা নিয়েছেন, সেটাও সুবিনয়কে আকারে প্রকারে বোঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সুবিনয় কি জানতো না—সংসারকে অতো ভালোবাসতো বলেই দৈনন্দিন কাজগুলোকে ও অতো ভালোবেসে—'মনোরমা ভার্য্যা' হয়ে উঠেছিল! হঠাৎ যেন চিড় খেয়ে গেল দুজনের সম্পর্কের সেতুতে। সুবিনয় আর সহজ হতে পারে না রাণুর কাছে। সংসারের ভার আর অর্থ আহরণের চেষ্টা—এ দোটানায় পড়ে রাণু আস্তে আস্তে তার লাবণ্য বিসর্জন দিতে শুরু করলো। মনের মিষ্টতাটুকুও হারিয়ে যেতে লাগলো। সুবিনয় ভেবে পায় না তার অনেক বন্ধুর স্ত্রীই তো চাকরী করেন—দুজনে আর্থিক হাল ধরায় সংসারতরী আরও স্বচ্ছন্দে চলে। শনিবারের সন্ধ্যায় পরিপাটি সাজে তারা জোড়ায় জোড়ায় বেরিয়ে পড়ে সিনেমা, থিয়েটার আর জলসার উদ্দেশে—তবে তার কেন এমন মনে হয়? রবিবারের সকালে কাগজের রাশে পাহাড় দাঁড়িয়ে কলকাতার আছাড় খেয়ে রাণু যখন বেশ খুশী খুশীই থাকে—প্রত্যেকটি আছাড় বুকে এসে লাগে যেন সুবিনয়ের—মনে হয় আমি অক্ষম, আমি অপদার্থ। আজ মশারীর জালের ভিতর একা একা হঠাৎ একটা আবিষ্কার করে ফেলে সুবিনয়। সেই যে স্কুলের আচার দেখিয়ে দেখিয়ে খাওয়ানো মেয়েটা—সেই প্রভাকে যেমন বিয়ে করে ঠেঙাবার ইচ্ছে হয়েছিল সুবিনয়ের সেই ইচ্ছেটা—প্রৌঢ় বয়সেও একেবারে মিলিয়ে যায়নি। স্ত্রীর উপর প্রতাপ দেখাতে না পারলে তার স্বামিত্বটা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারছে না সুবিনয়। অথচ এ-কথাটা এতদিন নিজের মনের কাছে স্বীকার করতেও লজ্জা পেয়েছে। গুহাবাসী আদিম মানুষটা গুম্‌রিয়েছে সুবিনয়ের মধ্যে। বাল্যকালে মাতাল সুরেন হালদারের চীৎকারটুকু উপভোগ করতো সে সুবিনয়। রাণু কতদিন তাকে অনুনয় করেছে—একসঙ্গে ছুটি নিয়ে বাইরে যাবার জন্য। সুবিনয়ের আগ্রহের অভাবে সে ছুটি একসঙ্গে হয়নি। শনিবারের সন্ধ্যায় থিয়েটারের টিকিট কা'কে দিয়ে কাটিয়ে এনে রাণু অনুরোধ করেছে সুবিনয়কে—ঠিক সেই দিনই প্রচণ্ড মাথা ধরেছে সুবিনয়ের। বেচারা রাণু হয় কোনো মেয়ে বন্ধু আর নয়তো বাপের বাড়ীর কাউকে নিয়ে চলে গেছে থিয়েটার দেখতে। রুক্ষ হয়ে উঠেছে তার মন—ধীরে ধীরে দেহের লাবণ্য ঝরে গেছে আস্তে আস্তে।

আধময়লা মশারীর জালটা হঠাৎ যেন জীবনের উপর জড়িয়ে ধরতে চাইছে…। এ জাল কবে থেকে যে জড়াতে শুরু করেছে—জানে না সুবিনয়। হঠাৎ যেন টান মেরে মশারীটাকে সরিয়ে দিয়ে ঝিঁঝি

হাওয়াটাকে প্রাণপণে টেনে নেয় হুলিনয়। অদ্ভুত একটা মমত্ববোধ জেগে ওঠে রাণুর উপর। রাণু আমার স্ত্রী, আমার জীবন-সঙ্গিনী, তার সবটুকু সে দিয়ে দিল আমাকে—নিতে আমার এতো দ্বিধা কেন? আমি তো আরও অনেক কিছু দিতে পারি—বৃথা আত্মাভিমানটুকু বিসর্জন দিই না কেন—? এ অন্তরের আর্তনাদ না করলেই তো বেশ শোভন হয়। দেবার কি আমার আরও কিছু নেই—

আবার ঘুমিয়ে পড়ে হুলিনয়। ঘুমোবার আগে ভেবে নিয়েছে—রাণুকে হঠাৎ একটা আশ্চর্য করে দিয়ে—বাপের বাড়ী থেকে সোজা নিয়ে যাবে কোথাও বেড়াতে। রাণুকে বাদ দিয়ে জীবনটা বড় বিস্বাদ।

সাধারণের কবি রবীন্দ্রনাথ

—শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রোত্তর কয়েকজন কবি ও সমালোচকের সবচেয়ে বড় অভিযোগ এই যে, তাঁর কাব্যে সাধারণ মানুষের বেদনা রূপ লাভ করেনি—রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ রোমান্টিক। তাঁর কাব্য-সাধনার পথে বিষয়বস্তুর রূপান্তর ঘটেছে, ভঙ্গির মধ্যে নূতনত্ব ঘটেছে, এমন কি কোথাও কোথাও বা কল্পনা ও সহানুভূতি ঘনীভূত ও তীব্র হয়েছে, কিন্তু যারা সমাজের সাধারণ স্তরের মানুষ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যারা "সভ্যতার পিলসুজ, সভ্যতার প্রদীপকে মাথায় করে ধরে রেখেছে," তাদের অন্তরের আনন্দ-বেদনা, আশা-নিরাশার কাহিনীকে তিনি তাঁর কাব্যে রূপ দিতে কতখানি সক্ষম হয়েছেন। কবিরই স্বীকারোক্তি—

জীবনে জীবন যোগ করা না হলে
কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয়
গানের পসরা—(ঐকতান)

কবি জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আত্ম-বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হয়ে বলেছেন—

আমার কবিতা আমি জানি
গেলেও বিচিত্র পথে
হয় নাই তা সর্বত্রগামি…

—(ঐকতান)

তাঁর এই স্বীকারোক্তি থেকেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে জীবন ও জীবনাতীতের মিলন-সাধনের পালা আছে; কিন্তু সাধারণ মানুষ সেখানে অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারায় সাধারণ মানুষের বেদনা রূপ লাভ করেছে কিনা তা তাঁর সমগ্র কাব্য-সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখা দরকার।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কখনও বা গভীর মর্ত্যপ্রীতি, ইহলৌকিক আসক্তি, কখনও বা ইন্দ্রিয়গত তরল ঐক্যমূলক সুখানুভূতিতে নিরস্ত না হয়ে ঐক্যমূলক রসাস্বাদই কবির অভিপ্রেত হয়ে উঠেছে। কবির অন্তরে যেন চিরদিন এক উদাসী বাউল একতারা বাজিয়েছে। তাঁর ধর্ম মূলতঃ অতিক্রমণীয়বাদের ধর্ম। কিন্তু জীবনপথ পরিক্রমার শেষে এসে কবি যখন আত্ম-বিশ্লেষণে মগ্ন হয়েছেন তখন তাঁর মনে হয়েছে যে, তাঁর কাব্য সাধনায় যেন কোথায় ফাঁক থেকে গেছে। জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে বিচিত্র সুরের ঝঙ্কার ধ্বনিত হয়ে উঠছে, পৃথিবীর হাটে অগণিত মানুষের গহন অন্তরে যে অব্যক্ত বেদনা লুকিয়ে রয়েছে, কবির বাঁশীর সুরে যেন তার সাড়া জাগেনি। বিচিত্র পথের অভিযাত্রী তিনি, অথচ তাঁর কাব্য যেন সর্বত্রগামী হতে পারেনি। তাই জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কবিমানসের ঘটেছে পালাবদল। কবি রাশিয়া গিয়ে দেখেছিলেন—"পৃথিবীর বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান"। রাশিয়ার বিপ্লবকে দেখে বলেছিলেন—"এ বিপ্লব অনেক দিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান। নব্য রাশিয়া

মানব-সভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড়ো মনুষ্যত্বশেল তোলবার সাধনা করছে—যেটাকে বলে লোভ।"

—(রাশিয়ার চিঠি)

সত্তর বৎসর বয়সে, খ্যাতি-প্রতি-পত্তির পসরা বহুপূর্বেই পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, রাশিয়ার সমাজজীবনের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন যাঁর অন্তর জগতে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, তিনি যে সাধারণ মানুষের বেদনাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ১৩৩৪ সালে প্রকা-শিত 'পঞ্চভূত'-এর মধ্যে কবির উক্তি :

"ভোলা মন, ও ভোলা মন, মানুষ কেন চিনলি না। ভোলা মন, এই সংসারের মধ্যে একবার প্রবেশ করিয়া দেখ, এই মানবহৃদয়ের ভিড়ের মধ্যে। সভাস্থলে যাহারা কথা কহিতে পারে না, সেখানে তাহারা কথা কহিবে. লোকসমাজে যাহারা উপেক্ষিত হয় সেখানে তাহাদের এক নূতন গৌরব প্রকাশিত হইবে।" ("মনুষ্য"—পঞ্চভূত)।

এমন কি 'পঞ্চভূত'এর মধ্যেই দেখি সামান্য বিদেশী মুহুরী যার স্ত্রী দুটি শিশু সন্তান রেখে মারা গেছে, শুধু শীর্ণ তার লক্ষীছাড়ার মতো যে বেঁচে রয়েছে, কবি তার বেদনার মধ্যে সমস্ত মানবের বেদনাকে অনুভব করেছেন। জীবনের শেষ পর্বে কবির সমস্ত মোহ গেছে ছিন্ন হয়ে, অনুভব করেছেন অন্তরের অপূর্ণতাকে। তাই পৃথিবীকে প্রণতি জানিয়ে গেয়েছেন :

আজ আমি কোন মোহ নিয়ে
আসিনি তোমার সম্মুখে,
এতদিন যে দিনরাত্রির মালা
গেঁথেছি বসে বসে
তার জন্যে অমরতার দাবি
করব না তোমার কাছে।
("পৃথিবী"—পত্রপুট)

১৩০০ সনে "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় কবি বৃহৎ জগতের সঙ্গে একাত্ম হবার বাসনা নিয়ে গেয়ে উঠেছেন—"এ দৈন্য মাঝারে কবি, স্বর্গ হতে নিয়ে এস বিশ্বাসের ছবি।" জীবনের শেষ পর্বে সর্ব বিশ্বের কর্ম ও স্বপ্ন, সকল মানুষের অন্তরে সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, ব্যথা-বেদনা কবির হৃদয়বীণায় যে সুরে ধ্বনিত করেছে সেই সুরেরই প্রকাশ ঘটেছে তাঁর "রোগশয্যা" কাব্যগ্রন্থের মধ্যে। অমূলক সংকোচে কবির স্বীকৃতি—

মোর কাব্যকলা রয়েছে কুণ্ঠিত,
তাপতপ্ত দিনান্তের অবসাদে—
কি জানি শৈথিল্য যদি ঘটে তার
পদক্ষেপ তালে।

জীবনের শেষ পর্বে যাঁর নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে এতখানি সচেতনতা, তিনি কি সাধারণের কবি নন? আর "পুনশ্চ"-এর যুগে এসে দেখি মানব-মূল্যের এক মহান্ উপলব্ধি কবিকে তাঁর চিরাচরিত পথ থেকে সরিয়ে এনেছে। তিনি এক নতুন পথে যাত্রা শুরু করেছেন। "পুনশ্চ"-এর প্রকাশ-কাল ১৩৩৯ সাল। তখন যুগছন্দের পরিবর্তন ঘটেছে, প্রথম মহাযুদ্ধ মানুষের জীবনবোধকে বদলে দিয়েছে। জীবনে এসেছে অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্য, জীবনের নব-মূল্যায়ন ঘটেছে, যন্ত্র আমাদের জীবনকে অধিকার করে বসেছে। তাই জীবন যেখানে প্রসাধনহীন, কাব্যকলায়ও সেখানে প্রসাধন থাকতে পারে না। তাই কবি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের গদ্য-ভাষাকেই আশ্রয় করেছেন ছন্দের বাহন হিসাবে। আর এই গদ্য-ছন্দের আঙিনায় দুঃখী-সুখী, ভালো-মন্দ সব-কিছুই এসেছে একসঙ্গে। কবি রূপ দিয়েছেন সদাপতি অফিসের কণিষ্ঠ কেরানির জীবনবেদনাকে, যে শিয়ালদা স্টেশনে যায় সন্ধ্যে কাটিয়ে আসতে, আলো জ্বালাবার চাকরি বাঁচবে বলে, তুলে ধরেছেন দুরন্ত ছেলেটার জীবন-প্রতিরূপকে। তাই আক্ষেপ করে বলেছেন—

থাকত ওর নিজের জগতের কবি
তাহলে গুবরে পোকা এত স্পষ্ট
হত তার ছন্দে
ও ছাড়তে পারত না।
কোনদিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি
পেরেছি লিখতে,
আর সেই নেড়ি কুকুরের ট্রাজেডি।
—("পুনশ্চ"—ছেলেটা)

মানুষের অবমাননা, মানবতা-বোধের অবলুপ্তি কবির চিত্তকে পীড়িত করেছে। তাই তিনি বলেছেন—"লাভের লোভে, শক্তির মত্তে, বুদ্ধির বিকারে যখন তার বিজত্বকে আচ্ছন্ন করে, তখন তার পশুধর্ম একেশ্বর হয়ে ওঠে।"

—("তীর্থযাত্রী"—ভূমিকা)

পত্রের শেষাংশে আমাদের না-বলা কথা বলবার অভিপ্রায় নিয়ে আমরা যেমন পুনশ্চ দিয়ে লিখতে শুরু করি, "পুনশ্চ" কাব্য কবির কাব্য-সাধনার সেই না-বলা কথারই পুনরারম্ভ। কবির কাব্য-পথ পরি-ক্রমায় যা ছিল অব্যক্ত অর্থাৎ যে অগণিত সাধারণ মানুষের বেদনা পূর্বে কবির কাব্যে শোনা যায় নি, এই ধারায় তারই পুনরারম্ভ। এই পর্বে এসে কবি অন্তরে শুনেছেন সাধারণ মেয়ের বেদনার সুর, যে কবিকে বলেছে—

তোমাকে দোহাই দিই,
একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি।
বড়ো দুঃখ তার।
তার স্বভাবের গভীরে
অসাধারণ যদি কিছু তলিয়ে
থাকে কোথাও
কেমন করে প্রমাণ করবে সে।
—("পুনশ্চ"—সাধারণ মেয়ে)

"পরিশেষ" থেকে শেষ লেখা এই ধারায় কবি সমকালীন যুগচেতনায় সাড়া দিয়ে কাব্য ভাণ্ডারে নতুন কিছু সঞ্চয় করেছেন। তাঁর কাব্যে সমাজের সাধারণ স্তরের মানুষের বেদনাও রূপ লাভ করেছে তা অস্বীকার করা যায় না। "ঐকতান" কবিতায় কবির স্বীকারোক্তিকে কিছুটা বৈষ্ণবের দীনতা বলা যেতে পারে। কবি বলেছিলেন—

"নবোদিত সাহিত্য সূর্যের আলোক প্রথমে অত্যুচ্চ পর্বতশিখরের উপর পতিত হইয়াছিল। এখন ক্রমে নিকটবর্তী উপত্যকায় প্রসারিত হইয়া ক্ষুদ্র দরিদ্র কুটীরগুলিকে প্রকাশমান করিয়া তুলিতেছে।"

—("মন্ত্রপূত"—পঞ্চভূত)

আর যে নবোদিত সূর্যের আলোকে ক্ষুদ্র কুটীরগুলিও প্রকাশমান হয়ে উঠেছে তার পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ। তিনি ভালোবেসেছেন প্রকৃতিকে, উপলব্ধি করেছেন স্রষ্টার অনন্ত মহিমাকে, আবার রূপায়িত করেছেন অগণিত সাধারণ মানুষের আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ ও ব্যথা-বেদনাকে। তাই তিনি সাধারণের কবি। রবীন্দ্রোত্তর যে-সমস্ত কবিগণ কাব্যের নতুন পথে যাত্রা শুরু করেছেন, সে-পথেরও পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ। তাই পরম উদ্ভাসিত সুদীর্ঘ জীবন স্মরণ করে কবির এই ১০৫তম জন্ম-উৎসবে উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে কবি বিষ্ণু দের ভাষায় বলি—

"তোমার আকাশ দাও কবি, দাও
দীর্ঘ আশি বছরের
আমাদের ক্ষীয়মাণ মানসে ছড়াও
সূর্যোদয় সূর্যাস্তের
আশি বছরের আলো।"

ভারত কোন্ পথে ?

—চারণ

ভারতবর্ষ—সোনার ভারতবর্ষ। যে ভারতবর্ষের জ্ঞানগরিমা একদিন সমগ্র বিশ্বের বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল, যার সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, সংস্কৃতি সগৌরবে মহিমান্বিত হয়ে বিশ্বসভায় তার আসন সমুন্নত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল, যে-দেশের ঋষিদের বাণীতে বেদের উৎপত্তি—যাঁরা রচনা করেছিলেন বেদান্ত, উপনিষদ্, ষড়্দর্শন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, যা আজও বিশ্ব-মানবমানসে ও বিদগ্ধ জ্ঞানার্থীর জন্য অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে আছে; যে-দেশের সুখৈশ্বর্যের কথা দেশ-বিদেশের জনগণকে প্রলুব্ধ করে টেনে এনেছে এই ভারতবর্ষেরই মাটিতে, যার অপরিসীম শৌর্যবীর্যও ছিল অতুলনীয়, সেই ভারতেরই মানুষ আমরা, আজ-কালের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে কোথায় এসে পৌঁচেছি তা ভাবলেও আতঙ্কের শিহরণ জাগে।

ভারতবর্ষের যেদিকেই আজ দৃষ্টি নিবদ্ধ করি না কেন, সেই দিকেই দেখি জনজীবনে চলেছে বীভৎসতার ঘূর্ণাবর্ত। ব্যক্তিজীবন বিপর্যস্ত, দাম্পত্যজীবন ছলনাময় ও অসংযত—দুর্বিপাকের মুখে। সামাজিক জীবন নানা ক্লেদে পরিপূর্ণ, রাষ্ট্রীয় জীবন উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্যবসিত। সমগ্র দেশ-ব্যাপী বেদনা ও নৈরাশ্যের ঘন কালো মেঘ পুঞ্জীকৃত হয়ে আছে; যে কোন মুহূর্তেই বুঝি একটা চরম অশুভ বিপর্যয় আত্মপ্রকাশ করবে।

যে-দেশ ছিল সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা, যে-দেশ অন্যান্য দেশেরও অন্ন যুগিয়েছে, সেই দেশেরই মানুষ আজ অনশনে অর্ধাশনে দিনাতিপাত করছে। আজ তার রাষ্ট্র-কর্ণধারগণ দেশবাসীর মুখে দুবেলা দুমুঠো অন্ন যোগাবার জন্য পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ছুটাছুটি করছেন। একটা অস্বস্তিকর দুরবস্থার মধ্যে যে সংশয়সকুল অনিশ্চিত অবস্থায় পদক্ষেপ হয়েছে তার পরিণতি মঙ্গলদায়ক নয়।

কেন এই রিক্ততা? ভারতবাসী অমৃতের সন্তান আজ নিঃস্ব সর্বহারা। কেনই বা আজ তারা বিশ্বের দরবারে কাঙাল—কৃপাকণার প্রার্থী? এই দীনতা ও হীনমন্যতাই বা কেন?

অথচ সদিচ্ছার ও আগ্রহের অভাব নেই, চেষ্টার বিরাম নেই। স্বাধীনতা লাভের পর রাষ্ট্রনায়করা ও দেশের হিতকামী নেতৃগণ দেশকে শিল্পে বাণিজ্যে কৃষিতে সর্বতোভাবে উন্নত করবার আপ্রাণ প্রয়াসে নানা দিগ্‌দেশ হতে রাশি রাশি অর্থ সংগ্রহ করেছেন (অবশ্য অধিকাংশই ঋণ)। তারপর সরকারী কর্মতৎপরতা। স্বাধীনোত্তর ১৮।১৯ বৎসর কত ধুমধামের সঙ্গে জনমানসে স্বর্ণসৌধের স্বপ্ন রচিত হয়েছে—কত প্রকল্প, কত শিল্প-নগরী, কত বাঁধ, কত ইস্পাত-নগরী, কতশত কল-কারখানা, সার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাড়ম্বরে স্থাপিত হয়েছে গো-প্রজনন কেন্দ্র, দুগ্ধ-বিক্রয় কেন্দ্র,

যায় ইট-ভাটা পর্যন্ত। এরূপ কত যে উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা চলেছে তার ইয়ত্তা নেই। কত পরিকল্পনা—শিক্ষা পরিকল্পনা, মেট্রোপলিটান পরিকল্পনা, বার্দ্ধক্য ভাতা পরিকল্পনা এবং আরও অনেক,—সর্বশেষ পরিবার-পরিকল্পনা পর্যন্ত। শুধু কি এই—নানা দেশের নানা বিভাগের অসংখ্য বিশেষজ্ঞের আমদানী করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা অবাধ গতিতে চলেছে, মোট কথা, কোথাও ত্রুটী লক্ষিত হইবে না।

কিন্তু হায়, আমরা যে তিমিরে শুধু সেই তিমিরেই যে আছি তা নয়, আরও গভীরতম তিমিরে প্রবেশ করছি। এত সদিচ্ছা-প্রণোদিত উৎসাহ ও অর্থ বিনিয়োগ এবং এত বিভিন্নমুখী পরিকল্পনার রূপায়ণে বিশেষ কোন সুরাহা হয়েছে কি? নিশ্চয়ই কোন রন্ধ্রপথে দুষ্টগ্রহ প্রবেশ করে প্রকল্পগুলির উন্নতি বানচাল করে দিচ্ছে—মাথা তুলে দাঁড়াবার মত সামর্থটুকুও আসছে না। আবার, শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি-প্রকল্পের এই অধোগতি বা অবনতির সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা-পরবর্তী ব্যক্তিগত ও নৈতিক জীবনের মান যে কোন্ নিম্নস্তরে নেমে এসেছে তার পরিসংখ্যান্ হিসাব করা আজ শিবেরও অসাধ্য। স্বার্থপরতা ও মানবিকতাবোধ বা জাতির মেরুদণ্ড গঠিত করে এবং যা জাতীয় শক্তির উৎস, তার অস্তিত্ব আজ প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছে। দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য্য ও পারিবারিক জীবনের বৈশিষ্ট্য আজ অবলুপ্তির পথে। সামাজিক জীবনের কোন বালাই নেই বললেই চলে। রাজনৈতিক জীবন উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর মাত্র। কালোবাজারীর দাপটে জনজীবন বিব্রত ও সন্ত্রস্ত। আরও ভয়াবহ অবস্থা যে, অদূর-ভবিষ্যতে যারা দেশের রাষ্ট্র-তরণীর হাল ধরবে সেই ছাত্রদলের শিক্ষাব্যবস্থাও একটা কালোবাজারী ব্যবসাক্ষেত্রে পরিণত হতে চলেছে। ফলে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ না করেই নানা অপকৌশলের সাহায্যে যে কোন উপায়ে একটা ডিপ্লোমা সংগ্রহ করবার রেওয়াজ অনেক ক্ষেত্রেই আজকাল অতি উগ্রভাবেই দেখা দিয়েছে। আবার স্কুল কলেজের চেয়ে টিউটোরিয়ালের প্রাবল্য খুবই বেশী এবং এই ব্যবসায়ে লাভও নাকি খুব। সুতরাং শিক্ষার দুর্গতি সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়েই দেখা দিয়েছে। আরও পরিতাপের বিষয়, তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিদের সাহায্যেই আজ ভারতবর্ষে ভেজালের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। এই ভেজালের প্রসার এমনই এক স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে যে তা কল্পনা করলেও আতঙ্কিত হতে হয়। অসুস্থ মানুষ ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে, ডাক্তার রোগ নির্ণয় করে ঔষধের ব্যবস্থা করেন, যার সাহায্যে রোগী নিরাময় হয়ে আবার সুস্থ জীবনে প্রবেশ করে। এমনই সর্বনাশা ব্যাপার যে, সেই

উপরেও তেজাল ; এমন একটা অবাঞ্ছনীয় অপরাধমূলক ব্যবসা দেশের মধ্যে চলেছে, তার প্রতীকার নাই। কোন সভ্য দেশে কোন মানুষ এ জাতীয় ভেজাল কল্পনাও করতে পারে না।

সুদীর্ঘ আঠার বৎসর ধরে সামগ্রিক ভাবে দেশের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে এখন তার বিচার-বিশ্লেষণ করবার সময় এসেছে আমাদের জন-সাধারণের ঐকান্তিক আগ্রহ থাকা সত্বেও এবং রাষ্ট্রনায়কগণের আপ্রাণ প্রচেষ্টার পরেও দেশের আজ এই দুর্গতি কেন ? কোন্ ছিদ্রপথে অক্ষমতার বীজ প্রবেশ করেছে ? বিশ্বের অবস্থা যখন ক্রমশঃই জটিল হতে জটিলতর হয়ে আসছে, তখন আত্ম-বিশ্লেষণের দ্বারা সমস্ত দুর্বলতা কঠিন হস্তে অপসারিত করে দৃঢ়সংকল্পে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে না পারলে অদূর-ভবিষ্যতে হয়তো আমরা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় হারিয়ে যাব।
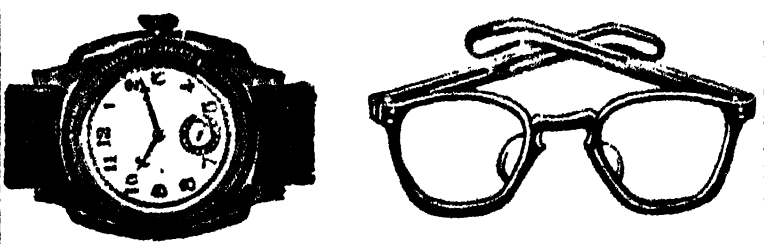
আত্ম-বিশ্লেষণী মনে আজ এ-কথাই মনে হচ্ছে যে, মানুষই শিল্প গড়ে বা ঐশ্বর্যের সৃষ্টি করে। অর্থদ্বারা শিল্প তৈরী হয় না। যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসও সেই সাক্ষ্য দিয়ে আসছে, সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে যদি অনুসন্ধিৎসু হয়ে লক্ষ্য করি এবং উদাহরণ-স্বরূপ দেখি—পাশাপাশি দুটি বাগান বা কারখানা, যেগুলির একটির মালিক বিত্তশালী, অপরটির মালিক বিত্তহীন। বিত্তবানের বাগান বা কারখানার জন্ত যাবতীয় মালমশলার প্রাচুর্য ও বহু বিশেষজ্ঞ কর্মচারী থাকা সত্বেও তার বাগানেরও শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে না বা কারখানারও উন্নতি হচ্ছে না। অথচ দেখা গেল তার পার্শ্ববর্তী কম বিত্তশালীর বাগান বা কারখানা অপ্রাচুর্যের মধ্যেও দিন দিন শ্রীবৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কারণ অনুসন্ধান করলে সঙ্গে সঙ্গেই চোখের সামনে ভেসে উঠবে একদিকে অবিত্তব্যয়ী—অব্যবস্থিতচিত্ত মালিক কর্মচারীদের অসাধুতা ও নিষ্ঠাহীনতা, এবং অপর-দিকে নিষ্ঠাবান, সৎপ্রকৃতিসম্পন্ন কর্মচারী ও মালিকের একাগ্রতা, সততা ও আদর্শনিষ্ঠা। সত্য যে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, শিক্ষা—সমস্ত কিছুইকে সুষ্ঠুভাবে ফলপ্রসূ করবার মূলে প্রয়োজন একনিষ্ঠ জাতনীতিপরায়ণ সৎ মানুষ। অসাধু ব্যক্তির দ্বারা জগতে কোন মহৎ কাজই সুসম্পন্ন হতে পারে না। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে, "Honesty is the best policy." সুতরাং সততাই সব কিছুর মূলধন—মহৎ কাজে সততাসম্পন্ন মানুষেরই প্রয়োজন সর্বাগ্রে এবং সর্বতোভাবে।

বহুযুগের এই পরাধীন জাতি বহু ব্যাপারেই সত্যের আদর্শ হতে চ্যুত হয়েছে। তারা দ্বেষ ও হিংসা-প্রবণ এবং মিথ্যাচারী—বৈদেশিক শাসক-সম্প্রদায়ের সৃষ্ট নানা ব্যভিচার দোষে দুষ্ট। এ-হেন অবস্থায় স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই রাষ্ট্র-নেতৃগণ দেশকে শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষিতে—এক কথায় সর্ববিষয়ে উন্নত করবার প্রবল আগ্রহে বিদেশ থেকে ঋণ করে অপরিমিত অর্থ সংগ্রহ করেছেন, বহু বিশেষজ্ঞ আনিয়েছেন, নানা পরিকল্পনা রচনা করেছেন। সাড়ম্বরে বহু প্রকল্পের উদ্যোগ আয়োজন করেছেন এবং তার জন্ত জলের মত অর্থ ব্যয় করেছেন ; কিন্তু

তাঁরা আন্তরিক প্রযত্নে চিন্তা করেননি, টাকায় শিল্প গড়ে উঠবে না—মানুষেই শিল্প সৃষ্টি করে। কাজেই দেশকে শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষিতে উন্নত করে তুলবে যে মানুষ, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর রাষ্ট্রনায়কগণের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য ছিল দেশের সেই মানুষগুলিকে সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও আদর্শনিষ্ঠ করে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করা। এই সুদীর্ঘ আঠার বছরে সৎ, কর্মনিষ্ঠ ও আদর্শনিষ্ঠপ্রাণ যুবক হয়ত আঠার লক্ষই তৈরী হতে পারত, যদি নেতৃবর্গ সেদিকে রীতিমত যত্নশীল ও প্রচেষ্ট হয়ে উঠতেন। সেই আঠার লক্ষ আদর্শনিষ্ঠ যুবকের মিলিত চেষ্টার ফলে কত উজ্জ্বল ভবিষ্যতেরই না সম্ভাবনা থাকত। কিন্তু সুস্পষ্ট কণ্ঠেই বলব, দেশের নায়কগণ এ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকার ফলেই আজ দেশের মানুষের নৈতিক চেতনাবোধ অবলুপ্তির পথে। আরও স্পষ্ট করে যদি বলা যায়, তবে বলতে হয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ধারক ও বাহক যাঁরা তাঁদের আচরণে ও কার্যকলাপে জনসাধারণের মনে আজ এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে যে, নৈতিক মানের কোন মূল্যই নাই। এরই ফলে সমগ্র দেশব্যাপী দুর্নীতির ঊর্ণনাভের জাল বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। অসাধু কর্মচারী, ব্যবসায়ী ও নাগরিকে দেশ ছেয়ে গেছে। এত প্রকল্প, শিল্প-নগরী ও পরিকল্পনা করেও সরকার হালে পানি পাচ্ছেন না। ন্যায়-নিষ্ঠাবিহীন আদর্শচ্যুত সমাজই আজ নানা জঞ্জালে পরিপূর্ণ। রাষ্ট্রের সর্বস্তরেই আজ তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত। এই অন্যায় ও অবিচার, ব্যভিচার ও দুর্নীতি দূর করা রাষ্ট্রপ্রধানদের পক্ষেও সাধ্যাতীত হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের নৈতিক মানের মানদণ্ডের প্রতি অবহেলার ফলেই প্রশাসনের ভিতরেও ঘুণ ধরেছে।

অবিলম্বেই একটা প্রতিকারের প্রয়োজন। চিন্তাশীল নায়ক ও রাষ্ট্র-প্রধানদের সমস্ত পরিকল্পনার পূর্বে চিন্তা করতে হবে কি ভাবে এই বিরাট শক্তিহীন অধোগত জাতিকে পুনরায় সৎপথে চালিত করে আবার সুস্থ ও স্বস্থ জীবনযাপনে অভ্যস্ত করানো যায়। অন্যথায় শত সহস্র পরিকল্পনাতেও প্রকৃষ্ট পথে দেশ ও জাতিকে বাঁচানো যাবে না। দেশকে এবং জাতিকে বাঁচাতে গেলে এখন সর্বাগ্রে প্রয়োজন man-making workshop—money-making workshop নয়।

সত্যদেব ঘরডে

বর্ষবরণে

শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী

আবার বৈশাখ এলো।
চৈত্রের লেলিহান বহ্নি শিখায় জীর্ণ পুরানো বছর
মহাকালের মহাশ্মশানে শবের মতো পুড়ে
নিঃশেষে ভস্মীভূত হয়ে গেলো। উদয় শিখরে
নববর্ষের পুণ্য বাসরে দেখা দিলো নূতন দিনের
রক্তরঞ্জিত সূর্য্য। জীর্ণ পুরানো দিনগুলি
কালের করাল স্রোতে ভাসতে ভাসতে কোন্ দিগন্তের
পারে বিস্মৃতির আবর্তে
লীন হয়ে গেলো—
শুধু রেখে গেলো লাভ ক্ষতি,
জয়-পরাজয়, দুঃখ-আনন্দ
আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বে ভরা খতিয়ান,
জীবনেতিহাসের একটি বিচিত্র অধ্যায়।

এইভাবেই দিন আসে আর দিন চলে যায়,
সূর্য্য ওঠে আর সূর্য্য ডোবে,
ফুল ফোটে আর ফুল ঝরে
এই আসা যাওয়া এবং ঝরা ফোটার মধ্যেই রয়েছে
মানুষের পতন অভ্যুত্থানের ইতিহাস।

হে নববর্ষ!
সেই স্মৃতি এবং সেই ইতিহাসের অনেক ঊর্দ্ধে তুমি।
আমরা প্রভাত আলোর দ্বারে দাঁড়িয়ে তোমাকে আহ্বান
জানাচ্ছি।
তুমি এলো! সব মোহ মালিন্যকে তোমার পবিত্র স্পর্শে
ধুয়ে মুছে দিয়ে
তুমি তোমার নূতন গীতা পাঠ শুরু করো।
জীবনে জীবনে ধ্বনিত হয়ে উঠুক তোমার ভৈরবী রাগিনী।
হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে বেজে উঠুক তোমার রুদ্র ভয়াল
বজ্র বিষাণ।
অন্যায়, অত্যাচার দুর্নীতির প্লাবনে প্লাবিত দেশে
শুরু হোক তোমার অপ্রতিহত যাত্রাভিযান।

শীতের হিম কুহেলিকা ও জড়তাকে ভেদ করে
জেগে উঠেছিলো বসন্তের লীলাবিলাস।
তারই ইন্দ্রধনু সৌন্দর্য্য মাদকতার দৃষ্টি যখন তড়িৎ চঞ্চল,
রক্তিম খলিত অঞ্চল এবং সম্ভোগ মদিরার কবোষ্ণতায়
চিত্ত যখন মত্ত মাতাল হয়ে উঠেছিলো
ঠিক তখনি রুদ্র তাণ্ডবে হোল তোমার নব জাগৃতি।
হে নব বসন্তঘাতী বৈশাখ!
তুমি সমস্ত উন্মত্ততা, সমস্ত মাদকতা সমস্ত সম্ভোগ মদিরার
অবসান করে নিয়ে এসো বিশ্বসৃষ্টিতে সঞ্জীবনী সুর।
তোমার অগ্নি-মন্ত্রোচ্চারণে উজ্জীবিত হয়ে উঠুক
নির্যাতিত নিপীড়িত
সর্ব্বহারার দল। তোমার সাম্যের মন্ত্রে দীক্ষিত করো
বিশ্বমানবকে।
পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ দুর্নীতির দাপট,
শহরে নগরে গঞ্জে গ্রামে গ্রামান্তরে ক্ষুধিত মানুষের কঙ্কাল
বিছিন্ন।
মানুষের শব সমান দেহের উপর ছুটে চলেছে অত্যাচারীর
রক্ত শকট।
তাই হে রুদ্র বৈশাখ!
তুমি জেগে উঠো তোমার উদাত্ত নৃত্যে।
তোমার রুদ্র তাণ্ডবের সঙ্গে সঙ্গে প্রকম্পিত বিশ্বে
খুলে পড়ুক তোমার পিঙ্গল জটাজাল।
প্রলয়ের তালে তালে বিশ্ব বিনাশী নর্ত্তনের ছন্দে ছন্দে
বেজে উঠুক তোমার ডমরু।
অত্যাচারীর মেদবহুল বক্ষে গর্জ্জে উঠুক তোমার
তীক্ষ্ণ ত্রিশূল।

হে রুদ্র বৈশাখ! তুমি এসো!
তোমাকে আহ্বান করি।
সমস্ত অশিব ধ্বংস করে তুমি নিয়ে এসো
অমরার অম্লান পারিজাত,
স্বর্গের নির্মাল্য উপহার।

—শ্রীসুজিৎকুমার ঘোষ

শতায়ু-পরবর্তী দীর্ঘজীবন

পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলের সংবাদ আদান-প্রদানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানা দেশের বহু দীর্ঘায়ু জীবনের খবর পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের দেশে পৌরাণিক গ্রন্থাদিতে বহু দীর্ঘজীবনের কথা আমরা শুনেছি। বর্তমান যুগে মহাযোগী তৈলঙ্গ স্বামী নাকি প্রায় তিন শ' বছর বেঁচেছিলেন। সম্প্রতি ৬ই এপ্রিল বোম্বাইএর রত্নগিরি জেলায় মুক্তাবাঈ অর্জুন সামন্ত ১১০ বছর বয়সে মারা গেছেন। তাঁর পিতার ১২৫ বৎসর ও পিতামহের ১৫০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়েছিল। কিছুদিন আগেই আমাদের দেশে শত-বর্ষাধিক বয়স্কা এক মহিলা আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করেছেন।

দেখা গেছে, দীর্ঘজীবনের ব্যাপারে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্বর্তী উত্তর ককেসাস অঞ্চলের দাঘেস্তান নামক স্থানের জয়-জয়কার। সেখানে শত শত শতায়ু আছে, তারা বেশ সুস্থ ও কর্মক্ষম, চিকিৎসকদের দ্বারস্থ হবার তাদের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। এদের একজন ১১৯ বৎসর-বয়স্কা শ্রীমতী মারিএম্ ছুজাক্রাইলোভা'র অসম্ভব স্মৃতিশক্তি, বার বৎসর বয়সের সব কথা তিনি বলতে পারেন। কিছুদিন আগে একজন চিকিৎসক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, জীবনে তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছে কতখানি। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—কিসের জন্ত? আমি তো কখনও অসুস্থ হই না, এখনও তো আমি বেশ কর্মক্ষম। ভেলিয়ারান্তা জেলার শ্রীমুহম্মদ জান্ মাহ্মুদফ-এর বেলায় দেখা গেছে, ১০৩ বৎসর বয়সে তাঁর একটী কন্যা-সন্তান হয়েছিল। সেই মেয়েটী এখন বেশ স্বাস্থ্যবতী—সপ্তম শ্রেণীতে সে পড়ছে। এই অঞ্চলেরই আর একজন মহিলা শ্রীমতী খাভা গমারোভা তাঁর ১৪০তম জন্মবার্ষিকী পালন করেছেন। মস্কোর ২৩এ এপ্রিলের খবর, আজের-বাইজান-এর পাহাড়ী গ্রামের শ্রীমতী বিয়েম মেখরালিএভা-ও তাঁর ১৩৪তম জন্মদিবস পালন করেছেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনদের অনেকেরই বয়স ৯০ বর্ষাধিক। এই গ্রামের অধিবাসীদের গড় বয়ক্রম ৮০ হতে ৯০ বৎসর। আবার, মস্কো থেকে ৩০এ এপ্রিল খবর পাওয়া গেছে, আজেরবাইজান-এর শক্তসমর্থ মানুষ শ্রীশিরালি মুসলিমভক নাকি পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যক্তি; তাঁর বয়স ১৬১ বৎসর এবং তাঁর বিশ্বাস এখনও তিনি ১৫০ বৎসর বাঁচবেন। সম্প্রতি তিনি কাস্পিয়ান-তীরবর্তী তৈল-শহর বাকুতে গিয়েছিলেন। মোটরগাড়ী দেখে তিনি বিরক্ত হন; বলেছেন, ঘোড়ায় চড়েই তিনি আরাম পান। ইরাক, ইরান প্রভৃতি রাজ্যেও অনেক শতায়ুর সন্ধান পাওয়া গেছে।

এরূপ দীর্ঘজীবনের মূল কারণ কি, তার গবেষণায় বৈজ্ঞানিকগণ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা যথেষ্ট বিব্রত বোধ করেছেন। সাধারণতঃ মনে করা হয়, উন্মুক্ত বিশুদ্ধ বাতাস, উপযুক্ত আহার এবং পরিমিত কাজ ও বিশ্রাম দীর্ঘজীবনলাভের মূল কথা। কিন্তু এই তত্ত্বের সম্যক্ সমাধান এখনও সম্ভব হয়নি। চিকিৎসা-শাস্ত্রাভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞেরা স্বীকার করেছেন যে, শতায়ু হবার পরেও তারুণ্য কি ভাবে থাকতে পারে তার রহস্যোদ্ঘাটনে তাঁরা সক্ষম ন'ন। তবে গবেষণা ও অনুসন্ধানের কাজ তাঁরা ছাড়েননি। তাঁদের সঙ্কল্প, এই গূঢ় তত্ত্বটি তাঁরা আবিষ্কার করবেনই।

এদিকে আমেরিকায় ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জনস্বাস্থ্য বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সোবেল গত ২৪এ এপ্রিল এই ব্যাপারে বলেছেন—বেঁচে থাকবার জন্ত মন প্রস্তুত থাকলে ভবিষ্যতে মানুষ দু'শ বৎসর বা তার বেশীও বাঁচতে পারবে। ভেষজবিদ্যা ও অস্ত্রোপচার-ব্যবস্থা ভবিষ্যতে এমনই এক উন্নত অবস্থায় পৌঁছবে যে তখন মৃত্যুভয় কমে যাবে—উপযুক্ত পরিবেশ পেলে এখনকার চেয়েও দু-তিন গুণ

বেশী সময় বেঁচে থাকা সম্ভব হবে। তবে সেরূপ পরিবেশের উদ্ভব ও এত দীর্ঘকাল বাঁচবার ইচ্ছা হওয়া কতটা সম্ভব হবে সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে—জরা ও বার্ধক্য-প্রপীড়িত জীবন ক'জনই বা চায়।

কিন্তু দীর্ঘজীবনের যে-সমস্ত সংবাদ পাওয়া গেছে তাদের দৃষ্টান্তে জরার প্রশ্ন আছে বলে মনে হয় না। বর্তমান জগতের বিচিত্র পরিবেশে মানসিক সমস্যা হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু দৈহিক সমস্যার খবর বড় একটা পাওয়া যায়নি।

মায়াবিনী গের্ডা মুন্সিংগার

শ্রীমতী গের্ডা মুন্সিংগার একজন জর্মান রমণী—খুবই রূপসী ও সৌভাগ্যবতী, বর্তমান বয়স ৩৬ বৎসর। তার আদি বাস পূর্ব-জর্মানীতে, এখন সে ম্যুনিক-এর অধিবাসিনী। কয়েক বৎসর আগে ব্রিটেনে মায়াবিনী ক্রিস্টিন কীলার যেমন অনেক কেলেঙ্কারী করে ব্রিটিশ রাজনীতিতে তোলপাড় এনেছিল, তেমনি রূপসী মায়াবিনী মুন্সিংগার কানাডায় অনেক কেলেঙ্কারীর ইতিহাস রেখে, অনেক টাকা সঞ্চয় করে ব্যাভেরিয়ার এক শৈলনিবাসে বেশ ভালোমানুষটী হয়ে রয়েছে।

পনের বৎসর আগে গের্ডা পূর্ব-জর্মানী হতে পালিয়ে এসেছিল পশ্চিম জর্মানীতে। সেখানে এক আমেরিকান সৈনিককে সে বিয়ে করে এবং তার পর কানাডায় চলে যায়। ১৯৫৫ সাল থেকে সেখানে সে বেশ পাকাপোক্ত হয়ে বসে। তখন আর স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল না বললেই হয়। বেশ উঁচু মহলে সে মেলামেশা শুরু করে দিয়েছে। তার রূপলাবণ্য ও আচরণে অনেকেই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এমনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন প্রধান মন্ত্রী শ্রী ডি ফে ন্‌ বে কা রে র মন্ত্রিসভার প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীসেভিনী। এদিকে উচ্চ সামরিক কর্মচারীদেরও এই মোহিনী রমণী বশীভূত করে। পুলিশ কিন্তু সব খবর রাখছিল ও সতর্ক ছিল। তিন বছর আগে শ্রীডিফেন্‌বেকারের মন্ত্রিত্বের পর শ্রীপিয়ার্সনের মন্ত্রিত্ব শুরু হয়েছে। তাঁরই এক মন্ত্রী এই গোপনীয় ব্যাপারটী ফাঁস করে দেওয়ায় সেখানে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ১৯৫৩ সালে গের্ডা কিছুকাল প্যারীতে উত্তর আটলান্টিক চুক্তি-সংস্থার সামরিক বিভাগেও কাজ করেছিল।

এর পরে গের্ডা ম্যুনিক-এ চলে এলো এবং গের্ডার বদলে নাম নিলে হেল্‌গা মুন্সিংগার। ম্যুনিক-এসে এক নাইট ক্লাব খুলে ব্যবসা শুরু করল। অনেকেই তার রূপে আকৃষ্ট হয়ে নাইট ক্লাবে ভীড় করতে লাগল—সারা শহরে তার নাম ও আকর্ষণ ছড়িয়ে পড়ল। পাঁচ বছর এই ব্যবসা চালাবার পর সে নিভৃত শৈলাবাসে আশ্রয় নিয়েছে। অপরদিকে কানাডায় উত্তেজনা ও পুলিশের তৎপরতা খুব বেড়ে গেছে। সন্দেহ করা হয়েছে, মাটাহারির মত গের্ডাও নাকি কানাডার সামরিক তথ্য সোভিয়েটের কাছে পাচার করবার কাজে লিপ্ত ছিল। সুতরাং নানা জায়গায় অনুসন্ধান ও তল্লাসী চলেছে। শ্রীডিফেন্‌বেকারের রক্ষণশীল দল মহা ফাঁপড়ে পড়ে গেছে।

এদিকে সুন্দরী গের্ডা বেশ কিছু অর্থ সঞ্চয় করে নিয়েছে। তার জীবন-কাহিনী প্রকাশ করবার ব্যাপারে ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক পত্রপত্রিকা বেশ তৎপর হয়ে উঠেছে। এর জন্য শ্রীমতী মুন্সিংগারের আম-দানী হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা। আমেরিকার রেডিয়ো ও টেলিভিশন সংস্থাগুলিও তাকে অনেক টাকা দিয়েছে। এখন সে বেশ ধনী হয়ে মনের আনন্দে আছে। ইংলণ্ডে ম্যাক-মিলান-সরকার-এর উচ্ছেদসাধনের কারণ হয়েও শ্রীমতী কীলার এত টাকার অধিকারিণী হতে পারেনি। জানা গেছে, কানাডা-সরকার গের্ডা কেলেঙ্কারীর বিচার গোপনে শুরু করে দিয়েছে। সে যাতে আর কানাডায় ঢুকতে না পারে তার জন্য কড়া প্রহরার ব্যবস্থা হয়েছে। হয়তো পরে তার ব্যাপারে বহু রহস্যের উদ্ঘাটন হবে।

জাতিস্মর

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ হেমেন্দ্র ব্যানার্জি লণ্ডনে সাত বৎসর বয়সের দুটী যমজ ভগিনীর সঙ্গে তিন ঘণ্টা কথাবার্তা বলেন। বালিকা দুটীর পিতার ধারণা, নয় বছর আগে মোটর-দুর্ঘটনায় নিহত তাঁর দুটী কন্যা পুনর্জন্ম লাভ করে তাঁর কাছে এসেছে। ডঃ ব্যানার্জি ঐ মেয়ে দুটীর সঙ্গে তাদের স্কুলের পড়াশুনা, খেলা-ধুলা, চিন্তাধারা, স্বপ্ন প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, রুশ ও মার্কিন বিজ্ঞানীরাও তাঁর এই তত্ত্বের গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে আগ্রহী।

নর্দাম্বারল্যাণ্ড শহরের হটটনি বে'র দুই কন্যা জেনিফার ও গিলিয়ান এবং তাদের মৃত দুই ভগিনী জোয়ানা ও জাকুলিনের এত সাদৃশ্য যে, তাদের বাবার মনে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, তাঁর মৃত দুটি কন্যারই পুনর্জন্ম ঘটেছে।
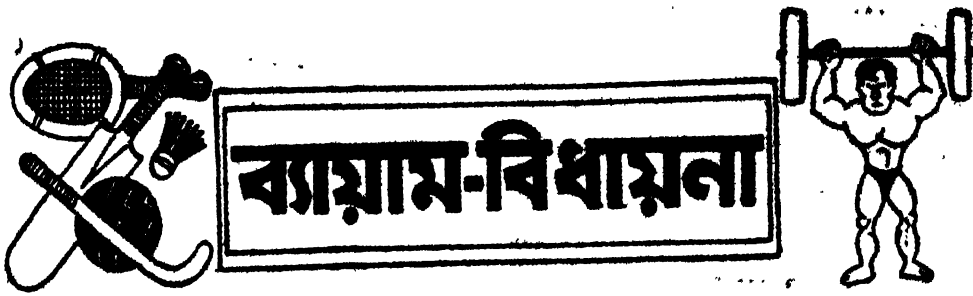
—শ্রীখেলোয়াড়

মিহির সেন সম্বর্ধনা

পক-প্রণালী অতিক্রম করে শ্রীমিহির সেন এক মৃত্যুঞ্জয়ী অভিযানে সফলতা লাভ করেছেন এবং সন্তরণের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। বাঙলায় তথা ভারতের প্রতিটি ক্রীড়া-রসিকের মুখে তাই শ্রীসেনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে। বাঙালী আজ গর্ব করে বলতে পারছে যে, আমারই ঘরের দুলাল বিজয়ী হয়ে ফিরে এল।

গত রবিবার ১৭ই বৈশাখ (১লা মে) মধ্য কলিকাতা কংগ্রেস কমিটি এক সম্বর্ধনা সভায় শ্রীসেনকে তাঁর সাম্প্রতিক সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। সভার সভাপতি ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার বলেছেন যে মিহির সেন শুধু বাঙলা দেশের নয় ভারতের গৌরব। কলকাতার মেয়র বলেছেন যে, বিদেশে স্পোর্টস্ মেডিক্যাল ল্যেবোরেটরি আছে, কিন্তু এদেশে নেই। এ ধরণের একটা সংস্থা গঠনের জন্য সরকারের সাহায্য করা প্রয়োজন।

সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীমিহির সেন বলেন যে, সাহায্যের জন্য সরকারের উপর নির্ভর ও পরকালের জন্য ভগবানের উপর ভরসা করে দিন কাটানো উচিত নয়। আবার শুধু রাজনীতিতেও সব কাজ হবে না। জনগণের দৃঢ় মনোবল নিয়ে মহৎ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ছোট গণ্ডি ভেঙে এগিয়ে যেতে হবে। পড়াশুনা ও খেলাধূলা এক সঙ্গে সমান তালে চালিয়ে নিজের দৃঢ় চরিত্রের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করতে হবে। আর জীবনে নব নব অভিযান-স্পৃহা বাড়াতে হবে।

সেরা খেলোয়াড়

ভেটারেন্স্ ক্লাব প্রতি বছর কলকাতা ময়দানের সেরা খেলোয়াড়কে (ফুটবল) পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করে। কলকাতা ময়দানের এককালের দিক্‌পাল ও সুখ্যাত খেলোয়াড়দের নিয়ে ভেটারেন্স্ ক্লাব গঠিত। কাজেই তাঁদের এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে ধন্যবাদের যোগ্য।

গত বছরের সেরা ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে প্রথম স্থান পেয়েছেন ইস্টার্ণ রেল দলের রাইট আউট শ্রীপ্রদীপ ব্যানার্জি। তিনি দীর্ঘকাল ধরে ফুটবল খেলছেন—এবং তাঁর পর্যায়ে সারা ভারতে আজও তিনি সেরা খেলোয়াড়। তাঁর হ্যাটিং, পাসিং এবং নিখুঁত ড্রিব্‌লিং অনুকরণযোগ্য। শ্রীব্যানার্জি বহু বার ভারতীয় অলিম্পিক দলে স্থানলাভ করেছেন। নিজেও '৬০ সালের অলিম্পিক দলের অধিনায়ক ছিলেন। বিদেশ সফরে গিয়ে উন্নত ধরণের খেলা দেখিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা আজও তিনি খেলছেন। ইস্টার্ণ রেল দলের তিনি ব্যাক্‌বোন্। কলকাতার সব কটি ফুটবল দলের কাছে এখনও তিনি ভীতিপ্রদ। বয়সের ধর্ম অনুযায়ী তাঁর গতিবেগ কিছুটা শ্লথ হয়েছে। কিন্তু তাঁর ক্রীড়া-শৈলীর গুণে এখনও তিনি সেরা ফুটবল খেলোয়াড়।

গত শুক্রবার ৬ই মে (২২শে বৈশাখ) কাস্টম্‌স্ ক্লাবের তাঁবুতে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে পদ্মশ্রী গোষ্ঠ পাল শ্রীব্যানার্জির হাতে ভেটারেন্স্ ক্লাবের প্রদত্ত ট্রফি তুলে দেন। এই সভার প্রধান অতিথি অতীতের সুখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীমরিস ব্রাউটন বলেন যে, আই-এফ-এ ওঠা-নামা বর্জিত যে লীগ খেলার ব্যবস্থা করেছে তাতে কোন উন্নতি হবে না, বরং বিশেষ ক্ষতি হবে। সম্মানিত শ্রীব্যানার্জি বলেন যে, কেবলমাত্র খেলার মাঠে ভাল খেললেই হবে না। খেলোয়াড়দের মাঠের বাইরের আচরণও সন্তোষজনক হওয়া প্রয়োজন।

এই অনুষ্ঠানে গত বছরের প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দলকে সম্বর্ধনা জানান হয়।

ভারত-জার্মাণ হকি টেস্ট

জসবন্ত সিংহের নেতৃত্বে ভারতীয় হকি দল পূর্ব জার্মানী সফর শেষ করেছে। এই সফরে ভারতীয় দল পূর্ব জার্মানীর বিভিন্ন শহরে তিনটি টেস্ট,

এবং একটি সাধারণ খেলায় অবতীর্ণ হয়েছিল। হকিতে জার্মান দল যথেষ্ট শক্তিধর। পূর্ব বার্লিন শহরে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্টে ভারত জয়লাভ করলেও দ্বিতীয় টেস্টে ভারত পরাজিত হয়। শেষ টেস্ট অনুষ্ঠিত হয় জেনা শহরে। চার হাজার দর্শক খেলার মাঠে হাজির ছিলেন। খেলা ভাঙবার ত্রিশ সেকেণ্ড আগে বলবীর সিং বিজয়সূচক গোলটি (খেলার একমাত্র গোল) দেন। ফলে ভারত আন্তর্জাতিক পর্যায়ের তিনটির মধ্যে দু'টিতে বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। জার্মান যুবদলের সঙ্গে ভারতীয় হকি দল একটি খেলায় অবতীর্ণ হয় এবং ভারতীয় দল এ-খেলাটিতে বিজয়ী হয়।

বিদেশ সফররত ভারতীয় হকি দল সম্পর্কে ১৯৫২ সালের অলিম্পিক বিজয়ী ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক শ্রীকে. ডি. সিং (বাবু) বিরূপ মন্তব্য করেছেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এবং ক্রীড়া-পরিষদ্ ও বিভিন্ন হকি সংস্থার কাছে প্রেরিত এক আবেদন পত্রে তিনি বলেছেন যে, তাঁরা যেন সকলে এই মহান্ খেলাটিকে বাঁচিয়ে রাখার সহায়তায় এগিয়ে আসেন। বিদেশ সফররত ভারতীয় হকি দলকে খুব শক্তিশালী করে গঠন করা হয়নি এবং অতীতের দলগুলোর চেয়ে এ দল অনেক কম শক্তিধর। ভারতীয় হকি দল গঠনে সুচিন্তিত পরিকল্পনার অভাব রয়েছে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ্ দলের সফর

অবশেষে ফুল পড়ল। বহু টাল-বাহনা, মান-অভিমানের পালা চুকিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ্ ক্রিকেট দলের ভারত সফর এখন এক রকম নিশ্চিত। শোনা যাচ্ছে, বরোদার-রাজা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজীকে 'কনভিন্স্' করতে সক্ষম হয়েছেন এবং যার ফলে ইন্দিরাজীও এই সফরের জন্ত আঠার হাজার পাউণ্ড বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করেছেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ্ দল ছাব্বিশ হাজার পাউণ্ড দাবি করেছিল পাঁচটি টেস্ট খেলার জন্ত—সঙ্গে অবশ্ত সাতটি তিন-দিনের খেলাও থাকবে। এখন টাকার অঙ্ক কম হওয়ার জন্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ্ দল মাত্র তিনটি টেস্ট খেলতে রাজী হয়েছে—সাতটি ছোট তিন-দিনের খেলা অবশ্ত বাদ পড়বে না। গারফিল্ড সোবার্সের নেতৃত্বে আগামী ডিসেম্বর মাসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ্ দল ভারতে আসবে এবং ন' সপ্তাহকাল ভারতে অবস্থান করবে।

ফুটবলের মরশুম

ময়দানে ফুটবলের মরশুম শুরু হয়ে গেল। এবার অবশ্ত লীগ ফুটবলে একমুখীন প্রতিযোগিতা হবে। কেবল-মাত্র চ্যাম্পিয়ানসীপের জন্তে প্রত্যেক বিভাগের শক্তিশালী দলগুলো পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দেবে। অবশিষ্ট দলগুলো সুবিধামত পয়েন্ট নিয়ে বাণিজ্য করার সুযোগ খুঁজবে। কিন্তু কলকাতার ফুটবল-দর্শকরা খেলা দেখতে পাগল। তাঁরা আই-এফ-এ'র বড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত। এবছর খেলার মাঠে খেলা বয়কট করাও যে প্রয়োজন একদল দর্শক তা' স্বীকারও করেছেন—হয় ত' আংশিক বয়কটও হবে। মাঠের উত্তেজনায় কিছুটা ভাঁটার টানও দেখা যাবে। কিন্তু ময়দানের ফুটবল মরশুম ঠিকই মন্দাক্রান্তা ছন্দে এগিয়ে যাবে। একেবারে বন্ধ হবে না।

প্রথম ডিভিসন লীগে এবারও সবচেয়ে শক্তিশালী দল মোহনবাগান। স্টপার প্রসাদ এবং সেণ্টার ফরোয়ার্ড অসীম মৌলিকের (দু'জনই ছিলেন ইষ্টবেঙ্গল দলের খেলোয়াড়) আগমনে মোহনবাগান দলের শক্তি বেড়েছে। কোন বিপর্যয় না ঘটলে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে মোহনবাগান দল এ বছরও লীগ বিজয়ী হতে পারবে। ইষ্টবেঙ্গল দল হায়দরাবাদ থেকে নঈমকে স্টপার হিসাবে এবং সার্ভিসেস্ থেকে গুরু কৃপাল সিংকে সেণ্টার ফরোয়ার্ড হিসাবে নিয়ে এসেছে। আর রাইট আউট হিসাবে এসেছেন হাবিব। ময়দানে এঁরা নবাগত। এঁদের খেলা ও প্রচেষ্টা কার্যকরী হলে ইষ্টবেঙ্গল দল এবছর মোহনবাগান দলের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হবে। সবচেয়ে শক্তিশালী দল গড়বার চেষ্টা করেছে এক কালের নামকরা মহমেডান স্পোর্টিং দল। কলকাতার বাইরে থেকে অনেক খেলোয়াড় এই দল আমদানি করেছে। বহিরাগত এ সব খেলোয়াড়দের মধ্যে টিম-স্পিরিট গড়ে উঠলে মনে হয় মহমেডান স্পোর্টিং দলও সমানে সমান প্রতিযোগিতা করতে পারবে। দু'টি রেল দলের শক্তি একই রকম আছে। কাজেই লীগ-বাজির দৌড়ে এরা বেশ কিছু পিছিয়ে থাকবে।

নেতাজীর প্রতি অসম্মান

নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের খেয়াল-খুশী ও আমলাতান্ত্রিক নীতি রীতিমতই টিঁকে আছে। কোথাও ভ্রান্তি, কোথাও অপরিণামদর্শিতা, কোথাও দূরদর্শিতার অভাব, কোথাও বা একগুঁয়েমিতার প্রীতি মন্ত্রক ও প্রশাসকদের রীতি ও নীতিকে আবিষ্ট করে রেখেছে। ক্ষমতা যখন হাতে আছে তখন একটা কিছু করবার বড়াইএর মোহে কোনো দ্বিধা নাই, পূর্বাপর চিন্তা ও বিচার-বিবেচনা করবার অবসর নাই। জাতীয় জীবনে ও জনগণের চিত্তে এই কৃতিত্ব-দর্শনের যে কোনো মূল্য থাকে না, বরং জনচিত্তকে ক্ষুণ্ণ ও বিক্ষুব্ধ করে তোলে, সেই চেতনার বিকাশ কবে হবে বলা শক্ত।

ব্যাপারটা এবার নেতাজীকে নিয়ে। সমগ্র ভারতের জাতীয় জীবনে ও জনমানসে এই প্রিয় নেতার স্থান যে কত ঊর্ধ্বে, কত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার মধ্যে আসমুদ্রহিমাচল ভারতভূমির বিরাট জনসমষ্টির মনোরাজ্যে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন, সেই সত্য মন্ত্রকের তথ্যধারী হতে প্রশাসকমণ্ডলীর কোনো জবরদস্ত পুরুষও অস্বীকার করবেন না। তবুও এই নেতার প্রতি অবহেলা ও অসম্মানের অন্ত নাই। কোনো বিশেষ ব্যবস্থায় তাঁর প্রতি যথোচিত সম্মানের প্রশ্ন এলে এঁদের টালবাহানার সীমা-পরিসীমা থাকে না। এমন কি, যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের তিনি সন্তান—যে কলিকাতা শহর তাঁহার বাসস্থান, সেখানেও তাঁর প্রতি যথাবিহিত সম্মানপ্রদর্শনে যথেষ্ট বিলম্ব করা হয়েছে। একটা প্রতিমূর্তি-প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কত জল ঘোলা হয়েছে, শাসনশক্তির পুরোধা ব্যক্তিদের কত না সতর্ক চিন্তায় চলতে হয়েছে, সে-সমস্ত বিষয় তোলবার কথা নয়।

আকাশবাণীর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পর্ষৎ-এর সদস্যমণ্ডলী সম্প্রতি খুব তৎপর হয়ে উঠেছেন। একটা-কিছু করা চাই—এরূপ একটা মহৎ উৎসাহের পরিচয় সম্প্রতি তাঁরা দিয়েছেন। তাঁরা ভারতের জননায়কদের একটা শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। স্থির করেছেন, ভারতের জাতীয় নেতৃবর্গের প্রথম ও প্রধান পর্যায়ের তিনজন হলেন মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু ও লালবাহাদুর শাস্ত্রী। প্রতি বৎসর এঁদের জন্মদিনে আকাশবাণীর মারফত বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রচার-ব্যবস্থা থাকবে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় পর্যায়ের নেতা—তাঁর জন্মদিন অনুষ্ঠানের প্রচার ব্যবস্থা প্রতি পাঁচ বছর অন্তর করা হবে। গত ৩রা মে লোক-সভায় যখন এই অত্যদ্ভুত ব্যবস্থাটির প্রশ্ন তোলা হয় তখন তথ্য ও বেতার-মন্ত্রকের উপমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সৎপথী উত্তর দেন, নেতাজীর জন্য বেতার অনুষ্ঠান প্রতি বৎসর হওয়া সম্ভব নয়; তা হলে যে বহুসংখ্যক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।

শ্রীমতী নন্দিনীর এই উত্তর খুবই বিস্ময়জনক। নেতাজীকে জাতীয় ক্ষেত্রে নিম্নস্তরে নিয়ে আসবার একটা বিশেষ উদ্দেশ্যজনিত প্রচেষ্টা বহুদিনের, কিন্তু নেতাজী সম্বন্ধে এমন মনোভাব প্রকাশের নজীর এর আগে আর দেখা যায়নি। কোন মতামত ব্যক্ত করবার সময় এবং কোন ব্যবস্থা গ্রহণকালে দেশের কল্যাণার্থেই জনগণের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেই কোন মন্ত্রীর তা করা একান্ত কর্তব্য ও সমীচীন। অযথা জনচিত্তকে ক্ষুব্ধ করে তোলা রাজনীতির পরিচায়ক নহে।

জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রথম সারিতে যাঁদের স্থান দেওয়া হয়েছে তাঁদের সম্বন্ধে কেহই ভিন্ন মত পোষণ করবেন না। কিন্তু নেতাজী কি তাঁদের সমপর্যায়ের নন? স্বাধীনতা-যুদ্ধে বিরাট দানের মধ্যে যিনি মহিমান্বিত হয়ে আছেন, ভারতের জনমানসে যিনি প্রতিষ্ঠা ও অমরত্ব লাভ করেছেন, কোনো হীন প্রচেষ্টাই তাঁকে ছোট করতে পারে না। জাতীয় নেতার যথাযোগ্য স্থান জনগণের মধ্যে, জাতির চিত্তে ও আদর্শে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আকাশবাণীর উচ্চ কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাবিলাসের আমলাতান্ত্রিক মোহ যত শীঘ্র ভাঙে ততই মঙ্গল।

স্কটের বিদায় ও নাগা-সমস্যা

শেষ পর্যন্ত রেভাঃ মাইকেল স্কট নামক কুখ্যাত ইংরেজ-পুঙ্গবটি ভারত হতে বিদায় হয়েছেন, মোট কথা বিতাড়িত হয়েছেন। বিলম্বে হলেও এর প্রয়োজন ছিল। এই অসামান্য ধূর্ত ও করিৎকর্মা ব্যক্তিটি নাগা বিদ্রোহের মূলে যে কতখানি খেলা খেলেছেন তার মূল্যায়ন এখনো হয়নি। তবে ইংরেজের রাজনৈতিক চরিত্রের একটা বিশিষ্ট রূপ তাঁর মাধ্যমে আর একবার যে প্রকাশিত হলো সেটাই শিক্ষার বিষয়। মিশনারীর ছদ্মবেশে এতবড় একটা

ধুরন্ধর কূটবুদ্ধি ব্যক্তি যেভাবে নাগাদের মধ্যে এমন অল্পকালের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছেন, নাগা-বিদ্রোহীদের নেতা ফিজোর লণ্ডনে পলায়নে ও সেখানে আশ্রয়লাভে সাহায্য করেছেন, বিদ্রোহীদের উস্কানী দিয়েছেন—তাদের হয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে প্রচারকার্য চালিয়েছেন, পয়োমুখ বিষকুম্ভের মত বাইরে সৌজন্য দেখিয়ে ও শান্তির দূত সেজে ভারতবিদ্বেষী পরমশত্রুর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন—সমস্তই ভারতবাসী খুবই ক্ষুব্ধ বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ্য করে এসেছে। ভারতে তিনি যে নিতান্তই অবাঞ্ছিত ব্যক্তি সেটা সম্যক্‌ভাবে বুঝতে ভারত-সরকারের প্রায় দু'বছর সময় লেগেছে।

ভারত-সরকার ভেবেছিলেন, স্কট শান্তির দূত। অবশ্য তখন তিনি এমন একটা ছদ্মবেশী রূপ নিয়ে আসরে আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন তাঁকে চেনা শক্ত ছিল। অথচ এমনই আশ্চর্য যে, এই মহাশয় পুরুষ যখন স্বরূপে আবির্ভূত হলেন এবং শেষ পর্যন্ত পলায়ন করে বিদেশে বিদ্রোহীদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিলেন, তখন সেই ভয়ঙ্কর লোকটাকেই শান্তি-মিশনে এসে বৈঠকে যোগ দিতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয়নি। ভদ্রলোক এতই অকৃতজ্ঞ যে, ভারত-সরকার তাঁর প্রতি সৌজন্য দেখালেও তিনি সেই সরকারকে ভারতত্যাগের প্রাক্কালে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। ওঠা যে দমদম বিমান বন্দরে দাঁড়িয়ে তিনি সাংবাদিকদের বললেন, নাগাদের এই সংগ্রামের প্রতি তাঁর বহুলাংশে সমর্থন আছে এবং সেইজন্য তিনি নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না। তাঁকে নাকি ভুল বোঝা হয়েছে—তিনি ভারতের মিত্র, শান্তিদূত। তাঁর সমস্ত কাগজপত্র ভারত-সরকার বাজেয়াপ্ত করেছেন বলে তিনি ক্ষোভ জানিয়েছেন।

অবশ্য ভারত-সরকার আশা করেছিলেন, নাগাদের উপর প্রভাবশালী এই মিশনারী প্রভুটী নাগাদের বুঝিয়ে শান্তি-স্থাপনে রাজী করাবেন। কিন্তু সেই ভ্রান্তিবিলাসের অবসান হয়েছে। যে পাদ্রীমহোদয় নাগা-নেতাদের আপত্তিকর চিঠিপত্র বিদেশে স্বার্থসংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে চালান দিয়েছেন, ভারতের নাগা সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সমস্যার রূপ দেওয়ার চক্রান্তে উদ্যোগী হয়েছিলেন, সেই ভদ্র-মহোদয়কে বিশ্বাস করা উচিত হয়নি।

শান্তি-মিশনের অপর একজন হোতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি। অতত কল্পনা করে এবং শান্তি অসাধ্য বুঝে তিনমাস আগেই তিনি মিশন ত্যাগ করেছেন। আর একজন আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহা শেষ পর্যন্ত যেগতিক বুঝে মিশনের সংস্রব হতে সরে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর কার্যকলাপেও গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। বৈরী নাগাদের অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের ষড়যন্ত্রের প্রামাণ্য নথীপত্র পেয়েও তিনি সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার করেননি, এমন কি মূল দলিলপত্র হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছিলেন। নাগাদের উদ্যোগ-আয়োজন জেনেও তিনি তাঁদের উপর কঠোর নীতি প্রয়োগ করেননি, আসামের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার চিন্তাকে প্রকারান্তরে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন। আমরা আগেও জানিয়েছি, আসামের মন্ত্রিসভা দুর্বল ও কর্মকুশল নহে। গভর্নমেণ্ট সময় থাকতে সতর্ক হলে ভারতের সামগ্রিক সংহতিরক্ষার প্রশ্নে জটিলতা কমবে বলেই মনে হয়।

মিজো-প্রমুখ উপজাতি-সমস্যা

এবার মিজোদের কথা ধরা যাক। আসাম উপত্যকার পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে একটা গভীর অসন্তোষ অনেক দিন ধরে দানা বেঁধে উঠছে। পূর্বসীমান্তের এই পার্বত্য এলাকাগুলির মধ্যে মিজো পাহাড় অঞ্চলের গুরুত্ব সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য মিজো-বিদ্রোহের সাম্প্রতিক যে অভ্যুত্থান ঘটেছিল তা মোটামুটি শান্ত হয়ে আছে। কিন্তু মিজোদের চরমপন্থী নেতারা যে স্থির হয়ে বসে শান্তির চিন্তা করছেন এরূপ কিছু আশা করলে ভুল হবে। তাঁরা লড়াই চালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন এবং বৈরী নাগাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভারত হতে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র রাজ্য-গঠনের স্বপ্ন দেখছেন। এ-ব্যাপারে মিজোদের সাহায্য করছে পাকিস্তান ও চীন। পূর্বপাকিস্তানের সরাসরি যোগাযোগ-ব্যবস্থায় সামরিক সাহায্য দিয়ে ও গেরিলা-যুদ্ধে শিক্ষিত করে তাদের প্রস্তুতিপর্ব চলেছে। সন্দেহ করা হচ্ছে, আগামী বর্ষায় পার্বত্য অঞ্চলের অবস্থার সুযোগ নিয়ে আবার হয়তো মিজোরা তৎপর হয়ে উঠবে। অবশ্য এরূপ একটা সুযোগ নাগারাও গ্রহণ করতে পারে।

আমরা আগেও বলেছি, এবারেও বলব, চীন ও পাকিস্তানের চক্রান্ত এর পিছনে আছে। সুযোগ-সুবিধা তারা পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেছে, কারণ ভারতকে নানাভাবে বিব্রত রাখাই তাদের উদ্দেশ্য। আর একটি বিষয়েও আমরা সতর্কতার প্রশ্ন তুলেছিলাম, সেটা আসাম সরকারের দুর্বলতা ও অদূরদর্শিতা। মূলতঃ আসামের পার্বত্য উ প জা তি রা রাজ্যের প্রশাসন-ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট নয়। সমতল-ভূমির অধিবাসীদের সঙ্গে পার্বত্য এ লা কা র অ ধি বা সী দে র ভাষা, সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহারে কোনরূপ সঙ্গতি নাই। অসমীয়া ভাষা ও রাজনীতির

উপর তাদের কোন প্রীতিও নাই। এমন কি মিজো-প্রমুখ উপজাতিগুলি আসাম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতের মধ্যে স্বতন্ত্র রাজ্য চেয়েছিল। কিন্তু আসাম সরকার তাতে রাজী না হয়ে এই সমস্ত অঞ্চলগুলিকে আঁকড়ে থেকেই যত অনর্থের সৃষ্টি করেছে। কিছুকাল আগেও মিজো চরমপন্থী নেতারাও ভারতরাষ্ট্রের মধ্যেই নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাজ্যগঠন করতে চেয়েছিলেন। কোনরূপ পরিণাম-চিন্তা না করে আসাম সরকার তাতে রাজী হতে পারেননি। এমন কি নেহেরুজী আসামের উপজাতিগুলির জন্য যে স্কটিশ-ধরনের স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাব করেছিলেন তাতেও আসাম-সরকারের পূর্ণ সমর্থন ছিল না। পটাশকর কমিশন মিজো পাহাড় অঞ্চলকে কেন্দ্রীয় শাসনের এক্তিয়ারে আনবার সুপারিশ করেছেন; তাতেও আসাম-সরকার ও রাজ্য-কংগ্রেস প্রবল আপত্তি তুলেছেন। যে কোন ব্যবস্থা সমগ্র ভারতের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই গ্রহণ করা উচিত। এতে উপজাতিগুলির সমস্যার যেমন অবসান হবে, ভারতীয় সীমান্তের নিরাপত্তাও তেমনি সংহত ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

মহিলা অভিযাত্রীদের কোকটাং শৃঙ্গ বিজয়

বিগত ১৮ই এপ্রিল কুমারী পুষ্প আটাভেলের নেতৃত্বে একটী মহিলা পর্বত-অভিযাত্রী দল পশ্চিম সিকিমে হিমালয়ের ২০,১৬৬ ফুট উচ্চ কোকটাং শৃঙ্গশীর্ষে আরোহণ করে একটা নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। বৈশিষ্ট্য এই যে, এই অভিযাত্রী দলটী সম্পূর্ণ মেয়েদের নিয়ে তৈরী। নেত্রী ছাড়া দলে ছিলেন সহকারী নেত্রী ও ডাক্তার কুমারী মীনা আগরওয়ালা, কুমারী গিরা শাম, কুমারী প্রবীণ শর্মা ও কুমারী লাকপা শেরপা। এছাড়া তিনজন শেরপাও তাঁদের সঙ্গে ছিল। অভিযাত্রী দল পর্বতশীর্ষে ভারতের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করেছে। হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনষ্টিটিউটে তাঁরা সকলেই শিক্ষা পেয়েছেন।

সম্পূর্ণ ভারতীয় মেয়েদের নিয়ে গঠিত মহিলা পর্বত-অভিযাত্রীর দল ভারতে এই-ই প্রথম। হিমালয়ের সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করে তাঁরা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, তার অভিনবত্বের দিক চিন্তা করলে আমাদের যথেষ্ট গর্বের কারণ আছে। সমস্ত সংস্কার হতে মুক্ত হয়ে নারীজাতিও নানা দুর্গম অভিযানে ব্রতী হয়ে সফলকাম হতে পারেন, এই দৃষ্টান্ত তার উজ্জ্বল পথিকৃৎ হয়ে থাকবে।

ব্রিটেন ও রোডেশিয়া

ব্রিটেন ও রোডেশিয়ার সম্পর্ক একটি হেঁয়ালির মত। এক সময় আফ্রিকার রোডেশিয়া রাজ্য ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অধিকারে ছিল। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ভাঙনের মধ্য দিয়েই রোডেশিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। ব্রিটিশ উপনিবেশ থাকায় বহু ব্রিটিশ সেখানে পাকাপাকি অধিবাসী হয়ে গেছে। অথচ স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে তাদের সংখ্যা অনেক কম। এই শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা ক্ষমতা দখল করে স্বাধীনতা প্রচার করেছে—অর্থাৎ এদেশ তাদেরই, তারাই এখানকার অধিবাসী। ঠিক দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের আদর্শে তারা রাজ্য করতে চায়—দেখাতে চায় তাদের দেশের চিরদিনের কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীরা কৃপাকণার পাত্র। রোডেশিয়ার বৃটিশজাত আয়ান স্মিথ যখন নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের সঙ্কল্প জানালেন, তখন ব্রিটিশ বিরক্তি ও ক্রোধ জানালেন, আয়ান স্মিথকে স্বীকার করলেন না। একটা অভিনয়ের ছলে যখন বহির্বিশ্বকে ধোঁকা দেবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল তখন ব্রিটিশের সঙ্গে রোডেশিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হলো।

সম্প্রতি পোর্তুগীজ মোজাম্বিকের সহায়তায় দুটি গ্রীক জাহাজ রোডেশিয়ার জন্য তেল নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার তৎপর হয়ে ওঠে এবং তেল সরবরাহে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ বাধা দেয়। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা এলো যে, উভয়ের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। ব্রিটিশের যেন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে। কয়েক দিনের মধ্যেই রোডেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী আয়ান স্মিথ লণ্ডনে এলেন। রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট লণ্ডনে এলেন একটা শান্তি প্রতিষ্ঠার দৌত্য নিয়ে। তিনি রোডেশিয়ার ব্যাপারকে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করলেন এবং শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধানের জন্য একযোগে ব্রিটেন ও রাষ্ট্রপুঞ্জকে চেষ্টা করবার জন্য আহ্বান জানালেন।

এদিকে ২৮শে এপ্রিল ঘোষিত হলো সাময়িকভাবে রোডেশিয়ার সঙ্গে ব্রিটেনের একটা সাময়িক কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী শ্রীউইলসন সাহেব বলেছেন, বিনাসর্তে আলাপ আলোচনা করেই এই কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যারা ব্রিটিশ মহিমার পরিচয় জানেন তাঁরাও বলবেন, পূর্বাহ্নেই সমস্ত স্থির করা ছিল। পৃথিবীর নিপীড়িত জাতিগুলির প্রতি ব্রিটিশ জাতের সমবেদনার বৈশিষ্ট্যের ছাপই রোডেশিয়ায় দিয়েছে—আয়ান স্মিথ তাদের অবাঞ্ছিত বলে মনে হয় না।

সাপ্তাহিকী

১ মে

বিপুল ও নব অস্ত্রশক্তির প্রদর্শনীর সঙ্গে ও বিরাট কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠানে মে দিবস পালিত হয়েছে রাশিয়ায়।

● নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের ১৯৬৫ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্র নির্বাচিত হয়েছে মলয়লম্‌ চিত্র 'চিমনী'; দ্বিতীয় চিত্র নির্বাচিত হয়েছে শ্রীতপন সিংহ পরিচালিত বাঙলা ছবি 'অতিথি'।

● শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসকর্মী সম্মেলনের নূতন নামকরণ হয় 'বাঙলা কংগ্রেস'।

● বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকদের নিখিল ভারতীয় ফেডারেশনের কার্যকরী সভার কলিকাতার অধিবেশনে সর্বত্র শিক্ষকদের বেতনের সমতা রাখবার দাবী করা হয়েছে।

● প্রায় তিন হাজার লোক পূর্বপাকিস্তানের চট্টগ্রাম জেলে হানা দেয়। রক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষে গুলিতে ১ জন নিহত ও ৪৪ জন আহত হয়েছে।

২ মে

নয়াদিল্লীতে ভারত ও ভুটানরাজের মধ্যে আলোচনা আজ শেষ হয়েছে। এর সফলতার জন্য ভুটানরাজ ভারত-সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

● যোজনা-মন্ত্রী শ্রীঅশোক মেহতা কানাডা সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য নিউইয়র্ক হতে অটোয়ায় উপস্থিত হন।

● ঘোষিত হয়েছে, আগামী ২৬এ মে ব্রিটিশ গায়না স্বাধীনতা লাভ করবে।

● বিশিষ্ট সাংবাদিক ও অমৃতবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক শ্রীযতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ৬০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন।

● নয়াদিল্লীতে আফ্রো-এশীয় বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের আট দিনব্যাপী অধিবেশন শেষ হয়েছে। চেয়ারম্যান শ্রীএম. সি. চাগলা এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নতিশীল দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও আত্মনির্ভরতার আহ্বান জানান।

● বোম্বাইএর সংবাদ, ফুলোয়ালে মার্শালিং ইয়ার্ডে বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ফলে ১১ জন নিহত, শতাধিক লোক আহত ও বিপুল ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে।

৩ মে

মাইকেল স্কটকে ভারত ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লোকসভায় আসামের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নাগাদের ব্যাপারে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হলে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

● অটোয়ায় শ্রীঅশোক মেহতা বলেছেন, ভারতের বৈষয়িক উন্নয়নে সঙ্কটজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

● আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহা জানিয়েছেন, তিনি নাগা শান্তি মিশন ত্যাগ করেছেন ও মিশন ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

৪ মে

● কলিকাতা ও ভারতের বৌদ্ধ তীর্থগুলিতে বিপুল শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে বুদ্ধ জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়।

● উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়েছে বলে প্রকাশ। জানা গেছে, অনেকের অনাহারে মৃত্যু হয়েছে।

● ওয়াশিংটনে যোজনা মন্ত্রী শ্রীঅশোক মেহতার সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট শ্রীজনসনের বৈঠক পুনরায় শুরু হয়েছে।

● সুখ্যাত মাইকেল স্কট বিতাড়িত হয়ে আজ ভারত ত্যাগ করেছেন।

● সেনাবাহিনী হতে অবসর গ্রহণের ও কানাডায় ভারতের হাই কমিশনাররূপে যাত্রার পূর্বে জেঃ জে. এন. চৌধুরী কলিকাতায় উপস্থিত হয়েছেন।

● পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার ডেপুটি স্পীকার শ্রীআশুতোষ মল্লিক ৬০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন।

● ফিলিপাইনের পররাষ্ট্র সচিব বলেছেন, শীঘ্রই মালয়েশিয়া সীমান্ত থেকে ইন্দোনেশিয়া সৈন্যাপসরণ করবে।

● ম্যানিলায় এশীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারত ২-০ গোলে জাপানকে পরাজিত করেছে।

৫ মে

উপাচার্যরূপে কার্যকাল পূর্ণ হবার আগেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীত্রিগুণা সেন পদত্যাগ করেছেন।

● শীঘ্রই ভারতরক্ষা আইন সংশোধনের কথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দ রাজ্যসভায় প্রকাশ করেছেন।

● সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডক্টরেট সম্মান লওয়ার সময় পাকিস্তানের শ্রীভুট্টো বলেছেন, ভারত-বিরোধিতা ছাড়া পাকিস্তানের গতি নাই।

● রাষ্ট্রপতি সংসদ-ভবনে পরলোকগত নেহেরুর পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন।

৬ মে

উড়িষ্যার খরা-জনিত দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে প্রকাশ।

● কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, বর্তমানে জোট নিরপেক্ষ জাতিগুলির উপর চাপ পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট শ্রীটিটো ও সংযুক্ত আরবরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট শ্রীনাসের ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে এক জরুরী আলোচনাচক্রের কথা জানিয়েছেন।

● ইন্দোনেশীয় সরকার পুনরায় ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা জানিয়েছেন।

● শ্রীপ্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়রূপে পুরস্কৃত হয়েছেন।

● হিমালয়ের ১০,২০০ ফুট উচ্চে তুষারাবৃত নীলকণ্ঠ ও নেওবর গিরিশৃঙ্গ দ্বয়ের মধ্যবর্তী যোশীমঠ হতে বদ্রীনাথ পর্যন্ত ২১ মাইল দীর্ঘ মোটর যাতায়াতের উপযোগী পথ প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচ্যবন উদ্বোধন করেছেন।

৭ মে

ভুবনেশ্বরে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মনীয়ম বলেছেন, উড়িষ্যায় যে দুর্ভিক্ষের সূচনা হয়েছিল তা আয়ত্তাধীন হয়েছে।

● বি. এস্‌সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে।

● ভারতের বৈষয়িক উন্নয়নে যোজনামন্ত্রী শ্রীঅশোক মেহতার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও বিশ্বব্যাঙ্কের সঙ্গে আলোচনা সফল হয়েছে বলে প্রকাশ। শীঘ্রই তিনি প্রত্যাগমন করছেন।

● প্রকাশ, ভারতের সঙ্গে মিত্রতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী নয়াদিল্লীতে আসছেন।

● চীন-সরকার ভারতকে জানিয়েছেন, এখনও তারা সীমান্তের অমীমাংসিত অঞ্চলগুলির উপর দাবী পরিত্যাগ করেনি।

● রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষ করে রবীন্দ্র রচনাবলীর ১২টি খণ্ডে রুশ অনুবাদের শেষ খণ্ডটী প্রকাশিত হয়।

● কলিকাতায় হকি প্রতিযোগিতায় ১-০ গোলে কর্প্‌স্ অফ্‌ সিগ্‌ন্যাল্‌স্‌কে পরাস্ত করে পঞ্জাব পুলিশ বেটন কাপ জয় করেছে।

● আলেকজান্দ্রিয়ার সংবাদ, প্রেসিডেন্ট নাসের ও মার্শাল টিটো যুগ্মভাবে ইস্তাহার দিয়েছেন, শীঘ্রই ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে ত্রিশক্তির বৈঠকের তাঁরা পক্ষপাতী।

শ্রীবীরেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক ১৬৬।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬, বসুমতি প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক ৩০, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ হইতে প্রকাশিত।

বিভিন্ন স্থানে 'স্মৃতিদীপা' পত্রিকার প্রতিনিধি

কলিকাতা

১। সংসদ পাবলিশিং হাউস,
১৭৩/৩, বিধান সরণি, কলি-৬

২। শ্রী বি. মণ্ডল, ৮বি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলি-১
(তিনতলা)

৩। শ্রীসুধীর নন্দী, ১/৬৫, যতীন দাস নগর,
বেলঘরিয়া, কলি-৫৬

৪। শ্রীগোপালচন্দ্র পাল
৫০, ইষ্ট কমলাপুর, দমদম, কলি-২৮

৫। গ্রন্থচক্র
৪৭, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলি-২৬

৬। শ্রীঅমরেন্দ্রকুমার দাস
৪, শেঠবাগান রোড, কলি-৩০

হাওড়া

১। শ্রীকরুণাসিন্ধু মুখোপাধ্যায়
১৪/১, হৃদয়কৃষ্ণ ব্যানার্জী ফার্স্ট বাই লেন,
ব্যাঁটরা, হাওড়া

২। শ্রীমণীন্দ্রনাথ দত্ত
১১৮/১, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, হাওড়া

হুগলী

১। শ্রীদীনবন্ধু ঘোষ
ভট্টাচার্য্যপাড়া, চাতরা, শ্রীরামপুর

২। শ্রীরতিরঞ্জন দত্ত, নবারুণ লাইব্রেরী
নবগ্রাম, কোন্নগর, হুগলী

মেদিনীপুর

১। শ্রীচারুভূষণ করণ, কোতবাজার, মেদিনীপুর

২। শ্রীমৃণালকান্তি মজুমদার
বক্‌শীবাজার, মেদিনীপুর

৩। বাণীমন্দির, মহিষাদল

৪। শ্রীশশাঙ্ককিরণ ঘোষ
গড়শালবনি, ভায়া ঝাড়গ্রাম

বর্দ্ধমান

১। শ্রীমনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
তেলমারুই রোড, বর্দ্ধমান

২। শ্রীনারায়ণচন্দ্র কর্মকার
আদ্যশ্রী জুয়েলারী, কালিতলা,
বি. সি. রোড, বর্দ্ধমান

৩। শ্রীশান্তিরঞ্জন দাস
১/৪-এ, মার্কনি এভেনিউ, দুর্গাপুর-৪

পুরুলিয়া

১। ডাঃ অন্নদাবিজয় হালদার
সেবা কার্য্যশ্রী, রঘুনাথপুর

বাঁকুড়া

১। শ্রীপঞ্চানন সিংহ, অমরকানন, বাঁকুড়া

বীরভূম

১। শ্রীনির্ম্মলশিব দত্ত, সাঁইথিয়া

নদীয়া

১। শ্রীজয়ন্তকুমার বসু, শক্তিনগর (ভায়া কৃষ্ণনগর)

২। শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পোঃ নাসরা, নদীয়া

২৪ পরগনা

১। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নীলাচল, খড়দহ

২। শ্রীনারায়ণচন্দ্র দাস, মোল্লার হাট,
ঠাকুরবাড়ী কোয়ার্টার, আগরপাড়া

৩। শ্রীপূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়
গোমোপাড়া, বাংলা, বাটানগর

৪। শ্রীকণ্ঠ মাইতি, কাকদ্বীপ

মালদহ

১। শ্রীবিভূতিভূষণ মিশ্র
C/o. শ্রীঅভয়পদ ঘোষাল, ইংলিশবাজার

মুর্শিদাবাদ

১। শ্রীব্রজগোপাল রায়, কান্দী

২। শ্রীকেদারনাথ সাহিড়ী, লালদীঘি, বহরমপুর

জলপাইগুড়ি

১। শ্রীকানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, জলপাইগুড়ি

২। শ্রীধনঞ্জয় বিশ্বাস, শিল্পসমিতি পাড়া, জলপাইগুড়ি

৩। শ্রীননীগোপাল বিশ্বাস, কামারপাড়া, জলপাইগুড়ি

বিহার

১। শ্রীহিমাংশুশেখর মহাপাত্র
টেলকো নিউ কলোনী, রোড ৫০,
জামসেদপুর-৪

উড়িষ্যা

১। শ্রীভগবান ঋষি
চাউলিয়াগঞ্জ, মাথাসাহী, কটক-১

২। শ্রীকালিপদ ভৌমিক, পিটনসাহী, কটক-১

৩। শ্রীভবানীপতি ঘোষ, মাতৃভাণ্ডার, বারিপদা

আসাম

১। শ্রীফাল্গুনীবিজয় চক্রবর্ত্তী
রেলওয়ে কলোনী, বদরপুর, কাছাড়

২। শ্রীধীরেন্দ্রকুমার মল্লিক
সাপেকাটি, শিবসাগর

৩। শ্রীকুমুদরঞ্জন দাস পুরকায়স্থ,
হাফলং, এন. সি. হিলস্

৪। শ্রী জি. সি. চক্রবর্ত্তী, মোহনীপাথা, কামরূপ

৫। শ্রীদিগেন্দ্রমোহন দে, রামকৃষ্ণনগর, কাছাড়

৬। শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র দেব, আর্য্যপট্টী, কাছাড়

৭। শ্রীসুকৃতিকুমার দত্ত
সি. এস. টি. ই. এস. অফিস, পাণ্ডু, গৌহাটী

ত্রিপুরা

১। শ্রী এস. এস. মিত্র, আগরতলা

দিল্লী

১। শ্রীনীলরতন চট্টোপাধ্যায়
জি ৩১১, নওরোজীনগর, নিউ দিল্লী

Regd. No. C 410.
Phone : 35-4297

প্রথম বর্ষ • ত্রয়োদশ সংখ্যা

শুক্রবার, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩
Friday, 20th May, 1966

সম্পাদক — শ্রী বিবেকরঞ্জন চক্রবর্তী

SREE DURGA IRON WORKS
OFFICE & WORKSHOP.
50, Nirmal Chandra St., Calcutta-12.
PHONE:-24-4226.
Manufacturers of:-
COLLAPSIBLE GATE,
W.I. GATE.
GRILL & RAILING Etc.

• চয়ন •

"সমাজে আনতে হবে progressive mood, marriage reform বা বিবাহ সংস্কার, আর industry; স্বাস্থ্যে আনতে হবে normal diet and mode of living, normal exercise through activity, আর elevative engagement; industry-তে আনতে হবে service basis, profitable management আর continuity; আর এ-সব আসে যথার্থ শিক্ষা হ'তে;—তাই education-এ বিশেষ করে আনতে হবে elevative intellectualism, আর practical ও industrial training. একটা being-কে যেমন তিনটা aspect-এ ভাগ করা যায়: psychological, physical and dynamic, —তেমনই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ ও industry বা শ্রমশিল্প —প্রত্যেকটিকে ঐ-রকম তিনভাগে ভাগ করে নিতে হবে।

Progressive mood মানে higher ideal-এ love আর admiration—যেমন বুদ্ধদেবের প্রতি admiration অশোকের ভিতর দিয়ে সম্ভব করে তুলেছিল এমন একটা empire যা' এখন কল্পনা করেও আনা যায় না। এই progressive mood যেমন করে আসে, তাই করা লাগবে। এটা আনতে গেলে চাই ঐ-জাতীয় idea-গুলি জাতির ভিতর চারিয়ে দেওয়া।....Progressive mood যাতে বজায় থাকে, এমনতর idea publish করা, বিরোধী publications discourage করা, স্কুল কলেজগুলিকে mould করা—তার জন্য চাই যাত্রা, কথকতা, থিয়েটার, উপন্যাস, বায়োস্কোপ, রেডিও, বক্তৃতা, নাটক—আর নূতন ধরণের পাঠ্যপুস্তক—elevating literature."

—শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র।

১ম বর্ষ **ধৃতিদীপা** ১৩শ সংখ্যা

Friday, 20th May, 1966 : শুক্রবার, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩ : 50 Paise

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি :

নাম ও ঠিকানা-সহ স্পষ্টাক্ষরে কাগজের এক দিকে লিখিত রচনার পাণ্ডুলিপি, সম্পাদকের নিকট পাঠান আবশ্যক। কোন মনোনীত রচনা কোন বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট পাঠালে ফেরত পাঠান হবে।

গ্রাহকদের প্রতি :

সপ্তাহের প্রতি শুক্রবারে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে কুড়ি পয়সার ডাকটিকিট-সহ অতিরিক্ত কপির জন্য জানাতে হবে। ঠিকানার পরিবর্তন হলে, পনেরো দিন আগে জানাতে হবে। ভিঃ পিঃ-তে পত্রিকা পাঠান হয় না। চিঠি-পত্রে ও কুপনে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করা দরকার।

এজেন্টদের প্রতি :

এজেন্সীর নিয়মাবলী পত্রিকার কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি :

পত্রিকার কার্যালয়ে পত্র দিলে বিজ্ঞাপনের মূল্য, নিয়মাবলী ইত্যাদি জানান হয়।

চাঁদার হার :

ডাকসহ বার্ষিক ২৪-০০ টাকা ;
ষাণ্মাসিক ১২-০০ টাকা,
ত্রৈমাসিক ৬-০০ টাকা ;
প্রতি সংখ্যা ০-৫০ পয়সা,

ম্যানেজার, ধৃতিদীপা
৪০, মতীলাল টেম্পল স্ট্রীট
কলিকাতা-৪
ফোন : ৩৪-৪২৯৭

সূচীপত্র

বোধ সমীক্ষা

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্তদের দুর্গতি (অর্থনৈতিক) যদি শীঘ্রই দূর করা না যায়, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গে আবার তীব্র গণ-আন্দোলন আরম্ভ হইতে পারে বলিয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রধানমন্ত্রীকে জানাইয়াছেন এবং কেন্দ্রের সাহায্যও প্রার্থনা করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্তরা যে জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং তাঁহাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে না পারিলে যে দেশ ও সমাজ মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন হইবে মুখ্যমন্ত্রী যদি সত্যই তাহা মনে প্রাণে বুঝিয়া থাকেন তবে খুবই আশার কথা।

যাঁহারা দেশ ও সমাজের মেরুদণ্ড, এমন কি, যাঁহাদের আত্মত্যাগে বিদেশী শাসনের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব হইল—সেই তাঁহাদের অস্তিত্ব আজ বিলুপ্তির পথে কেন? স্বাধীনতা লাভের পর হইতে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে নেতৃবৃন্দ তাঁহাদেরই স্বগোত্রীয় মধ্যবিত্তদের জন্য কি কিছুই করিতে পারিলেন না—যাহা কারণে আজ এইরূপ আশঙ্কার কারণ ঘটিত না?

স্বাধীনতা লাভের পর হইতে আমরা ইহাই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে মধ্যবিত্তদের বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য বাস্তবে কিছুই করা হয় নাই। বরং জ্ঞানতঃই হোক আর অজ্ঞানতঃই হোক যাহা করা হইয়াছে তাহা মধ্যবিত্তদের বিলোপ সাধনের পক্ষেই গিয়াছে।

বিলম্বে হইলেও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে সজাগ হইয়াছেন ইহা অতীব শুভলক্ষণ। তাঁহার আন্তরিকতা কেন্দ্রকে নিশ্চয়ই অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করাইতে সক্ষম হইবে। কেন্দ্র বিষয়ের গুরুত্ব তাঁহার মত অতখানি হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্তদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যাহা যাহা করণীয় অচিরাৎ তাহা বাস্তবে আরম্ভ করিতে তাঁর সাধ্যমত সকল শক্তি নিয়োগ করিবেন নিশ্চয়ই। তাঁর হৃদয়বত্তাকে আমরা সমস্ত অন্তর দিয়া অভিনন্দন জানাইতেছি।

পালন, পোষণ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়া মানুষকে সংহত ও উজ্জ্বল করিয়া তোলাকেই আমরা রাজনীতি বলিয়া মনে করি। রাজনীতি মানে শ্রেষ্ঠ নীতি—মানবের কল্যাণের, সত্তা সংরক্ষণ ও উবর্দ্ধনের নীতি।

মধ্যবিত্তদের মধ্যে দুর্জয় শক্তি নিহিত আছে। সর্বাঙ্গীন পালন, পোষণ ও পরিচর্যা পাইলেই সেই শক্তি দুর্জয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে। এই মধ্যবিত্তরাই রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার অতন্দ্র সৈনিক—যুগে যুগে ইহারাই আদর্শ ও নীতির ধারক ও বাহক। এই মধ্যবিত্তরা আবার বাঁচিয়া উঠুক—দেশের সর্বত্র যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুর্নীতি অবাধে লীলা করিতেছে তাহার চির অবসান হোক।

বর্তমানে মধ্যবিত্তদের দুর্গতি শুধু অর্থনৈতিকই নহে। অর্থনৈতিক দুর্গতির অপনোদন করবার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মানসিক এবং আত্মিক সচ্ছলতার জন্যও যাহা করণীয় তাহা করিতে হইবে। উদরান্নের সঙ্গে সঙ্গে মন এবং আত্মার অন্নও যোগাইতে হইবে। কারণ একটা মানুষ শুধু উদর নহে যে দু'মুঠো চাল আর গম দিলেই তাহার দুর্গতি দূর হইয়া যাইবে।

মধ্যবিত্তদের সর্বাঙ্গীন দুর্গতি দূরীকরণের এই প্রচেষ্টা একটা সাময়িক ও বাহ্য প্রলেপে পর্যবসিত হইবে না বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি।

আমি এই

—উমাপদ নাথ

রাতের ঘোমটা তুলে আকাশের সিঁড়িতে পা ফেলে
সে-দিন সে যাত্রী হলো তার-সে সে-কেলে
ছেলেবেলার ঘর ছেড়ে,
বাবা দিলেন মাথা নেড়ে
বললে চকিতে হেসে, 'আর কেন দেখা
অন্ধচোখে হাতি দেখা ? তার চেয়ে দেখা
গেলে যদি চোখ মেলে—তার সাথে তাকে,
তবে কেন ছাড়বো না এই বিশ্বটাকে ?'

দেখলাম, ও হয়েছে পাগল—
মুক্ত হয়ে গেছে ওর মনের আগল :
ওকে ছেড়ে দিতে হলো—চলে গেল মাথা ঠেলে
ধীরে ধীরে আকাশের সিঁড়িতে পা ফেলে।

ও গেলে দেখলাম, আমি নেই—
যদিও সবার চোখে রক্তে মাংসে আমি সেই।

তারপর আমি এই—
তাহারই চরণ ছুঁয়ে
তারই কাছে মাথা নুয়ে
মিছিলের তীর্থপথে যেতে যেতে বুঝি, আছে
সেই সত্য মোর কাছে—
সে ছাড়া আমার কিছু নেই।

আমার গাছগুলো

—[illegible]

ছেলেরা যখন মেয়েদের পায়ে-পায়ে হাঁটিয়ে যায়,
তখন আমায় খুঁজে দেখ ;
সময়!
মেয়েদের পায়ের নূপুরের নীচে থেকে [illegible] ;

এইতো বাদামের খোসা ছড়ানো বেঞ্চের কোণের দিকে
ওদের আসার শব্দ শুনতে পাচ্ছি
ময়দানের সবুজ-সবুজ ঘাসগুলো মাড়িয়ে-মাড়িয়ে,
ওরা আসছে।

ওরা আসছে!
ওরা আসছে!!
কুকুরীর কামনা লিপ্সা চোখে।

সময়, চোখের আলোর জানালা খুলে
আমি আমার মাঠের স্বপ্নে বিভোর ;
আমার গাছগুলো—
গাছের মর্মরিত সবুজ পাতার মৌনতায় ;
জাজীনপুরের নীলিম ছোঁওয়া
নির্জন বিকাল আমায় ডাকে।
প্রান্তরের আদিম অরণ্য প্রেমে ;
আমি হারিয়ে যাই।

পুতুল

—শৈলেনকুমার দত্ত

কারিগর পুতুল গড়েছে—
ছোট বড় সাদা কালো কত যে পুতুল :
জেলে, তাঁতী, কামার, কুমোর,
আরও সব কত যে রয়েছে!
রঙিন পরিধিতে তাই কেউ হাসছে—
ফিকে রং নিয়ে কেউ বসে চোখের জলের
হিসেব কষছে।
কেউ আবার হাল্কা হাওয়ার মতো
নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে আছে।

কিন্তু একদিন আসবে—
সাতপাকে পোড় খাওয়া পুতুলগুলো তখন
জীবনটাকে বুঝবে,
আওয়াজ দেবে নতুন একটা ইতিহাসের।

তারপর আর এক আশ্চর্য রাতের গভীরে
মাটির সঙ্গে মিশে যাবে তার রঙিন দেহটা?

গীতার্থ-সন্ধানে

—শ্রীধনেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত

—পঞ্চম পরিচ্ছেদ—

(পূর্বানুবৃত্তি)

সৃষ্টি, প্রকৃতি-পুরুষ ও জীবতত্ত্ব

কোন বস্তু সম্বন্ধে সমগ্র জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সেই বস্তুর স্বরূপ কি, উহার অস্তিত্বের মূল বা আদি কোথায়, উহার প্রকাশ কিরূপ এবং পরিণতিই বা কোথায় তাহা জানিতে হয়। কিন্তু জাগতিক পদার্থের ন্যায় ব্রহ্মবস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নহেন। তিনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অনির্দেশ্য, অনাদি ও অনন্ত। সুতরাং তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ জীববুদ্ধির অগোচর। সৃষ্ট জীবের পক্ষে সৃষ্টিবহির্ভূত বিষয়ের ধারণা করা সম্ভব নহে, কারণ সে সৃষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং ব্রহ্ম সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানও সৃষ্টির সঙ্গে সেই ব্রহ্মবস্তুর সম্পর্কযুক্ত অবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ—অর্থাৎ সৃষ্টিতে তিনি যেরূপে প্রকাশিত, সৃষ্টির সঙ্গে যে ভাবে সম্পর্কযুক্ত তাহাই মাত্র জীব সাধন-বলে জানিতে পারে। এই জ্ঞানই ব্রহ্ম সম্বন্ধে জীবের সামগ্রিক জ্ঞান। এই জ্ঞানকে নানাদিক হইতে নানা বিষয়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহাদের প্রত্যেকটী বিষয়কে এক একটী তত্ত্ব নামে অভিহিত করা হয়। গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতেই এই সকল তত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে এবং প্রায় সমস্ত অবশিষ্টাংশ ভরিয়াই উহা চলিয়াছে। এই ভাবে গীতা ক্রমে প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব, জীব বা ভূত-তত্ত্ব, গুণ-তত্ত্ব, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব, জ্ঞান ও জ্ঞেয়-তত্ত্ব, ক্ষর অক্ষর ও উত্তম পুরুষ-তত্ত্ব ইত্যাদি বহু তত্ত্বালোচনার অবতারণা করিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে ঐ সমস্ত আলোচনায় প্রবেশের চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ আমরা সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। এই প্রসঙ্গে প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব ও জীব-তত্ত্বে প্রবেশ করিতে হইবে।

আমাদের পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগৎ কি প্রকারে সৃষ্ট হইল? শাস্ত্র বলেন ভগবানই ইহার সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু ভগবদ্বস্তু চিন্ময়, চৈতন্য-স্বরূপ, আর সৃষ্টি জড়প্রধান। জড় উপাদান ভিন্ন সৃষ্টি হইতে পারে না। জাগতিক পদার্থমাত্রেরই দুইটি কারণ দেখিতে পাই—একটিকে উপাদান কারণ ও অপরটিকে নিমিত্ত কারণ বলা হয়। ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা ও নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার। মৃত্তিকাও থাকা চাই কুম্ভকারও থাকা চাই—তবেই ঘট প্রস্তুত হইতে পারে। নিষ্ক্রিয় চৈতন্যময় ব্রহ্মসত্তা ক্রিয়াশীল হইলে তিনি সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ হইতে পারেন কিন্তু উপাদান কারণরূপী জড়বস্তু কোথা হইতে আসিল? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাইয়া সাংখ্যশাস্ত্র জড় ও চৈতন্যরূপী দুইটি স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন। ঐ শাস্ত্রমতে জড় ও চৈতন্য দুইটি স্বতন্ত্র সত্তা; যথাক্রমে প্রকৃতি ও পুরুষ নামে অভিহিত। উহাদের উভয়ের সহযোগিতায়ই সৃষ্টি রচিত হইয়াছে। কিন্তু বেদ উপনিষদাদি শাস্ত্র জড়বস্তুর স্বতন্ত্র কোন সত্তা স্বীকার করেন না। ঐ সকল শাস্ত্র বলেন চৈতন্যরূপী ব্রহ্মবস্তুই একমাত্র সত্তা—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"—তদ্ভিন্ন অন্য কোন সত্তা নাই। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মবস্তু একদিকে যেমন চৈতন্য সত্তারূপে সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ হইয়াছেন, তেমনি নিজ অচিন্ত্য মায়া-শক্তিবলে অন্যদিকে জড়রূপে প্রকাশিত হইয়া সৃষ্টির উপাদান কারণও হইয়াছেন। একক ব্রহ্মই সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত কারণ উভয়ই। এক ভিন্ন দুই সত্তা নাই। কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্র সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বেদমতের সঙ্গে নিজ প্রতিপাদ্য মতের সুষ্ঠু সামঞ্জস্যবিধান করিতে পারেন নাই। প্রকৃতি ও পুরুষকে দুইটি স্বতন্ত্র সত্তারূপে স্থাপন করিতে গেলে যেরূপ সমস্যার উদ্ভব হয়, দুইটি একই বস্তুরূপে স্থাপন করিলেও তেমনই নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। এই উভয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান আমরা গীতাতেই দেখিতে পাই। গীতার মতে প্রকৃতি ও পুরুষ দুইটি স্বতন্ত্র তত্ত্বও নহে, এক তত্ত্বও নহে; বস্তুতঃ উহারা একই সত্তার দুইটি পৃথক অভিব্যক্তি মাত্র। পরমবস্তু একটিই—পুরুষ ও প্রকৃতি তাঁহার দুইটি প্রকাশ মাত্র। এই প্রকাশের মধ্যে পার্থক্য আছে বলিয়া, মাত্র সেই দৃষ্টিতেই ইহারা ভিন্ন।

ব্রহ্মের যাহা পরমভাব তাহাতে সৃষ্টির প্রকাশ নাই। সে ভাবে তিনি জগদতীত, নিরাকার, নির্বিকার, নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, অনির্দেশ্য, নির্লিপ্ত, অক্ষর, চিন্ময় বস্তু। চৈতন্যময় সেই পরমতত্ত্বে যখন লীলাবিলাসের ইচ্ছা জাগ্রত হইল, যখন তিনি আনন্দ আস্বাদনের জন্য বহুরূপে প্রকাশ পাইতে ইচ্ছা করিলেন, "একোঽহং বহুস্যাম্" ভাবের যখন উদ্ভব হইল, তখন তিনি নিজ অচিন্ত্য মায়াশক্তি বলে নিজেই নানা প্রকার স্থূলরূপ

পরিগ্রহ করিয়া প্রকটিত হইলেন—"তৎ সর্বমভবৎ"। এই অবস্থাতেই জগৎ-প্রপঞ্চ প্রকাশিত হইল। স্থির সমুদ্রের বুকে বহুরূপী কোটী কোটী তরঙ্গ উত্থিত হইলেও যেমন সমুদ্র হইতে তরঙ্গগুলির স্বরূপতঃ কোন পৃথক সত্তা নাই তেমনি স্থির অচঞ্চল, নির্বিকার ব্রহ্মবস্তুর ইচ্ছাক্রমে তাহাতে উৎক্ষিপ্ত নিখিল জীবজগতেরও পৃথক কোন সত্তা নাই—উহা স্বরূপতঃ ব্রহ্মবস্তুরই বিশেষ একটি প্রকাশ মাত্র। কিন্তু সমুদ্রের প্রতিটী তরঙ্গের যেমন একটি ব্যবহারিক সত্তা আছে, তেমনি সমগ্র জীবজগতেরও ব্রহ্মবস্তু হইতে একটী পৃথক ব্যবহারিক সত্তা আছে—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এই হিসাবেই প্রকৃতি ও পুরুষ তত্ত্বতঃ এক হইলেও উহাদের ব্যবহারিক পৃথক সত্তা অস্বীকার করা চলে না।

অব্যক্ত, অচিন্ত্য, নির্বিকার, চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুর স্থূলভাবে প্রকাশের নামই সৃষ্টি—ইহাকেই প্রকৃতি বলা হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"অনন্তের সীমাবদ্ধভাবে প্রকাশের নাম প্রকৃতি।" প্রকৃতি ও পুরুষ দুইটী আপেক্ষিক শব্দ—ইহাদের একটীর সঙ্গে অপরটী যুক্ত। যেখানে পুরুষ আছেন সেখানে প্রকৃতিও আছেন। সৃষ্টিপ্রকাশক ব্রহ্মবস্তুকেই পুরুষ বলা হইয়াছে। যে অবস্থায় প্রকৃতির বা সৃষ্টির প্রকাশ নাই সে অবস্থায় পুরুষেরও প্রকাশ নাই। সে অবস্থা প্রকৃতি ও পুরুষের ঊর্ধ্বে—নির্গুণ ব্রহ্মাবস্থা।

এই প্রকৃতি দ্বিবিধা—'অপরা' ও 'পরা'। সৃষ্টিতে স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাদানরূপে ব্রহ্মের যে প্রকাশ তাহাকে 'অপরা' প্রকৃতি বলা হইয়াছে, আর ব্রহ্মবস্তুর সান্নিধ্যবশতঃ (শ্রুতির ভাষায় 'ঈক্ষণ' বশতঃ) প্রকৃতির সূক্ষ্ম উপাদানে চৈতন্যজ্যোতির প্রতিফলনে যে চৈতন্যাভাস উদিত হইতেছে সেই চৈতন্যভাবযুক্ত প্রকৃতিকে 'পরা' প্রকৃতি বলা হইয়াছে। সুতরাং এক ব্রহ্মবস্তুই সৃষ্টিতে পরা ও অপরা প্রকৃতিরূপে প্রকট হইয়াছেন। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চমহাভূত এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার সৃষ্টির স্থূল ও সূক্ষ্ম এই আটটী উপাদানকে 'অপরা' বা অপ্রধানা প্রকৃতি বলা হইয়াছে—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো-
বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না
প্রকৃতিরষ্টধা॥" (৭।৪)

ইহাদের সমবায় বা মিশ্রণে জড় দৃশ্যমান জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। আর চৈতন্যভাবাপন্ন 'পরা' অর্থাৎ প্রধানা বা শ্রেষ্ঠা প্রকৃতি ঐ জড় দৃশ্যমান জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সৃষ্টিতে জীবভাব প্রকটিত করিয়াছেন—"জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ" (৭।৫)। এই অপরা ও পরা প্রকৃতির সমবায়ে চেতন-জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—অপরা প্রকৃতি দেহ রচনা করেন আর পরা প্রকৃতি সেই দেহে জীবভাবের বিকাশ করিয়া সর্বভূতের প্রাণধারণের নিমিত্তভূতা হয়েন। বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ পরা ও অপরা প্রকৃতিকে যথাক্রমে 'তটস্থা' ও 'বহিরঙ্গা' শক্তি নামে অভিহিত করিয়াছেন। তটস্থা শক্তিই জীবশক্তি। গীতার 'জীবভূতা' পরা প্রকৃতিই চৈতন্যযুক্ত 'জীবাত্মা' বা 'পুরুষ'। 'প্রকৃতি' বলিতে সাধারণতঃ অষ্টধা বিভক্ত অপরা প্রকৃতিই বুঝায়, আর 'পুরুষ' বলিতে পরা প্রকৃতি জীবশক্তি বুঝায়। এই অপরা ও পরা প্রকৃতির কথাই প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্ব।

জীবের পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহের অন্তরালে আঁর একটী দেহ আছে—তাহাকে সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গদেহ বলা হয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ) এই ১৮টি সূক্ষ্মতত্ত্বে এই সূক্ষ্মদেহ গঠিত। দশ ইন্দ্রিয় বলিতে চক্ষু কর্ণাদি স্থূল ইন্দ্রিয় নহে; যে শক্তিবলে স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি কার্যকরী হয় সেই ইন্দ্রিয়শক্তি সমূহই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়। স্থূল দেহটি মৃৎপিণ্ডের ন্যায় মলিন ও আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়গোচর। কিন্তু সূক্ষ্মদেহটি স্বচ্ছ স্ফটিকের ন্যায় নির্মল ও স্থূল ইন্দ্রিয়ের অগোচর। সূর্যকিরণে মৃৎপিণ্ড ও স্বচ্ছ স্ফটিক উভয়কেই স্থাপন করিলে স্বচ্ছ স্ফটিক সূর্যের ন্যায় জ্যোতির্ময় হয় কিন্তু মৃৎপিণ্ড তদ্রূপ হয় না। সেই প্রকার সর্বতোব্যাপী আত্মবস্তুর চৈতন্য-জ্যোতিতে সূক্ষ্মদেহটি চৈতন্যের আভাসযুক্ত হয়, উহা চেতনবৎ হয় কিন্তু স্থূলদেহটি তদ্রূপ হয় না। সূক্ষ্মদেহের এই চৈতন্যভাবকেই পরাপ্রকৃতি বলা হইয়াছে। চন্দ্রের আলো যেমন সূর্যালোকেরই প্রতিফলন মাত্র, চন্দ্রের নিজস্ব সম্পদ নয়, সেইরূপ সূক্ষ্মদেহের এই চৈতন্যভাবও চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মবস্তুরই প্রতিফলন মাত্র; উহার নিজস্ব সম্পদ নয়। চৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

"অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ
প্রকাশে॥"

পরমাত্মার এই প্রতিফলনকেই 'পরা প্রকৃতি' বলা হইয়াছে। স্বরূপতঃ ইহার কোন পৃথক সত্তা না থাকিলেও স্বাধীনবৎ কার্যকরী এই চৈতন্যশক্তির ব্যবহারিক সত্তা অস্বীকার করা চলে না—যেমন চাঁদের আলো উহার নিজস্ব আলো না হইলেও ব্যবহারিক

ক্ষেত্রে উহাকে চিদের আলোই বলা হয়। তাই জীবের চৈতন্যসত্তা যাহাকে 'আত্মা' বা 'জীবাত্মা' নামে অভিহিত করা হয়, উহা পরমাত্মবস্তুর প্রতিফলন হইলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উহাকে একটি পৃথক সত্তারূপে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এই আত্মসত্তাকে অখণ্ড পরমবস্তুর একটি ক্ষুদ্র অংশরূপে, বিভুচৈতন্যের এক অতি ক্ষুদ্রাংশ 'অণুচৈতন্য' রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীভগবান বলিতেছেন, জীব আমারই অংশ বিশেষ—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (১৫।৭)। অতএব স্বরূপতঃ এই আত্মবস্তু পরমাত্মবস্তুরই এক বিশেষ প্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। আত্মারূপে তিনিই সর্বভূতে অবস্থান করেন—"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ" (১০।২০)।

স্থূলদেহ, উহার অন্তরালে অবস্থিত সূক্ষ্মদেহ ও সেই সূক্ষ্মদেহে উদ্ভাসিত বা প্রকটিত আত্মবস্তু, এই তিনের সমবায়কে 'জীব' বলা হয়। জীবের মৃত্যুতে স্থূল দেহটী নষ্ট হয় কিন্তু সূক্ষ্ম দেহ নষ্ট হয় না। উহা অদৃশ্যভাবে প্রকৃতিতে অবস্থান করিতে থাকে। উহাই জীবের বীজস্বরূপ। বটবৃক্ষটি যেরূপ উহার ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে সূক্ষ্মাকারে অবস্থান করে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলেই উহা হইতে অতিকায় বৃক্ষরূপে আত্মপ্রকাশ করে, সেইরূপ জীবও সূক্ষ্মদেহরূপ বীজে অবস্থিত থাকিয়া উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলেই পুনঃ জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

জীবের মৃত্যুকালে জীবাত্মা যখন স্থূলদেহ হইতে বাহির হইয়া যায় তখন সূক্ষ্মদেহকে সঙ্গে লইয়া যায়; আবার যখন নূতন দেহ গ্রহণ করে তখন প্রকৃতিতে অবস্থিত এই সূক্ষ্মদেহকে সঙ্গে লইয়াই শরীরে প্রবেশ করে—

"শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎ-
ক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধা-
নিবাশয়াৎ॥" (১৫।৮)

এই প্রকারেই জীবের বারবার সংসারে গতাগতি চলিতে থাকে।

সূক্ষ্ম দেহেরও পশ্চাতে আর একটী দেহ আছে—তাহাকে 'কারণ দেহ' বলা হয়। আমরা অষ্টম অধ্যায়ে দেখিতে পাই ব্রহ্মার দিবসাগমে অর্থাৎ 'কল্পারম্ভে' সৃষ্টির উদ্ভব হয়, আর উঁহার রাত্রি সমাগমে বা 'কল্পক্ষয়ে' সৃষ্টির লোপ বা প্রলয় হইয়া থাকে। প্রলয়ে বা কল্পক্ষয়ে সৃষ্টির আত্যন্তিক নাশ হয় না—উহা অপ্রকাশ অবস্থায় প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে। প্রকৃতির এই অপ্রকাশ অবস্থাকে 'অব্যক্ত' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই 'অব্যক্তা প্রকৃতি'র অপর নাম 'মূলা প্রকৃতি' বা 'মহদ্ব্রহ্ম'। প্রলয় অবস্থায় স্থূলসূক্ষ্মাদি সৃষ্টি, কারণ বা বীজরূপে ঐ অব্যক্তা বা মূলা প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে। আবার কল্পারম্ভে সেই কারণ হইতেই চরাচর সমস্ত সৃষ্টির প্রকাশ হয়। তাই প্রলয়কালে জীবের স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ অপ্রকট হইলেও তাহার অস্তিত্ব নষ্ট হয় না—উহা কারণদেহরূপে অব্যক্তা প্রকৃতিতে লীন হইয়া অব্যক্ত অবস্থায় বর্তমান থাকে। এইরূপে জীবজগৎ সর্বাবস্থায় প্রকৃতির মধ্যেই ভাসিতেছে—প্রকৃতির প্রকট অবস্থায় জীবের প্রকাশ দেখা যাইতেছে; আবার প্রকৃতির অপ্রকট অবস্থায় উহাও তাহাতে লীন হইয়া অব্যক্ত হইতেছে। জীবের আধারস্থল এই প্রকৃতির কোন আদি বা অন্ত নাই। 'পুরুষ' যাহা চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুর অবস্থা বিশেষ, তাহার যেমন আদি অন্ত নাই, তেমনি প্রকৃতি যাহা সেই ব্রহ্মবস্তুরই শক্তি বিশেষের প্রকাশ মাত্র, তাহারও কোন আদি অন্ত নাই—"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি" (১৩।১৯)। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি ব্রহ্মসত্তার দুইটী পৃথক প্রকাশ মাত্র। সুতরাং ব্রহ্মের ন্যায় উভয়েই অনাদি। কল্পে কল্পে উহাদের প্রকাশের আদি ও অন্ত আছে বটে কিন্তু উহাদের সত্তা সর্বদাই বর্তমান—উহা অনাদি ও অনন্ত। পরা প্রকৃতিরূপী জীবসত্তাও তাই অনাদি ও অনন্ত। জীবসত্তার অবস্থার নানা পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে সত্য কিন্তু উহার আত্যন্তিক নাশ কখনও হয় না। পরমাত্মবস্তুর ন্যায় জীবাত্মাও অবিনাশী, অনাদি ও অনন্ত—

"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং
পুরাণো।
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"
(২।২০)।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম

—[illegible]

মাটি আর মানুষকে ভালবাসার আভিধানিক অর্থ হল স্বদেশপ্রেম। যাঁরা জন্মভূমিকে ভালবাসেন, দেশবাসীকে ভালবাসেন তাঁরাই স্বদেশপ্রেমিকের আখ্যা পান। এদিক থেকে যেমন আখ্যা পেয়েছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী—তেমনি পেয়েছেন কবি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি ছিলেন, দার্শনিক এবং চিত্রকর ছিলেন, কিন্তু তার চেয়ে বড় পরিচয়, তিনি দেশকে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসতেন। রুপোর চামচ নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি জানতেন—তিনি একটি গরীব দেশের নাগরিক। পাশ্চাত্য শিক্ষার আওতায় মানুষ হলেও তিনি জানতেন এ দেশের প্রতিটি নিরক্ষর অধিবাসী তাঁর একান্ত আপন-জন। তাই কাব্যে যেমন বলেছেন 'এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা'—দেশপ্রেমিক হিসেবেও তেমনি এগিয়ে এসেছেন সবল কর্মক্ষমতা নিয়ে। প্রতিটি কাজ, প্রতিটি মন্তব্য যা দেশকে আঘাত দিয়েছে—দেশবাসীকে ব্যথিত করেছে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করেছেন। কখনো কর্মে, কখনো বা মননে।

দেশের চরম বিপর্যয়ের দিনে নিরাপত্তা বা শান্তি সম্পর্কে একজন সমাজবিজ্ঞানী বা একজন রাজনীতিবিদ্ যেমন চিন্তা করেন—একজন সত্যদ্রষ্টা ঋষি কবির চিন্তাধারা এর থেকে নিশ্চয়ই আলাদা। কবির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। তিনি সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে যেমন গভীরভাবে চিন্তা করেছেন—ঠিক তেমনিভাবেই তার সমাধানের পথও আবিষ্কার করেছেন। তাঁর সত্যদৃষ্টি আর উদার মানবতাবোধের পটভূমিকায় সে-পথের সমাধানও হয়েছে সুন্দরভাবে। এই শীর্ষবিন্দুতে মহৎ কবি হিসেবে তাঁর চিন্তাধারা আর মহৎ সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর কর্মধারা এসে মিলিত হয়েছে। এইখানেই স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের জন্ম।

কবি হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেও রবীন্দ্রনাথ যে এত বড় দেশপ্রেমিক হয়েছিলেন এর মূলে যুগের এবং তাঁর বংশের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। অনেক ঐতিহাসিক রবীন্দ্রনাথের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ যুগকে ভারতের জাতীয়তাবাদের যুগ বলে চিহ্নিত করেন।

বংশের প্রভাবের কথা কবি জীবনস্মৃতিতে নিজেই স্বীকার করেছেন। বস্তুত তাঁর পিতা আর পরিবারবর্গই ছিলেন তাঁর দেশপ্রেমের উৎস। সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য প্রথায় পরিচালিত হলেও ঠাকুরবংশের শিক্ষাপদ্ধতিতে দেশপ্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয়। মাতৃভাষা, মাতৃভূমি ও দেশীয় সংস্কৃতির ওপর দেবেন্দ্রনাথের যে গভীর শ্রদ্ধা ছিল—পুত্রদের মধ্যেও তা সঞ্চারিত হয়।

মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে স্বদেশীমেলায় একটি কবিতা পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশপ্রেমের বীজ বপন করেন। প্রথম জীবনের এই অভিব্যক্তিটুকু পরবর্তী কালে তিনি "সভ্যতার সংকট"-এ বর্ণনা করেছেন—'সদাচারের যে আদর্শ একদা মনু ব্রহ্মাবর্তে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন, সেই আদর্শ ক্রমশ লোকাচারকে আশ্রয় করলে। আমি যখন জীবন আরম্ভ করেছিলুম, তখন ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে এই বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেশের শিক্ষিত মনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।…আমাদের পরিবারে এই পরিবর্তন কী ধর্ম মতে, কী লোকব্যবহারে ন্যায়বুদ্ধির অনুশাসনে পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি সেই ভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলুম।"

স্বদেশী যুগের এই আবহাওয়ার মধ্যে তাঁর চিন্তাধারা যেমন পরিবর্তিত হয় সাহিত্যেও অনুরূপ প্রভাব দেখা গেল। স্বদেশী প্রচারের জন্যে তিনি লিখলেন—

নিজ হস্তে শাক অন্ন তুলে দাও হাতে
তাই যেন রুচে,
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে
তাহে লজ্জা ঘুচে।

কিন্তু কর্তব্য এখানেই শেষ নয়। বিদেশী দ্রব্য বর্জনের ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে লিখলেন,—"একথা আমরা বলি না যে, বিদেশী সামগ্রী আমরা

গ্রহণ করিব না। গ্রহণ করিতেই হইবে ; কিন্তু দেশীয় আধারে গ্রহণ করিব। পরের অস্ত্র কিনি ত' নিজের হাতখানা কাটিয়া ফেলিব না।'

—(দেশীয় রাজ্য)

তাঁর স্বদেশীযুগের এই সব রচনা দেশব্যাপী উন্মাদনা জাগিয়ে তুলল। দেশের মানুষের চিন্তাধারা নিত্য নতুনভাবে চিত্রিত হতে লাগল তাঁর সাহিত্যে। স্বজাত্যভিমানের সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত তাঁর দেশপ্রেমকে সংস্থাপিত করলেন বিশ্বপ্রেমের পটভূমিকায়। তাই বিদেশী সরকারের সে কঠোর শাসনেও দেখতে পেলেন নতুন এক সম্ভাবনার মুখ। দেশবাসীর সামনে স্থাপন করলেন এক নতুন চিন্তাধারা —'It is true that the spirit of the West has come upon our fields in the guise of a storm, it is nevertheless scattering seeds that are immortal.' —(Nationalism).

স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকেই একে একে নানান আন্দোলনের সূত্রপাত হতে লাগল। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর বাংলাদেশে বেশ নতুন একটা জাগরণ দেখা দিল। সরকারী বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে দেশশুদ্ধ লোক অখণ্ড বাংলা এবং অখণ্ড বাঙালি জাতি—এ প্রচার ঘোষণা করলেন। সারা বাংলা জুড়ে শুরু হল আন্দোলন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তখন সর্ববাদি-সম্মত নেতা। তাঁরই সহায়তায় ১৬ই আগষ্ট বাংলা দেশ জুড়ে হরতাল পালন করা হল, অরন্ধন হল, বাড়িতে বাড়িতে কারো উনুন জ্বলল না। সকালে সকলে মিলে গঙ্গাস্নান করে ভাই ভাই বলে ধনী-দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে হাতে রাখী বাঁধলেন। বিলাতী পণ্য বর্জনের পথ গ্রহণ করলেন।

কবিগুরু এগিয়ে এলেন সকলের সামনে। লিখলেন রাখী-বন্ধনের গান—

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক
পুণ্য হউক, হে ভগবান !

লিখলেন,—

আমি ভয় করবো না ভয় করবো না
দুবেলা মরার আগে মরবো না ভাই,
মরবো না।

সেই সংগে স্মরণ করিয়ে দিলেন—

ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে
বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ—
দুই নয়নে স্নেহের হাসি
ললাট-নেত্র আগুন-বরণ।

বৃটিশ সরকার এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে কঠোর শাসনের ব্যবস্থা করলেন। কবিগুরু আবার লিখলেন—

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
(মোদের) ততই বাঁধন টুটবে
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে
ততই মোদের আঁখি ফুটবে।

কিন্তু গান লিখেই কাজ নয়। সকালে স্নান করে নগ্ন পা'য়ে শুধু একখানি চাদর গায়ে দিয়ে পথের দু'ধারে মুটে-মজুর, দীন-দুঃখী-ভিক্ষুক সকলকে বুক দিয়ে আলিঙ্গন করে ভাই বলে সকলের হাতে রাখী বেঁধে দিলেন। বস্তীতে গিয়ে হাড়ি-মুচি-ডোম-মুসলমানকে বুকে টেনে নিয়ে ভাই বলে সম্বোধন করলেন। সমস্ত বাংলাদেশের মানুষ সেদিন রবীন্দ্রনাথকে দেখল নতুন চোখে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর ১৯১৭ সালে ইংরেজ সরকার অত্যাচারের এক নতুন উপায় আবিষ্কার করেন। ভারতরক্ষা আইনের অজুহাতে বহু নিরীহ নির্দোষ ব্যক্তিকে তাঁরা বিনা বিচারে বন্দী রাখতে শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ তীব্র ভাষায় এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন। এই প্রতিবাদের প্রসঙ্গ তুলে তখনকার বাংলার গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রবীন্দ্রনাথের অনেক নিন্দা করলেন।

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে রোনাল্ডসের এই নিন্দার বিরুদ্ধে মডার্ণ রিভিউ-তে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। সে-প্রবন্ধের ফুটনোটে তিনি লিখলেন—'নির্জন কক্ষে লোকেদের আবদ্ধ করিয়া রাখার প্রথা জনগণের নিকট সতর্কতা-বলম্বন না হইয়া প্রতিশোধবৃত্তি চরিতার্থকরণ বলিয়া বিবেচিত হয়। আবার মুক্তিলাভের পরেও আটক আসামীকে পুলিশের অনুসরণে যেভাবে বিব্রত করা হয় তাহা অত্যন্ত কষ্টকর।'

১৯১৭ সালের এ অত্যাচারের অব্যবহিত পরেই শুরু হয় জালিয়ান-ওয়ালাবাগের ইতিহাস-বিখ্যাত বর্বর হত্যাকাণ্ড,—যে নির্মমতা চার্চিলকেও বিস্মিত করেছিল !

পরাধীনতার শৃঙ্খল দৃঢ় করবার জন্যে ইংরেজ সরকার ১৯১৯ সালে যে রাউলাট আইন পাশ করেন মহাত্মা গান্ধী সে আইন তুলে নেবার জন্যে চেমসফোর্ডকে অনুরোধ জানান। কিন্তু তাঁর সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করা হয়। শুধু তাই নয়। গান্ধীজীর দিল্লী ও পাঞ্জাব প্রবেশ নিষিদ্ধ করে ইংরেজ সরকার পাঞ্জাবের দুই বিখ্যাত নেতা ডক্টর কীচলু আর ডক্টর পালকে বন্দী করেন। এতে সারা দেশে একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হল এবং এই জন-সাধারণের হাতে কয়েকটি ব্যাঙ্ক ও অফিস লুণ্ঠিত হল। কয়েকজন শ্বেতাঙ্গও প্রাণ হারালেন।

তারপর ১৩ই এপ্রিল তারিখে জালিয়ানওয়ালাবাগে একটি সভার

আয়োজন হ'ল। এতে প্রায় দশ হাজার লোক সমবেত হয়েছিল। কিন্তু জেনারেল ও'ডায়ার এ সংবাদ আগেই পেয়েছিলেন। কয়েকদিনের সংগৃহীত সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন জালিয়ানওয়ালাবাগের দিকে। সমস্ত গেট বন্ধ করে দিয়ে দশ মিনিট ধরে অবিরাম গুলি বর্ষণের আদেশ দিলেন। দশ হাজার নিরস্ত্র লোক এক কোণে দাঁড়িয়ে গুলি খেয়ে চলল।

সমস্ত জনতা যখন নিহত আর আহত হয়ে নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে রইল, জেনারেল ও'ডায়ার তখন ফিরে গেলেন। ফিরে গিয়ে কর্তৃপক্ষকে বললেন—'আমি স্থির করেছিলাম যে সমবেত জনতা যদি সভা চালাতে থাকে তাহলে আমি সকলকেই মেরে শেষ করব।'

ঘটনার শেষ এখানেই নয়। জালিয়ানওয়ালাবাগের সেক্ষেত্র যখন গলিত শবদেহে পরিপূর্ণ হয়ে আছে ইংরাজ সরকার তখন ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন—এ সংবাদ যাতে পাঞ্জাবের বাইরে না যেতে পারে।

কিন্তু এত চাপাচাপি সত্ত্বেও এ সংবাদ চাপা রইল না। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এ সংবাদ পেলেন মে মাসের শেষাশেষি। এ সংবাদ পাবামাত্র তিনি কলকাতায় এলেন ২৭শে মে তারিখে। এসে নেতাদের ধরলেন—এর প্রতিবাদ চাই। চলুন সকলে অমৃতসরে।

সাহিত্যের নিভৃত আরাধনা ছেড়ে কবি এসে দাঁড়ালেন দেশবাসীর পাশে। প্রতিবাদে মুখর করতে চাইলেন ভারতের আকাশ-বাতাসকে।

কিন্তু তাঁর এ ডাকে কেউ সাড়া দিতে চাইলেন না। ডিফেন্স অব্ ইণ্ডিয়া এ্যাক্টের ভয়ে তখন সকলে নীরব। কিন্তু কবিকে কেউ টলাতে পারলেন না। দেশের এ অবস্থায় নীরব থাকাটা তিনি অপরাধের মনে করলেন। তিনি নিজে বলেছেন—'অবশ্য এসব প্রোটেস্ট মিটিং-এ যে বিশেষ কিছু ফল ছিল তা নয়, শুধু অন্যায়ের প্রতিবাদ যথাসময়ে না করলে সেটা নিজের প্রতিও অন্যায়।'—(মংপুতে রবীন্দ্রনাথ : মৈত্রেয়ী দেবী)।

সবশেষে গান্ধীজীও যখন কবির সঙ্গে পাঞ্জাব যেতে রাজী হলেন না তখন কবি চতুর্দিকে ছোটাছুটি করতে আরম্ভ করলেন। বিবেকের অসহ্য পীড়নে স্থির করলেন ইংরাজের দেওয়া নাইট উপাধি ত্যাগ করবেন। ২৯শে মে রাত্রে তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডকে যে চিঠি লিখলেন সে চিঠির তুলনা নেই। সে-চিঠি শুধু সেদিনের প্রতিবাদপত্রই নয়—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দলিল। তিনি লিখলেন—"These are the reasons which have painfully compelled me to ask Your Excellency to relieve me of my title of Knighthood, which I had the honour to accept from His Majesty."

এ পত্রের কথা যেদিন দেশে প্রচারিত হল, সেদিন দেশবাসী কবির স্বদেশপ্রেম, দেশবাসীর প্রতি তাঁর ভালবাসা, সম্মান, মর্যাদাবোধ এবং সাহস ও তেজের পরিচয় পেয়ে তাঁর চরণে মাথা নত করল।

কিন্তু কবি শুধু উপাধি বর্জন করেই নিজের কর্তব্য সমাধান করে দিলেন না। সারাজীবন মনে রাখলেন এ বীভৎসতার কথা। এ ঘটনা তাঁকে কতখানি আঘাত দিয়েছিল তা তিনি নিজেই বলেছেন—'তখন যে কি প্রবল অসহ্য কষ্ট হয়েছিল তা আজও মনে করতে পারি। কেবল মনে লাগল—এর কোনো প্রতিকার নেই? কোনো উত্তর দিতে পারব না? এও যদি নীরবে সইতে হয় তাহলে জীবন ধারণ যে অসম্ভব হয়ে উঠবে।'

—(মংপুতে রবীন্দ্রনাথ)।

তারপর শান্তিনিকেতনে নিদারুণ গ্রীষ্মের দিনে চিঠি লিখলেন রাণী অধিকারীকে—'আকাশের এই প্রতাপ আমি একরকম সহ্য করতে পারি কিন্তু মর্ত্যের প্রতাপ আর সহ্য হয় না। তোমরা তো পাঞ্জাবেই আছো, পাঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধ হয় পাও। এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে।'

—(ভানুসিংহের পত্রাবলী)।

ইংরাজ সরকারকে বজ্রতুল্য পত্রাঘাত আর এই উপাধি পরিত্যাগ করায় ইংরাজরা রাগে জ্বলে উঠলেন। তাঁদের মুখপত্র 'ইংলিশম্যান'-এ যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল তা হল—স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—যাঁর নামও পাঞ্জাবের জঙ্গলে কেউ কখনো শোনেনি···তিনি গভর্ণমেণ্টের পলিশির সমর্থন করলেন কি করলেন না···তার জন্য কারো মাথাব্যথা নেই। বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথ নাইট রইলেন কি সাদাসিধে বাঙালীবাবু রইলেন তাতে ব্রিটিশ শাসনের মানের হানি বা ব্রিটিশ শাসনের নিরাপত্তা একটুকু টসকাবে না।

এ ঘটনায় ব্রিটিশ সরকারের নিরাপত্তা যেমন একটুকু টসকালো না (?), রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাও তেমনি একটুকুও পরিবর্তন দেখা গেল না। তিনি পরের বার লণ্ডনে গিয়ে মণ্টেগুকে বললেন—জেনারেল ও'ডায়ারের শাস্তির জন্য ভারতবাসী তত আকুল নয়—ভারতবাসী চায় এ

হননের ব্যাপারে ইংরাজ জাতি প্রতিবাদ করুক, নিন্দা করুক—moral condemnation of the crime by the British Nation। এবং লণ্ডনে ঐ সময়ে জেনারেল ও'ডায়ার সংক্রান্ত পার্লামেন্টে যে বিতর্কসভা হয় রবীন্দ্রনাথ তাতে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু ইংরাজদের বিচারে স্তম্ভিত হয়ে অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে সি. এফ. এণ্ড্রুজকে চিঠি লেখেন—'এ বিতর্কমূলক অনুষ্ঠানে যে কথাটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা এই যে, এদেশে যাদের মধ্যে থেকে আমাদের শাসনকর্তারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন তাঁদের আমলারা আমাদের উপর যত দানবীয় অত্যাচারই করুক না কেন তাতে তাঁদের মনে কোন রকম বিক্ষোভের সঞ্চার হয় না।'

—(পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ—অমল হোম)

জালিয়ানওয়ালাবাগের এ হত্যাকাণ্ডের পরেও দেশে যত আন্দোলন হয়েছে রবীন্দ্রনাথ সব কিছুতেই যোগদান করেছেন। ১৯৩০ সালে যখন তিনি লণ্ডনে এসে পৌঁছান তখন সংবাদ পেলেন—ভারতবর্ষে দারুণ ব্যাপার। জানতে পারলেন গান্ধীজীর লবণ আন্দোলন শুরু হয়েছে। শোলাপুরে মার্শাল আইন জারি হয়েছে। বড় লাটের অভিনান্সের বলে কংগ্রেসকে বে-আইনী গণ্য করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ইংরাজের উস্কানিতে ঢাকায় হিন্দু-মুসলমানে ভয়ানক দাঙ্গা বেধেছে।

কয়েকদিনের মধ্যেই তাই তিনি ওখানকার 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান'-এর সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করলেন। প্রতিবাদ করে বললেন—The present complications cannot be dissipated by repression and a violent display of physical power। তারপর ভারতসচিব [illegible] [illegible] সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করলেন। কোয়েকার সভার নিমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতা দিলেন—Realise yourselves in own place and recall the time when your own brothers in America wanted to secure their freedom with their blood

তাঁর গভীর দেশপ্রেমের নমুনা এখানেই শেষ নয়। মৃত্যুর মাত্র কয়েক বছর আগে ১৯৩৬ সালে যখন বাংলার হিন্দুদের ওপর দারুণ অবিচার চলল, রবীন্দ্রনাথ তখন কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড পত্রের বিরুদ্ধে টাউনহলের জনসভায় যোগদান করলেন। প্রতিবাদিপক্ষ হয়ে এ আন্দোলনে অগ্রণী হয়ে প্রতিবাদ-পত্রে নাম স্বাক্ষর করলেন। রাজনৈতিক স্বার্থসেবীর দল ব্যস্ত হয়ে উঠল। কবি হিসাবে যাঁর জগৎজোড়া যশ মান তিনি কেন এসব দলে মিশে নিজের অমর্যাদা করছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। যুক্তির সাহায্যে এই এ্যাওয়ার্ড-এর গলদ তুলে ধরলেন সকলের সামনে।

রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবন আলোচনা করলে এমন আরও অনেক নমুনা মিলবে। কিন্তু সেটাই বড় নয়। প্রত্যক্ষভাবে তিনি যেমন আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন—পরোক্ষভাবে ঠিক তেমনি সমস্তজীবন ধরে ধ্যানে-জ্ঞানে-কর্মে প্রমাণ রেখে গেছেন তাঁর গভীর দেশপ্রেমের নমুনা। এই সূত্রেই গান্ধীজীর সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর বন্ধুত্ব। রবীন্দ্রনাথই গান্ধীজীকে 'মহাত্মা' নাম দেন, মহাত্মাও কবিকে 'গুরুদেব' বলতেন। এই গুরুদেবের কাছেই ছুটে আসতেন চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল প্রমুখ [illegible] দেশনেতারা। নিজেদের [illegible] অমূল্য উপদেশ নিয়েছেন। এ সমস্ত উপদেশের মূল্য সাধারণ মানুষের চেয়ে তাঁরাই বেশী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

স্বদেশী মেলার কিছুদিন পরে যখন সন্ত্রাসবাদ দেখা দেয়, রবীন্দ্রনাথ তখন আন্দোলনের সঙ্গে সংস্রব বিচ্ছিন্ন করেন। কিন্তু তা বলে দেশসেবা বন্ধ করেননি। গ্রামে গ্রামে পল্লী সংস্কার করতে শুরু করেন। দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণ, কুটির-শিল্পের উন্নতিবিধান সমস্তই এই সময় তাঁর পরিচালনায় আরম্ভ হয়। কৃষিশিল্পের উন্নতি বিধানের জন্য তিনি নিজের জামাতা এবং পুত্র রথীন্দ্রনাথকে বিদেশে পাঠান। বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এসে তাঁরা যাতে তাদের বিদ্যা দেশের কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতি-বিধানে কাজে লাগাতে পারেন।

এক কথায় জ্ঞানের উন্মেষ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি দেশের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন। দেশকে তিনি এত গভীরভাবে ভালবাসতেন এবং দেশের প্রতিটি মানুষকেও তিনি এত গভীরভাবে ভালবাসতেন যে, কোনরকম অপমানজনক মন্তব্যই তিনি সহ্য করতে পারতেন না। পার্লামেন্টের সদস্যা মিস্ রাথবোন্ জওহরলালকে কয়েদে বন্দী অবস্থায় যে পত্র দেন, রবীন্দ্রনাথ তারও প্রতিবাদ করেন। সে চিঠির তেজোদীপ্ত জবাব তাঁর ক্ষুব্ধ অন্তরের জ্বালাময় প্রকাশ।

শুধু মাটি আর মানুষ নয়—এ দেশের প্রাচীন শাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ, ঋষি ও সাধকদের ওপর রবীন্দ্রনাথের যে ভক্তি ছিল, তাকে স্বদেশ-ভক্তি বলে অভিহিত করলে বলতে হয় রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়। এ ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ কোনদিন কেউ ছিল না—ভবিষ্যতেও কেউ হবেন কিনা, যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পাছে সান্ন্যাল তাকে বলে ওর দিকে পাঁচ ছ'দিন যাইনি। যেটুকু কাজ সবই দূর থেকে দাঁড়িয়ে করে নিয়েছি। মিস্ প্যাট্রিক ওর সম্বন্ধে যা আভাস দিয়েছিলেন তাতে ওর জীবনকাহিনী শুনলে আমি খুশি হই বা না হই ওর উত্তেজনা বাড়বে। তার ফলে ওর রোগ বাড়াও বিচিত্র নয়। এসব নানা কারণে ওর কাছে যাইনি।

সেদিন কিন্তু সান্ন্যাল প্রায় কাছাকাছি ধরে ফেলল—কই আপনি তো এলেন না সেদিন।

—ও হ্যাঁ, আসা হয়নি। দেখুন না কদিন বড় ব্যস্ত আছি, এত কাজ পড়েছে কদিন ; নিজের ফাঁকিটাকে ঢেকে যেন সান্ন্যালের কাছে কিছুটা অজুহাত দেখালাম।

সান্ন্যাল কোন কথার জবাব দিল না, আমি ওর নীরস পাংশু মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বললাম—তবে আপনার সে সৈনিক জীবনের গল্প শোনার আগ্রহ এখনও আছে। আজ কতকটা সেটা শোনার জন্যেই এসেছি বলতে পারেন।

—কাহিনী ? একটু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে সান্ন্যাল ম্লান ভাবে হাসল—আমার কোন কাহিনী-টাহিনী তো নেই। আপনাকে ডেকে-ছিলাম আলাপ করব বলে। বাঙালী দেখলেই আলাপ করতে ইচ্ছে করে। বাংলা দেশের বাইরে কোথাও গেছেন ?

—নাঃ। আমার দৌড় ওই বরাকর পর্যন্ত। কিন্তু কেন বলুন তো ?

—তাহলে এ জিনিস বুঝতে পারবেন না। বাংলা দেশের বাইরে বাঙালী দেখলে মনে হয় যেন ঘরের একটা লোক পেলাম। আলাপ করবার জন্যে মন উশখুশ করে।

—তাই বুঝি ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—তা যাই হোক। আপনি এ হোমের সন্ধান পেলেন কি করে ? চাকরীর বিজ্ঞাপন দেখে নাকি ?

—না না, ওসব নয়। পিয়ার্সন সাহেবের সুপারিশে পেয়েছি। এসব চাকরীর কি বিজ্ঞাপন দেয় এরা ? আপনি কি করে সন্ধান পেয়েছিলেন ?

—আমি ? তীক্ষ্ণ নাকটা সোজা উঁচিয়ে সান্ন্যাল বলল—আমাকে এনেছেন মিসেস্ ওয়েজার। আমি তখন বিমানবাহিনীতে। একদিন প্যারেড করতে করতে পড়ে গিয়েছিলাম। আঘাত লেগে গেল মাথায়, ইন্টারনাল হেমারেজ হয়েছিল। সেই আঘাতেই মাথাটা বোধহয় কেমন যেন হয়ে গেছে। প্রথমে অনেকে বলেছিলেন মাথাটা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে। বিমান-কর্তৃপক্ষ মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়ে-ছিলেন, কিন্তু তারা ফেরৎ পাঠায়। তারা বলে এটা কোনো মানসিক রোগ নয়, পুরোপুরি শারীরিক রোগ। সেখান থেকে যাই এক সরকারী হাসপাতালে। সেখানে দীর্ঘ দিন থাকার পর শরীরটা সেরেছে বটে কিন্তু মাঝে মাঝে মাথাটা কেমন ঝিন্ ঝিন্ করে ওঠে, হাত পা শিথিল হয়ে আসে, দাঁড়াবার শক্তি পর্যন্ত থাকে না। ওখান থেকেই তাই

কোন হোস্টেলে থাকার মনস্থির করি। বিসেস্ ওয়েস্টারের এক পরিচিতা আমাদের হাসপাতালের নার্স ছিলেন। তারই সাহায্যে এখানে আশ্রয় পাই।

—একদিন পড়ে গিয়ে এত কাণ্ড? বিস্ময়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম—খুব জোরে পড়েছিলেন তাহলে?

—হ্যা, সে আর বলতে!

—কোন ধাক্কা লেগেছিল, না এমনি পড়ে গিয়েছিলেন?

—ধাক্কা! আনমনে যেন শব্দটা একবার উচ্চারণ করে—সান্যাল বিমর্ষভাবে বলল—হ্যা ধাক্কাই একরকম। তবে ধাক্কাটা শরীরে নয়।

—তবে কোথায়?

—মনে; একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সান্যাল চুপ করল।

আমি এবার মিস্ প্যাট্রিকের নির্দেশটা স্মরণ করে অন্য প্রসঙ্গে যাবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু সান্যাল সে সব কথায় কান না দিয়ে ম্লানভাবে হেসে বলল—সে-ধাক্কার বড় জ্বালা। জানি না আপনি কখনও সে-ধাক্কা খেয়েছেন কিনা!

—কোন্ ধাক্কা! কিসের ধাক্কা! আমি প্রশ্ন না করে পারলাম না।

—অতি প্রিয়জনের বিয়োগব্যথা! সান্যাল যেন শব্দগুলো কেটে কেটে উচ্চারণ করল।

—মানে? আপনার কোন প্রিয়জন কি—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সান্যাল বলল—না না আমার কোন প্রিয়জন নয়। কখনও ব্যর্থ প্রেমিকের কাহিনী শুনেছেন? আমি সেই একজন ব্যর্থ প্রেমিক। আঙুল দিয়ে সান্যাল নিজেকে দেখাল।

মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছিলাম। সান্যাল আমাকে কোন সুযোগও না দিয়ে বলে চলল—ছেলেবেলা শুনেছিলাম ভালবাসা মানুষকে বড় করে, মহান করে। কিন্তু আমাকে নিঃস্ব করেছে। আমার যেটুকু ক্ষমতা ছিল তাও নষ্ট করে দিয়েছে।

খুব শান্তভাবে জিজ্ঞেস না করে পারলাম না—কেন, আপনি যাকে চেয়েছিলেন, তাকে বুঝি পাননি?

—না; মাথাটা জোরভাবে দুলিয়ে সান্যাল বলল—না। যাকে আমি জীবন দিয়ে চেয়েছিলাম তাকে পাইনি। যার জন্যে আমি জীবন মন জলাঞ্জলি দিয়েছি, সমস্ত ছাত্রজীবনটাকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছি—তাকে পাইনি।

—কেন তিনি কি—আমি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সান্যাল বলল—না, তিনি আমাকে চাননি। শুধু চাননি বললে ভুল হবে, তিনি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন।

আমি চুপ করে শুনছিলাম। কি বা বলব আমি! শুধু বিস্ময়ে একবার বললাম—প্রতারণা!

একটু চুপ করে থেকে সান্যাল বলল—প্রতারণা ছাড়া কি। দশ বছরের মধ্যে সে একথা কি আমাকে একবারও বলতে পারত না?

—কি কথা?

—যে সে আমাকে ভালবাসে না! সান্যালের মুখ চোখ যেন কঠোর হয়ে উঠল।

—আপনাকে ভালবাসতেন না এ সিদ্ধান্তে আপনি এলেন কি দেখে? জীবনে তো অনেকেই অনেককে চেয়ে পায় না।

—চুপকেই যদি চাওয়ার মত চাওয়া থাকে নিশ্চয়ই পাবে। আমার চাওয়ার মধ্যে কোন খুঁত ছিল না, কিন্তু সে আমাকে চাইত না।

সান্যাল একটু যেন দম নিল। ওর কণ্ঠস্বর বেশ গাঢ় এবং রুক্ষ শোনাচ্ছে। সে প্রায় কান্নার সুরে বলল—তা আমাকে চায় না সেকথা আগে বললে তো! আমি তাহলে এতটা আঘাত পেতাম না!

—তা আপনি এত দীর্ঘ সময়েও তাঁর অভিনয়ে কোন ত্রুটি দেখতে পাননি? আপনি তো বলছেন তিনি আপনার সঙ্গে অভিনয় করতেন!

—সেটা পারিনি বলেই তো এমনভাবে হারলাম আমি। এমনভাবে ছোট হয়ে গেলাম নিজের কাছে; হাতের একটা মুঠো এগিয়ে ধরল সান্যাল।

—তিনি কি অন্য কাউকে বিয়ে করেছেন পরে?

—হ্যা; ছোট্টভাবে জবাব দিল সান্যাল।

দেখলাম সান্যালের চোখে মুখে কেমন যেন একটা অভিমানের ছাপ। ওর মনটা তখনই কিছুটা আন্দাজ করতে পারলাম।

হেসে বললাম—তা এমনও তো হতে পারে তাঁর বাবা-মা বিয়ের ব্যাপারে চাপ দিয়েছেন!

—তা তো পারেই, এবং তা হবেই। কিন্তু তাতে যারা চায় মানে তারাই তো অভিনেত্রী।

সান্যালের তরুণ মনের সিদ্ধান্ত শুনে একটুকু বিস্মিত হলাম না।

সান্যাল আবার মুখটা আমার দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল—আমি ওকে এত বিশ্বাস করতাম জানেন, কখনও এসব আমল দিইনি। মাঝে মাঝে এসব কথা আমার কানে আসত মাত্র!

—কি-সব কথা? বিয়ের কথা নাকি! আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—হ্যা এখন তো বিয়ের কথাই বলতে হবে! সান্যাল একটু নীচু

পড়তাম বলল—বাবাকে এ-সব খবর পাঠাত আমারই এক বন্ধু। তখন যদি তাকে বিশ্বাস করে সচেতন হতাম!

সান্যাল একটু চুপ করল। তারপর দু'একমিনিট পরে নিজেই আবার বলল—আর সচেতন হলেই বা কি হবে তখন। জীবন তো ছন্নছাড়া করে ফেলেছি তার মধ্যে।

—ওসব কি বলছেন! সান্যালকে আশ্বাস দিয়ে বললাম—আপনিও যদি এমন দুর্বল হন তাহলে তো কথাই চলে না। সৈন্যবাহিনীতে তো দৃঢ় মনের লোকেরাই থাকেন শুনেছি, কিন্তু আপনি—!

—সেদিক থেকে আমি সত্যিই বিমানবাহিনীর অযোগ্য। কলেজ জীবনে যে কি হল, সব ভেঙে চুরমার করে দিল; সান্যাল যেন অতীত জীবনের দিকে ফিরে তাকাল—কলেজে যেদিন প্রথম যাই, জানেন সে কি রোমাঞ্চ!

নিজের কথাও মনে পড়ছিল আমার। জীবনের সে রোমাঞ্চ যে আমারও মনে পড়ে।

বেশ আগ্রহের সঙ্গেই তাই বললাম—সে কি আর বলতে!

সান্যাল সোজা হয়ে বসে বলল—ইস্কুল জীবনে কত বাধা-বিঘ্ন এসেছে, মোটামুটি তা পেরিয়ে এসেছি। ক্লাস নাইনে যখন পড়ি তখনই আমার এলার সঙ্গে পরিচয়। ও আমি একই মাষ্টার মশাই-এর কাছে পড়তাম তখন। অল্প বয়েসে মোটা মোটা বই পড়ে ক্লাসে যখন সবচেয়ে ভাল পড়া বলতে পারতাম তখন আমার বুক গর্বে ফুলে উঠত। মাষ্টার মশাই পিঠ চাপড়ে বলতেন—ভাল করে পড়াশোনা কর বিমল, জলপানির ব্যবস্থাটা যেন হয়। তোদের অবস্থাটা একবার চিন্তা করে দেখ—বৃত্তি না পেলে কি পড়াশোনা করা সম্ভব হবে তোর! তাছাড়া ইস্কুলেরও গৌরব কতখানি বলত! জেলা ইস্কুলের ছাত্ররা যা পারেনি আমার এ উপেক্ষিত ইস্কুলের ছাত্র তা করে ফেলল—মাষ্টার মশাই গভীর আবেগে আরও কত কি বলতে গিয়েও চুপ করে যেতেন। আমিও মূকভাবে শুনে মনে মনে সে সংকল্পকে দৃঢ়তর করার চেষ্টা করতাম।

একটু চুপ করে সান্যাল বলল—সেটা বোধ হয় ফেব্রুয়ারী মাসই হবে। স্কুলের সরস্বতী পুজো। আমরা স্কুলের বিদায়ী ছাত্রদল, পুজোর ভার আমাদের ওপরে। পাশাপাশি দুটো স্কুলের ঠাকুর নিয়ে কী প্রতিযোগিতা! মেয়ে-স্কুলের ঠাকুরের রংটা বেশি নীল হয়ে গেছে, আমাদের ঠাকুর অপূর্ব! এরই বিরোধ মীমাংসায় আমরা তখন চঞ্চল উদ্দাম। ঠিক তখনই এলাকে দেখি। মেয়ে-স্কুলের পুজোর ভারও পড়েছিল ওদের ওপর।

"রেষারেষির ফলে সে পরিচয় যে কি করে অন্তরঙ্গতায় গিয়ে পৌঁছেছিল তা আর মনে পড়ে না, তবে মাষ্টার মশাইএর কাছে পড়তে এসেই এলার সঙ্গে পরিচয় নিবিড় হয়। আর সেই পরিচয়ের গভীরতাই আমার সব সর্বনাশের মূল—

সান্যাল চুপ করল। ওর চোখে-মুখে বেশ একটা করুণভাব ফুটে উঠেছিল; সেদিকে তাকিয়ে চুপ করে শুনছিলাম। একবার চোখা-চোখি হয়ে যেতে সান্যাল চোখটা সরিয়ে নিয়ে বলল—সেদিন ভাবতেই পারি নি এই এলাই আমার জীবনে এতখানি বঞ্চনার বোঝা বয়ে নিয়ে এসেছে! সেটা অবশ্য ভাববার বয়স তখন ছিল না। তখন কি উন্মাদ! জীবনটা তখন কত হাল্কা মনে হত! এলার সঙ্গে পরিচয় বা প্রেম যাই বলুন, সেটা আরও বেশি প্রগাঢ় হল মাস্কের সময়। আর তখনই লোক-মুখে নানা কানাকানি শুনতে লাগলাম।

মাষ্টার মশাইও একদিন আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। আমি তো দৃঢ়ভাবে সে আশঙ্কার প্রতিবাদ করে মন দিয়ে পড়াশোনা করে বাবার প্রতিশ্রুতি দিলাম। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়ে কি হবে, প্রকৃতি ছিল না তো আমার! টেষ্টের ফলা-ফলেই আমার স্বরূপ প্রকাশ পেল। ফরম ফিল-আপ করতে গিয়ে মাষ্টার মশাইকে দেখতে পেলাম না। শুনলাম ওঁর নাকি শরীর খারাপ।

আমি তো ফরম ফিল-আপ করে বাড়ি চলে এলাম। পরের দিন সকালে শুনলাম মাষ্টার মশাই আমাকে আর পড়াবেন না। তিনি গতকাল স্কুলে আসেননি আমার মুখ দেখবেন না বলে।

খুব ধিক্কার দিলাম নিজেকে। মনে মনে ভেবে রাখলাম ঠিক আছে। মাষ্টার মশাইকে আমি চমক লাগিয়ে দেব। ভাল করে পড়াশোনা করি তারপর একদিন দেখিয়ে দেব। মাষ্টার মশাইকে দেখিয়ে দেব যে মৃত্যুকালে বাবা যে-প্রতিশ্রুতি নিয়ে গিয়াছিলেন তাঁর কাছে—সে-প্রতিশ্রুতি তিনি ভঙ্গ করতে দেননি।

দিনকতক খুব পড়াশোনা করে-ছিলাম কিন্তু আবার একদিন এলা এসে হাজির হল। তাকেও নাকি মাষ্টার মশাই পড়াবেন না।

সেই হ'ল কাল। আবার যে কি করে নিজেকে আস্তে আস্তে সরিয়ে নিলাম দৃঢ়তার পথ থেকে,

আর ভেবেই পাই না। তারপর অনেক পরীক্ষায় কোন রকমে পাশ করলাম। পাশ করতে পেরেছি এই মনোবলেই ধার করে কলেজেও ভর্তি হয়ে গেলাম। দিদি আশ্বাস দিলেন—কলেজের মাইনের ক'টা টাকা তিনি জুগিয়ে যাবেন। প্রথম প্রথম কলেজে ঢুকে বেশ পড়াশোনা চলছিল, কিন্তু পরের বছর এলা কলেজে ঢুকল।

"দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল। তবু কিছুটা মনের জোরে আই. এস্-সি পরীক্ষায় পাশ করে গেলাম। যাঁরা আগে একটু কৃপার চোখে দেখতেন তাঁদের কেউ কেউ অনার্স নিয়ে পড়তে পরামর্শ দিলেন। নানা রকম ভেবে সত্যিই একদিন কিজিক্সে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়ে গেলাম বি. এস্-সি ক্লাসে! ভেবেছিলাম মোটামুটিভাবে জীবনটা চালিয়ে নিতে পারব। এলার সঙ্গে পরিচয় তখন পুরোপুরি প্রণয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এলা তখন আমাকে পড়তে প্রেরণা জোগাত। নিজেও বলত—তুমি পাশ কর, যা হোক একটা চাকরী করবে, আমিও বি. এ-টা পাশ করলে একটা মাষ্টারী করব—দু'জনের রোজগারে সংসারটা ঠিক চলে যাবে। সে-কাঁচাবয়সে এলার কথাবার্তা যেন আমাকে মাতাল করে রাখত। সংসার পাতার মতলবও তাই প্রায় ঠিক করে রেখে পড়াশোনা করে যাচ্ছিলাম তখন।

কিন্তু বিধি বাম। সে-বছরেই কাকা মারা গেলেন। আমাদের সংসারে বাট টাকার মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেল। অশ্রুসজল চোখে মা এসে দাঁড়ান আমার সামনে—এবার কি করে সংসার চলবে বিনু!

মাকে অত ভেঙে পড়তে কখনও দেখিনি। তাই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাকে বললাম—ভাবছ কেন মা, আমি তো বড় হয়ে গেছি!

মা একটুও জোর পাননি। আমার সব ঘটনা মা শুনেছিলেন। দিদিও কি-ভাবে খবর পেয়ে কলেজের মাইনে পাঠাবেন না বলে পাঠালেন। ভাবলাম পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে একটা চাকরী-বাকরী করি। হয়তো করতামও। সেই মুহূর্তে, জামাইবাবু কিন্তু একদিন এসে জোর দিয়ে গেলেন আমাকে। তিনি ক'টা বছর আমাদের ভরণপোষণের ভার নেবেন। আমি যেন পড়াটা এখন না ছাড়ি।

হ'লও তাই। আমি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে লাগলাম। মায়ের সে অসহায় মূর্তিটা মনে পড়লে পড়াশোনায় মন দিতে পারতাম না।

কিন্তু ওসবে কিছুই হ'ল না। এলা—এলা আর এলা! তখন আমার সমস্ত দেহমন গ্রাস করে ফেলেছে সে। শুধু পড়াশোনা নয়, আমার সে শক্ত চেহারাও অসংলগ্ন হয়ে গেল। নানা দুশ্চিন্তা, অনিয়ম আর অনিদ্রা—শরীরটাকে কাহিল করে আনল। কোর্থ-ইয়ার টেনে কেল করলাম। অনার্স দূরে থাক পাস-কোর্সেও কর্তৃপক্ষ পড়তে দিলেন না।

কিছুটা অপমানিত হয়ে শক্ত করলাম নিজের মনকে। নাই বা হ'ল পড়াশোনা! পড়াশোনা না করেও তো কত লোক করে খাচ্ছে, আমি তবু তো দুটো পাশ করেছি;—এ-সব দিয়ে মনকে প্রবোধ দিতে লাগলাম। তবু হার মানব না।

কিন্তু শেষ সেখানেই নয়। জামাইবাবুর চিঠি এল—উনি আর সাহায্য করবেন না। অবশ্য সর্তও তাই ছিল। মা এসে দাঁড়ালেন দু'হাতে মুখ দিয়ে। দিদাদী বাড়ীর কাছে শেষবলন দিলেনে আমাকে দোষী করেছিলেন তিনি—শত অপরাধেও তাই আমি তাঁর আশায় বশ।

মায়ের কাছে নিজেকে দোষীর অপরাধী মনে হ'ল। বড়জোড়া বেপরোয়া হয়ে বেরিয়ে পড়লাম চাকরীর সন্ধানে। কিন্তু বৃথা সে চেষ্টা। বুঝতেই তো পারছেন চাকরী জোগাড় করা কি কঠিন ব্যাপার। যেখানেই যাই ফিরে আসি ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে। কত জায়গায় দরখাস্ত করলাম। জবাব পেলাম না বেশির ভাগ জায়গা থেকেই। দু'একজনে মা-ও বা জবাব দিলেন—লিখলেন চাকরী খালি নেই। সেই অসহ্য জ্বালা তার উপর ব্যর্থতার গ্লানি, সব মিলে আমি যেন উন্মাদ হয়ে উঠলাম, এমন সময় একদিন সকালে খবর পেলাম বিমানবাহিনীতে লোক নিচ্ছে। চলে গেলাম সেখানে। মাকে জানালাম না। এলাকেও প্রথমে বলিনি। কারণ জানি সবাই বাধা দেবে। আসার দিন এলা অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বিদায় জানাল—এ-কাজ করার আগে আমাকে জানালে না পর্যন্ত! তার সে অভিমান আমি শান্তকণ্ঠে ভাঙলাম। এলা হাসিমুখে সম্মতি জানাল—কিন্তু এবার বিয়ের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা দরকার।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার ফিরেই ও-ব্যবস্থাটা পাকা করে নেব,—বলে আমি চলে এসেছিলাম।

তারপর কতবার বাড়ি গিয়েছি, এলার কাছে কোন অনাস্থার আভাস কোনদিন পাইনি। কঠোর কর্তব্য পালনের মুহূর্তগুলোতে আমি তার কথা ভেবে কাটিয়ে দিতাম। ভাবতাম—জীবনে আমি যতই ব্যর্থ হই না কেন একটা মানুষ আমি পেয়েছি যাকে

জীবন দিয়ে ভালবেসেছি। কিন্তু হঠাৎ একদিন প্রবীরের চিঠি পেলাম, লিখেছে এলার বিয়ে হয়ে গেছে। প্রবীর আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হ'লেও প্রথমে ওকে বিশ্বাস করি নাই। কিন্তু পরে মায়ের চিঠিতেও সে খবর পেলাম। আমার চোখের সামনে থেকে সমস্ত জগৎটা মুহূর্তে সরে গেল। জীবনে আমার শেষ প্রাণস্পন্দনও যেন থেমে গেল! যে প্রতিক্রিয়াতে প্রথম দিনকত দুশ্চিন্তা করেছি—নিজেই বুঝতে পেরেছি আমার জীবন যেন শেষ হয়ে আসছে। তারপরে একদিন এ-অঘটন ঘটে সে-ছাপা ভাবটি প্রকাশিত হ'ল।

চুপ করে বিপ্লববাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বুকে একটা হাত দিয়ে যেন একটু দম নিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা এলাকে বিশ্বাস করে কি আমি ভুল করেছি? মানুষকে বিশ্বাস করা কি একটা পাপ?

কিছুটা চমকে উঠলাম বিপ্লববাবুর প্রশ্ন শুনে। মানুষকে বিশ্বাস করা কি একটা পাপ? না তা হবে কেন!

বিপ্লববাবু আবার চেঁচিয়ে উঠলেন—বলুন, বিশ্বাস করে আমি এত ভুল করেছিলাম।

বুঝতে পারলাম বিপ্লববাবু উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। সান্ত্বনা দিয়ে বললাম তাকে—না, না, ওসব আপনি কি বলছেন! ওসব ভুলে যান!

কিন্তু বিপ্লববাবু ওসব কথায় কান না দিয়ে—আবার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ বুকের হাতটা সরিয়ে 'উঃ' বলে বিছানায় উপর ঝুঁকে পড়লেন।

কি করব ভেবে না পেয়ে মিস্ প্যাট্রিক বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। আশ-পাশের বিছানার অন্য সকলেও সচকিত দৃষ্টিতে তাকাল আমাদের দিকে।

[ক্রমশঃ]

কবিগুরু স্মরণে

—শ্রীসত্যভূষণ দে

১৯৩০-৩১ সন; চৈত্রের সন্ধ্যা। আমি ও শ্রদ্ধেয় শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু (বর্তমানে সৎসঙ্গের প্রেসিডেণ্ট) শান্তিনিকেতনে পৌঁছেছিলাম। পূর্বাহ্ণে হিমাইতপুর (পাবনা জেলায়) সৎসঙ্গ আশ্রম থেকে বিস্তারিতভাবে তার করা ছিল। কবিগুরুকে উপহার দিবার জন্য আমাদের হাতে ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের 'সত্যানুসরণ', 'নানা-প্রসঙ্গে', 'ইসলাম প্রসঙ্গে' বইগুলি। কবিতীর্থে আমাদের এই অভিযানের মূল উৎস বা প্রেরণা শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং—তা' মোটেই নয়। আমরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে গিয়েছিলাম।

চৈত্রশেষের বি ল ম্বি ত সন্ধ্যা। উত্তরবঙ্গের সুদূর পদ্মাতীরের ক্ষুদ্র পল্লী নিকেতন থেকে উত্তরিত হলাম ধূসর, রুক্ষ অথচ চিত্রার্পিত মায়াময় শান্তিনিকেতনে। সেখানে আমাদের অভ্যর্থনা শুধু যে হৃদ্যতাপূর্ণ বা সৌজন্য-পূর্ণ ছিল তা' নয়—একেবারে উপাদেয়। উপাদেয় এই জন্য যে ৺সুধামাধব বাবু (চৌধুরী) তৎকালীন ম্যানেজার ছিলেন—বরিশালের লোক, সুরসিক। পৌঁছবার দিন, রাত্রির আহার সমবেতভাবে ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের স ঙ্গে ই হয়েছিল, হয়তো আরো অতিথি ছিলেন। পরিবেশনে শুধু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশাগতই ছিলেন না, পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশের উৎসাহী যুবকগণও ছিলেন। তাঁদের যত্ন ও আদর ছিল খুবই হৃদ্য। আহার প্রধানতঃ নিরামিষ।

আমাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল ৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে। সামনের দেওয়ালে তাঁর উইল বা ইচ্ছাপত্রের কিয়দংশ যেন খোদাই করা দেখেছিলাম! ঐ বাড়ীতে আমিষ প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। কর্তৃপক্ষ জানতেন আমরা নিরামিষাশী। এখানে ছোট একটু রসের অবতারণা করবার সুযোগ আছে। কবিতীর্থে রস ও রসিক প্রধান হবেই। সহসা জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হলাম। সুধামাধব বাবু বললেন—'নিরামিষ খান, তা' ডিম তো নিশ্চয়ই চলে।' সুশীলদা বয়স্ক ও সমাহিত ধরণের; আমি তখন প্রগল্ভ যুবক। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ—'না। ওটা পাশ্চাত্যের ফ্যাশন। আমাদের নিরামিষ আহারে ওটা চলে না।' তৎক্ষণাৎ হুকুম শোনা গেল—'ডাকো, সরোজিনী দেবীকে।' বর্ষীয়সী বিধবা ভদ্রমহিলা এলেন, এবং আমাদের খাঁটি থান-পরা বিধবার আহার্য ধার্য হয়ে গেল। তবে দু'বেলার জন্য ভার নিলেন। আমরা দু'দিন ছিলাম। 'কমন কিচেন'-এ আর যেতে হয়নি।

মহর্ষির গৃহে যে আমলের রাজ-রাজড়ার বাড়ীতে মাত্র অতিথিদের জন্য যেমন, ভিক্টোরিয়া আমলের জাঁক-জমকপূর্ণ 'ভোজোৎসব হল' থাকতো ওখানেও তাই ছিল। পরিচ্ছন্ন আর্ট-চিনু বেয়ারা এবং যেমনি ধাক নেটে দাড়ি, বেগুন, আলু, বিভিন্ন ধরণের শাক, ডাল, আলুপটল, এ চোড়, মোচা,

আইনি, রই-রিটি রাজকীয়ভাবেই থেকেছি। দোতলায় ছিলাম। সামনে পেছনে বিরাট গাড়ি-বারান্দা। রাজপ্রাসাদের হলের সাজসরঞ্জামে যাওয়া ছিল। এখনকার যোগলাই ধাঁচের আঁকিয়া ফরাস প্রভৃতি তো ছিলই না, তেমনি ছিল না সোফা, সেটি ইত্যাদি। বেশির ভাগ নানা কারুকার্যময় প্রশস্ত চৌকি, নানাধরনের গদিওয়ালা আরাম-কেদারা। পরে শুনেছিলাম, সে-সবই নাকি শ্রীনিকেতন-জাত কুটীর-শিল্প—বিদেশী এ-সবার কোনটাই নয়। তবে ডাইনিং হল বা বেড্‌রুম যতদূর মনে পড়ে ছিল পাশ্চাত্য কেতায় সুসজ্জিত, সেকালের রাজপ্রাসাদে যেমনটা দেখা যেত। আমাদের হোস্টেল্ রুমতেই হয়নি। পিতলের খাট সোনার মত ঝকঝক্ করছিল। সব সাজানো সব প্রশস্ত দামী শয্যাদ্রব্য প্রস্তুতই ছিল। বিলাতে যেমন কোথাও বিছানা নিয়ে চলতে হয় না, খানা ও বিছানা সর্বত্রই মিলে যায়, এখানেও তাই ছিল।

প্রথম দিনের প্রথম রাত্রি; শুতে যাবার কিছু আগে। রাত্রি তখন আন্দাজ ন'টা হবে, কি একটু বেশী। ম্যানেজার অর্থাৎ সুধামাধববাবু এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—'আচ্ছা মশায় (সুশীলদাকে উদ্দেশ করে), আমাদের এখানকার ছাত্রছাত্রীরা যখন কলকাতায় ফিরে যায়, কি অন্যত্র কোথাও যায়, দু'চার মিনিট কথা-বার্তাতেই যেমন সহজে বোঝা যায় ইনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন, তেমনি আপনাদের ওখানকার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটু মেলামেশায়, কথাবার্তায় 'এটি সংসদের'—সেটা বোঝা যাবে কি?' সমাহিত স্থিতপ্রজ্ঞ সুশীলদা নীরবিলম্ব নেয়ে উত্তরে বললেন—'উপস্থিত সেটা আমরা নিজেদের মধ্যে বুঝি, পরে আর সকলেও পারবেন আশা হচ্ছে।' খানিকক্ষণ কথার পরে সুধামাধববাবু বললেন—'বরুন, অতবড় পণ্ডিতপ্রধান প্রজ্ঞা-ভাজন বিধুশেখর শাস্ত্রী মশায় সেদিন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, ছেলেমেয়েরা হাততালি দেয়নি, বারবার বলছিল 'সাধু' 'সাধু'। ওঁদের মধ্যে পক্ষকেশী বা বোড়শী অনেকেই ছিলেন। ইংরেজীমতে ক্ল্যাপ দেয়া বা 'হিয়ার' 'হিয়ার'—এসব এখানে অচল। বীজমন্ত্র ভিন্ন এসব অর্থহীন হর্ষধ্বনি আপনাদের চালু হতে আর কতদিন?'—ইত্যাদি।

এমন সময় সহসা যেন একটু উৎকর্ণ হতে হল, আর অমনি ভেসে এলো সেই চিরনূতন গানখানি 'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে, সুন্দর—'। অমন রাত্রিতে বহুজন-গীত হয়ে চলছিল গানখানি। বৈশিষ্ট্য যা' লক্ষ্য করেছিলাম, তা' হলো গান যেন শেষই হচ্ছিল না; মেয়েদের কণ্ঠ শেষ হতে না হতেই ছেলেরা শুরু করছিল। শেষ বসন্তে অমন সুকণ্ঠ, তান-লয়-ছন্দে রবীন্দ্র সংগীত—মন কোথায় যেন হারিয়ে গেল। তবে যা মনে গেঁথে থাকবার মত তা' অবিনশ্বর। শুনলাম, আহারপর্বের পরে প্রতিদিন রাত্রে ও প্রভাতে কবির আবাসস্থল 'উত্তরায়ণ' কখনও বা 'শ্যামলী' পর্যন্ত এই সঙ্গীতের অভিযাত্রিদল প্রাচীন চারণ-গাথার মত গেয়েই চলেছেন। সবটা মিলিয়ে একটা স্বপ্নময় মধুর পরিবেশ। যেন 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।'

পরের দিন সকালে চা-পর্ব শেষ করে বেরুলাম ঘুরতে। প্রথমে চোখে পড়ল স্বর্গীয় চিত্রশিল্পী (এককালে যিনি কলকাতা স্কুল অব্ আর্টস্-এর অধ্যক্ষ ছিলেন) মুকুল দে'র কুটীর-খানি। অত্যন্ত শিল্পী-জনোচিত কুটীর। দু'টি পাশাপাশি বড় গাছের কাণ্ডের মধ্যখানে নির্মিত শ্রীনিকেতনে পেলাম। সাদরে গৃহীত হলাম সেখানে। বিভিন্ন রকম কুটীরজাত শিল্প-নমুনা—যেমন কাঠের, বেতের, বাঁশের, চামড়ার—দেখতে পেলাম। ৺রথীন্দ্রনাথের নিজস্ব বিভাগ অর্থাৎ 'পোল্‌ট্রি'—ডিম থেকে বাচ্চা বৈজ্ঞানিক উপায়ে, সংরক্ষিত করা—তাও দেখলাম। সেখানেই বোধ হয় ৺কালিমোহন সেন মহোদয়কে দেখেছিলাম। কুটীর-শিল্পের আরও বহুবিধ ব্যবস্থা দেখে-ছিলাম, যা' আজ আর সব মনে নেই। ওখানেই শুনি যে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। ওখান থেকে ফিরে শান্তিনিকেতনে প্রবেশ করেই তানপুরা সহকারে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত অনুশীলন শুনলাম। জানলাম যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে দক্ষ হতে না পারলে নাকি রবীন্দ্র সঙ্গীত শেখবার অধিকারী হওয়া যায় না ওখানে। সঙ্গীতাচার্য শান্তিদেব ঘোষ তখন সেখানে ছিলেন। পরবর্তীকালে ইনি কবিগুরুর সঙ্গে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, মালয়, যবদ্বীপ ইত্যাদি বহু দেশের সঙ্গীত, নৃত্যকলা প্রভৃতি দেখবার ও শেখবার সুযোগ পান। তখন বেলা নয়টা কি দশটা হবে, বীরভূমে 'লু' শুরু হয়ে গেছে। একটি অতি পরিচ্ছন্ন কুটীর-সম্মুখে দেখলাম, একজন সৌম্যকান্তি পরিণতবয়স্ক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। আমাদের দিকে তাকিয়ে সামনে চাসছেন। আলাপ হলো। স্বপাক আহারান্তে মাটির চাড়িটি ফেলে দিচ্ছিলেন। ইনিই স্বর্গীয় বিধুশেখর শাস্ত্রী।

কবিগুরুর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ-

কারের সময় নির্দিষ্ট ছিল সন্ধ্যা সাতটা। বই ক'খানি হাতে নিয়ে সুশীলদা চলেছেন। আমি কখনও পাশে বা পেছনে চলেছি। কিছুদূর যেতেই বিরাট বাগান। বিভিন্ন প্রতিবেশী দেশের ফুলের সমারোহ—আমাদের বাংলা পল্লীর রজনীগন্ধা, জুঁই, বেল, কামিনী, এবং হাসনাহানার গুচ্ছ পাশাপাশি দেখেছি। ইরান, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, যবদ্বীপ, মালয়—আজ সব মনে আসছে না—এসব দেশের ফুলের পরিচয় দিচ্ছিলেন কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথ। মনে হয়, আমাদের সুশীলদার সঙ্গে আগেই এঁর পরিচয় ছিল। পা'জামা-পরা, ঢিলা হাতা পাঞ্জাবী গায়ে, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—মনে হলো যেন প্রৌঢ়ত্বের তটরেখা অতিক্রান্ত।

সুস্নিগ্ধ ধূপধুনা-সুরভিত কবিগুরুর কক্ষে উপস্থিত হলাম। সস্নেহে বসবার ইঙ্গিত করলেন। মাথার উপর বড় পাখা চলছিল, চন্দনের গন্ধ মধুর। একটি ফুল কবিগুরুর হাতে, একটি টাটকা সুগন্ধি ফুল ছোট্ট ফুলদানিতে ছিল। বইয়ের কয়েকটা আলমারী। ছবিতে কবিগুরুর যে রকম পরিচ্ছদ, তা-ই দেখলাম। অর্দ্ধশায়িত, কনুই-এর কাছ থেকে আলখাল্লার হাতা খোলা। ঐ বয়সে জ্যোৎস্নার মত শুভ্র, স্নিগ্ধকান্তি। মুখে বা অঙ্গ কোনও দেহাংশে বার্দ্ধক্যের জীর্ণতার চিহ্নমাত্র নেই। সব মিলিয়ে যেন একখানি গ্রীক্ স্ট্যাচু।

কবিগুরু শ্রীশ্রীঠাকুরের বইগুলি শ্রদ্ধের সুশীলদার হাত থেকে অদ্ভুত শ্রদ্ধার সঙ্গে নিয়েই পাতা ওল্টাতে লাগলেন। যতদূর মনে পড়ে প্রথমেই 'মাধ্যাপ্রসঙ্গে' বইখানা। কবির যেন সহসা লক্ষ্য পড়ল 'ফুটনোট'-এর উপর। বললেন—"ঠাকুরের কথা যেন সূত্রাকারে—তার ভাষ্যও হয়। আমি মনোযোগ দিয়ে সবই পড়বো। পড়বার আমার অভ্যাসও আছে, আনন্দও পাই প্রচুর। কিন্তু এই সাধকটী কে—যাঁর তপস্যা উপলব্ধি করবার মতো? প্রাচ্য, পাশ্চাত্য সকল দেশের সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস—জ্ঞানের বহু দিক কঠিন নিষ্ঠার সঙ্গে আহরণ করে যিনি প্রতি-পৃষ্ঠায় প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তাঁর ইষ্টদেবের প্রতিটি উক্তি অভ্রান্ত ও অকাট্য।" সুশীলদা ৺কেষ্টদার (স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য) পরিচয় দিলেন। কবিগুরু তাঁর পিতাঠাকুরকে চিনলেন। কারণ জো ড়া সাঁ কো র 'বি চি ত্রা' আসরে তিনি নি য় মি ত যেতেন। অবশ্য বাবার সঙ্গে কেষ্টদাও মাঝে মাঝে ঐ আসরে যেতেন। খুব খুশী হলেন কবিগুরু। প্রায় এক-ঘণ্টা কাল কথাবার্ত্তা চ লে ছি ল। শ্রীশ্রীঠাকুরের তখনকার বয়স জেনে নিয়ে বল্লেন যে পদ্মানদীর ঐ দিকে (শিলাইদহে) বোটে করে অনেক-বারই গেছেন, কত গল্প, কত কাহিনী আজও তার চিরস্মরণীয় সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। পৃথিবীতে শুধু আমাদের দেশের মাটিতেই বার বার প্রতি সন্ধি-ক্ষণে বার বার এত মহান্ পুরুষ কেন জন্মান, এ কিসের গুণ—দেশের মাটির না যুগ প্রয়োজন—ইত্যাদি অনেক কথার অবতারণা করেছিলেন কবি-গুরু। আমাদের পাবনা আশ্রমে কেবল ভিক্ষামাত্র সম্বল করে যুগোপযোগী কত ধরণের সংস্থা শ্রীশ্রীঠাকুর গড়েছেন তার খুঁটিনাটি প্রতিটি কথা নিবিষ্ট মনে শুনছিলেন। আলবার্ম সময় বললেন ('আলা প্রসঙ্গে'র এক জায়গায় খানিকটা মনোনিবেশ করে)—"কত অগ্রগতির, কত সাধনার, কত কিছুর অনুপ্রেরণা এর ভেতর রয়েছে বুঝতে পারছি। খুব ভাল করে পড়বো।"

কবি-কক্ষ ছেড়ে বাগানের পথ দিয়ে ঘরপানে চলেছি। বোধ হয়, পূর্ণিমা রাত ছিল। ততক্ষণে আকাশে চাঁদ বেশ বড় হয়ে উঠেছে। সমস্ত প্রান্তরের ধূসর জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। চৈত্র-শেষের শুষ্ক মর্মরিত আম্রকুঞ্জ যেন দুর্বার বসন্ত বাতাসে উদ্দাম হয়ে উঠেছিল।

বিঃ দ্রঃ—শান্তিনিকেতনে ঐ শুভ্র রাত্রির পরিবেশের মধ্যে যতদূর মনে পড়ে সী মা ন্ত গা ন্ধী র পুত্র ছিলেন। ভারতের বর্ত্তমান প্রধান-মন্ত্রী তখন সেখানকার পাঠনিরতা ছাত্রী ছিলেন, তবে তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি। মেজোঃ সি. এফ. এণ্ড্রুকে দেখেছিলাম। আমরা চীনাভবনও দেখেছিলাম।

সে-দিনের বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ-ধাপের যুবক ছাত্রটি আজ জরাজীর্ণ। সুতরাং শুধু স্মৃতি শক্তির বা স্মৃতি-চয়নের ভুলভ্রান্তি থাকা বিচিত্র নয়। বিষয়বস্তু বা মূল বক্তব্য অতীব সংক্ষিপ্ত। তবে সেদিনের শান্তিনিকেতনের দৃশ্য-পট অজস্র লেখনীমুখে লিপিবদ্ধ, সবই নিছক সত্য। তবু কবি-পক্ষে কবি-গুরুর স্মৃতি-কথা বিশেষতঃ তাঁরই সৃষ্ট বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম-কথা বহুল কীর্তিত হবার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে—একথা অনস্বীকার্য।

শিল্প ও সাহিত্যের সমস্যা

—রঞ্জিত রায় চৌধুরী

যে কোন মহৎ সৃষ্টিই আসলে সুগভীর রহস্যের কোন অজ্ঞাত-লোকের গোপন দুয়ারটিকে খুলে দিয়ে তার ভেতরের যাবতীয় বিস্ময়ের সাথে রসিকের মিলনের মধুর মুহূর্তটিকে সত্য করে তোলার ভিন্ন-নাম। স্রষ্টার যা কিছু সাধনা, তা একান্তভাবেই রসিকের উপভোগের জন্য নিবেদিত বলে, সমস্ত সার্থক সৃষ্টিকর্তাকেই সৌন্দর্যের উৎসভূমির ভেতর থেকে তার সমস্ত নিষ্ঠা দিয়ে একটি বা একাধিক পরম রহস্যময়তাকে খুঁজে ফিরতে হয়।

আবার শিল্প বা সাহিত্যের রচনার জন্য আমরা যা কিছুরই অনুসন্ধানে ব্রতী হই না কেন, তা আমাদের পরিচিত জগৎ ও জীবনের বাইরের কোথাও থেকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ আমরা সৌন্দর্য-সৃষ্টির জন্য যা কিছুই সংগ্রহ করছি তা একান্তভাবেই জাগতিক। এই সমস্ত পরিচিত বস্তু বা বিষয়কে শিল্পী বা সাহিত্যিক নিজের অনুভব তথা বোধের পরিশুদ্ধ রং-এর আবরণে আবৃত করে রসিকের সম্মুখে যখন উপস্থিত করছে তখন তার পরিচিত রূপটির মধ্যে একটি আশ্চর্য সংযোজন ঘটে যাচ্ছে। এই সংযোজনই রহস্য। এই রহস্যেরই অপর নাম সুষমা।

ফলতঃ সমস্ত সৃষ্টির ভেতর দিয়ে আমরা সৌন্দর্য-উপভোগের জন্য প্রতিনিয়ত সুষমাকে সত্য করে পাচ্ছি আমাদের জীবনে। এবং সুষমার অনুপাতের পরিমাণের বিচার, সাহিত্য-শিল্পের সঠিক মূল্যায়ন।

আমরা মানুষের জীবনের দিকে যখন শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে আজ তাকাতে চাইছি তখন এক নিদারুণ আশংকা আমাদিগকে বিব্রত করে তুলছে। আজকের সময়ের মানুষের জীবন এক অর্থহীন জটিলতার আবরণে আবৃত। এই জটিলতাকে অনিবার্য হিসাবে স্বীকার করে নিতে গিয়ে মানুষ কখনো সভ্যতা, কখনো যন্ত্রের দোহাই দিচ্ছে. নিজের খণ্ডিত সত্তার দৈন্যকে মানুষ সভ্যতার ফলশ্রুতি বলে চিহ্নিত ক'রে, এক করুণ আত্মবঞ্চনার ইতিবৃত্ত রচনা করে চলেছে।

এই বঞ্চিত এবং নিজেদের অজান্তে ছোট-হয়ে-পড়া অস্তিত্ব আত্মাদের কাছ থেকে আমরা সৌন্দর্যের জন্যে, আনন্দের জন্যে কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারছিনে। ফলে সাহিত্য বা শিল্পের মধ্যে যে আনন্দের সংবাদ সুষমার বর্ণবিন্যাসের ভেতর দিয়ে পরিবেশন করার কথা, তা বারে বারে বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে।

মানুষের জীবনের প্রতি দিনের যে চিত্র, তাতে অজস্র জটিলতার রেখাপাত ঘটতে বাধ্য। কারণ একমাত্র মানুষকেই মন নামক এক আপাতঃ জটিলতাকে তার জীবন ধারণের জন্য, প্রাণের মন করে নিতে হয়েছে। জীবন ও জগতের এই জটিলতার সাথে সুষমার সংযোগ ঘটিয়ে শিল্পি বা সাহিত্যিক যতকাল মানুষের জীবন এবং জগতের কতক-গুলো গোপনতার খবর দিতে পেরেছে ততকাল তাকে কোন সংকটের মুখোমুখি হতে হয়নি। তখন পর্যন্ত জটিলতার ভেতর একটি অর্থবহ অবস্থা বর্তমান ছিল। কিন্তু মানুষের দুর্ভাগ্য, মানুষকে ক্রমশঃই এক নির্মম অর্থহীনতার সাথে পরিচিত করে তুলতে লাগলো। আর তাই তার জীবনের কোথাও কোন গোপনীয়তার আয়োজন রইল না। অহংকারী মানুষ যতকাল তার এই অভাবকে সভ্যতার দোহাই দিয়ে, যন্ত্রের দোহাই দিয়ে গোপন করতে চেষ্টা করেছে, ততকাল সে প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের গতির সাথে, সভ্যতার অগ্রগমনের সাথে সংগতি রেখে তার পথ চলার কর্তব্যের প্রতি অবহেলাই দেখিয়েছে। আজ সমস্ত মানবসমাজের যে ব্যর্থতার ভাবটি, সমস্ত জীবন জুড়ে যে বিনাশের রূপটি ক্রমশঃই প্রকটিত হতে চাইছে, তা সভ্যতা তথা ইতিহাসের কাছ থেকে মানুষের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ারই বেদনাদায়ক পরিণতি মাত্র।

আমরা সাহিত্য ও শিল্পের জন্যে মানুষের সংসারে উপাদান সংগ্রহ করতে গিয়ে মানুষের ক্ষুদ্র-হয়ে-পড়া রূপটি দেখার সাথে সাথে গভীর বেদনায় তার সমস্ত গোপনতার অপ-মৃত্যু দেখতে পেয়ে শিউরে উঠছি। আমাদের জীবন এবং জগৎ থেকে সমস্ত গোপনীয়তা আজ অন্তর্হিত। তাই আমরা আজ আর কিছুতেই বিস্মিত হই না। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, এ সমস্ত ক্ষেত্রেই অন্যায়, অধর্ম, আজ স্ব স্ব নির্মম মূর্তিতে প্রকটিত।

এবং এই অন্যায় অর্থাৎ অশিবের এই সংহার-মূর্তির সম্মুখে আমরা সভয়ে আজ নতজানু। আমাদের সমস্ত গোপনতাকে আজ আমরা এই অশিবের পায়ে অঞ্জলি দিয়ে রিক্তসর্বস্ব।

তাদের মুখ চেয়ে, তত্ত্বের মুখ চেয়ে মানুষকে এখন শুধু তাই প্রতীক্ষা করতে হবে, শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কালোত্তীর্ণ প্রতিভার শুভ আগমনের জন্য। আজ শিল্প ও সাহিত্যকে চিরন্তনের স্পর্শে ধন্য করবার জন্যে একজন শিল্পি বা একজন শক্তিমান সাহিত্যিকের চাইতেও একজন শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবক্তার প্রয়োজন সর্বাগ্রে।

মালা-চন্দন

—শ্রীপঙ্কজভূষণ সেন

একালে কি হয় জানি না—কথাটা হচ্ছে কয়েক বছর আগেকার—

রায়বাহাদুর নীলাম্বর চৌধুরীর দু'-দু'টো বন্দুকই সরকার বাজেয়াপ্ত করে দিল! ঘটনার আকস্মিকতায় আর আঘাতের প্রচণ্ডতায় রায়বাহাদুর উপরতলা হতে নীচে নামলেন না তিন দিন।

কিন্তু রায়বাহাদুরের মত সরকার-ভক্ত লোকের বন্দুক বাজেয়াপ্ত হয় কেন? রায়বাহাদুরের কি অপরাধ? বেশী দিন নয়, বছর সাতেক আগে ডিভিশনাল কমিশনারের সম্বর্দ্ধনা উৎসব কত ধুমধাম করে করলেন রায়বাহাদুর! এই তো সেদিনও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গার্নার সাহেব পাখী শিকার করতে এলেন তেলকাড়ের বিলে—সর্বাঙ্গসুন্দর আয়োজন রায়-বাহাদুর নীলাম্বর চৌধুরীই করেছিলেন। কিন্তু আজ সেই নীলাম্বর চৌধুরী কি অপরাধ করলেন বৃটিশ সরকারের কাছে?

ক্ষোভ চলে গেল সময়ে। এষ্টেটের বাঁধা উকিলবাবু এক গোপন চিঠিতে রায়বাহাদুরকে জানিয়ে দিলেন কারণটা। রায়বাহাদুরের নিজের কোন ত্রুটির জন্ম নয়—ত্রুটি তাঁর একমাত্র অবাধ্য পুত্র স্বরূপ-সুন্দরের। সে কিনা কংগ্রেসকর্মী! দেশময় আন্দোলন চলছে। কাজেই স্বরূপের মত উগ্র কংগ্রেসকর্মী যার ঘরে সেখানে দু'-দু'টো বন্দুক রেখে দিয়ে বৃটিশ সরকার নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না।

অনেক সহ্য করেছেন রায়বাহাদুর! বাপের মান-সম্মান যতটা সম্ভব নষ্ট করাই যেন স্বরূপের ব্রত! বহুবার বহুরকমে পুত্রকে সংশোধন করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বৃথা! রায়বাহাদুরেরও তো সহ্য করবার একটা সীমা আছে।

পিতা-পুত্রে এমনিতে সাক্ষাৎ বিশেষ হয় না। কিন্তু সেদিন স্বরূপের ডাক পড়ল দোতলায় রায়বাহাদুরের খাস-কামরায়। রায়বাহাদুরের গৃহিণী বিরজা দেবী ঘরে ঢুকতে সাহস পেলেন না, দরজার বাইরে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইলেন সন্ত্রস্তভাবে—পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎকারের পরিণামের দুশ্চিন্তায়।

মনের আক্রোশ যতটা সম্ভব চেপে রেখে উকিলবাবুর চিঠিটা ছুঁড়ে দিলেন স্বরূপের দিকে "—পড়ে দেখ—"

স্বরূপ চিঠি পড়ছে। রায়বাহাদুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে আছেন ছেলের মুখের দিকে—যদি কোন অনুশোচনার মলিন ছাব ফুটে ওঠে ওর মুখে! রায়বাহাদুরের মত নামী সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ী থেকে বন্দুক নিয়ে গেল থানার লোকেরা—কতলোক যে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হেসে গেল! কিন্তু তা সত্ত্বেও ভাল মন্দ কোন ভাবান্তর আছে ওর মুখে? নাঃ! ওটা কি মানুষ!

"কি বলবার আছে তোমার—?" কোন জজ সাহেব যেন প্রশ্ন করলেন অপরাধীকে।

"বলার অনেক কিছু আছে। কিন্তু জানি, বলে কিছু লাভ নেই—!"

"বটে! লাভ-লোকসান সম্বন্ধে তোমার দেখছি খুব টনটনে জ্ঞান হয়েছে বন্দেমাতরমের লোফারদের সঙ্গে মিশে। যোড়হাত করছি বাবা—এইবার আমাকে রেহাই দাও—" রায়বাহাদুর সত্যি সত্যি হাত যোড় করলেন—"মানুষ করেছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি। একবিন্দুও ত্রুটি করিনি তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের! আমার কর্তব্য শেষ হয়েছে। স্বদেশী করতে হয়, দেশোদ্ধার করতে হয় এইবার অন্য জায়গায় গিয়ে কর—আমার এখানে আর নয়, অন্ততঃ আমি যতদিন বেঁচে আছি! বেরিয়ে যাবার গেট তোমার জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত—" থরথর করে কাঁপছেন রায়বাহাদুর।

স্বরূপ নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এল—

"স্বরূপ যাসনে—শোন্—" মা ব্যাকুলভাবে স্বরূপের হাতটা চেপে ধরলেন। রায়বাহাদুর বাপ হয়ে পুত্রকে যতটা জানেন, তার চেয়ে অনেক বেশী গভীরভাবে স্বরূপকে জানেন ওর মা।

মায়ের ব্যাকুল নিষেধেও হল না কিছুই! বাপের কোন কথাই যে শোনেনি এতদিন, সে কিন্তু সেদিনের বিশেষ পিতৃ-আজ্ঞাটা মাথা নীচু করেই পালন করল—রায়বাহাদুরের বিরাট গেট পেরিয়ে মিলিয়ে গেল আন্দোলিত ভারতের জনারণ্যে।

• • •

রুক্ষ মলিন চেহারা—কোনদিন স্নান করে, কোনদিন করে না। দাড়ি কাটবার সময় দু'সপ্তাহে একবার হয়ত হয়, কখনও আবার তাও হয় না। সাক্ষাৎ করতে চান? একবার খোঁজ করুন পাকুবাবুর আড্ডায় না হয় চায়ের

দোকানে। এই শোনা গেল কংগ্রেস মজলিসে, পরমুহূর্তে গেছে কোন্ অজানায় শব দাহ করতে শ্মশানে। এত খুঁজে যার দেখা পেলেন, সে নাকি অ র্থ কু বে র রায়বাহাদুর নী লা ম্ব র চৌধুরীর একমাত্র বংশধর স্বরূপসুন্দর। কোথায় সেই সিল্কের পাঞ্জাবী, আর হীরের বোতাম আংটি, কোথায় বা কিডের জুতো আর সোনার চশমা। সেক্ষেত্র খালি পায়ে না থাকলে যার পায়ে সাত-পটি দেওয়া কেড্ স সেই নাকি উগ্র কংগ্রেসকর্মী স্বরূপসুন্দর।

কিন্তু এ চেহারা তো স্বরূপ-সুন্দরের আসল চেহারা নয়! কি শৌখিন মানুষই না ও ছিল—কাল হলো ওর কলকাতায় পড়তে যাওয়াটা! এম. এ. পড়তে গিয়ে ফিরে এল আমূল প রি ব র্ত ন নিয়ে—কি মানসিক কি বাহ্যিক। অনুগত সরকার-ভক্তের পরিবর্তে হয়ে এল সরকার-বিদ্বেষী কংগ্রেসকর্মী। চমকে উঠলেন রায়-বা হা দু র আর মা বিরজা দেবী। উপায়—? মা নিতান্ত বাঙালী মায়ের মতই কাজ করলেন—স্বরূপের বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন। কিন্তু স্বরূপ মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করবার জন্য গা'ঢাকা দিল মাস কয়েকের মত—

মা সেদিন স-খেদেই বলেছিলেন—"স্বরূপ! তোকে দেখে কেউ বলবে না যে তুই এ বাড়ীর ছেলে—"

"ঠিকই বলেছ মা—শুধু এ-বাড়ী কেন, কোন বাড়ীরই ছেলে আমি হতে পারলুম না!"—স্বরূপ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিল। কিন্তু কত ব্যথায় মানুষ নিজের ঘরে নিজেই পর হয়ে যায় সে খোঁজ কেউ কোনদিন নেয়নি। কেতকীকে আজও এ-বাড়ীর কেউ জানে না—চিরদিনই অজ্ঞাত থেকে গেল সে। রূপ আর সুষমামণ্ডিত নারীদেহের আকর্ষণে মুগ্ধ ভ্রমরের মতই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল স্বরূপসুন্দর। নানা মানুষের নানা বাসনা আছে সত্যি, কিন্তু স্বরূপ বেশী কিছু তো চায়নি। অতি তুচ্ছ একমাত্র কামনা—কেতকী। ব্যর্থ হয়ে গেছে সেই প্রথম চাওয়া।

স্ব রূ পে র তখন ছাত্রজীবন—যৌবনের প্রাণপ্রাচুর্যে টলমল করছে তার স্বাস্থ্যময় দেহলাবণ্য।

কংগ্রেসের এক ঘরোয়া ছোট-খাটো আলোচনা-চক্র বসেছে কলকাতায় এক বাড়ীতে। সহপাঠী ত্রৈলোক্য পণ্ডিতের সঙ্গে স্বরূপ এক-রকম অপ্রত্যাশিতভাবেই সেখানে হাজির হল এবং সেখানেই প্রথম দেখল ক্ষীণ-মধ্যমা রূপসী কেতকীকে। কালো চুলের বেণী দুটো শুভ্র সুগঠিত ঘাড়ের গোড়া থেকে আলতোভাবে গড়িয়ে আছে পিঠের ওপরে—দৃঢ় নিঃসংকোচ বাচনভঙ্গি।

ঘণ্টা খানেকের অধিবেশন—কেতকী ছাড়া অধিবেশনের আর কিছু মনে থাকল না স্বরূপসুন্দরের। মনের গভীরে সাতদিন ধরে চলল আগ্নেয়গিরির চাপা গুমরানি। তারপর একদিন রাজভক্তির যে শীলাচ্ছাদন এতদিন ঘিরে রেখেছিল স্বরূপের মানসিক সত্তাকে, সেটা বিদীর্ণ হয়ে গেল বিস্ফোরণের ধাক্কায়। দ্বিতীয় অধিবেশনে স্বরূপ কেতকীর বাড়ী গিয়ে কেতকীকে জানিয়ে দিল—স্বরূপ হতে চায় কংগ্রেসকর্মী—উগ্র নম্র—যে কোনটা।

কেতকী ব্যারিষ্টারের মেয়ে। তীক্ষ্ণ জেরায় জেনে নিল স্বরূপ-সুন্দরের ইতিবৃত্ত, বাপ নীলাম্বর চৌধুরীর রায়বাহাদুরি, আর্থিক অবস্থা—আরও কত কি।

"সব শুনলাম স্বরূপবাবু, কিন্তু এ-পথ আপনার নয়—" রায় দিয়ে দিল কেতকী।

"তবে এ-পথ কাদের?"

"আর যারই হোক, আপনাদের নয়। এ-পথ বড় দুর্গম, বড় কাঁটা এ-পথে—সিরাজী-রোদ্দুরের কর্ম নয়—বুঝলেন স্বরূপবাবু।"

না, স্বরূপ কিছুই বুঝতে পারেনি। কিম্বা বুঝেও বোঝেনি। বাপ রায়বাহাদুর—স্বরূপ তো রায়বাহাদুর নয়। জন্ম যদি কেউ নেয়, তবে প্রহ্লাদই দিতে পারে হিরণ্যকশিপুর পিছনে—

"তা ছাড়া, রায়বাহাদুর রায়-সাহেবদের সঙ্গে আমাদের ঠিক খাপ খায় না—উচিতও নয়। আপনিই বলুন স্বরূপবাবু—উচিত কি? বিয়ে করেছেন? করেন নি? এম. এ. পাস করুন, বিয়ে থা করুন, তারপর চেষ্টা করুন নাইট, সি-আই-ই যা হোক একটা কিছু হবার—সরকারের স্নেহ-ছায়ায় দিব্যি কেটে যাবে আপনার জীবনটা—"

মুখ কালো করে ফিরে এল স্বরূপসুন্দর। এরপর কি সম্পর্ক থাকতে পারে কেতকীর সঙ্গে? ভীষণ রাগ হল সহপাঠী ত্রৈলোক্যের উপর—কি দরকার ছিল স্বরূপকে ওদের আড্ডায় নিয়ে যাওয়ার? কংগ্রেস কি শুধু বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো ভিখিরিদের জন্য? তা যদি হয়, তাহলে কেতকীর বাবাও তো মস্ত বড়লোক।

দিন যায়, স্বরূপ শান্তি পায় না কোথাও—পড়ার বই তাকেই তোলা রইল। টো টো করে ঘুরে বেড়ায় উন্মাদের ম ত—কি ক র বে? কোথায় যাবে—?

একদিন ত্রৈলোক্য স্ব রূ প কে জানিয়ে দিল—কেতকীর বিশেষ অনুরোধ—স্বরূপ যেন স ত্ব র ই একদিন সাক্ষাৎ করে কেতকীর [illegible]—

প্রত্যাখ্যান করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পারল না। একদিন কেতকীর বাড়ী গিয়ে দেখা করল। কেতকী সেদিনের রূঢ় কথার জন্য ক্ষমা চাইল এবং জানিয়ে দিল স্বরূপদের মত নিষ্ঠাবান লোক কংগ্রেসে যোগ দিলে কংগ্রেস উপকৃতই হবে। "ভাতের চাল ভাল জিনিস—কাঁকর যাতে না ঢুকতে পারে চালের মধ্যে সে চেষ্টাই আগে করা উচিত। তা না হলে পস্তাতে হবে ভবিষ্যতে—। কি স্বরূপবাবু তাই না—?"

"নিশ্চয়—নিশ্চয়।" হৃষ্টমনে স্বরূপ সায় দিল।

স্বরূপ এখন কংগ্রেসের সব গোপন অধিবেশনে যোগ দেবার অধিকার পেয়েছে—এবং যোগও দেয়। কয়েক-মাসের মধ্যে পরিবর্তন এসে গেল ওর বেশভূষায়। সিল্কের পাঞ্জাবীর পরিবর্তে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী। বন্ধুত্বের পথ দিয়ে সুরু হল কেতকীর বাড়ী আসা যাওয়া। কেতকী তখন দ্বিতীয় বার্ষিক বিজ্ঞানের ছাত্রী। পরীক্ষা সন্নিকট কিন্তু সময়াভাবের অজুহাতে স্বরূপকে কোনদিনই বাড়ী থেকে বিদায় দেয়নি—

কেতকীর পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে একদিন নিতান্ত অপরিচিতার মতই কোন খবর না দিয়েই কেতকী চলে গেল সিমলা—জনৈক আই. সি. এস. ম্যাজিস্ট্রেটের হৃদিনীপদ অলঙ্কৃত করবার সম্ভাবনায়!

খবরটা জানিয়ে দিলেন কেতকীর মা— "কেতকী একরকম বাগদত্তাই ছিল। কংগ্রেসীদের আন্দোলন-অত্যাচারে ভাবী জামাতা বাবাজী ছুটি পায়নি বলেই শুভকাজটা সম্পন্ন হয়নি। এইবার হয়তো—"

আই. সি. এস-দের বিয়েতে যারে হলুদের রীতি আছে কিনা স্বরূপ জানে না কিন্তু ওদের ভবিষ্যৎ বিয়ের যত হলুদ সবই যেন ছড়িয়ে পড়ল স্বরূপের চোখের সামনে—আকাশে বাতাসে। রায়বাহাদুর আর রায়-সাহেবদের উপর এত ঘৃণা ছিল যে মেয়ের, তারই কিনা এত লোভ আই. সি. এস. স্বামীর ওপর? সংসারে মানুষ চেনা বরং সোজা মেয়েমানুষ চেনা ততটা নয়!

স্বরূপের জীবন দর্শনে শুরু হল নতুন পরিচ্ছেদ—জলন্ত হাউইটা নিভে গিয়ে আবার ফিরে এল মাটির পৃথিবীতে—যে পৃথিবীতে আশা নেই, আনন্দ নেই—নেই জীবনের উত্তাপ!

আবার সেই ভুলে যাওয়া পুরোন বন্ধু—ত্রৈলোক্য পণ্ডিত। ত্রৈলোক্য সেদিন যে পথের নির্দেশ দিল সে পথ হল পরমার্থের পথ। সে নির্দেশ দেবার অধিকার ত্রৈলোক্য পণ্ডিতের অবশ্যই ছিল। অল্প বয়সে বার্ধক্য-জনিত বিজ্ঞতা—কি আচরণে কি ভঙ্গিতে, সুন্দরভাবে আয়ত্ত করে ফেলেছিল ত্রৈলোক্য পণ্ডিত। বন্ধুদের দেওয়া 'পণ্ডিত' আখ্যা কোন সময়ে পরিহাস ছলে পেলেও তার সার্থকতা সম্বন্ধে ত্রৈলোক্য সর্বদাই সচেতন। এই 'জ্ঞানবৃদ্ধ' অকালপক্বকে স্বরূপ মোটেই দেখতে পারত না, কিন্তু কেতকীর অন্তর্ধানের প্রচণ্ড আঘাতে আশ্চর্য উপশম খুঁজে পেল অনাদৃত ত্রৈলোক্যের মধ্যে।

"—দেখ্ স্বরূপ! তোরা হলি ঘোর বৈষয়িক জীব! কে একজন কেতকী, কে একজন অমুতা তোর হোলো না বলে দুনিয়া শুকিয়ে কাঠ! সব মায়া রে—সব মায়া! কেতকী বল, অমুতা বল—ওরা আর কেউ নয় মায়ারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র! এই গোটা জগৎ ব্যাপারটাই যদি মায়া হয়, তাহলে কেতকী যে মায়াবিনী হবে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে স্বরূপ? ওদের কাজ ওরা ঠিকই করেছে। এই গরীব ত্রৈলোক্যের কথা শুনে রাখ্—ওদের সর্বনাশা হাতছানির মোহিনীতে ভুলিস না—কেঁদে কূল পাবি না যে স্বরূপ—কেঁদে কূল পাবি না!"

ধিক্ ধিক্! এমন একটা সত্যি কথা কেমন সহজভাবে বলল ত্রৈলোক্য পণ্ডিত। কেতকী যে মায়াবিনী হবে তাতে আর আশ্চর্য কি? ধিক্—ধিক্—!

দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব যেন আরও প্রগাঢ় হয়ে উঠল। সন্ধ্যাসমাগে এক-যোগে পা বাড়াবার জন্য নিয়মিতভাবে সন্ধ্যা-আহ্নিক জপতপ—সেই সঙ্গে কলেজ কামাইও চলল!

গৃহত্যাগের আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা যখন সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে তখন হঠাৎ একদিন মেস থেকে ত্রৈলোক্য পণ্ডিত নিরুদ্দেশ হোলো। তারপর মাসখানেক পরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আবার হাজির হোলো স্বরূপসুন্দরের মেসে—ওর মাথায় আর হাঁটুতে ব্যাণ্ডেজ, হাতে লাঠি! ব্যাপার আর কিছুই নয়—মটর চাপা! ঘটনার দিন সাধন-মার্গের চিন্তায় এতই বিভোর হয়ে পথ দিয়ে হাঁটছিল যে বিপজ্জনক পথ-মার্গের কথাটা আর মনেই ছিল না। কিন্তু তার চেয়ে চমকপ্রদ খবর হল—কেতকীর বিয়ে-টিয়ে সব বাজে কথা, কেতকী এখনও অবিবাহিতা কিম্বা ওপাট একবারে সেরে এসেছে এবং সে এখন ডাক্তারী স্কুলের একজন ছাত্রী! তারপর ত্রৈলোক্য গলার স্বর নামিয়ে বলল—আবার এও হতে পারে যে কেতকী উগ্র কংগ্রেসী, হয়তো কোথাও গিয়েছিল বোমা রিভলবার পৌঁছে দিতে! স্বরূপ! সরে এসেছিস, ভালই করেছিস; তা না হলে কোনদিন

ঘুরঘুর করে সেই কাঁসিকাঠে ঝুলতে হোতো ভিড় বেড় করে—!

আসলে কিছুই বলল না স্বরূপ—একবার নিজের চোখে দেখতে চায় কেতকীকে, অন্ততঃ নেপথ্য হতে। পরের দিন দুপুরে ডাক্তারি স্কুলের সামনে চায়ের দোকানে স্বরূপ অপেক্ষা করল—বেলা বারটা নাগাদ দেখা গেল কেতকীকে—ত্রৈলোক্য পণ্ডিত সত্যি কথাই বলেছে!

বেলা একটায় ক্লান্ত ক্ষুধার্ত হয়ে স্বরূপ মেসে ফিরে দেখে—ত্রৈলোক্য এই মায়াময় সংসার ত্যাগের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবে আজ ধারণ করেছে গেরুয়া বসন। এদিক দিয়ে মেডিক্যাল হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের কাছে ত্রৈলোক্য পণ্ডিতের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই—দুর্ঘটনায় চিড় ধরা মাথার খুলিটায় বৈজ্ঞানোচিত সূচীশিল্পের জন্ত আগেই ওটা জোড়া করে দিয়েছেন, আর সাময়িক খঞ্জত্বের জন্ত হাতে ধরিয়েছেন লাঠি—এখন শুধু পা বাড়ালেই হয়!

পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল স্বরূপসুন্দরের—কোথাকার উন্মাদ একটা! দিন নেই রাত্রি নেই, ভগবান আর ভগবান! স্বরূপ বেশ রুক্ষভাবেই ত্রৈলোক্যকে শুনিয়ে দিল—"বুঝলে পণ্ডিত! সংসার ত্যাগ করে তারাই যারা হেরে যায় সংসারযুদ্ধে। কাপুরুষ—কাপুরুষ! কোটী কোটী রুগ্ন ভারতবাসীর মুখে পথ্য দেবার প্রয়োজন থাকতে পারে কিন্তু তার আগে ওদের খাইয়ে দাও দু'বাগ ওষুধ! রুগ্ন শিশুদের অকালমৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনে তুলে দাও অসহায় মায়েদের হাতে—সার্থক হবে তোমার সন্ধ্যা-আহ্নিক, সার্থক হবে তোমার গেরুয়া বসন! ভগবান বলে দাড়ি নখ গজিয়ে তোমার যে আজই হোক না কেন সেটা তোমার নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার—অসহায় দেশবাসীর এক কাণাকড়িও উপকার হবে না তাতে! অতএব—"

"—অতএব—তোমার এই আকস্মিক আমোদদের মূলাধারে যে শক্তিরূপিণী শ্রীমতী কেতকী মায়াবিনী বিদ্যমানা আছেন, তাতে আমার একবিন্দুও সন্দেহ আর নেই! কিন্তু তোমার কপালে যে অপার দুঃখ ভোগান্তি আছে, এ ভবিষ্যবাণী আমি করে দিয়ে গেলুম—!" ত্রৈলোক্য পণ্ডিত রাগতভাবে লাঠি ঠুকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল বাইরে এবং ওর গৃহত্যাগী সবর্ণ চলনভঙ্গী দেখে স্বরূপের আর একবিন্দুও সন্দেহ থাকল না যে এরপর ওর সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ করতে হয় তাহলে হয় বদ্রিনাথ—হনুমান কোলায়, কিম্বা যোশীর কোন মঠের ওদিকে—লোকালয়ে মোটেই নয়!

সাতদিন ধরে বহু ঘোরাঘুরি, বহু তদ্বির করে এম. এ. ক্লাসের ছাত্র স্বরূপসুন্দর ভর্তি হোলো ডাক্তারি স্কুলে—কেতকীর সহপাঠী হয়ে। কিসের আকর্ষণে স্বরূপ ডাক্তারি পড়তে এল, সেটা বুঝতে না পারা কেতকীর উচিত নয়, তবুও সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, "স্বরূপবাবু, আপনি—? আশ্চর্য! কলেজ ছেড়ে পড়তে এলেন কিনা স্কুলে—?"

"—কলেজ কেন, স্বর্গ ছেড়েও আসতে পারি! আমাদের কথা ছেড়ে দিন কিন্তু আপনি যে বড় আই. সি. এস. ছেড়ে—?"

"আই. সি. এস.—? ও হ্যাঁ! আপাততঃ ছুটি নিলুম স্বরূপবাবু—কাজ পড়ে আছে অনেক!" কেতকীর গলার স্বর বন্ধ হয়ে এল।

"ছুটি নিয়েছেন? তা ছুটির ফুরোবে কবে—?"

"কাজ ফুরোলেই—" গম্ভীরভাবে কেতকী বলল।

আবার নিয়মিতভাবে স্বরূপ কেতকীর বাড়ী আসা যাওয়া আরম্ভ করে দিল। কেতকীর মা এবার স্বরূপের ওপর স্নেহধারা একটু বেশী পরিমাণেই বর্ষণ করলেন—পারিবারিক খোঁজ খবরও নিলেন অনেক।

ডাক্তারি পড়ার একই বই—দু'জনের সহপাঠ ভালই চলতে লাগল কেতকীর পড়ার ঘরে। ক্যানিংহাম, গ্রে, হ্যালিবার্টন-আদি সাহেবরা মৌলিক ডাক্তারি গ্রন্থ রচনা করতে কতটা মনঃসংযোগ করেছিলেন তা' তারাই জানেন, কিন্তু স্বরূপ আর কেতকী যৌথ একাগ্রতায় গ্রন্থকারদেরও যে ছাড়িয়ে গেল তাতে বাইরের লোকের আর কোন সন্দেহই রইল না।

কিন্তু পরনারী যদি রূপসী হয় তাহলে—একাল সেকাল সবকালেই পরোপকারীর অভাব হয় না এবং নিছক পরোপকারের উদ্দেশ্যেই একজন নবীন বিলাতফেরত ডাক্তারশিক্ষকের আবির্ভাব হল কেতকীদের পাঠাগারে—ডাঃ নিরঞ্জন মুখার্জি। শুধু দেশপ্রেমের জন্তই মোটা মাইনের সরকারী চাকরি নেননি—এই কথাটাই স্বরূপের সঙ্গে প্রথম আলাপ-পর্বে ডাক্তারসাহেব বেশী জোর দিয়ে বললেন!

ভাল কথা! কিন্তু একফালি কাল মেঘ যেন অপেক্ষের জন্ত ঢেকে ফেলল অভসারী রক্তীম সূর্যকে, আর তারই অদৃশ্য কালো ছায়া এসে পড়ল স্বরূপসুন্দরের মুখে! সে যাই হোক পড়াশুনোর পক্ষে যে অত্যন্ত ভাল হোলো সে কথা কেতকীর চেয়েও বেশী স্বরূপই

সেদিন . স্বীকার করতে হোলো স্বরূপকে।

. কয়েকমাস চলে গেল—ডাঃ নিরঞ্জন প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দেন প্লানা, আর্টারীর গতিবিধি, শাখা প্রশাখার সংখ্যা—নানা স্নায়ুতন্ত্রীর পার্থক্য। প্রতিদিনের অধ্যয়নে আর অধ্যাপনায় বৈদ্য-বিদ্যার জটিলতা যেমন একদিকে পরিষ্কার হয়ে চলল অন্যদিকে তেমনি সৃষ্টি হোলো আর একরকমের চিরন্তন জটিলতা—স্বরূপের মনে হোলো ডাঃ নিরঞ্জনের বিরাট দেশ-প্রেমটা ক্রমেই যেন ঘনীভূত হয়ে কেতকী-প্রেমে কেন্দ্রীভূত হয়ে আসছে। স্বরূপ আর নিরঞ্জন দুই নদীপ্রবাহের মধ্যে কেতকী ছোট্ট দ্বীপের মতই মাথা খাড়া করে জেগে আছে—কে যে ভাসিয়ে নিয়ে যায় কে জানে !

ত্রৈলোক্য পণ্ডিতের চলে যাওয়ার পর ছ'মাসও হয়নি, একদিন অপ্রত্যাশিত দুখানা চিঠি স্বরূপসুন্দর পেল :—যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন মিদং ! আগামী ৮ই ফাল্গুন আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ত্রৈলোক্য-নাথ ভাদুড়ী বাবাজীবনের সহিত কৃষ্ণনগর নিবাসী অমুক মহাশয়ের চতুর্থী কন্যা অমুক মাতার শুভ পরিণয় ...ইত্যাদি ইত্যাদি ! আর একখানা ত্রৈলোক্য পণ্ডিতের নিজের হাতের লেখা—"আমার জীবনের পৌরাণিক আদর্শ পুরুষ রামচন্দ্র। পিতৃ-আজ্ঞায় তিনি যদি জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ বনে জঙ্গলে কাটিয়ে দিতে সক্ষম হয়ে থাকেন তাহলে আমি পিতৃ-আজ্ঞার বিদ্রোহী হতে পারব না. এটা কোন কথা হল নাকি ?"

মনে মনে হাসল স্বরূপসুন্দর, আর অলক্ষ্যে হাসলেন বিধাতা পুরুষ।

দুর্যোগের ঝড়টায় তখন ছেয়ে গেছে গোটা পৃথিবীর রাষ্ট্রনৈতিক গগন—কারারুদ্ধ হলেন মহাত্মাজী। সাগরের পূর্বপারে নেতাজীর রণহুঙ্কার। দেশময় 'ভারত ছাড়' বিক্ষোভ গুমরে গুমরে ধোঁয়াচ্ছে—সন্ত্রাসের আগুন ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে। বৃটিশ-সিংহ প্রচণ্ড থাবা মেরে মেরে সে আগুন নিভিয়ে চলেছে—নির্দয় আক্রোশে থা মেরে নিভিয়ে দিচ্ছে ভারতের কত ছেলেমেয়ের জীবন-দীপ !

গভীর ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ধরা পড়ল ডাঃ নিরঞ্জন। কেতকীদের পাঠাগারে নেমে এল বিষণ্ণতার ছায়া। বাইরের অশান্ত ঝড়ের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলল কেতকী আর স্বরূপসুন্দরের জীবন ধারা—

এতদিন যে নিরঞ্জনকে হিংসা করেছে স্বরূপ, তারই জন্য ব্যথায় টন্‌টন্ করে উঠল ওর মনটা। দেশকে যে এত ভালবাসে তার জীবনে নারী-প্রেমের অবকাশ কই ? কেতকী কিন্তু নির্বিকার—যেন নিতান্তই একটা জানা পরিণতি ঘটেছে, ওতে বিচলিত হবার যেন কিছুই নেই। শুধু বন্ধ হয়ে গেল পড়াশুনো—বইগুলো পড়ে রইল টেবিলে। কেতকীকে সব সময়ে পাওয়া যায় না বাড়ীতে—কোথায় ঘুরে বেড়ায়, কার সঙ্গে দেখা করে, কি যে উদ্দেশ্য—স্বরূপসুন্দর কিছুই বুঝতে পারে না।

সেদিন দুপুরে স্বরূপ বসে আছে নিজের মেসে। দেখা করতে এল কেতকী, ঘোমটা দিয়ে গ্রাম্যবধূর বেশে—"স্বরূপবাবু ! দিনকতকের জন্য বায়ু পরিবর্তন করতে যাচ্ছি, বেহারের ওদিকে—তাই যাবার আগে দেখা করতে এলাম—"

এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল স্বরূপ—"কিন্তু তোমার এ বেশ কেন কেতকী ?"

"এ বেশ কেন ? কে জানে হয়ত একদিন পাড়াগাঁয়েরই বউ হতাম। বাংলার পল্লীবধূ—কি মিষ্টি কি মধুময়। আমি সহরের মেয়ে কিন্তু তবু আমি মনে মনে চেয়েছিলাম—সন্ধ্যার আকাশে গ্রামচৌয়া বাঁকা নদীর শীতল স্পর্শ ! চেয়েছিলাম, স্নানান্তে কলসী কাঁখে বাড়ী ফেরা—আমার বসন সিক্ত, ভরা দেহের লাজনম্র গতি-ছন্দ ! তুলসীতলায় সন্ধ্যার স্নিগ্ধ বাতাসে আমার শুচি-শীতল করপুট ঘেরা সন্ধ্যা-দীপের কম্পমান শিখার আলোয় আমি চেয়েছিলাম আমার মাথা নত করে দিতে ! চেয়েছিলাম—দিনান্তের কর্ম-শেষে ঝিল্লিমুখরিত নিশীথের নিভৃতে স্বামীর নিবিড় সান্নিধ্য। ন—না স্বরূপবাবু ওসব কিছু নয়—একটু কাব্য করলাম মাত্র ! যা কখনও হবার নয়, তা ভাববার নয় ! যদি কখনও ফিরি কবিতার খাতা খানা—"

"যদি—মানে—?"

"যদি মানে—এই ধরুন—অর্থাৎ—" কেতকী কথাটা শেষ করতে পারল না। আনমনা হয়ে তাকিয়ে থাকে জানলার বাইরে—দুটো শঙ্খচিল খড়কুটো বয়ে এনে ঘর বাঁধছে দূরের অশ্বত্থ গাছটার মগডালে—কি তাদের ঐকান্তিকতা ! কেতকীর মনটা যেন ভেসে গিয়েছে অশ্বত্থগাছ ছাড়িয়ে—বহুদূরে ভবিষ্যতের কোন্ অতল অনিশ্চয়তায়।

বহু প্রতীক্ষা স্বরূপ করেছে, আর যেন পারে না—কেতকীর হাতদুটো মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলল—"কেতকী আজও তুমি কি যেন লুকোচ্ছ—যেমন করে চিরদিন তুমি আমার কাছে নিজেকে লুকিয়েছ। যোগ্যতা বা অধিকার আমার হয়ত নেই, তবু একটা

শেষ কথা জানতে ইচ্ছে হয়—তুমি কাউকে কখনও ভালবেসেছ—?"

"বেসেছি অরুণবাবু—বিশ্বাস করুন—ঠিক হয়েই ভালবেসেছি। ভালবেসেছি আপনাকে—দেশের জানা অজানা প্রতিটি মানুষকে। ভালবেসেছি ভারতের দেখা না দেখা প্রতিটি ধূলোকণা, নদী-প্রান্তর, আকাশ-বাতাস। কিন্তু আমি কত ছোট কত সামান্য—দেশ কত বড় কত জনপদ, কত মানুষ। আমার ভালবাসার স্পর্শ তাদের ক'জনে টের পাবে? ক'জনে মনে রাখবে—? কিন্তু আমার ছোঁয়া এই মাটি এই বাতাস পড়ে রইল পিছনে—কিছুই তো আমার হল না—" ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল কেতকী। কিন্তু পর মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—"ঐ দেখুন। আবার কাব্য করে ফেললাম—"

"কাব্য—? হয়ত তাই। আমি কবি নই কিন্তু তুমি যতই হেঁয়ালি কর আমি এইটুকু বুঝলাম যে আমার ভালবাসা প্রত্যাখ্যাত এবং সেই প্রত্যাখ্যাত ভালবাসার শবাধার ঢেকে দিয়ে গেলে "কাব্যমালায়—বরমাল্যে নয়। কেতকী! আমার এ পরাজয় আমি মাথা নত করেই মেনে নিলাম—"

"ভুল—ভুল—!" কেতকীর মুখে ফুটে উঠল ম্লান হাসির এক অপূর্ব জ্যোতি, কিন্তু চোখ দুটো চিক্‌চিক্ করে উঠল জলে—"পরাজয় আপনার নয়, পরাজয় আমারই। তবু কিন্তু আপনার দেওয়া মালা আমি একদিন গ্রহণ করতে পারব—এ সৌভাগ্য আমি নারী হয়ে কামনা করি অরুণবাবু—!"

এক অপূর্ব আনন্দে অরুণসুন্দরের অন্তরটা ভরে গেল—"আর একটা কথা কেতকী—শুধু তোমার সঙ্গে থাকবার অনুমতি চাইছি—"

"বেশ তাই হবে—কিন্তু সে সব ক'দিনেরই বা—"

"হয়ত 'চিরদিনের—" অরুণ নিঃসংশয়েই বলল।

পরের ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—মরদেহী অরুণ আর কেতকী কি চেয়েছে—কি পেয়েছে—তারই হিসাব নিকাশ। যারা সন্ত্রাসের বারুদ দিয়ে সাম্রাজ্যলোভীদের লেলিহান বহ্নি নেভাতে যায় তাদের জীবন-দীপের শিখা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ঝাপ্টায় নিভে যেতে দেরী লাগে কি? সন্ত্রাসবাদী কেতকী আর অরুণ বেহারের এক অখ্যাত জঙ্গলে প্রাণ হারাল বৃটিশ রাইফেলের অব্যর্থ গুলিতে।

কি চেয়েছিল কেতকী—? মধুময় পল্লীবধূ হতে। চেয়েছিল গ্রাম্য নদীর শীতল জল—কলসী কাঁখে বাড়ী ফেরা—লাজনম্র ওর গতিভঙ্গি। চেয়েছিল সিঁদুরসন্ধ্যায় মাথা নত করে দিতে তুলসীতলায়! আর, কি চেয়েছিল অরুণ—? বেশী কিছু নয়—একমাত্র কামনা—কেতকী! কি পেল তারা—?

কেতকী আর অরুণসুন্দরের মৃতদেহ দুটো পুলিশ বয়ে এনে পাশাপাশি সাজিয়ে রেখে দিল সরকারী হাসপাতালের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করবার ঘরে—যদি কেউ সনাক্ত করে। হিমশীতল মর্গ-এর মেঝের যেন রচিত হল ওদের বাসরশয্যা।

• • •

ঠিক সেইদিন রাত্রিতে রায়বাহাদুর নীলাম্বর চৌধুরী নিজের দোতলা ঘরের জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছেন বাইরে—চাঁদের ম্লান আলোয় ভরে গিয়েছে পৃথিবী। রায়বাহাদুরের প্রাণটা আজ বহুদিন পরে হঠাৎ যেন হু হু করে উঠল নিখোঁজ পুত্র অরুণসুন্দরের জন্য—রায়বাহাদুরের কত সাধ, কত বাসনা—ছেলের বিয়ে দিবেন কত আড়ম্বরে—কত বাদ্য! কত রোশনাই। নিয়ে আসবেন এক অপরূপ সুন্দরীকে পুত্রবধূ করে—ঐ জোড়া পালঙ্কের দখল ছেড়ে দিবেন ছেলের [illegible]কে—ফুলে চন্দনে আজ রচিত হোতো পুত্র পুত্রবধূর বাসর-শয্যা—।

কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস এই যে অরুণ আর রূপসী কেতকী সেই মুহূর্তে বাসর রাত্রি উদ্‌যাপন অবশ্যই করছে—হোলোই বা হাসপাতালের মর্গ রুমে!

> "আগে অন্যের জন্য যথাসর্ব্বস্ব ঢেলে দাও, দশের পায়ে মাথা বিক্রয় কর, আর কারো দোষ বলে দোষ দেখা ভুলে যাও, সেবায় আত্মহারা হও, তবে নেতা, তবে দেশের হৃদয়, তবে দেশের রাজা। নতুবা ও-সব কেবল মুখে-মুখে হয় না।"
>
> —শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

স্বাস্থ্য ও সদাচার

—জীবন পূজারী

বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ; যুগ যুগ ধরে বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানবদেহ লাভ সম্ভব হয়েছে। মনুষ্য-দেহ লাভ এক পরম সৌভাগ্য বিশেষ। যুগ যুগ ধরে তপস্যা-লব্ধ এই পরম অবদানকে আমাদের কখনও হেলায় উপেক্ষা করা সমীচীন হবে না। আমাদেরও তপস্যা করতে হবে এই শরীর-বিধানকে সুস্থ ও স্বস্থ রাখবার জন্য। আর তখনই আমরা আমাদের এই মনুষ্য জীবনকে তো যথাযথভাবে উপভোগ করতে পারবই—তা' ছাড়া এই বিশ্বজগৎকেও উপভোগ করতে সমর্থ হব। এই জন্যই বলা হয়েছে—'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্'।

শরীর বিধানকে সুস্থ ও স্বস্থ রাখতে হলে শরীর বিধান সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞ থাকলে চলবে না—শরীর বিধানকে খুব ভাল ভাবে জানতে হবে,—একটি মোটামুটি স্থূল ধারণা নিয়ে চলাও যথেষ্ট হবে না। বিভিন্ন প্রকারের কোষের সমাহারে এই মানব শরীর গড়ে উঠেছে—তাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আমাদিগকে একান্তভাবে পরিচিত হতে হবে এবং সেইভাবে চলতে হবে।

যে আচার আচরণগুলি পরিপালন করে চললে সুস্থ থাকা যায় তা-ই সদাচার। সুতরাং সদাচার নিত্য জীবনে আমাদের প্রত্যেকেরই পালন করে চলা একান্ত কর্তব্য। আহার-বিহার, অভ্যাস-ব্যবহার, চাল-চলন, চিন্তা-কর্ম, বাক্য সব কিছুই স্বাস্থ্যের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। তাই আমাদের চলা-বলা ও করা সে-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, যে-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করলে আমাদের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে। এই ব্যাপারে শুধু নিজের দিকে লক্ষ্য রাখলেই চলবে না। পরিবার এবং পরিবেশের দিকেও লক্ষ্য দিতে হবে। কারণ, আমাদের অস্তিত্ব অনেকাংশেই নির্ভর করে পরিবেশের উপর।

স্বাস্থ্য তিনপ্রকারের—শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক। তাই সদাচারও তিন প্রকারের—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। এই ত্রিবিধ সদাচার যুগপৎ পালনের মধ্য দিয়েই একটা মানুষ সুস্থ ও স্বস্থ থাকে। এদের যে কোন একটা দিকের সদাচার পালনের অভাবেই মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। সুস্থ থাকার আগ্রহ যদি আমাদের থাকে, তাহলে সব সময়ই স্মরণ রাখতে হবে যে দেহ, মন ও আত্মার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। আমাদের প্রত্যেকের সুস্থ থাকার উপরই নির্ভর করে নিজের, পরিবারের এবং দেশ ও জাতির সুখ, সমৃদ্ধি ও উন্নতি। এদিকে লক্ষ্য না দিয়ে এবং এ-সম্বন্ধে অবহিত না হয়ে আমাদের দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্যের জন্য যত তত্ত্ব ও দর্শনের অবতারণাই করি না কেন, অন্যকে যতই দায়ী করি না কেন—দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্যের জাল কিছুতেই ছিন্ন করতে পারব না। কেননা, এর জন্য মুখ্যতঃ দায়ী আমরা নিজেরাই—আমাদের চাল চলন। যা' আমার নিজের করণীয়, তা' অন্যের ঘাড়ে চাপালে হবে কেন?

আজ দেশের মধ্যে প্রতি পরিবারে যে ব্যাপক স্বাস্থ্যহীনতা দেখা যাচ্ছে তার জন্য অনেকেই সরকারকে দায়ী করেন এবং এই স্বাস্থ্যহীনতার জন্য কতকগুলি স্থূল কারণেরও অবতারণা করেন। সরকার তো কিছুটা দায়ী আছেন বটেই, কিন্তু মুখ্যতঃ আমাদের দায়িত্বও আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। মৌলিক এমন কতকগুলি সদাচার আছে যা' নিত্য জীবনে ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য-পালনীয়। সে বিষয়ে সরকার বা অন্যে কি করতে পারেন! তবে সরকার এটুকু করতে পারেন যে, সেই সদাচারগুলি সম্বন্ধে দেশবাসী যাতে সজাগ হ'য়ে ওঠেন এবং জনসাধারণ সেগুলি পালনে অভ্যস্থ হয়ে উঠতে পারেন—সে বিষয়ে ব্যবস্থাদি করা। আবার সরকার বা সরকারের কর্মচারীবৃন্দ যদি এই সদাচারগুলি সম্বন্ধে নিজেরাই সচেতন ও পালনতৎপর না থাকেন, তবে তো কথাই নাই।

যে কোন চিন্তা বা চলন শরীর বিধানকে যখন বিকৃত করে তোলে তখনই ব্যাধি আসবার পথ তৈরী হয়। কাজেই এমন কোন ব্যতিক্রমী পথে আমাদের চলাই উচিৎ নয়, যাতে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক বিকৃতি আসতে পারে। তাই সুষ্ঠু ও শিষ্ট অনুচলনের দ্বারা প্রত্যেকটি ব্যতিক্রমী অনুচলনকে নিরস্ত করতে হবে। শিষ্ট অনুচলন যদি থাকে, তবে অনেক বিপাকের হাত থেকেই আমরা রেহাই পাব। বাইরের থেকে যে সংঘাতগুলি আমাদিগকে ব্যাধিগ্রস্ত করে তুলতে পারে, সেগুলিকে নিরোধ করার ক্ষমতা আমাদের বাড়িয়ে তুলতে হবে। আর জন্ম থেকেই আমাদের অন্তর-প্রকৃতিতে যদি তেমনতর কিছু থেকে থাকে, তবে আমাদের অন্তরকে উপযুক্ত পরিচর্যায়, বিহিত সংযমের

মধ্য দিয়ে বিনাবিত করে তুলতে হবে। এর জন্যই শুদ্ধ ও শিষ্ট অনুচলনের—ত্রিবিধ সদাচার পালনের বিশেষ দরকার. শ্রেয়-সন্দীপী হয়ে চলা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের সব সময়ই মনে রাখতে হবে যে, "রোগ-পোষণী চলন ও ব্যবহার আত্মহত্যারই সমান" এবং আমাদের এই চলন ও ব্যবহার পরিবারের এবং পরিবেশের অন্যের মধ্যেও সংক্রামিত হবে। "রোগে পড়ে আরোগ্য হওয়ার চাইতে প্রতিবেধ ঢের ভাল" এই মহাজন বাক্য সর্বদা স্মরণে রেখে প্রাত্যহিক জীবনে আমরা সদাচারগুলি পালন করে চললে আমরা নিজেরাও সুখী হব এবং দেশ ও জাতিকেও সুখের অধিকারী করে তুলতে পারব। রোগ যাতে হয়, এমনতর অকল্যাণকর কিছু না করা ঢের ভাল—বিড়ম্বনা ভোগ করার চাইতে। একথা আমাদের বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে, পোষণ ও বর্দ্ধনের সহায়ক যা' নয়, তাই রোগ উদ্দীপী। আর একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, রোগে পড়ে কুচিকিৎসিত হওয়ার চাইতে অচিকিৎসিত থাকা অনেক ভাল। কারণ তাতে আরোগ্য-লাভের পথে প্রকৃতির সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কুচিকিৎসা প্রকৃতিকেই বিপন্ন করে তুলবে।

আমাদের জীবনকে ইষ্টার্থ-অনুবেদনী করে তুলতে হবে। এই ইষ্টার্থ-সন্দীপনাই আমাদের আজকের পরিশ্রান্ত জীবনকে স্বস্থ ও স্বস্থ করে তুলবে। শরীর, মন ও বৃত্তি সংবেগকে ব্যতিক্রম দুষ্ট হতে যদি আমরা না দেই, তা'হলে জীবনে আমরা সার্থক হ'য়ে উঠবই এবং দেশ ও জাতিকে সার্থক করে তুলতে পারব। সর্বতোভাবে সব রকম সদাচার পরিপালন করে চলাই হচ্ছে এর প্রকৃষ্ট উপায়।

সংবাদ-বিচিত্রা

বিদেশীয়

চাঁদে গিয়ে যাতে কেউ সামরিক তৎপরতা চালাতে না পারে এবং চাঁদের উপর সার্বভৌমত্ব দাবি করতে না পারে, সেজন্য প্রেসিডেন্ট জনসন গতকাল এক চুক্তি সম্পাদনের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি চান, এই চুক্তিতে সই করবেন আমেরিকা, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং আর যে-সব মহাকাশ শক্তি আছেন। চাঁদ নিয়ে অবাধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে যাওয়াই এই চুক্তির লক্ষ্য। চাঁদে মানুষ নামাবার জন্য আমেরিকা ও রাশিয়া প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা ১৯৭০ সালের মধ্যে চাঁদে মানুষ নামাতে চায়।

• • •

ষাট ফুট উঁচুতে টাঙান তারের উপর দাঁড়িয়ে উনিশ বছরের কারলা মিলার মাটি থেকে ষাট ফুট উঁচুতে চাল্লিশ বছরের লোথার রেনজের কাছে বাগদত্তা হন। এ দুজন ব্যাভেরিয়ান সার্কাস-শিল্পীর অনুষ্ঠান বেইকটের মেলায় অনুষ্ঠিত হয়। এজন্য একজন পুরোহিত এবং দমকলের ডাক পড়ে। দমকল ডাকার কারণ পুরোহিতকে এত উঁচুতে তুলে ধরার জন্য।

• • •

আমেরিকায় শুধু ধনীদের জন্যই আর একটি ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছে। নিউ ইয়র্কের এই ব্যাঙ্কটিতে যে-কোন লোককেই অ্যাকাউন্ট খুলতে হলে কম পক্ষে জমা দিতে হবে সওয়া এক লক্ষ টাকা।

দেশীয়

ভারতের কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীমনুভাই শাহ সম্প্রতি বোম্বাইএ শিল্প ও আর্ট শিল্প এসোসিয়েশনের রজত-জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন-প্রসঙ্গে বলেছেন—ক্রোড়পতি ও লক্ষপতিদের সংখ্যা স্বাধীনতার পর বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এখনও এঁদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তিনি বলেন, স্বাধীনতার আগে দেশে ক্রোড়পতিদের সংখ্যা আঙুলে গোনা যেত। কিন্তু এখন এঁদের সংখ্যা অগণিত। লক্ষপতিদের সংখ্যা নিরূপণ করা অসম্ভব।

শ্রীশাহ এই সব ক্রোড়পতি ও লক্ষপতিকে শিল্প-প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হবার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।

• • •

কেন্দ্রীয় খাদ্য-মন্ত্রকের তদারকিতে এক ইঁদুর সমীক্ষার ফলে প্রকাশ পেয়েছে, মোট ফসল ফলনের শতকরা ৬—৭ ভাগ ইঁদুরের পেটে যায়। এদের অশেষ গুণ। বড় প্রসবিণী এক একটা ইঁদুর বছরে ১২৫০টা বাচ্চার জন্ম দেয়। এদেশের মানুষ আর ইঁদুরের অনুপাত হচ্ছে জনপ্রতি ৬টি ইঁদুর। ইঁদুর-সংখ্যা নাকি ২৫০ কোটি।

ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ্ এক বিশেষ প্রসঙ্গে এই তথ্য জানিয়ে কিভাবে ইঁদুরকুল নির্মূল করা যায়, তার বিভিন্ন উপায় বলতে গিয়ে বিড়াল পোষার কথা বলেছেন। কিন্তু যদি ইঁদুর মারতে বিড়ালের পোষা যাচ্ছে, তখন আবার নূতন সমস্যার উদ্ভব হবে।

বিদেশীয়

অকল্যাণ্ডের অর্ক হইলার ৩০ মিনিটে ৬২ কাপ চা সাবাড় করে বিশ্ব-রেকর্ড স্থাপনের বিনীত দাবি জ্ঞাপন করেছেন। পূর্ববর্তী রেকর্ড নাকি অর্ধ ঘণ্টায় ২৬ কাপ। শ্রীহুইলার বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এক-জন প্রচারবিদ্ এই চা-পান প্রতি-যোগিতার আয়োজন করেছিলেন।

* * *

টেক্সাস চিকিৎসাকেন্দ্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডাঃ মাইকেল ডিবাকির নেতৃত্বে একদল সার্জেন ৬৫ বছর বয়স্ক এক ব্যক্তির দেহে সাফল্যের সঙ্গে কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড বসিয়েছেন। এই কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড আকারে একটি কমলালেবুর মত। এই কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডের কাজ স্বাভাবিক ভাবেই চলছে এবং যাঁর দেহে এটি বসানো হল তাঁর রক্তের চাপ এবং অন্যান্য ক্রিয়া-প্রক্রিয়া স্বাভাবিক বলা হয়েছে, সম্ভবত এইই প্রথম মানব দেহে কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড বসান হলো।

ডাঃ ডিবাকি বলেন, তাঁদের লক্ষ্য ছোট আকারে এমন একটি কৃত্রিম হৃদযন্ত্র তৈরী করা, যা মানবদেহের হৃৎপিণ্ডের পরিবর্তে বসানো যাবে এবং যার সাহায্যে মানুষ স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারবে।

* * *

কথার তোড়ে মেয়েদের জিভ ক্ষুরধার, কিন্তু তাতেও একজন পুরুষের কাছে তারা হেরে গেছে। এই লোকটির নাম পিটার স্পিগেল, বয়েস বাষট্টি। স্পিগেল মিনিটে কথা বলেন ৩০৮ এবং তার উচ্চারণ এতো স্পষ্ট যে, সবাই বুঝতে পারে। সেই তুলনায় পশ্চিম জার্মানীর যে মহিলাটি সবচেয়ে তোড়ে কথা বলতে পারেন, তিনি হলেন কৌতুকাভিনেত্রী গিজেলা স্লুইটের; তাঁর কথার তোড় মিনিটে মাত্র ২৪০।

অনেক বছর ধরে আপ্রাণ অনু-শীলনের চেষ্টায় স্পিগেল তার কথা বলার তোড় বাড়িয়েছেন। কথা যাতে স্পষ্ট উচ্চারণ হয় সেজন্য তিনি একটি টেপ রেকর্ডারের সাহায্যে অনুশীলন করেন। তোড়ে কথা বলার প্রতিযোগিতার আগে তিনি একটি ডিমের কুসুম মুখে দিয়ে জিভ ও মাড়িতে ভালভাবে মাখিয়ে নেন।

শুধু তোড়ে কথা বলাতেই স্পিগেল ওস্তাদ নন, দ্রুত শব্দ লিখনেও তিনি সমান দক্ষ। এই শব্দলিখন-পদ্ধতিও তার নিজস্ব। প্রচলিত শব্দ-লিখনে মাট ২০০ নিয়ম শিখতে হয়, অথচ তার পদ্ধতিতে আছে মাত্র ১৩টি নিয়ম। নিজস্ব পদ্ধতিতে তিনি মিনিটে ৪৪০টি কথা লিখতে পারেন। এক্ষেত্রেও স্পিগেল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।

* * *

লিমা'র পুলিশ একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদে বলেছেন, স্বামী তার প্রতি বিশ্বস্ত নয়—এইরূপ সন্দেহ করে একটি স্ত্রীলোক তার স্বামীকে খেয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল বলে তারা স্ত্রীলোকটিকে অভিযুক্ত করেছে। স্ত্রীলোকটির নাম লুসি মেডিনা। সে পুলিশের কাছে এই কথা বলে যে, সে তার স্বামীকে মেঝের উপরে ফেলে দিয়েছিল। তারপর সে চিৎকার করে বলেছিল, "তোমার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আমি তোমাকে খেয়ে ফেলব!"

স্বামীটিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার মুখে, ঠোঁটে, নাকে, বুকে এবং পিঠে জোর কামড় লেগেছে।

* * *

অক্সফোর্ডের একটি সংবাদে প্রকাশ ৫৬ বছর বয়সের একজন ব্রিটনের দেহের মধ্যে শুকরের 'হার্ট-ভাল্‌ব' লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই ভাল্‌ব-এর সাহায্যে তার শরীরে রক্ত-চলাচল হচ্ছে। তিন সপ্তাহ আগে রোগী যখন হৃদরোগে মারা যাচ্ছিল, তখন তার হৃৎপিণ্ডের উপর অস্ত্রোপচার করা হয়। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে বসানোর জন্য মানুষের দেহের কোন ভাল্‌ব হাতের কাছে না পাওয়া গেলে শল্য-চিকিৎসক তার দেহে একটি শুকরের 'ভাল্‌ব' বসিয়ে দেন। রোগীকে হাস-পাতাল থেকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে বেশ সুস্থ আছে।

* * *

সলসবেরিতে রোডেসিয়ার নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল 'জাপু' এক বিবৃতিতে প্রকাশ করেন যে, সম্প্রতি পুলিশ নয় জন আফ্রিকানকে গুলি করে মেরেছে—উদ্দেশ্য গুলিতে হাত পাকান।

পুলিশ যাতে গুলি করবার সুযোগ পায় সেইজন্যই নাকি আফ্রিকানদের ক্ষেপিয়ে তোলা হয়।

এই নর-মৃগয়ায় নয় জনের মৃত্যু ছাড়াও বহু লোক আহত বলে প্রকাশ। অনেককে গ্রেপ্তার করাও হয়েছে।

অভিনয় উপস্মরণী

সমালোচনা

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি

নায়ক

গত ৬ই মে সত্যজিত রায় পরিচালিত 'নায়ক' মুক্তি লাভ করেছে। চিত্রটিতে শ্রীরায় একজন জনপ্রিয় চলচ্চিত্র নায়কের জীবনকে খণ্ড খণ্ড ঘটনার মাধ্যমে দেখিয়েছেন। খ্যাতির শীর্ষদেশে পৌঁছেছে নায়ক। কলকাতা থেকে ডেস্টিবিউল ট্রেনে দিল্লী চলেছে সে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার আনতে। তার অসংখ্য ভক্ত, যারা তাকে দেখবার জন্য, তার একটু কাছে আসবার সুযোগ পাবার জন্যে উদগ্রীব। এ-খ্যাতি তার নিজের কাছে কেমন লাগে পত্রিকা-সম্পাদিকা অদিতি সেনগুপ্তের প্রশ্নের জবাবে নায়ক অরিন্দম বলেছে, মন্দ কি। কিন্তু আপাত-পরিতৃপ্ত নায়কের অন্তরে রয়েছে বিরাট এক শূন্যতা, এক যন্ত্রণা। তার খ্যাতি বাড়ছে, অর্থ বাড়ছে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে দূরে সরে গেছে তার বন্ধুরা। আগের সেই সাধারণ সরল জীবনের মধ্যে আর ইচ্ছে হলেও তার ফিরে যাবার উপায় নেই। বন্ধুর সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করে সে যখন টাকা দেবার কথা বলে তখন কেবলমাত্র বন্ধুর কাছেই নয়, নিজের কাছেও সে ছোটো হয়ে যায়। নায়কের সঙ্গীর অভাব নেই, তবু তার একাকীত্ব ঘোচেনি। অদিতি সেনগুপ্তের কাছে সে তার জীবনের বিভিন্ন ঘটনার বিবৃতি দিয়েছে। কিন্তু এ-বিবৃতি তার সরব আত্মচিন্তা মাত্র। একটা অদ্ভুত ফ্রাস্ট্রেশনের সম্মুখীন হয়েছে নায়ক। তাই ঘুমের ওষুধ না খেলে তার ঘুম আসে না, নিদ্রা তার ভরা থাকে দুঃস্বপ্নে, সুরাপান ক'রে মুক্তি পেতে চায় সে নিজের চিন্তাজাল থেকে। তার এই অন্তর বেদনাকে বুঝতে পারে অদিতি। তাই একসময় সে ছিঁড়ে ফেলে নায়কের জীবন বিবরণ যা সে লিপিবদ্ধ করেছিল তার পত্রিকার জন্যে। নায়কের এ-জীবন অজানা থাকুক পাঠকের কাছে। তারা তাকে এতদিন যা জেনেছে তাই জানুক।

ছবির শেষে দিল্লী এসে পৌঁছয় ট্রেন। ফুলের মালা গলায় অসংখ্য ক্যামেরাম্যান আর রিপোর্টারের ভীড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে নায়ক। দেখতে পায় অদিতি চলে যাচ্ছে তার আত্মীয়ের সঙ্গে। অন্যমনস্কভাবে সে-দিকে তাকিয়ে থাকে নায়ক। বোধহয় মনের কোণে অতি সূক্ষ্ম বেদনার একটু আভাস দেখা দেয় ক্ষণিকের জন্য।

প্রায় বাইশ ঘন্টাব্যাপী ট্রেন ভ্রমণে আরও কয়েকটি চরিত্র ছবিতে এসেছে স্বাভাবিক ভাবেই। বিভিন্ন ছোট ছোট ঘটনা ও ফ্লাশব্যাকের মাধ্যমে এ-কাহিনীর বিস্তার। শিল্পী সত্যজিত রায়ের হাতের তুলিতে নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে প্রতিটি চরিত্র। বাস্তবতার স্পর্শে সমগ্র চিত্রটি জীবন্ত। যে কোনো বিদেশী শ্রেষ্ঠ মানের ছবির সঙ্গে 'নায়ক' এক আসনে স্থান পাবার যোগ্য। কয়েকটি দৃশ্যে শ্রীরায়ের পরিচালনা অপার বিস্ময়ের চমক জাগায়। নায়কের স্বপ্নদৃশ্য দুটি অভিনব। অত্যন্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারও পরিচালকের সজাগ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আড়ালে যেতে পারেনি। পরিচ্ছন্নতা ও পরিমিতিবোধ ছবিটিকে একটি বিশেষ মর্যাদা আরোপ করেছে। বাংলা চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে 'নায়ক' আপনার গুণে ভাস্বর একটি জ্যোতিষ্ক হয়ে উঠেছে।

নায়ক অরিন্দমের ভূমিকায় বাংলার জনপ্রিয়তম নায়ক উত্তমকুমারের অভিনয় অপূর্ব। তাঁর বিভিন্ন অভিব্যক্তি, গাম্ভীর্য, কৌতুকোজ্জ্বলতা, যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট রূপ—সব কিছুই অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে তাঁর অসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্যে। নায়িকা চরিত্রে শর্মিলা ঠাকুরকে ভাল লেগেছে। কিছুটা কমপ্লেক্সের ছাপ রয়েছে এই চরিত্রে। যেমন, চেহারার প্রশংসা শোনা মাত্র বিরাটাকার চশমা পরে নেওয়া, নায়কের অটোগ্রাফ নিতে এসে ছোটো বোনের নাম করা। দুটি

মাত্র বৃত্তে সুমিতা সান্যাল তাঁর চমৎকার অভিনয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বীরেশ্বর সেন, রণজিত সেন, প্রেমাংশু বসু, সৌমেন বসু, যোগেশ চট্টোপাধ্যায়, কানু মুখোপাধ্যায়, ভারতী দেবী ও যমুনা সিংহের অভিনয়।

সুব্রত মিত্রের ক্যামেরার কাজ অপূর্ব। তবে মাঝে মাঝে ক্লোজ-আপে নায়কের মুখে বড় বেশী দাগ চোখে পড়েছে। দৃশ্যসজ্জা অত্যন্ত সুন্দর। বংশী চন্দ্রগুপ্তকে অভিনন্দন জানাই। ট্রেনের কম্পার্টমেন্ট আসল না সেটে তৈরী বোঝাই যায় না। আবহ সংগীত খুবই সুন্দর।

চলচ্চিত্র-সৃষ্টির ক্ষেত্রে শ্রীরায়ের এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের জন্য সারা ভারতের অকুণ্ঠ অভিনন্দন তাঁর প্রাপ্য।

—মঞ্জু দত্তগুপ্তা

বি. এফ. জে. এ পুরস্কার বিতরণী উৎসব

গত শুক্রবার (১৩ই মে) সন্ধ্যায় ফাইন আর্টস একাডেমী-হলে বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংঘের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীরাজবাহাদুর এবং তিনিই বিভিন্ন পুরস্কারগুলি বিতরণ করেন। সভাপতিরূপে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ শ্রীরাজবাহাদুরকে স্বাগত জানিয়ে বাংলার চিত্র-সাংবাদিকদের নানারূপ অভিযোগের বিষয় উল্লেখ করেন। বিশেষতঃ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার নির্বাচনী কমিটিতে চিত্র-সাংবাদিকদের প্রতিনিধিত্ব দাবী করেন। এরপর ভাষণ দেন সংস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষক শ্রীঅশোককুমার সরকার।

শ্রীরাজবাহাদুর তাঁর ভাষণে বলেন যে চলচ্চিত্র শিল্পসম্মত হওয়া প্রয়োজন এবং চিত্র নির্মাণে শুধুমাত্র ব্যবসার দিক লক্ষ্য রাখা উচিত নয়। সমাজজীবনে চলচ্চিত্র তথা শিল্পীদের বিরাট প্রভাব বর্তমান। এবং এই নৈতিক দায়িত্বের কথা প্রতিজন শিল্পীর স্মরণ রাখা কর্তব্য। তাঁদের ব্যক্তিগত পোষাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি প্রভৃতি জনসাধারণের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের সুষ্ঠু সমাজগঠনে শিল্পীগোষ্ঠীর অবদান যথেষ্ট রয়েছে। জাতীয় চরিত্রের পরিপন্থী যাতে না হয় সে-ভাবেই চিত্রজগতের প্রতিজনের সতর্ক থাকা দরকার। চলচ্চিত্রে বাংলা তথা বাঙালীর ঐতিহ্যের কথা তিনি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। বিশেষভাবে উল্লেখ করেন নিউথিয়েটার্স-এর কথা।

শ্রীরাজবাহাদুর পরিপূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেন যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার নির্বাচনী কমিটিতে চিত্র-সাংবাদিকদের যাতে গ্রহণ করা হয় সে বিষয় তিনি নিশ্চয়ই বিবেচনা করবেন।

ভাষণ শেষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিভিন্ন প্রতিযোগিদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন। যাঁরা ১৯৬৫ সালের জন্য এই পুরস্কার গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন :

শ্রেষ্ঠ পরিচালক (বাংলা—'সুবর্ণরেখা'): ঋত্বিক ঘটক

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা (বাংলা—'রাজা রামমোহন') : বসন্ত চৌধুরী

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী (বাংলা—'সুবর্ণরেখা') : মাধবী মুখোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার (বাংলা—'অতিথি') : তপন সিংহ

শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক (বাংলা—'সুবর্ণ-রেখা') : ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ।

হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে এই পুরস্কারগুলি লাভ করেন যথাক্রমে চেতন আনন্দ (হকীকৎ), শশীকাপুর (যব যব ফুল খিলে), মালা সিন্‌হা (হিমালয় কী গোদমে), কল্যাণজী আনন্দজী (হিমালয় কী গোদমে)।

এ ছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন বিভাগেও পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সাংবাদিকদের বিচারে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ১৯৬৫ সালের যে দশখানি ছবিকে পুরস্কৃত করা হয় সে ছবিগুলির নাম (মান অনুসারে) : অতিথি, সুবর্ণ-রেখা, হকীকৎ, একই অঙ্গে এত রূপ, কাপুরুষ ও মহাপুরুষ, রাজা রামমোহন, রাজকন্যা, আকাশকুসুম, আরজু, গীত গায়া পাথরোনে।

বিদেশী ছবির ক্ষেত্রেও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উক্ত ছবিগুলি হল—মাই ফেয়ার লেডি, দি ভিজিট, ডিভোর্স ইটালিয়ান স্টাইল।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন অপরেশ লাহিড়ী এবং সমাপ্তি শেষে যন্ত্র মাধ্যমে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন ভি বালসারা।

—'শম'

নজরুলের ধর্মচেতনা

-ডঃ তারকনাথ ঘোষ

॥ ইসলাম সংস্কৃতি ॥

'সর্বহারা' কাব্যের 'ফরিয়াদ' কবিতায় নজরুল ঈশ্বরের কাছে অভিযোগ করেছেন। এই অভিযোগ এক দিক দিয়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও, কারণ কবির দৃষ্টিতে ঈশ্বর অন্যায়ের প্রশ্রয়দাতা। কবি বলেছেন,

তোমার চক্র রুধিয়াছে আজ
বেনের রৌপ্য-চাকায়, কি লাজ!
এত অনাচার সয়ে যাও তুমি, তুমি মহা মহীয়ান্!
পীড়িত মানব পারে নাক আর, সবে না এ অপমান—
ভগবান। ভগবান।

কিন্তু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেও নজরুল অবিশ্বাসী বা নাস্তিক তো নয়ই, বরং ঈশ্বরে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তিনি কেবল ভগবানের নামে ধর্মধ্বজীদের অনাচার বা স্বার্থসাধনেরই বিরোধী। তিনি ভগবৎ-সাধনায় সব মানুষের সমান অধিকারে বিশ্বাসী।—

কোথা চেঙ্গিস্, গজনী মামুদ, কোথায় কালাপাহাড়?
ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা দেওয়া দ্বার।
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা!
[মানুষ, সর্বহারা]

আদর্শের দিক থেকে নজরুল মানবতায় বিশ্বাসী। মানুষের 'অমৃতহিয়ার নিভৃত অন্তরালে' পরম দেবতার অধিষ্ঠানের কথা তিনি বহুবার বলেছেন। মোল্লা-পুরুতের বিরুদ্ধে তাঁর বিষোদ্গারও এই আদর্শানুসরণেরই ফল।

নজরুল তথাকথিত ধর্মজীবন যাপন করেন নি। তাঁর আদর্শবাদ এর অন্যতম কারণ বটে, কিন্তু প্রধান কারণ তাঁর আধুনিক জীবনভঙ্গি। তিনি পরিণত বয়সে কিছুকাল তান্ত্রিক সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে, কিন্তু প্রচলিত কোনো ধারার আচার অনুসরণ করে ধর্মচর্চায় ব্রতী হন নি। তিনি সাধারণ অর্থে ধর্মজিজ্ঞাসু ছিলেন না—সক্রিয়ভাবে কোনো বিশেষ ধর্মমতের অনুগামীও ছিলেন না।

কিন্তু ধর্মজীবনের চিরায়ত সংস্কৃতিকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। হিন্দু মুসলমান দুই ধর্মেরই সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সংস্কৃতির দিক থেকে তিনি দুটিকেই বরণ করেছিলেন। একদিকে যেমন তিনি ইসলামী কবিতা ও গান রচনা করেছেন, অপরদিকে তিনি হিন্দু সংস্কৃতির শাক্ত বা বৈষ্ণব গাথা দুই-ই রচনা করেছেন।

বাস্তবিকপক্ষে নজরুল বিদ্রোহী হলেও বিপ্লবী ছিলেন না, এমনকি বিরুদ্ধবাদীও না। যে ধর্ম-সংস্কৃতির মধ্যে তিনি লালিত হয়েছিলেন তাকে তিনি অতিক্রম বা অস্বীকার করতে চান নি; তিনি কেবল তার গ্লানি দূর করতে চেয়েছিলেন। বরং ঐ ধর্ম-সংস্কৃতি তাঁর কবিচিত্তকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল, কাব্য বা সংগীত সৃষ্টিতে প্রেরণাও দিয়েছে। তাঁর ঐ সব রচনা নিছক প্রথানুবর্তন বা মামুলী রচনা নয়, ঐগুলির মধ্যে আন্তরিকতার ছাপ আছে।

ইসলামীয় ধর্মসংস্কৃতির পরিচয় প্রধানত এই কয়টি গ্রন্থে পাওয়া যায়—জিঞ্জীর, মরু-ভাস্কর, কাব্য আমপারা, জুলফিকার। এ ছাড়া অনেক কাব্য বা গীতি সংকলনেও ইসলামীয় ধর্মসংস্কৃতি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। নজরুল ঐ সব কবিতা বা গান রচনা করবার সময় ধর্মের আদর্শ-টুকুই কেবল গ্রহণ করেননি, ধর্মসংস্কৃতির মধ্যে পুরোপুরি অবগাহন করে ঐ সংস্কৃতির সমগ্র পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এজন্য তিনি ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করতে বা পারিভাষিক আরবী ও ফারসী শব্দ ব্যবহার করতে কার্পণ্য করেন নি। নজরুল যখন যে বিষয় গ্রহণ করেছেন, তখন সেটিকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে উৎসুক হয়েছেন; এটি তাঁর ব্যক্তিস্বভাবও বটে।

নজরুলের ইসলামী গানের নিদর্শন হিসাবে 'জুলফিকার'-এর কয়েকটি গানের একটি করে স্তবক উদ্ধার করা হল।

(ক) শহীদী ঈদ্গাহে দেখ আজ জমায়েত ভারি।
হবে দুনিয়াতে আবার ইসলাম ফরমান জারি।

(খ) কলেমা আমার তাবিজ, তৌহীদ আমার মুর্শিদ,
ঈমান আমার ধর্ম, হেলাল আমার খুর্শিদ।
আল্লাহ্ আকবর ধ্বনি
আমার জেহাদ-বাণী,
আখের মোকাম ফেরদৌস্ খোদার আরশ
যেথায় রয়॥

(গ) আমিনার কোলে নাচে হেলে দুলে।
শিশু নবী আহমদ্ রূপের লহর তুলে॥
রাঙা মেঘের কাছে ঈদের চাঁদ নাচে
যেন নাচে ভোরের আলো গোলাব গাছে।
চরণে ভোমরা গুঞ্জরে গুল ভুলে॥

(ঘ) তোরা যারে এখনি হালিমার কাছে
লয়ে ক্ষীর সর ননী।
আমি খোয়াবে দেখেছি কাঁদিছে মা বলে
আমার নয়নমণি॥

শেষ দুটি উদ্ধৃতি অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাবিষয়ক বৈষ্ণব পদাবলীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

নজরুলের এই গানগুলি এক সময় বাঙালী মুসলমান সমাজে আনন্দের উৎস ছিল। গানগুলির মধ্যে সহজ যে মাধুর্য আছে তা ভক্তিপ্রবণ চিত্তকে সহজেই অভিভূত করে। নজরুল 'আমপারা'-র যে অনুবাদ করেছিলেন তার মধ্যেও এই সরল ভক্তির প্রকাশই সবচেয়ে বড়ো কথা। পুরোপুরিভাবে ধর্মসাহিত্য বলে নির্দেশ করা না গেলেও হাফিজের রুবাই-এর যে অনুবাদ তিনি করেছিলেন, তার মধ্যে এই সহজ সৌন্দর্য দেখা যায়। হজরত মহম্মদের জীবন অবলম্বন করে 'মরুভাস্কর' নামে কাব্য রচনার প্রয়াসের মূলেও এই সহজ বিশ্বাস ছিল।

প্রচলিত আদর্শ অনুসারে নজরুলকে ধর্মপ্রাণ বলা না গেলেও তাঁর অন্তরে ধর্মসংস্কৃতির প্রভাব গভীরই ছিল। তবে এই প্রভাবের কতটা যে তাঁর বাস্তব জীবনে অনুসৃত ধর্মসম্প্রদায় থেকে এসেছে, আর কতটার জন্ত যে তাঁর কবিজনোচিত কল্পনা দায়ী তা বলা সহজ নয়। তবে এ-কথা সহজে বলা যেতে পারে যে, কবিকল্পনা ছিল বলেই তাঁর ধর্মমূলক কবিতা বা গানগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

ইসলামের দুটি উৎসব কবি নজরুলের কাছে বিশেষ তাৎপর্যময়। মোহরম তাঁর কাছে ধর্ম বা সত্যকে রক্ষার জন্ত আত্মদানের প্রতীক। অতীতের ঘটনার জন্ত শোক আর মহৎ ব্রত সাধনের জন্ত শহীদ হওয়ার প্রেরণা দুইই তাঁর কল্পনায় এসেছে। একটি কবিতায় তিনি ব্যক্তিগত জীবনের শোককে মোহররমের শোকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন।

মোহর্‌রমের চাঁদ ওঠার ত আজিও অনেক দেরী,
কেন কারবালা-মাতম্ উঠিল এখনি আমায় ঘেরি'?
ফোরাতের মৌজ ফোঁপাইয়া ওঠে কেন গো
আমার চোখে।

নিখিল এতিম ভিড় করে কাঁদে আমার মানসলোকে!
মর্সিয়া খান! গাসনে অকালে মর্সিয়া শোকগীতি,
সর্বহারার অশ্রুপ্লাবনে সয়লাব হবে ক্ষিতি।
[মিসেস্ এম্ রহমান, জিঞ্জীর]

ইসলামের সর্বপ্রধান উৎসব ঈদ্ নজরুলের কাছে বিশেষ মূল্যবান্। তিনি একদিকে এই উৎসবের গভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের কথা স্মরণ করে বলেছেন,

গরীবের ঈদ্ রাখিবে বলিয়া যে-আত্মা রোজা রাখে,
পরমাত্মার পরমাত্মীয় বলে আমি মানি তাঁকে।
[নিত্য প্রবল হও, শেষ সওগাদ]

অপরদিকে ঈদ্ তাঁর কাছে ইসলামের সাম্যের প্রতীক। 'জিঞ্জীর' কাব্যের 'ঈদ্ মোবারক' কবিতার তিনটি স্তবক থেকে কবির কল্পনার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে।

শত যোজনের কত মরুভূমি পারায়ে গো,
কত বালুচরে কত আঁখি-ধারা ঝরায়ে গো,
বরষের পরে আসিলে ঈদ্!
ভুখারীর দ্বারে সওগাত বয়ে রিজওয়ানের,
কণ্টক-বনে আশ্বাস এনে গুল-বাগের,
সাকীরে "জামের" দিলে তাগিদ্।

• • •

ইসলাম বলে, সকলের তরে মোরা সবাই,
সুখ দুখ সম-ভাগ ক'রে নেব সকলে ভাই,
নাই অধিকার সঞ্চয়ের।
কারো আঁখি জলে কারো ঝাড়ে কিরে জ্বলিবে দীপ?
দু'জনার হবে বুলন্দ্-নসিব লাখে লাখে
হবে বদনসিব?
এ বিধান নহে ইসলামের॥

• • •

পথে পথে আজ হাঁকিব বন্ধু,
ঈদ্ মোবারক ! আস্সালাম !
ঠোঁটে ঠোঁটে আজ বিলাব শিরনী ফুল-কালাম !
বিলিয়ে দেওয়ার আজকে ঈদ্ ॥
আমার দানের অনুরাগে রাঙা 'ঈদ্‌গা' রে !
সকলের হাতে হাত দিয়ে আজ আপনারে—
দেহ নয়, দিল্ হবে শহীদ্ ॥

একটি কবিতায় সাম্যবাদের আধুনিক জেহাদী সুর ফুটে উঠেছে।

সিংদিওয়ালাদের দুয়ারে এসেছে আজ
চাষা মজুর ও বিড়িওয়ালা ;
মোদের হিস্সা-আদায় করিতে ঈদে
দিল হুকুম আল্লাতালা।
দ্বার খোলো সাততলা-বাড়ী-ওয়ালা,
দেখ কারা দান চাহে,
মোদের প্রাপ্য নাহি দিলে যেতে নাহি দেব ঈদ্গাহে।
আনিয়াছি নব যুগের বারতা নতুন দিনের চাঁদ,
শুনেছি খোদার হুকুম, ভাঙিয়া গিয়াছে ভয়ের বাঁধ।
মৃত্যু মোদের ইমাম সারথি, নাই মরণের ভয় ;
মৃত্যুর সাথে দোস্তি হয়েছে—অভিনব পরিচয় !
যে ইসরাফিল প্রলয় শিঙা বাজাবেন কেয়ামতে—
তাঁরি ললাটের চাঁদ আসিয়াছে, আলো দেখাইতে পথে।
[ঈদের চাঁদ, নতুন চাঁদ]

॥ হিন্দু সংস্কৃতি ॥

ধর্মের দিক থেকে মুসলমান হলেও হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি নজরুলের একান্ত অনুরাগ ছিল। কবিসুলভ ঔদার্যই যে তাঁকে হিন্দুধর্ম-সংস্কৃতিমূলক কাব্য রচনা করতে প্রবৃত্ত করেছিল একথা ভাবলে ভুল হবে। নজরুলের প্রকৃতিতে জীবনের প্রতি যে সুগভীর প্রেম ছিল তাই তাঁকে সব কিছুকে বরণ করতে প্রেরণা দিয়েছিল। তাঁর ইসলামী কবিতা বা গান যেমন আন্তরিক, তাঁর হিন্দুধর্মাশ্রয়ী কবিতা বা গানও তেমনই আন্তরিক। তাঁর কবিজীবনের মধ্যে ফাঁকি ছিল না বলেই দুইয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গতার সুর বেজে উঠেছে।

শাক্ত-পদাবলী বাঙালী হিন্দুর বিশিষ্ট সম্পদ। নজরুল বাঙালী হিন্দুর এই রত্নভাণ্ডারে অজস্র রত্ন সংযোজন করেছেন। তিনি যে সব শাক্ত সঙ্গীত রচনা করেছেন তা বাঙালী হিন্দুর হৃদয় হরণ করেছে। লোক-প্রসিদ্ধি যে, নজরুল শাক্ত সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, আর তাঁর শেষ জীবনের মানস বিপর্যয় তাঁর সাধনারই প্রতিক্রিয়া বা মতান্তরে স্তরবিশেষ। সাহিত্যের আলোচনায় এ-প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য অবান্তর—তবে এ-থেকে নজরুলের বিচিত্রগামী জীবনচর্যা সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে তোলা যেতে পারে। হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় কেবল গ্রন্থগত ছিল না, তিনি সাগ্রহে হিন্দুর ধর্মসংস্কৃতির প্রবাহিণী ধারায় অবগাহন করেছিলেন, যদিও প্রাচীন বা মধ্যযুগের ধর্ম দর্শনের অতল তত্ত্ব-রহস্য সম্পর্কে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। কাব্যসাধকের পক্ষে যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু তিনি পেয়েছিলেন—বিশেষতঃ লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকার ফলে তাঁর গানগুলির মধ্যে সহজ সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে।

নজরুলের শাক্ত-সংগীতকে মোটামুটিভাবে দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে। তাঁর কয়েকটি গানের মধ্যে সংস্কৃতির চেতনা প্রবল - তিনি পৌরাণিক যুগের সঙ্গে আধুনিক ভাবনা মিশিয়ে কয়েকটি গান রচনা করেছেন। এগুলি কোনো অনুষ্ঠান বা উপলক্ষকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। যেমন,

জাগো যোগমায়া, জাগো মৃণ্ময়ী
চিন্ময়ীরূপে জাগো।
তব কনিষ্ঠা কন্যা ধরণী
কাঁদে আর ডাকে 'মা-গো'।...
দশভুজে দশ প্রহরণ ধরি
আয় মা দশ দিক আলো করি
দশ হাতে আন কল্যাণ বারি
নিশীথ শেষের ঊষা গো।

এই ধারার রচনার মধ্যে নজরুলের হিন্দু-সংস্কৃতির চেতনার গভীর পরিচয় পাওয়া যায় সন্দেহ নেই। অপর ধারার শাক্ত-সংগীতের মধ্যে তাঁর যে আন্তরিকতা দেখা যায় তা আরও মূল্যবান্। তাঁর গভীর অনুরাগ শ্যামা-বিষয়ক গানগুলিকে মনোগ্রাহী করে তুলেছে। এই গানগুলির মধ্যে তিনি রামপ্রসাদ-কমলাকান্তের উত্তরাধিকারের পরিচয় দিয়েছেন। 'আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন,' 'মহাকালের কোলে এসে গৌরী হল মহাকালী,' 'বল রে জবা বল, কোন সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণ তল'—প্রভৃতি গানে কবির হৃদয়ের গভীর অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে—প্রধানত সেইজন্যই এই গানগুলি হৃদয়গ্রাহী। আবার এই রচনাগুলি যে ভাবের দিক দিয়ে লঘু এ-কথা মনে করবারও কোনো

হেতু নেই। এই গানগুলির মধ্যে একদিকে যেমন লোকায়ত ভাব ফুটে উঠেছে অন্যদিকে তেমনই কবির সুগভীর উপলব্ধিও ব্যক্ত হয়েছে। কোনো কোনো গানের মধ্যে এমন এক একটি ছত্র আছে যা সাধক কবির উপলব্ধিজাত বলে মনে হবে। নজরুল সাধনার ক্ষেত্রে কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন বা সাধনার পথ আদৌ অবলম্বন করেছিলেন কিনা সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু তাঁর গভীর সহমর্মিতা বা প্রেম যে তাঁর অন্তরে গভীর উপলব্ধির স্পর্শ এনে দিয়েছিল একথা বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে নজরুলের স্বভাবই এ-ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধির কারণ যদিও সেই সিদ্ধি আংশিক, হয়তো বা ক্ষণিকও।

নজরুল বৃন্দাবনলীলা অবলম্বন করে কয়েকটি গান রচনা করেছিলেন। তবে এই ধারার গানের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমই মুখ্য—প্রেমের লীলাচপলতাই সেখানে প্রধান হয়ে উঠেছে, প্রেমের গভীরে অবগাহনের প্রয়াস সেখানে নেই। মনে হয় নজরুল বৈষ্ণব ভাবাদর্শের সঙ্গে সম্যক্ পরিচিত ছিলেন না, বা ঐ আদর্শ তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। বৃন্দাবনলীলার মধ্যে নরনারীর যে চিরন্তন হৃদয়বৃত্তি স্থান পেয়েছে সেইটাকেই তিনি কাব্যের বিষয়বস্তু করে তুলেছেন। এই ধারার রচনাগুলির মধ্যে শ্যামা-সংগীতের মতো ভাবগত গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায় না; তবে এ-গুলির মধ্যে শিল্পগত সৌকর্য বা বর্ণাঢ্যতার অভাব নেই। কবিসুলভরূপাসুরাগই তাঁর এই সব রচনার মূল।

ইসলামী কবি নজরুল আর হিন্দু ধর্মসংস্কৃতির কবি নজরুল এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করা কঠিন। ইসলাম ধর্ম একেশ্বরবাদী—ঈশ্বরের মূর্তিকল্পনা ঐ ধর্মাদর্শের বিরুদ্ধ ভাবনা। হিন্দুর অদ্বৈত-দর্শনে অনুরূপ ভাবনা থাকলেও নজরুল ঐ চিন্তা গ্রহণ করেন নি। শ্যামা-সংগীত বা বৃন্দাবন-গাথার মধ্যে বহুদেব-বাদের সুস্পষ্ট পরিচয় না থাকলেও মূর্তিকল্পনা আছে। সুতরাং নজরুলের পক্ষে এই দুই ধারায় কবিতা বা গান রচনা স্ব-বিরোধী বলে মনে হতে পারে।

কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর 'শাশ্বত বঙ্গ' গ্রন্থে নজরুলের ধর্মচেতনাগত এই বিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করে যে সিদ্ধান্ত করেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "নজরুলের কবিপ্রকৃতি সম্পর্কে একটি বড় ব্যাপার লক্ষ্য করবার আছে। নজরুলের ভিতরে তারুণ্য চমৎকার, জীবনের আনন্দ তিনি সহজভাবে অনুভব করতে পারেন, নানাদিক দিয়ে তিনি একজন সহজ মানুষ—এ সবের কিছুই মিথ্যা নয়। কিন্তু এই সঙ্গে এ-কথাও বুঝবার আছে যে অন্তরের গোপনতম প্রদেশে তিনি তাত্ত্বিক—আর সেই তাত্ত্বিকতা তাঁর যেন জন্মগত। তাঁর এই পরমপ্রিয় তত্ত্বের নাম দেওয়া যেতে পারে লীলাবাদ—ইংরেজীতে যা সাধারণত Pantheism নামে পরিচিত। এই দৃষ্টিতে ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য শেষ পর্যন্ত নেই—ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, জন্ম-মৃত্যু, উত্থান-পতন, সব কিছুই ভগবানের লীলা। এই তত্ত্বকে বলা যায়, একই সঙ্গে অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ [দ্বৈতাদ্বৈতবাদ নামকরণ সংগততর—লেখক]। হিন্দু চিন্তায় এটি যে মর্মকথা তা না বললেও চলে, সুফী চিন্তারও এটি মর্মকথা—এক হিসাবে প্রাচীন কালের ভাবুকদের এটি পরম আশ্রয়। এই হিন্দু-মুসলমানের মাথা ভাঙাভাঙির যুগেও নজরুল যে অবলীলাক্রমে শ্যামা-সংগীত ও বৃন্দাবন গাথা রচনা করে চলেছেন, তৌহীদেরও (একেশ্বর তত্ত্বের) শক্তিশালী ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন, তার রহস্য নিহিত আছে তাঁর এই মূল বিশ্বাসের ভিতরে। কিন্তু এই বিশ্বাস যে তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ বিঘ্নও ঘটিয়েছে সেইটিই আমাদের প্রধান বক্তব্য। কবিদের অথবা শিল্পীদের কেউই হয়ত সর্বপ্রকারে 'বিশ্বাসবর্জিত' নন, কিন্তু তাঁদের বিশেষত্ব এই যে কোন ব্যক্তি বা বস্তু বা ঘটনার যাথার্থ্য উপলব্ধির আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁদের থাকে—সেই উপলব্ধির সময়ে তাঁরা যেন সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত রাগদ্বেষবর্জিত ও অপূর্বভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে ওঠেন। এই যে পূর্ণ আত্ম-বিস্মরণ ও বিষয়-নিষ্ঠতা এটি নজরুলের পক্ষে তাঁর শ্রেষ্ঠ মুহূর্তেও প্রায় অসম্ভব হয়েছে লীলাবাদে তাঁর অপরিসীম আনন্দের জন্য। এই লীলাবাদ তাঁর জন্য এক ধরণের আত্ম-বিস্মৃতি এনে দিয়েছে, তাঁকে আশ্চর্যভাবে নিরহংকার ও সৌন্দর্য-পিপাসু করেছে, কিন্তু কবিত্বের পূর্ণ বিকাশের পথে এটি এই বাধা উপস্থিত করেছে যে এর ফলে বহির্মুখী না হয়ে অন্তর্মুখী হয়েছেন তিনি অনেক বেশী, রূপবৈচিত্র্য-অঙ্কনের চেয়ে type বা প্রতীক সৃষ্টির দিকে তাঁর মন ঝুঁকেছে।"

অন্তর্মুখী হওয়ার এই প্রবণতার জন্যই নজরুলের ধর্মমূলক কবিতার চেয়ে গানগুলি আরও বেশি উপাদেয় হয়েছে—রচনা হিসাবেও সার্থকতর হয়েছে। সমন্বয়ের সচেতন প্রয়াস তাঁর ছিল না—তাঁর লীলারসিক কবিচিত্ত সহজেই আপাত দৃষ্টিতে বিরুদ্ধ ভাবনার মধ্যে সহজে অবগাহন করে আনন্দলাভ করেছে।

সঙ্ঘ-বার্ত্তা

—শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

[ভারতের ধর্মীয় সঙ্ঘগুলির অধিকাংশই ভারতীয় সংস্কৃতির সঞ্জীবনী ধারাটিকে নিরন্তর সাধনায় প্রবহমান রাখিয়াছেন। আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই ঐ সঙ্ঘগুলির বার্ত্তা জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিভাগে যে-সকল সঙ্ঘের সংবাদ আমরা প্রকাশযোগ্যরূপে পাইব, তাহা প্রকাশিত হইবে।

—সম্পাদক, ভক্তিদীপা]

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের স্বাস্থ্য মাঝে কয়েকদিন বেশ খারাপ চ'লছিল, সম্প্রতি একটু ভালর দিকে। তিনি স্বাভাবিকভাবেই সবার সাথে আলাপ-আলোচনা ক'রছেন। বর্ত্তমানের আলোচনা চ'লেছে প্রধানতঃ শাণ্ডিল্য-বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে। শ্রীশ্রীঠাকুরের আশৈশব স্বপ্ন এই শাণ্ডিল্য-বিশ্ববিদ্যালয়।

শিশুকাল থেকেই তিনি শিক্ষার সঙ্কটের কথা উপলব্ধি ক'রতেন। অন্নবিদ্যার বড়াই, বেত মেরে ছাত্র পড়ানো, প্রয়োগজ্ঞানহীন পুঁথিগত বিদ্যার আয়ত্তীকরণ, অধিক জ্ঞান-লাভের পরেও যোগ্যতার দৈন্য ইত্যাদি শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিরন্তর পীড়িত ক'রত। তিনি সব দেখতেন আর ভাবতেন, কিভাবে এর নিরাকরণ করা যায়, কিভাবে প্রতিটি শিশুকেই আদর্শচরিত্র সুযোগ্য দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন প্রাজ্ঞ মানুষ ক'রে তোলা যায়। এরই ফলস্বরূপ, তাঁর মানসলোকে জন্মলাভ ক'রল—শাণ্ডিল্য-বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন ক'রে, আর্য্যকৃষ্টির বর্ণে তাকে অনুরঞ্জিত ক'রে, যোগ্য শিক্ষকের চরিত্রধনে ছাত্রগণকে ধনী ক'রে, এক নূতন আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থার সংস্থাপনার্থে তাঁর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা। মহর্ষি শাণ্ডিল্য শ্রীশ্রীঠাকুরের গোত্রপিতা। তাই পরম শ্রদ্ধাভরে সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহান্ ঋষির নামেই শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠা ক'রবেন তাঁর বহুসাধের বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বের সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতিটি বিষয়েরই শিক্ষালাভের ব্যবস্থা এখানে থাকবে। শিক্ষার যে মূল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ দ্যুতিমান চরিত্রের অধিকারী হ'য়ে যোগ্যতায় সমারূঢ় হওয়া, তাই হবে শ্রীশ্রীঠাকুর পরিকল্পিত এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মুখ্য লক্ষ্য।

এই বিরাট পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের নানাবিধ প্রচেষ্টায় বর্ত্তমানে সৎসঙ্গ আশ্রম মুখরিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নেহল পরিচালনায় সৎসঙ্গিগণ ঐ লক্ষ্য বাস্তবায়িত করার পথে এগিয়ে চলেছেন। অর্থ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী সংগৃহীত হ'চ্ছে। এই আহ্বানে সাড়া দিতে এগিয়ে এসেছেন দেশের জনসাধারণ, শিক্ষক, অধ্যাপক, বহু রাজকর্মচারী এবং শিক্ষাবিদ্গণ।

আমরাও শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা করি, শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের এই লোকসম্বর্দ্ধনী ক্ষেম-প্রসূ সাধু উদ্যোগটি সত্বর সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হোক; দেশ ধন্য হোক, জাতি মহান্ জাতিতে পরিণত হোক।

জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রত্রয়ীর শীর্ষ বৈঠক

১৯৫৮ সালে যুগোশ্লাভিয়ার ব্রিয়োনীতে ভারতের পরলোকগত প্রধান মন্ত্রী নেহেরু, আরব যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নাসের ও যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট মার্শাল টিটোর মধ্যে আন্তর্জাতিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে ত্রি-পক্ষীয় রাষ্ট্রপ্রধানদের অধিবেশন হয়েছিল। এ-রকম দ্বিতীয় শীর্ষ বৈঠক যাতে আগামী জুন মাসে হয় তার জন্য শ্রীনাসের ও শ্রীটিটো উদ্যোগী হয়েছেন। সেই সময় শ্রীমতী গান্ধীর যদি বিদেশযাত্রার অসুবিধা থাকে তা হলে ভারতেই অধিবেশন হবে।

এ-ধরণের বৈঠকে ভারতের কিন্তু বিশেষ উৎসাহ নাই। এর কারণ, বিগত চীনা আক্রমণের সময় ভারতের বন্ধু-স্থানীয় জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির কাছে ভারত কোন সহানুভূতি পায় নি—এরা চীনা আক্রমণের অন্যায় জুলুমের কোনো নিন্দাও করেনি। সুতরাং এদের জোটনিরপেক্ষতার নীতির উপর ভারতের সংশয় দেখা গেছে। এর আগেও কয়েকবার এশিয়া ও আফ্রিকার জোটনিরপেক্ষ জাতিগুলির বৈঠকের কথা উঠেছিল। সেগুলিতেও ভারতের উৎসাহ বড় একটা ছিল না। কারণ, কয়েকটী রাষ্ট্র ছিল চীনের অনুরাগী। এখন আফ্রিকার এরূপ রাষ্ট্রগুলির কয়েকটীর মোহ কেটে গেছে। ইন্দোনেশিয়ারও মোহ ভাঙছে। কিন্তু এই মোহভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতেও ভারত সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারেনি।

জোটনিরপেক্ষতার নীতির আদর্শে ভারত বরাবরই পথিকৃৎ হয়ে আছে। প্রধান মন্ত্রী নেহেরু সেই নীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী করেছেন। তবুও শেষজীবনে তিনি যে আঘাত পেয়েছেন তার গুরুত্ব কম নয়। প্রস্তাবিত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের আলোচ্য সূচী এখনও স্থির হয়নি। এখন বৃহৎ শক্তিদের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইএর তীব্রতা কমে গেছে। দুর্দান্ত চীনের প্রসারনীতির যথেষ্ট আস্ফালন থাকলেও নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি এখন নিরপেক্ষতার অধিকতর পক্ষপাতী। টিটো ও নাসের হয়তো চেয়েছেন জোটনিরপেক্ষতার একটা সংস্কৃত নূতন নীতি স্থির করতে। সে ব্যাপারে ভারতের বর্তমান অবস্থায় বিশেষ আগ্রহ না থাকাও স্বাভাবিক। ভারত এখন নানা জটিল ঘরোয়া সমস্যায় জর্জরিত। টিটো-নাসেরের উদ্যোগী হবার অবসর আছে, ভারতের তা নাই। ভারত-সীমান্তে দুই শত্রু চীন ও পাকিস্তান খড়্গহস্ত হয়ে রয়েছে। অর্থনৈতিক ও খাদ্য সমস্যার সীমা-পরিসীমা নাই। তার উপর আছে বিদেশী শক্তির স্বার্থপ্রণোদিত চক্রান্ত। টিটো বলছেন, জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগোষ্ঠী কাশ্মীর-সমস্যার সমাধানে প্রভাব বিস্তার করবে। কিন্তু চীন যখন সীমান্তে ওৎ পেতে রয়েছে, তার ব্যাপারে সকলে নীরব।

সুতরাং নানা অভিজ্ঞতার পর আমরা নাসের-টিটো-প্রস্তাবিত বৈঠকে বিশেষ উৎসাহ বোধ করি না। ভারতের এখন বহু সমস্যা, বহু চিন্তা—বহুবিধ চক্রান্ত তাকে দূরে সরাতে হবে। ভারত স্বয়ংনির্ভর হয়ে সমস্তই করতে পারবে।

শ্রীঅশোক মেহতার আমেরিকায় দৌত্যের পরে

পরিকল্পনা-মন্ত্রী শ্রীঅশোক মেহতা আমেরিকায় তাঁর দৌত্যকার্য শেষ ক'রে এসে গত ৮ই মে তার বিবরণীতে স্বীকার করেছেন, কি যুক্তরাষ্ট্র সরকার বা বিশ্বব্যাঙ্ক কোন পক্ষ হতেই সুনির্দিষ্ট সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়নি। সেনেটে কংগ্রেসের সমর্থন না পাওয়া পর্যন্ত ভারতকে সাহায্যদানের নীতি অথবা কতখানি সাহায্য যুক্তরাষ্ট্র দিতে প্রস্তুত, সে বিষয়ে প্রেসিডেণ্ট জনসনও নীরব আছেন। এমন কি গতবর্ষের প্রতিশ্রুত সাহায্যের যে অংশ এখনো দেওয়া বন্ধ আছে, সেটুকু প্রদান করবার স্থির সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়নি। সম্ভবতঃ এ ব্যাপারেও প্রেসিডেণ্ট কংগ্রেসের সমর্থনের আশায় আছেন। ভারতে এ ব্যাপারে নৈরাশ্যের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক, তবে শ্রীমেহতার যুক্তি-বিবেচনায় আমরাও আশা করছি, যুক্তরাষ্ট্র সরকার নিজেদের দৃষ্টি-ভঙ্গীতে বিচার-বিবেচনা করবেন। ভারতের যা প্রয়োজন বা যে অর্থের জন্য শ্রীমেহতার দৌত্য, তা নিশ্চয়ই মার্কিন কংগ্রেস বিশ্লেষণ করবেন। কারণ, প্রতিশ্রুত সাহায্যের অপ্রদত্ত অংশবিশেষের জন্যই নয়, ভারত তার চতুর্থ যোজনার রূপায়ণে একটা মোটা অঙ্কের অর্থ সাহায্যের জন্য তাদের দ্বারস্থ হয়েছে।

ভারত-সহায়ক সংস্থার সমস্ত রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যথাযথ আলোচনা করবার পর বিশ্বব্যাঙ্ক তার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেবেন বলে মনে হয়। এবার চতুর্থ যোজনা বেশ কলাও করে তৈরী হয়েছে—টাকার প্রয়োজনের হিসাব তৃতীয় যোজনার

প্রায় বিফল। পরিকল্পনা-মন্ত্রী মার্কিন মুলুকে গিয়ে ভারতের একতরফ উদ্যোগ-আয়োজনের তাৎপর্য যদি সেখানকার কর্তৃপক্ষমহল ও বিশ্বব্যাঙ্ককে বুঝিয়ে আসতে সক্ষম হয়ে থাকেন ও তাদের সংশয়মুক্ত করতে পারেন তা হলেই আমরা বুঝব তাঁর এই দৌত্যকার্য সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। যদি দেখা যায়, গতবারে যা পাওয়া গিয়েছিল তার বেশী পাওয়া সম্ভব হয়নি অথবা তদনুপাতে কম সাহায্য পাওয়া যাবে, তা হলে শ্রীমেহতার যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও বিশ্বব্যাঙ্কের দরজায় ধর্না দেওয়ার কোন মূল্যই থাকবে না।

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য মিত্ররাষ্ট্রগুলি তাদের সাহায্যের ইঙ্গিত বা মোটামুটী প্রতিশ্রুতি ইতোমধ্যেই দিয়েছে। ব্রিটেন ও কানাডা গতবারের চেয়েও বেশী সাহায্য করবে বলে জানা গেছে। পশ্চিম জার্মানীও তার সাহায্যের অঙ্ক জানিয়ে দিয়েছে। রাশিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করে যাবে। এখন নির্ভর করছে আসল মোটা সাহায্য আমেরিকা ও বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে। শ্রীমেহতার স্বীকারোক্তিতে যথেষ্ট আশা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর বিশ্বাস হয়েছে, প্রয়োজনানুরূপ দাক্ষিণ্য তিনি পাবেন। কিন্তু কোনরূপ শর্তের প্রশ্ন উঠলে তা আমাদের জাতীয় মর্যাদায় আঘাত করবে। মর্যাদা-হানিকর বা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোনরূপ বাধ্য-বাধকতায় আমরা সম্মত হতে পারি না। প্রয়োজন হলে, পরিকল্পনাকে ভেঙে-গড়ে ব্যয়সঙ্কোচ করে নূতনভাবে রচনা করতে হবে।

লালচীনের তৃতীয় আণবিক বোমা

৯ই মে চীন তার তৃতীয় পরমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এই পরীক্ষাকার্য ঘটানো হয়েছে চীনের সিনকিয়াং-উইগুর এলাকায় লপ্ হ্রদের তীরে। জানা গেছে, এটা হাইড্রোজেন বোমা এবং হিরোশিমায় যে বোমা পড়েছিল এটা তার ছ'গুণ শক্তিসম্পন্ন। রাশিয়া, আমেরিকা ও ব্রিটেনের পরীক্ষিত বিস্ফোরণ-পর্যায়ের এটা সমশক্তি-সম্পন্ন নয় বটে, কিন্তু চীনের এই কাজ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৬৪ সালের ১৬ই অক্টোবর প্রথম এবং ১৯৬৫ সালের ১৪ই মে দ্বিতীয় বার সে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল।

একথা ঠিক যে, চীন তার প্রকৃতি ও নীতির জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট কোণঠাসা হয়ে গেছে। উগ্র জঙ্গীবাদ ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাহানির কারণ হয়েছে। তার পাশে ভারতের মত একটা আদর্শ গণতন্ত্রী দেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে তা সে চায় না। নানা স্বার্থগত কারণে আমেরিকা চীনকে দাবড়ে ও তার শক্তিকে সীমাবদ্ধ করতে চায়। সাম্প্রতিক কালে রাশিয়ার সঙ্গে তার অসদ্ভাব ঘটেছে। [illegible] রাশিয়া ও আমেরিকার সঙ্গে শক্তিসাম্যে আসবার তার আপ্রাণ প্রচেষ্টা।

মার্কিন পদার্থবিজ্ঞানী ও হাইড্রোজেন বোমার আবিষ্কর্তা শ্রীএডওয়ার্ড টেলার গত ২১এ এপ্রিল ডুসেলডর্ফের এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, চীন শীঘ্রই ২২০০ মাইল পাল্লার আণবিক ক্ষেপণাস্ত্র-নির্মাণে সক্ষম হবে এবং ক্ষেপণাস্ত্র-নিক্ষেপের উপযোগী সাবমেরিন-বহরের উপযোগী হলেই সে পৃথিবীর যে কোন দেশকে 'ব্ল্যাকমেল' করতে পারবে। এদিকে ২৯এ এপ্রিল করাচীতে চীনা প্রধানমন্ত্রী চু-এন-লাই বলেছেন, পিকিং-এর প্রতি যুক্তরাষ্ট্র বৈরী মনোভাব না ছাড়লে ও তাইওয়ান থেকে সরে না গেলে চীন ও আমেরিকার মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে না।

বর্তমান অবস্থায় ভারত পরমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে কি না সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোকসভায় নানা দলের দাবী উঠেছে, ভারতের যখন পরমাণবিক সামর্থ্য আছে তখন কালবিলম্ব না ক'রে আণবিক বোমা তৈরী করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী যদিও নীতিগতভাবে রাজী হতে পারেননি, কিন্তু ১১ই মে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং জানিয়েছেন, পরমাণু আক্রমণের বিরুদ্ধে পরমাণু শক্তির অধিকারী প্রধান রাষ্ট্রগুলি নিরাপত্তার নিশ্চয়তা না দিলে অন্যান্য রাষ্ট্র পরমাণু বোমা তৈরী করবে। এই ইঙ্গিত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমরা মনে করব। চীন যদি ন্যায়নীতিকে কোনরূপে আমল না দেয় এবং স্বেচ্ছাক্রিয়তা ও আণবিক স্তূপে আবহমণ্ডল বিষাক্ত করে তোলে, তা হলে আমেরিকা-রাশিয়া-ব্রিটেনের যথোচিত প্রতিশ্রুতি না পেলে এ-ব্যাপারে ভারতের নিশ্চেষ্ট থাকা সমীচীন হবে না।

জরুরী অবস্থা ও ভারতরক্ষা আইন

বিগত চীনা আক্রমণের সময় ১৯৬২ সালের ২৬এ অক্টোবর ভারতে জরুরী অবস্থা ও ভারতরক্ষা আইন বলবৎ হয়েছিল, আজও তা অক্ষুণ্ণ আছে। এটা তুলে দেওয়ার আশু লক্ষণ আছে বলেও মনে হয় না। বর্তমানে এই আইন তুলে দেওয়ার ব্যাপারে লোকসভায় যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে, ভারতব্যাপী আলোড়ন হয়েছে। কিছুদিন পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ ছাড়া, দীর্ঘ সাড়ে-তিন বৎসর যুদ্ধাবস্থা না থাকলেও এই ভারতরক্ষা বিধি চলে আসছে এবং এর অপব্যবহার হয়েছেও যথেষ্ট। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দ সম্প্রতি সংসদে ঘোষণা করেছেন, জরুরী অবস্থা বর্তমানে একেবারে তুলে দেওয়া সম্ভব নয়—সীমান্তপারের

চীন ও পাকিস্তান যুদ্ধায়োজন করছে, সেই সমস্ত সীমান্ত অঞ্চলে এবং কাশ্মীর, নাগাভূমি ও আসামের পর্বতীয় অঞ্চলে ভারতরক্ষা বিধি চালু রাখতে হবে। অবশ্য বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ সন্দেহের গুরুত্ব আছে। আবার আইনবিদ্ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাখতে হলে আইনটিকে পূর্ণভাবেই রাখা উচিত। নচেৎ সম্পূর্ণই তুলে দেওয়া দরকার।

আমরা জানি, জাতীয় সঙ্কট উপস্থিত হলেই জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতা, শান্তি ও আঞ্চলিক সংহতি যখন বিপন্ন হয় তখনই সঙ্কটকাল। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে সেরূপ সঙ্কট না থাকলেও যে জরুরী অবস্থা অব্যাহত থাকে এবং তারই জন্ত বিশেষ রক্ষা-ব্যবস্থায় আইন বলবৎ থাকা অস্বাভাবিক। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তার সুযোগ গ্রহণে বাধা থাকে না। বাঙলায় সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় ও পঞ্জাবের অশান্তিতে তাই এই আইন বিনা দ্বিধায় প্রয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া সরকার যে-কোন ব্যাপারে প্রয়োজন বোধ করেছেন এই আইন প্রয়োগ করেছেন। অবশ্য সম্প্রতি যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের সকলকেই প্রায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আমাদের বক্তব্য এই যে, দেশের মধ্যে যখন অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চলবে, রাষ্ট্রদ্রোহমূলক ও সমাজবিরোধী অবস্থার সৃষ্টি হবে তখন প্রচলিত আইনগুলির সংশোধন ও পরিবর্ধন করা যেতে পারে, কিন্তু জরুরী অবস্থার দোহাই দিয়ে সমগ্র জাতির উপর ভারতরক্ষাবিধির জগদ্দল পাথর চাপিয়ে রাখা উচিত হবে না।

পূর্ববঙ্গে স্বাধীনতার দাবী

সম্প্রতি আমেরিকার নিউ ইয়র্ক টাইমস্ ও অব্জারভার, লণ্ডনের গার্ডিয়ান ও কায়রোর আল্ আহ্রাম সংবাদ-পত্রগুলিতে পূর্ববঙ্গে স্বায়ত্তশাসনের দাবী ধূমায়িত হয়ে ওঠার সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। পাকিস্তানের সৃষ্টি হবার পর হতেই পশ্চিম পাকিস্তান যেভাবে পূর্বপাকিস্তানের উপর চাপ দিয়ে আসছে, দমননীতি চালিয়ে পূর্বের উপর পশ্চিমের প্রভুত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, তাতে অনেকেরই আশঙ্কা ছিল একদিন পূর্বপাকিস্তান বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। আজ সেই অবস্থারই সূত্রপাত হয়েছে। পূর্ববঙ্গের জনসমাজ স্বায়ত্তশাসন দাবী করছে।

প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ ক্রুদ্ধ হয়েছেন। কিছুদিন পূর্বে ঢাকায় এক জনসভায় বেশ ক্রোধের সঙ্গে জানিয়েছেন, পূর্ব-পাকিস্তানের এই দাবী পুরাতন অখণ্ড বাঙলার দাবী। এতে যদি গৃহযুদ্ধ বাধে তার জন্তও তিনি প্রস্তুত। পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্তে পাঠানদের পাকতুনিস্তানের দাবী অনেকদিনের। পাঠানরা স্বাধীনচেতা, অতি দুর্ধর্ষ। তাদের দমন করাও সহজসাধ্য নয়। সেখানকার জন্ত পাকিস্তানের কর্তা-ব্যক্তিদের কাকেও একটা বিচলিত হতে দেখা যায়নি। মূল কারণ অবশ্য সুজলা সুফলা পূর্ববাঙলার উপর সমস্ত পাকিস্তান অনেকটা নির্ভর করতে হয়। এই অংশকে বাদ দিয়ে মূল পাকিস্তানের অস্তিত্ব বজায় রাখা কঠিন।

বাঙলা ও বাঙালী আজ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। ইসলাম বিপন্নের দোহাই দিয়ে সুপরিকল্পিত উপায়ে হিন্দুদের উৎখাত করা হয়েছে, এবং বাকীটুকু যত শীঘ্র শেষ হয় তার চেষ্টা চলেছে। দুই বঙ্গের অধিবাসীরা চেয়েছিল, যাতায়াত, যোগাযোগ ও লেনদেন স্বাভাবিক থাকুক; কিন্তু তাও হয়েছে অস্বাভাবিক। সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনধারা যদি কৃত্রিম চাপে বাধাপ্রাপ্ত ও বিপর্যস্ত হয় তা হলে সেই জনসমাজ বিক্ষুব্ধ হবেই। একমাত্র ধর্মগত ছাড়া পশ্চিমের মুসলমানদের পূর্বের মুসলমানদের অন্ত কোন বিষয়ে মিল নাই। ধর্মের গোঁড়ামি দিয়ে পূর্বের মুসলমানদের এতদিন চেপে রাখা হয়েছিল। এখন পূর্বপ্রান্তের মুসলমানদের মোহভঙ্গ হয়েছে।

ছাত্রসমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা

সাম্প্রতিক কালে বাঙলায় ছাত্রসমাজের মধ্যে এক শ্রেণীর ছাত্রদের ভিতর একটা বিকৃত শিকার প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। তারা নামেই পরীক্ষার্থী; পরীক্ষা-ব্যবস্থায় কোনরূপে একটু এদিক-ওদিক দেখলেই তারা হাঙ্গামা বাধিয়ে দেয়—নানাভাবে ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে পরীক্ষা ভণ্ডুল করাই এদের কাজ; যারা সত্যই পরীক্ষার্থী তাদেরও পরীক্ষা দিতে দেয় না; যারা শান্তিকামী, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়ে তাদেরও আহত ও বিপর্যস্ত করে দেয়।

ঠিক এই রকম ব্যাপার সম্প্রতি কলিকাতায় চলছে। বি. এ. ও বি. এস্‌সি. পার্ট ওয়ান পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। যারা প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখছিল তাদেরও পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়নি, তাদের মধ্যে অনেকে আহতও হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়-ভবনের নানারূপে ক্ষতি করে দুর্নীতি স্থাপিত হয়েছে।

ছাত্রদের মধ্যে এরূপ অবস্থা হওয়া কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। যারা জাতির ভবিষ্যৎ সেজন্তও তাদের মধ্যে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া উচিত। শিক্ষাকে অতি পবিত্র বিষয় জ্ঞান করে, সুন্দর চরিত্র গঠন করে ছাত্রগণ যদি তাঁদের লক্ষ্যপথে অগ্রসর হন তা হলে জাতির উন্নতি ও সুপ্রতিষ্ঠা হবে, নচেৎ নয়। এ-বিষয়ে নিশ্চয়ই শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট দায়িত্ব আছে, শিক্ষকসমাজেরও আছে। তাঁরা নিজেরাই স্থিরমতিক ন'ন। তাঁরা যদি উচ্চ আদর্শের অনুপ্রাণনায় শিক্ষা ব্যবস্থায় আত্মনিয়োগ করেন, তা হলে ছাত্ররাও সেইভাবে গঠিত হবে।

সাপ্তাহিকী

৮ মে

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন, এই রাজ্যের মধ্যবিত্তদের অর্থনৈতিক দুর্গতি কমাবার জন্ম বিশেষ কিছুই করা হয়নি। শীঘ্রই বিশেষ ব্যবস্থা না করলে তীব্র গণ-আন্দোলন দেখা দিতে পারে এবং তার প্রভাব পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতেও পড়বে।

● ভিয়েৎনামের ... হাজিপীর ও পুঞ্চের যুদ্ধবিরতি সীমা-বরাবর বড় রকমের সামরিক তোড়জোড় শুরু হয়েছে বলে প্রকাশ।

● জানা গেছে, মিজো পাহাড় ও কাছাড় সীমান্তে অতর্কিত হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

● মার্কিন বোমাবর্ষণে ভিয়েতকঙদের রাজধানীর পরিবহণের সমস্ত যোগাযোগ পথ প্রায় বিনষ্ট হয়েছে।

৯ মে

ভারতের সর্বত্র জাতীয় নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলের জন্মশতবার্ষিকী ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ১০৫তম জন্মবার্ষিকী আড়ম্বরের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে কলিকাতায় 'রবীন্দ্র-সরণী'র উদ্বোধন হয়। গতকাল নয়াদিল্লীতে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ গোখলের জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন করেন।

● চীন তাদের তৃতীয় পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

● ভারতে মার্কিন গোয়েন্দাগিরি চলতে দেওয়া হবে না বলে প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় জানিয়েছেন।

● কলিকাতায় পক্ষকালব্যাপী বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন শুরু হয়েছে।

● নয়াদিল্লী হতে ঘোষিত হয়েছে, ১১ই মে হতে কেরলে আরও ছ'মাস রাষ্ট্রপতির শাসন বহাল থাকবে।

● উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষজনিত অবস্থায় কেন্দ্রের কাছে ৩০ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা সাহায্য চাওয়া হয়েছে।

১০ মে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. ও বি. এস্‌সি. পার্ট ওয়ান পরীক্ষা ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্ম স্থগিত হয়েছে।

● সংবাদ, একটা শক্তিশালী চীনা সামরিক দল পিস্‌পিট এজেন্সীতে প্রবেশ করেছে।

● রাজ্যসভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, বিদ্রোহী মিজোদের শিক্ষা দেবার জন্ম পূর্বপাকিস্তানে তিনটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

● উত্তর বিহারে ও বিহার-নেপাল সীমান্তে প্রচণ্ড ঝড়ে ন্যূনাধিক ১৩ জন নিহত, বহু আহত এবং ৩.৫ হাজার শ্রমিক গৃহহীন হয়েছে।

১১ মে

লোকসভায় অভিযোগ উঠেছে, গত মাসে উড়িষ্যায় অনাহারে ৫০০ জনেরও বেশী মারা গেছে। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত অঞ্চলে সাহায্যের নীতি গৃহীত হয়েছে।

● লোকসভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, চীনের আণবিক বোমার বিস্ফোরণের পর, আত্মরক্ষার নিশ্চয়তা না পেলে অন্যান্য দেশও পরমাণু বোমা তৈরী করবে।

● বিজয়বাড়া শহরের উপকণ্ঠে এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডে ২১ জন নিহত ও অনেকে আহত হয়েছে। সহস্রাধিক ঘরবাড়ী, কুটীর ভস্মীভূত হয়।

● মণিপুর রাজ্যের উখরুল-এ প্রায় এক সহস্র সশস্ত্র বৈরী নাগা প্রবেশ করেছে বলে জানা গেছে।

১২ মে

লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে, মিজোরা বড় রকম আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, সম্ভবতঃ আগামী বর্ষায় তারা সুযোগ গ্রহণ করবে।

● দক্ষিণ-ভারতের পশ্চিম গোদাবরী, গুনটুর ও চিত্তুর জেলায় বড় রকমের অগ্নিকাণ্ডের খবর এসেছে; বহু প্রাণহানি ঘটেছে।

● সংসদে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ আইন বলবৎ থাকবে, না তা প্রত্যাহার করা হবে, গভর্নমেন্ট তা বিচার করে দেখছেন।

● কথাসাহিত্যিক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন।

১৩ মে

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অঞ্চল পরিক্রমণ করেছেন এবং ৯ কোটি টাকা সাহায্যের সঙ্কল্প জানিয়েছেন।

● রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষকদের পেন্‌শন দিবার পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদন করেছেন।

● ভিয়েতনামের যুদ্ধে দক্ষিণ-ভিয়েতনাম সৈন্য-বাহিনী ও মার্কিন নৌ-সেনা একযোগে ২৬৫ জন ভিয়েতকঙ গেরিলাকে নিহত করেছে বলে প্রকাশ।

১৪ মে

অনাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কালাহাণ্ডি জেলার অঞ্চলগুলি পরিদর্শনান্তে ভুবনেশ্বরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে এই অবস্থাকে দুর্ভিক্ষ বলা যেতে পারে। ভবিষ্যতে যাতে এরূপ অবস্থা না ঘটে তার ব্যবস্থা করাই দরকার।

● শ্রীঅশোক মেহতা বলেন যে চতুর্থ পরিকল্পনায় যে বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন হবে তা আমেরিকা ও অন্যান্য কনসর্টিয়াম দেশ থেকে আসবে।

● ভারতীয় বিমানবাহিনীর অধ্যক্ষ বলেন পাক-চীনের মোকাবিলা করবার জন্য আরও শক্তিশালী বিমান বহর চাই।

● কেন্দ্রীয় রেলওয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন যে বৈরীদের ব্যবহৃত প্লাষ্টিক বোমা চেকোশ্লোভাকিয়ায় তৈরী এবং এসেছে পাকিস্তান থেকে।

● কলকাতার খেলার মাঠে সাধারণ দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট গ্যালারীর একাংশ ভেঙ্গে পড়ার দরুণ ৫০ জন আহত হয়েছেন। ক্যালকাটা-মোহনবাগান মাঠের এই গ্যালারী রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন।

● জেনারেল জে. এন. চৌধুরী বলেন যে কেউ ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা করলে ভারতীয় সৈন্য-বাহিনী তাদের সমুচিত জবাব দিবে।

বিঃ দ্রঃ—অনিবার্য কারণবশতঃ এই সংখ্যায় 'ব্যায়াম-বিধায়না' দেওয়া সম্ভব হল না। —সম্পাদক।

শ্রীবীরেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক ১৩৮।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬, স্মৃতি প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক ২০, বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪ হইতে প্রকাশিত।

বিভিন্ন স্থানে 'স্মৃতিদীপা' পত্রিকার প্রতিনিধি

কলিকাতা

১। সংসদ পাবলিশিং হাউস,
১৭৩/৩, বিধান সরণি, কলি-৬

২। শ্রী বি. মণ্ডল, ৮বি, লালবাজার স্ট্রীট, কলি-১
(তিনতলা)

৩। শ্রীসুধীর নন্দী, ১/৬৪, যতীন দাস নগর,
বেলঘরিয়া, কলি-৫৬

৪। শ্রীগোপালচন্দ্র পাল
৫০, ইষ্ট কমলাপুর, দমদম, কলি-২৮

৫। গ্রন্থচক্র
৪৭, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলি-২৬

৬। শ্রীঅমরেন্দ্রকুমার দাস
৪, শেঠবাগান রোড, কলি-৩০

হাওড়া

১। শ্রীকল্যাণেন্দু মুখোপাধ্যায়
১৭ ১, রামকৃষ্ণ [illegible] লেন,
[illegible], হাওড়া

২। শ্রীমণীন্দ্রনাথ দত্ত
১১৮/১, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, হাওড়া

হুগলী

১। শ্রীদীনবন্ধু ঘোষ
ভট্টাচার্যপাড়া, চাতরা, শ্রীরামপুর

২। শ্রী[illegible]রঞ্জন দত্ত, [illegible]
নবগ্রাম, কোন্নগর, হুগলী

মেদিনীপুর

১। শ্রীচারুভূষণ করণ, কোতবাজার, মেদিনীপুর

২। শ্রীমৃণালকান্তি মজুমদার
বক্সীবাজার, মেদিনীপুর

৩। [illegible], [illegible]

৪। শ্রী[illegible]কিরণ ঘোষ
[illegible], [illegible]

বর্ধমান

১। শ্রীমনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
[illegible] রোড, বর্ধমান

২। শ্রীনারায়ণচন্দ্র কর্মকার
আদর্শ জুয়েলার্স, কালিবাজার,
বি. সি. রোড, বর্ধমান

৩। শ্রী[illegible]রঞ্জন দাস
১১৭-ই, মার্কনি এভেনিউ, দুর্গাপুর-৪

পুরুলিয়া

১। ডাঃ অমলেন্দু হালদার
সেবা ফার্মেসী, রঘুনাথপুর

বাঁকুড়া

১। শ্রীপঞ্চানন সিংহ, অমরকানন, বাঁকুড়া

বীরভূম

১। শ্রীনির্মলশিব দত্ত, সাঁইথিয়া

নদীয়া

১। শ্রীঅমলকুমার বসু, শক্তিনগর (ভায়া কৃষ্ণনগর)

২। শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পোঃ মাজদিয়া, নদীয়া

২৪ পরগনা

১। শ্রীশুভাষচন্দ্র চক্রবর্তী, নীলাচল, খড়দহ

২। শ্রীনারায়ণচন্দ্র দাস, মোল্লার হাট,
ঠাকুরবাড়ী কোয়ার্টার, আগরপাড়া

৩। শ্রীপূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়
গোমেসপাড়া, বাংলা, বাটানগর

৪। শ্রীকৃষ্ণ মাইতি, কাকদ্বীপ

মালদহ

১। শ্রীবিশ্বভূষণ মিশ্র
C/o. শ্রীঅভয়পদ ঘোষাল, ইংলিশবাজার

মুর্শিদাবাদ

১। শ্রীব্রজগোপাল রায়, কান্দী

২। শ্রীকেদারনাথ লাহিড়ী, লালদীঘি, বহরমপুর

জলপাইগুড়ি

১। শ্রীকানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, জলপাইগুড়ি

২। শ্রীধনঞ্জয় বিশ্বাস, শিল্পসমিতি পাড়া, জলপাইগুড়ি

৩। শ্রী[illegible]গোপাল বিশ্বাস, কামারপাড়া, জলপাইগুড়ি

বিহার

১। শ্রীবিশ্বেশ্বর মহাপাত্র
টেলকো নিউ কলোনী, রোড ২০,
জামসেদপুর-৪

উড়িষ্যা

১। শ্রী ভগবান প্রেস
চাউলিয়াগঞ্জ, মাখামাছি, কটক ১

২। শ্রীকালিপদ ভৌমিক, পিঠনমাছী, কটক-১

৩। শ্রী[illegible] ঘোষ, মাড়োয়ারী পাড়া, বালেশ্বর

আসাম

১। শ্রীকাশীবিজয় চক্রবর্তী
রেলওয়ে কলোনী, বদরপুর, কাছাড়

২। শ্রীধীরেন্দ্রকুমার মল্লিক
[illegible], শিবসাগর

৩। শ্রীকুমুদরঞ্জন দাস পুরকায়স্থ,
[illegible], এন. সি. হিলস

৪। শ্রী বি. সি. চক্রবর্তী, মোহরীপাড়া, কামরূপ

৫। শ্রীনিশেন্দ্রমোহন দে, রামকৃষ্ণনগর, কাছাড়

৬। শ্রী[illegible] সেন, আমপট্টি, কাছাড়

৭। শ্রীশক্তিকুমার দত্ত
[illegible] পি. ই. এস. অফিস, পাণ্ডু, গৌহাটী

ত্রিপুরা

১। শ্রী [illegible], আগরতলা

দিল্লী

১। শ্রী[illegible]রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
[illegible], [illegible], নিউ দিল্লী

• চয়ন •

"যখন বন্যা আসে তখন খানা, ডোবা সমস্ত ভাসিয়ে দে যায়। [illegible] সামান্য নালা দিয়ে কষ্টে জল যায় যায়। যখন মহাপুরুষ আসেন সকলেই তাঁর কৃপায় তরে যায়।

"কলের জাহাজ নিজে অনায়াসে চলে যায় ও বড় বড় গাধাবোটকে টেনে নিয়ে যায়, তেমনি মহাপুরুষ যখন আসেন, তখন তিনি অনায়াসে বহু লোকদের টেনে নিয়ে যান।

"যেমন কোন অচেনা জায়গায় যেতে হোলে যে জানে এমন একজনের কথামত চলতে হয়, অনেককে জিজ্ঞাসা করলে পথ গোল হয়ে যায়, সেই রকম ঈশ্বরের নিকট যেতে গেলে গুরুর কথামত চলতে হয়। এ নিমিত্ত একজন গুরুর দরকার।

"অবতার ঈশ্বরের কর্ম্মচারী— যেমন জমিদার আর তাঁর নায়েব। আপন অধিকারের যে প্রদেশে গোলমাল হয়, জমিদার সেই প্রদেশেই তাঁর নায়েবকে প্রেরণ করেন, সেইরূপ জগতে যে কোন স্থানে ধর্ম্ম হানি হয়, সেইখানেই অবতারকে আসতে হয়।

"সেই একই অবতার যেন ডুব দিয়ে এখানে উঠে কৃষ্ণ হলেন, ওখানে উঠে যীশু হলেন।

"বাদশাই আমলের টাকা এখন চলে না। কেননা, তার সে ক্ষমতা এখন নাই, এখনকার অবতারের মতে চলা চাই।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব

১ম বর্ষ **ধৃতিদীপা** ১৬শ সংখ্যা

Friday, 10th June, 1966 : শুক্রবার, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩ : 50 Paise

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি :

নাম ও ঠিকানা-সহ স্পষ্টাক্ষরে কাগজের এক দিকে লিখিত রচনার পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নিকট পাঠান আবশ্যক। কোন মনোনীত রচনা কোন বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট পাঠালে ফেরত পাঠান হবে।

গ্রাহকদের প্রতি :

সপ্তাহের প্রতি শুক্রবারে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে কুড়ি পয়সার ডাকটিকিট-সহ অতিরিক্ত কপির জন্য জানাতে হবে। ঠিকানার পরিবর্তন হলে, পনেরো দিন আগে জানাতে হবে। ভিঃ পিঃ-তে পত্রিকা পাঠান হয় না। চিঠি-পত্রে ও কুপনে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করা দরকার।

এজেন্টদের প্রতি :

এজেন্সীর নিয়মাবলী পত্রিকার কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি :

পত্রিকার কার্যালয়ে পত্র দিলে বিজ্ঞাপনের মূল্য, নিয়মাবলী ইত্যাদি জানান হয়।

টাকার হার :

ডাকসহ বার্ষিক ২৪·০০ টাকা,
ষান্মাষিক ১২·০০ টাকা;
ত্রৈমাসিক ৬·০০ টাকা;
প্রতি সংখ্যা ০·৫০ পয়সা,

ম্যানেজার, ধৃতিদীপা
৪০, বজোদাস টেম্পল ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৪
ফোন : ৩৫-৪২৫৭

সূচীপত্র

বোধি সমীক্ষা

সম্পাদকীয়

আকাশের করুণা ও আমাদের খাদ্য

কোটী কোটী টাকা ব্যয়ের গাল-ভরা ভারী ভারী নাম-ওয়ালা আমাদের সেচ-পরিকল্পনাগুলি লইয়া শহরের এয়ার-কণ্ডিশন্‌ড্ কিংবা বৈদ্যুতিক পাখা-সেবিত কক্ষে বসিয়া যতই গুরুগম্ভীর গবেষণা-নিবন্ধ রচিত হউক না কেন এবং উক্ত পরিকল্পনাগুলির ফলপ্রসূতা লইয়া প্রচারবিভাগের ঢক্কানিনাদ যতই উচ্চগ্রামে উঠিতে থাকুক না কেন, আসলে দেখা যাইতেছে আমাদের ক্ষেতের মাটীর বুক ভিজাইবার ব্যাপারে বিজ্ঞানের এত উন্নতির যুগেও এখনও আমাদিগকে ষোল আনার মধ্যে পনেরো ভাগ আকাশের বর্ষণ-দাক্ষিণ্যের উপরই নির্ভর করিতে হইতেছে। গতবারের আকাশের বর্ষণ-কার্পণ্য ভারতের এ-বছরের শোচনীয় খাদ্যাভাবের অন্যতম প্রধান কারণ। আর এই খাদ্যাভাবের ফলশ্রুতি বৈদেশিক সম্পর্ক হইতে শুরু করিয়া দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং আভ্যন্তরীণ নৈতিক পরিস্থিতি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র যে কি বিষাক্ত নারকীয় এবং মানবতার চরম অসম্মানজনক অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা সমগ্র যন্ত্রণাকাতর দেশবাসীর সহিত আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। এ বৎসরে আকাশ আরও নির্দ্দয়, আরও নিষ্করুণ হইয়া দেখা দিয়াছে। চাষীদের মতে বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে এমন সাংঘাতিক রকমের অনাবৃষ্টি এবং খরা নাকি পশ্চিম বাংলায় দেখা যায় নাই। আবহাওয়া তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিতেছেন যে, পূর্ব্বাঞ্চলের সবগুলি রাজ্যেই এবারের অনাবৃষ্টির প্রকোপ পড়িয়াছে। পল্লী-বাঙলায় বুক-ফাটা ক্ষেত এবং পুষ্করিণীর মধ্যে দাঁড়াইয়া বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া মানুষ আকুল হইতেছে। স্নান এবং পানের জলও সেখানে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি দুই এক জায়গায় দুই এক পশলা বজ্র-বিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত হইলেও মুমূর্ষু আউশ, ক্ষেতের শাকসবজি, উঁচু জমির পাট ইত্যাদিকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলার প্রতিশ্রুতির বিশেষ স্বাক্ষর তাহাতে নাই। এবারেও যদি পর্জ্জন্যদেব যথোচিত কৃপা না করেন, তাহা হইলে যে ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহা ভাবিয়া কৃষককুলের সহিত আমাদেরও হৃদ্‌কম্প হইতেছে।

এই অনাবৃষ্টির অন্যতম কারণ হিসাবে কেহ কেহ চীনের বোমাকে দায়ী করিতেছেন। নানা দিক হইতে ইহার কারণিক স্বীকৃতি বহুবিতর্কিত। দেশের প্রজ্ঞাবান্ প্রবীণ কৃষকগণ এবং বহুদর্শী বিজ্ঞগণ বলিতেছেন যে নির্ব্বিচারে অরণ্য-উৎসাদনই এই অনাবৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ। 'গ্রীন্‌বেল্ট' যে মেঘাকর্ষণ করে এবং বনস্পতিকুল যে মেঘমিতা, এ তথ্য লইয়া তর্কের অবকাশ আজ আর নাই। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্টের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত দ্রুত শিল্পায়নের পথে যে ভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের অরণ্যগুলি উৎসাদিত ও বনস্পতিগুলি উন্মিত হইয়াছে তাহাতে মিত্রবিরহাতুর মেঘকুল কৃপণ হইয়া

উঠিলে বিস্ময়ের কিছু নাই। সরকারী বন-বিভাগের কর্ম্মতৎপরতা একমাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকটি সরকারী 'রিজার্ভ ফরেস্ট' এবং বিপুল আড়ম্বরে উদ্‌যাপিত 'বন-মহোৎসব' উপলক্ষ্যে রোপিত কিছুসংখ্যক বৃক্ষশিশু পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়া আছে, এবং সেই বৃক্ষশিশুগুলিরও অধিকাংশ রোপণের সময়ে মূল্যবান্ হস্তের জলসেচটুকুমাত্র উপভোগ করিয়া উপযুক্ত শুশ্রূষার অভাবে সুদৃঢ় বেষ্টনীর আড়ালে অকালে মরিতে বাধ্য হইয়াছে ও হইতেছে।

অন্যদিকে বহুবিঘোষিত খাদ্য সম্বন্ধে ভারতের ভবিষ্যৎ আত্মনির্ভরশীলতার অনেক স্বপ্নসুষমায় মণ্ডিত সেচ-পরিকল্পনাগুলির অসারতা এবারের ভীষণ অন্নকষ্টই নগ্নভাবে প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছে। তাহার উপর সরকারী ঔদাসীন্যবশতঃ বিদ্যুৎ-শক্তি না পাওয়ায় এই রাজ্যের সেচকার্য্যের জন্য খনিত গভীর নলকূপগুলির অর্দ্ধেকই ধরিত্রীর অন্তরে সঞ্চিত স্নেহধারায় আকাশের কার্পণ্যের প্রতিবিধান করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই। ফলে প্রায় এক লক্ষ একর উর্ব্বর ভূমি বন্ধ্যার মত পড়িয়া আছে। উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে ভবিষ্যতে আরও কত সোনা-ফলা জমি এমনই অনাবাদী হইয়া উঠিবে। আর আমরা পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম স্বাধীন দেশের মুষ্টিভিক্ষাদানের প্রয়াসেও নির্লজ্জের মত আমাদের ভিক্ষাপাত্র বাড়াইয়া ধরিতে থাকিব।

ভিক্ষা চাহিলে ভিক্ষা হয়ত মিলিবে। কিন্তু সেই ভিক্ষার সহিত পরোক্ষভাবে মিলিবে পৃথিবীর অন্যান্য পরনির্ভরশীল রাষ্ট্রগুলির মতই গৃহযুদ্ধের উস্কানি, ভিয়েতনা· ীতি বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ না করার আলাময় নির্ব্বিকারতা, চীন পরমাণবিক অস্ত্রের রক্তচক্ষু দে লেও পরমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত হওয়ার প্রয়াস করিলে ভিক্ষা-বন্ধের পরোক্ষ শাসানি, তাসখন্দ-চুক্তি অনুসারে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ কাশ্মীরের হাজিপীর গিরিবর্ত্ম পাকিস্তানকে উৎসর্গের ঔদার্য্য এবং শিয়ালকোট খণ্ডে ভারতের পবিত্র ছত্রিশ একর জমি বিনা প্রতিবাদে ত্যাগ করার নির্বীর্য্যতা—অযাচিত অথচ অপরিহার্য্য এমন আরও অনেক দান। আর সেই পথেই আসিবে ভিখারীর সন্তানের বড়লোক 'ফ্যাশন' অনুকরণ করার মতই বিদেশী সংস্কৃতির কদর্য্য দিকগুলির অন্ধ অনুকরণের প্রবৃত্তি।

আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে আমাদের ঋষি আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন— "অন্নে জানিস মন বয়, অন্ন-মাফিক প্রবৃত্তি হয়।" বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করিয়া বাঁচিতে হইলে আমাদিগকে মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন খাদ্যের দিক হইতে স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীলতা লাভ করিতেই হইবে। আকাশের মেঘকে আকর্ষণ করিবার জন্য যথাসম্ভব শ্যামল কাজল-আঁখি 'বনরাজি-নীলা'র যথোচিত রূপসজ্জার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সেই সঙ্গে মানুষের হস্তে বিধাতার দান বিজ্ঞানের সাহায্যে সেচ-পরিকল্পনাগুলিকে সর্ব্বপ্রযত্নে সফল করিয়া তুলিয়া আদর্শনিষ্ঠ শ্রমসুখপ্রিয়তায় 'প্রকৃত' হইয়া প্রকৃতিকে অকৃপণ করিয়া তুলিতে হইবে। তবেই আমরা দুনিয়া জোড়া ভিক্ষাদানে উদ্যত হাতগুলির বেড়াজাল হইতে মুক্তি পাইয়া সাহস করিয়া ভিক্ষাপাত্রটি ভাঙিয়া ফেলিতে পারিব। আবার ভারতমাতার সেই স্নেহমধুর অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি দু'চোখ ভরিয়া দেখিবার আশা করিতে পারিব, যে মূর্ত্তি ঘেরিয়া পুনরায় বন্দনা-গান উঠিবে, "চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন।"

বিশ্ব-বন্দিতা

শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বরণীয়া দেবী মনোমোহিনী ; স্মরণীয়া
রবে যুগযুগান্তে সবাকার চিত্তমাঝে ;
অতুলনীয় কীর্তি নিয়ে তুমি অদ্বিতীয়া,
লহ মোর প্রণাম জননী সকাল-সাঁঝে।
পরমপিতা অনুকূলে তব স্বরূপ ;
লভেছ চরম মানুষের দিব্য-ঝলকে,
নারীকুল শ্রেয়সী মাতঃ ; তব অপরূপ
মহিমা শুনেছি বিবর্জিত মর্ত্যলোকে।

ধর্ম-নিষ্ঠ সুকোমল-হৃদয়া জননীরে ;
পরীর মতো নর-নারী সবে অগ্রণীরে
আপন করেছে ব্যথা ; পেয়ে অমৃতসুধা
মহীয়সী মায়ের স্নেহে মিটায়েছে ক্ষুধা।

অন্যায় প্রতিকারে ছিল শাসন দুর্বার ;
আয়ত চোখে বিজলী জ্বলেছে অনিবার,
শান্তি বিরাজিতে সুকঠিন বজ্রনির্ঘোষে ;
কতো প্রাণ ধন্য হয়েছে পদপ্রান্তে এসে।

দূর বিবরের অখ্যাত পল্লী পাবনায় ;
তোমার স্মৃতি জড়িয়ে তৃণ-গুল্ম-লতায়,
সেথা আজো আলোক-বাতাস খুঁজিছে তাঁরে ;
বিধাতা-জননী লাগি' মূর্চ্ছনা বীণাতারে।
বীরভোগ্যা গরীয়সী মাতা মনোমোহিনী ;
কি যাদুমন্ত্রে নারীজন্ম সার্থক তোমার,
মরুভূমে জীবনালেখ্য পূত মন্দাকিনী
সম ; প্রণাম জানাই সবে বারংবার।

আসন্ন যুগের মানুষ

শ্রীহিরণ্ময় মুন্সী

হে আসন্ন যুগের মানুষ!
কথা কও! বাড়াও দুহাত বজ্রমুষ্টি!
ভেঙে দাও একটি আঘাতে যতো পথের বাধা,
ভেঙে চুরে পথ করে দাও!
নির্লজ্জ রাত্রির অন্ধকার,
ভীরুতার অবসাদ গ্লানি,
দুঃসহ স্পর্দ্ধায় যাহা দাঁড়ায়েছে মাথা উঁচু ক'রি।
তোমাদের আঁখির আগুনে
মুহূর্তে উঠুক জ্বলি—বারুদের মতো,
সহস্র শিখায়।

এলো যে আহ্বান।
দিলো ডাক-রুদ্র ভয়ংকর মহাকাল ;
জীর্ণ পৃথিবীর বুকে নূতনের জয়পদক্ষেপে—
ধূসর ধূলির পথে জাগুক বিপ্লব
জ্যোতিষ্মান্! অগ্নিধ্বজা-ধারী!
তোমরা তার অগ্র-দূত :
তোমাদের জয়নাদ কণ্ঠে আমাদের
আজ শুধু উচ্চারিতে চাই,
এ আসন্ন যুগে : বজ্র কণ্ঠে।

অভিসার

শ্রীঅমূল্যচরণ মাইতি

কত যুগ হ'তে অভিসার মোর—আমি চির অভিসারে,
গহন-পাথার দুর্গম ভেদি আমি চির বিস্ময়—
চির চঞ্চল, অজর, অমর, মিলনের পারাবারে,
চলেছি কেবল—আলোর নেশায়—কত নিশি করি জয়।

অনন্ত স্রোতে আমি উচ্ছল—আমি কামনার ঢেউ :
কে জানে আমার পরিণতি কোথা আমি চির দুর্বার—
ঘটে ঘটে আমি অমৃতের শিখা—তবুও বোঝে না কেউ।
আমি যে পরম, আমি নিশ্চিন্ত—আমি সৃষ্টির সার।

আমি মধুময়,—ধূলি-ধূসরিত সংসার-মরুমাঝে—
স্বার্থ নিগড়ে পড়ে কভু কাঁদি, কভু হাসি একাকিনী—
পুণ্য পাপের হিসাব নিকাশে চলি ভেবে সারা সাঁঝে,
হেলায় খেলায় দিন হ'ল ভোর—আমি যেন বিরহিণী।

আমি হরিণীর চকিত চরণে ফিরি বনকান্তারে,
আমি দুরাশার দূরপানে ছুটি বলাকা অসীম নীলে—
আমি তটিনীর কলগানে হাসি, ভাসি নয়নের নীরে—
আমি বনফুল, পূজা হয়ে লুটি' দেবতা-চরণতলে।

গীতার্থ-সন্ধানে

—শ্রীখগেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত

—দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—

(পূর্বানুবৃত্তি)

অধিভূত, অধিযজ্ঞ, অধিদৈব, অধ্যাত্ম, অখিল কর্ম ও সদগতি-রহস্য

সামগ্রিক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যেমন সৃষ্টিকে জানিতে হয়, তেমনি সৃষ্টির আদি কারণ ব্রহ্মবস্তুর সহিত উহার সম্বন্ধ কিরূপ, সেই সনাতন ব্রহ্মবস্তুটীর স্বরূপ কি এবং তাঁহার কর্মই বা কি প্রকার তাহাও বিস্তৃতভাবে জানিতে হয়। ব্রহ্মবস্তুকে জানিতে হইলে সৃষ্টিতে তাঁহার বিভিন্ন প্রকাশের সহিত পরিচয় লাভ করা প্রয়োজন। সৃষ্টিতে তিনি বহুভাবে প্রকাশিত। অধিভূত, অধিযজ্ঞ, অধিদৈব, অধ্যাত্ম ইত্যাদি ব্রহ্মের বিভিন্ন ভাব বা প্রকাশ। এই সকল ভাবের বিষয় আমরা গীতার সপ্তম অধ্যায়ে শুনিয়াছি।

অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জুন ঐ সকল বিষয়ে জিজ্ঞাসা উপস্থিত করিলেন। প্রশ্ন করিলেন—সনাতন ব্রহ্মবস্তু কি, অধ্যাত্ম কাহাকে বলে, অধিভূত কি, অধিদৈব কাহাকে বলে আর অধিযজ্ঞই বা কি; কর্ম কাহাকে বলে এবং মৃত্যুকালে সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণ তোমাকে কি ভাবে জানিয়া থাকেন তাহা পরিষ্কার করিয়া বল। অর্জুনের এই সাতটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান যাহা বলিলেন, একণে তাহাই আমরা আলোচনা করিব।

ব্রহ্মবস্তু কি এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—"অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্" (৮।৩) —যিনি পরম অক্ষর, সম্পূর্ণভাবে ক্ষরণহীন; কোন অবস্থাতেই যাঁহার পরিবর্তন নাই, সেই পরম অক্ষরস্বরূপই 'ব্রহ্ম'। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য সমস্ত বস্তু ক্ষর, পরিবর্তনশীল; আজ আছে, কাল নাই বা পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু ব্রহ্মবস্তু যাহা ছিলেন তাহাই আছেন, আর তাহাই থাকিবেন। তিনি সর্বকালে, সর্বাবস্থায় সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয়। এইরূপ বস্তু একটী ভিন্ন আর নাই; তাঁহার দ্বিতীয় কেহ নাই—তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

অধ্যাত্ম কি এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন:—"স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে" (৮।৩)। ব্রহ্মবস্তু নির্বিশেষ সত্তা। কিন্তু সৃষ্টিতে তাঁহার একটী সবিশেষ ভাব বা প্রকাশ আছে। এই সবিশেষ ভাব স্বীকার করিয়া তিনি সৃষ্টিতে প্রতি জীবদেহে আত্মারূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। সৃষ্টিতে ইহাই তাঁহার 'স্ব-ভাব' বা স্বকীয় স্ফূর্তি, উৎপত্তি বা বিশেষ প্রকাশ। আত্মারূপে প্রকাশিত ব্রহ্মবস্তুর এই ভাবকে তাঁহার 'অধ্যাত্ম' ভাব বলা হয়। এইভাবে তিনি বিশ্বাত্মা; এক বিরাট আত্মসত্তা। এই এক বিরাট আত্মসত্তাই আবার প্রতি জীবে পৃথক্ পৃথক্ আত্মারূপে বিরাজ করেন—"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ" (১০।১০)। এক অখণ্ড আত্মবস্তু হইয়াও তিনি প্রতি জীবদেহে খণ্ডিতবৎ অবস্থান করেন "অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্" (১৩।১৭)। সৃষ্টিতে ব্রহ্মসত্তা যে ভাবে আত্মরূপে অবস্থান করিয়া জীবজগৎকে ধারণ করিতেছেন তাহাই ব্রহ্মের 'অধ্যাত্ম' ভাব। এই বিরাট আত্ম-সত্তাকেই পঞ্চদশ অধ্যায়ে 'অক্ষর পুরুষ' বলা হইয়াছে।

সৃষ্ট পদার্থ মাত্রকেই 'ভূত' বলা হয়। পরিদৃশ্যমান এই জগৎ সংসারই 'ভূত' শব্দবাচ্য। ব্রহ্মবস্তুই এক বিশেষ ভাব লইয়া এই জগৎরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন। তাঁহার এই ভাবকেই 'অধিভূত' ভাব বলা হইয়াছে। ভূতরূপেই তাহার এই ভাবের প্রকাশ। ব্রহ্ম স্বয়ং অপরিবর্তনীয় হইলেও তাঁহার এই বিশেষ ভাবটী মায়াশক্তির প্রভাবে নিয়ত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীল ভূত ভাবকেই 'অধিভূত' বলা হইয়াছে—"অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ" (৮।৪)। ব্রহ্মের এই ক্ষর বা পরিবর্তনশীল ভাব বা প্রকাশকে পঞ্চদশ অধ্যায়ে 'ক্ষর পুরুষ' বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মাত্ম যে ভাব লইয়া বিরাট জগৎরূপ দেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া 'পুরুষ' রূপে বিরাজ করেন, যে তেজোময় ভাব লইয়া তিনি পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ইত্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণেরও অধিপতিরূপে বিরাজ করেন; যে ভাবযুক্ত হইয়া তিনি সমগ্র সৃষ্টিতে, স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অন্তর্যামীরূপে প্রত্যেককে ধারণ, পোষণ ও নিয়ন্ত্রণ করেন, ব্রহ্মের সেই ভাবকে 'অধিদৈবত' ভাব বলা হয়। বিশ্বজগতের অন্তর্যামী ও নিয়ন্তা, সকল তেজ ও শক্তির উৎস সেই পুরুষই অধিদৈবত—"পুরুষশ্চাধিদৈবতম্" (৮।৪)।

জীবের সমস্ত জীবন ভরিয়া যে জৈব-ক্রিয়া নিয়ত চলিতে থাকে—যাহাদ্বারা দেহের ধারণ, পোষণ, রক্ষণ ও পতন হয় তাহাকে জীবন-যজ্ঞ বলা যাইতে পারে। কর্মকেই যজ্ঞ বলা হয়। জীবদেহে যে যজ্ঞ বা কর্ম নিয়ত নির্বাহ হইতেছে এবং জীব যে সকল কর্ম করিতেছে; ব্রহ্মবস্তুই অন্তর্যামী-

রূপে তত্ত্বাবত্তের প্রবর্তক। তিনিই এক বিশেষ ভাবযুক্ত অবস্থায় ঐ সকল কর্মের প্রেরণা দিতেছেন এবং তাঁহার শক্তিবলেই উহা নিষ্পন্ন হইতেছে। ঐ ভাবযুক্ত অবস্থায় তিনিই সকল কর্মের বা যজ্ঞের প্রবর্তক ও অধিষ্ঠাতা। ব্রহ্মবস্তুই অধিযজ্ঞরূপে জীবনের সমস্ত কর্মের প্রেরণা দিতেছেন ও উহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। ব্যষ্টিদেহের অন্তর্যামী ও নিয়ামক এই পুরুষকে অধিযজ্ঞ বলা হইয়াছে—"অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর" (৮।৪)। প্রতিদেহে আমিই অধিযজ্ঞরূপে বিরাজ করি।

কর্ম কি ? এই প্রশ্নে অর্জুন সপ্তম অধ্যায়ের ২৯ শ্লোকে বর্ণিত 'অখিল কর্মে'র কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের নবম শ্লোকে যে 'দিব্য-কর্মে'র উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাই এই 'অখিল কর্ম'। এই অখিল কর্ম-তত্ত্ব জানিলে জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে—

"জন্মকর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি
তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি
সোঽর্জুন ॥" (৪।৯)

অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলিলেন—"ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ" (৮।৩)। 'বিসর্গ' শব্দের অর্থ বিশেষ সৃষ্টি অথবা বিসর্জন বা ত্যাগ। অব্যক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্মে যখন সৃষ্টির ইচ্ছা জাগিল তখন তিনি মায়াশক্তিবলে নিজ নির্বিশেষ রূপকে বিসর্জন দিয়া বা সম্বরণ করিয়া সবিশেষ জীবজগৎরূপে প্রকাশিত হইলেন। তিনিই ভূতভাব গ্রহণ করিয়া জীব হইলেন। এই যে ভূতভাব উদ্ভবকারী বিশেষ সৃষ্টি বা বিসর্জনমূলক কর্ম ইহাই ভগবানের দিব্যকর্ম। এই কর্মদ্বারা তিনিই স্বয়ং সমগ্র জীবজগৎ-রূপে প্রকাশিত হইলেন। পরিদৃশ্যমান জগতে আমরা যাহা কিছু দেখি তাহা যে সেই ব্রহ্মবস্তুরই বিভিন্নরূপ, কর্ম-তত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিবার ফলেই এই ধারণা সম্ভব হইয়া থাকে।

অর্জুনের শেষ প্রশ্ন—প্রয়াণকালে সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণ তোমাকে কিভাবে জানিয়া থাকেন ? উত্তরে বলিতেছেন :—

"অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা
কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র
সংশয়ঃ ॥" (৮।৫)

অন্তিম সময়ে আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করিতে পারেন, তিনি মদ্ভাব বা ব্রহ্মভাব লাভ করেন সন্দেহ নাই। বলিতেছেন এই নিয়ম যে শুধু আমার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য তাহা নহে ; সর্বক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য ; প্রকৃতির নিয়মই এই।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে
কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা
তদ্ভাবভাবিতঃ ॥" (৮।৬)

ভালমন্দ যাহাই হউক না কেন, মৃত্যুকালে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে জীব দেহত্যাগ করে, পরবর্তী জীবনে সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। ইহা প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম। এই নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। সুতরাং আমাকে স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলে যে আমার ভাব প্রাপ্ত হইবে ইহাও প্রকৃতির সাধারণ নিয়মেরই ফল।

এই উক্তি হইতে ধারণা হইতে পারে যে জীবন ভরিয়া ভালমন্দ যে ভাব লইয়াই কাটাই না কেন, মৃত্যু-কালে একবার ভগবানকে স্মরণ করিতে পারিলেই তো মুক্তিলাভ হইবে—তবে আর সমস্ত জীবন ভরিয়া এত সাধন-ভজনের প্রয়োজন কি ? মৃত্যুকালে ভগবানকে স্মরণ করা আপাতদৃষ্টিতে যত সহজ মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে উহা তত সহজ নহে। আজীবন পাপকর্মা ব্যক্তি মৃত্যুকালে ভগবানকে স্মরণ করিতে পারে না। যে বিষয়চিন্তা করিয়া সমস্ত জীবন অতিবাহিত হইয়াছে, মৃত্যুকালে সেই বিষয়চিন্তাই জোর করিয়া মনকে অধিকার করে ; আত্মীয়-বন্ধুগণ তখন কানের কাছে হরিনাম করিলেও তাহা চিত্তকে স্পর্শ করে না। মৃত্যুকালে চিত্ত সাধারণতঃই ব্যাকুলিত হয়—চিত্রগুপ্তের খাতা তখন চক্ষুর সম্মুখে খুলিয়া যায়। জীব জীবন ভরিয়া যাহা কিছু কর্ম করে তাহা সমস্তই তাহার চিত্তে কিছু না কিছু রেখাপাত করিয়া থাকে এবং কোন না কোনরূপে উহাকে প্রভাবান্বিত করে। যদিও কালক্রমে সেই কর্মের বিষয় জীব ভুলিয়া যায় তথাপি উহা চিত্তে যে রেখাপাত করিয়াছিল, যে চিত্র উহাতে অঙ্কিত করিয়াছিল, তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না ; চিত্তের অবচেতন ভূমিতে উহা গুপ্ত অবস্থায় থাকে মাত্র। ইহাই চিত্রগুপ্তের খাতা। সময় সুযোগ পাইলেই সেই গুপ্ত চিত্র চেতনভূমিতে দেখা দেয়, জীবের স্মৃতিপথে উদিত হয়। মৃত্যুকালে চিত্তের এই গুপ্ত চিত্র সকল রূপ ধারণ করিয়া মানসপটে উদিত হয়। যে ব্যক্তি সমস্ত জীবন ভরিয়া কুকর্ম করিয়া আসিয়াছে, মৃত্যুকালে তাহার স্মৃতিপটে সেই কুকর্ম সকল ভয়াবহ মূর্তিতে প্রকট হইয়া থাকে। এই অবস্থায় ভয়বিহ্বল, উদ্বেলিত চিত্তে ভগবৎ স্মরণ সম্ভব হয় না। চিরজীবন অন্যায়, অধর্ম, পাপাচরণ করিয়া মৃত্যুকালে কোন ব্যক্তি ভগবৎ-চিন্তাপরায়ণ হইতে পারে না—প্রকৃতির নিয়ম ইহা নহে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন "মূলো খেলে মূলোর ঢেকুরই ওঠে"—

নিয়ের প্রশ্ন ওঠে না। যিনি সদা ভগবৎ-চিন্তাপরায়ণ হইয়া জীবন যাপন করেন, ভগবানের সেবাবুদ্ধিতে নিজ নিঃস্বার্থভাবে সম্পাদন করিয়া যান, যিনি সর্বজীবে, সর্বভাবে, সর্বকর্মে ভগবানকেই দেখিয়া থাকেন; যাহার মনবুদ্ধি সর্বদা ভগবানেই যুক্ত, মৃত্যুকালে তাঁহার পক্ষেই ভগবৎ-স্মরণ সম্ভব ও স্বাভাবিক। কারণ তিনি "সদা তদ্ভাবভাবিতঃ" (৮।৬), সর্বদা ভগদ্ভাবেই ভাবিত।

গীতার সপ্তম অধ্যায়ের শেষ মন্ত্রে আমরা শুনিয়াছি ব্রহ্মের অধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিযজ্ঞ, অধিদৈবত ইত্যাদি ভাবের সহিত যিনি পরিচিত, তিনি মৃত্যুকালে ব্যাকুলিত-চিত্ত অবস্থায়ও উহা হইতে চ্যুত হন না। সর্বদা, সর্ববিষয়ে ও সর্বকার্যে তিনি ব্রহ্ম-বস্তুরই বিভিন্নভাব দেখিতে পান। যাহা কিছু তাঁহার জ্ঞানের বিষয় হয়, সমস্তই ভগবদ্বস্তুর বিভিন্ন ভাব ও প্রকাশ বলিয়া তাঁহার উপলব্ধি হয়। তিনি সর্বদা সেই সকল ভাবে ভাবিত "সদা ত দ্ভা ব ভা বি তঃ" থাকেন। সুতরাং মৃত্যুকালেও তিনি ভগবৎ-চিন্তা করিতে করিতেই প্রাণত্যাগ করেন। ফলে তিনি মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন ইহাতে সন্দেহ নাই। তাই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—যদি সদ্গতি লাভ করিতে চাও, তবে যে উপায়েই হউক সর্বদা আমাকে স্মরণ কর :—

"তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ" (৮।৭)। সর্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার নির্দিষ্ট কর্তব্যকর্মও করিয়া যাও। আমাকে কখনও ভুলিও না আর তোমার কর্তব্যকর্মও ত্যাগ করিও না।

সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিয়া কেবল ভগবৎচিন্তা-পরায়ণ হইয়া থাকিতে গীতা উপদেশ দেন নাই। গীতা বলিতেছেন—তোমার জন্য যে কর্ম নির্দিষ্ট রহিয়াছে, যে কর্ম তোমার প্রকৃতিগত, তাহা তোমাকে করিতেই হইবে। তোমার সেই কর্মদ্বারা তুমি ভগবৎপ্রবর্তিত এই জগৎচক্র পরি-চালনে একটী ক্ষুদ্র অংশ সম্পাদন করিতেছ মাত্র—এইরূপ বুদ্ধি লইয়া কর্ম করিয়া যাও। ভগবৎসেবা বুদ্ধিতে তোমার জন্য নির্দিষ্ট ভগবৎকার্য নিঃস্বার্থভাবে সম্পন্ন করাই তোমার কর্তব্য। এইরূপ বুদ্ধি লইয়া কার্য করিলে তুমি আমাকেও স্বভাবতঃই স্মরণে রাখিবে। এই অবস্থায় তোমার চিত্ত সর্বদা আমার ভাবনায় ভাবিত থাকা হেতু, "সদা তদ্ভাবভাবিতঃ" থাকা হেতু অন্তকালে তুমি স্বাভাবিকভাবেই আমার চিন্তাপরায়ণ হইতে পারিবে। ফলে তোমার মুক্তিলাভ সুনিশ্চিত। মৃত্যুকালে কিভাবে এই চিন্তা করিতে হইবে তাহা নির্দেশ করিতে যাইয়া বলিতেছেন :—

"প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।"
(৮।১০)

অন্তকালে একান্ত ভক্তিযুক্ত চিত্তে, ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে সমস্ত মনপ্রাণকে স্থির করিয়া তথায় পরমপুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলে সেই দিব্য বা জ্যোতির্ময় পুরুষ, যাহা হইতে সমস্ত সৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাকে প্রাপ্ত করা যায়। অনন্যাভক্তি অবলম্বনেই ইহা সম্ভব হইয়া থাকে—"ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া" (৮।২২)। এই লাভই মানুষের চরম লাভ, মনুষ্যজীবনকে ইহাই সার্থকতামণ্ডিত করে। এই লাভেই মনুষ্যজীবন ধন্য, কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকে।

"মুসলমানগণ জগতের সকল মহাজনকেই—তাহা তিনি যে যুগের ও যে দেশেরই হউন না কেন—ভক্তি করিয়া থাকেন, ধর্মতঃ তাহারা ঐরূপ করিতে বাধ্য; এই প্রকার বিশ্বাস তাহার ঈমানের অংশ—এস্লামের বীজমন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত; অন্যথায় কেহ মুসলমান হইতে ও থাকিতে পারে না।"

—"মোস্তাফা চরিত," ৪৪৩ পৃঃ।

দিন সে ভয়ঙ্কর

-শ্রীসুধীরকুমার বসু

শৈশবে নিভৃত পল্লীর অনাবিল শান্ত পরিবেশে অপরিসীম স্নেহের প্রতিমূর্তি ঠাকুমা'র স্নিগ্ধ ক্রোড়ে বসে একটা উপকথা শুনেছিলাম—শিশুমনের অপূর্ব আনন্দদায়ক সেই কাল্পনিক উপকথাটির গহনে এমন সুক্ষ্ম সুদূরপ্রসারী লোকচরিত্রের তথ্যে নির্ভেজাল সত্যকথাটি সুপ্ত ছিল—তা' স্বপ্নেও ভাবিনি।

ঠাকুমা বলছিলেন যে রাজার দুলালী পরম সোহাগী রাজকন্যার আবদারে রাজার অকাট্য আদেশ বিশিষ্ট প্রভাবশালী অমাত্যদের উপর জারী করা হ'ল যে পরবর্তী রাত্রিশেষে সকলেই যেন রাজ-অন্তঃপুরে নতুন খোদিত পুকুরে এক-এক কলসী দুধ ঢেলে দিয়ে যান—সকালবেলায় রাজকুমারী দুধের পুকুরে তার নিত্য-আরাধ্য শিবঠাকুরকে স্নান করিয়ে পরিতুষ্ট হ'তে চান। কোটাল পুরী-মধ্যে কাড়া-নাকাড়া বাদ্যসহকারে পরিভ্রমণ ক'রে বজ্র-নির্ঘোষে এই নির্দেশ প্রচার করল এবং রাজাজ্ঞা অমান্যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা—সে-কথাও ঘোষণা করল।

রাত্রির তৃতীয় যাম থেকে কলসী-কলসী দুধ এনে নির্দিষ্ট পুকুরে ঢালা হবার কথা। প্রত্যেকেই ভাবতে লাগল যে, অন্য সকলেই তো বিশুদ্ধ দুধ রাজার পুকুরে ঢালবে; সুতরাং আমি যদি অত দুধের মধ্যে এক কলসী জল ফেলে আসি রাত্রের অন্ধকারে—কেউ টের পাবে না। ফলে, শুধু জলই ঢালা হল পুকুরে—এবং সকালে রাজা ও রাজকন্যা তাদের সাধের দুধের পুকুরের এই শোচনীয় পরিণামের কথা শুনে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন।

উত্তরকালে বয়স্ক হয়ে বহু দয়া-দাক্ষিণ্য এবং সদ্ব্যবহারের দ্বারা গয়লা-বৌএর হৃদয় জয় করে যখন তাকে কাকুতি করে অনুরোধ করলাম—বিশুদ্ধ দুধের জোগান দিয়ে আমাদের উপকৃত করতে, তখন সে সবিনয়ে অন্তরতম গুহ্য কথাটি নিবেদন করল—দাদাবাবু, অমন কথা বলবেন না। দুধ-বেচা আমাদের জাত-ব্যাপ্সা আর সেই ব্যাপ্সায় ধর্মের দোহাই দিয়ে—মা-ঠাকুমা বলে গেছে—একটু-না-একটু জল মেশাতেই। জল না মিশিয়ে দুধ বিক্রী করলে অমঙ্গল হবেই হবে।

সুতরাং এই অকর্মটি দীর্ঘকাল পুরুষানুক্রমিক ধারায় এমন অপরিহার্য-রূপে চলে আসছে যে এটা একটা সুপ্রতিষ্ঠ ধর্মাচরণের মর্যাদা লাভ ক'রে সমাজের বুকে নিমগ্ন হ'য়ে বসে আছে। দুধে জল মেশানো থেকেই মনে হয়, এই প্রবঞ্চনামূলক মিশ্রণ-শিল্পের প্রথম উদ্ভাবন!

তারপর ধীরে ধীরে তেল-ঘি-মাখনে, মধুতে, আটা-ময়দায়, চাল-ডালে, সোনা-রূপায়, ওষুধ-পত্রে, বস্ত্র-বয়নে, গৃহনির্মাণেও এই অবৈধ মিশ্রণ-শিল্পের জয়-যাত্রা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলতে লাগল। এমন কি, সরকারী বহুব্যয়সাধ্য উচ্চ-প্রশংসিত প্রকল্পগুলি পর্যন্ত তথাকথিত মিশ্রণ-শিল্পের অর্থাৎ ভেজালের দৌরাত্ম্যে বানচাল অথবা অসার্থক হ'তে বসেছে। আজকার এই দুর্মূল্যের ও দুষ্প্রাপ্যের দিনে মানুষের প্রধান অপরিহার্য খাদ্যবস্তুতে, এমন কি, শিশুপথ্যে ও ঔষধপত্রে এই যে নির্বিচার, নৃশংস ও অমানুষিক ভেজালের প্রাদুর্ভাব—তার ফল যে কী সাংঘাতিক—সেকথা ভাবতেও অন্তরাত্মা শিহরিত হয়। শুধু কি বস্তু-জগতেই এই ভেজাল কর্মটি সীমাবদ্ধ? কক্ষনো নয়, চিন্তারাজ্যেও এর আক্রমণ ও আধিপত্য আজ সুস্পষ্ট। জড় দ্রব্যে ভেজাল হ'তে পারে না যদি পূর্বে কোন জন-মানসে তা চিন্তারূপে অধিষ্ঠিত না হয়। মানুষের মন ও তাই আজ এই বিপদ-সঙ্কুল, প্রবঞ্চনা-মূলক, অপরূপকে অতিরিক্ত মুনাফা-শিকারী ভেজাল-কর্মে ও তার প্রতিরোধে সর্বদা পঙ্কিল ও আতঙ্কিত হয়ে আছে। শান্তিময়, স্বাস্থ্যকর, মলয় বাতাস আজ মানুষের মনের আকাশ থেকে নির্বাসিত। সন্দেহ, অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা তার মনকে সদা আবিল ও আবিষ্ট করে রেখেছে। সুস্থ, শুভ ও আনন্দদায়ক চিন্তা কি কখনো সেই সদা-সন্ত্রস্ত, ক্লিষ্ট, নিষ্পিষ্ট মনে উঁকি দিতে পারে? এই ত মনের অবস্থা! দেহের অবস্থা আরো সঙ্গীন! অখাদ্যে মানুষ দিন-দিন ক্ষীণ, দুর্বল, অবসন্ন ও অকর্মণ্য হ'য়ে যাচ্ছে, কুখাদ্যে ব্যাধিগ্রস্ত, রোগজর্জর এবং ভেজাল ওষুধের কল্যাণে তার নিরাময়তা অলীক কল্পনায় পর্যবসিত। অনাস্থা, অনীহা, নৈরাশ্য ও নৈরাজ্য তাই আজ তাকে পেয়ে বসেছে—এ অবস্থায় তার পক্ষে অকরণীয় কিছুই নেই, থাকতেও পারে না। যে নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে—মরণের বাড়া গাল নেই—তার কাছে

কোন কর্মই অকর্ম নয়। ক্ষণিকের খুশির জন্য, খাস ফেলবার সাধারণতম আরামের খাতিরে সে জঘন্যতম কাজ করতেও এতটুকু বিচলিত হবে না। ভেজালের এই বৈজয়ন্তীতে আবার যুক্ত হয়েছে—ভেজাল-বিবাহ। যা'তে ভাবীকালের শিশুরা এই অমোঘ অকল্যাণ শিল্পের সহজাত সংস্কার নিয়েই জন্মায়। তাকে আর কষ্ট করে শিখতে হবে না—সে স্বভাব-ধর্মেই হবে কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক ও কুলাঙ্গার—born-treacherous—ফলে born-criminal এবং villain-incarnate! ভেজাল-বিবাহ শুনে আশ্চর্য হবার কিছু নেই incompatible marriage মাত্রই ভেজাল-বিবাহ। কার্য-কারণের অমোঘ শৃঙ্খলায় বিধৃত হয়ে চলেছে এই বিশ্ব-জগৎ। সত্ত্বগুণ না জানলেও, কার্য্যের ফলাফলে অনভিজ্ঞ হলেও, কর্মফল থেকে অব্যাহতি নেই। সুতরাং বিশুদ্ধ বিবাহ বা compatible marriage কি এবং কেমন করে তা সংঘটিত হতে পারে সে-বিষয়ে অজ্ঞানতার দ্বারা তার প্রত্যবায়ের বিষময় দুর্ভোগ থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না। তাই তো সকল সভ্যদেশে বর্ণ-সঙ্কর বা bastard child-দের প্রতি এত ঘৃণা ও অবজ্ঞা। কারণ তারা স্বাভাবিক কারণে আত্মমর্যাদা-জ্ঞানশূন্য এবং পিতৃপুরুষের গরিমা-বোধ-রহিত, অন্য কথায়, বংশের ঐতিহ্য-গৌরব তার চেতনায় স্থান পায় না। সুষ্ঠু, সুষম, আনন্দ-প্রোজ্জ্বল, আদর্শ-নিষ্ঠ, প্রীতি-বলিষ্ঠ বিবাহের একটিমাত্র সুপুষ্ট সার্থক ফলে পৃথিবীর যা কল্যাণ সাধিত হয়—তা' বিস্ময়কর। বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে ক্রমিক-ধারায় এতগুলি মহাপ্রাণ, বীর্যবান, লোক-কল্যাণকৃৎ পূত-চরিত্র অক্লান্ত-কর্মী, জীবন্ত-আদর্শ-নিষ্ঠ মনীষিগণের দলে-দলে আবির্ভাব ঘটেছিল—সেটা নিছক প্রাকৃতিক খেয়াল নয়। তার পিছনে রয়েছে ঋষির দূরদর্শন, প্রাজ্ঞ সমাজ-ব্যবস্থা, নিষ্ঠা-নন্দিত সুষ্ঠু বিবাহ-ব্যবস্থা। "ঋষি" শব্দ শুনে ঘাব্‌ড়ে যাবার কিছু নেই। ঋষি তিনিই—যিনি ঋদ্ধির পথ—সম্যক্ বৃদ্ধির পথ, harmonious growth and development-এর পথ—সমৃদ্ধির পথ—তাঁর স্বচ্ছ, সমাহিত, সুদীর্ঘ-দৃষ্টির দ্বারা সুস্পষ্ট দেখতে পান। আর, সেইসব তত্ত্বাত্মাকে আবাহন, ধারণ ও পোষণ করার মত পবিত্র বেদী ছিল—তেমনতর জনক-জননী ছিলেন সমাজে।

'এক বাস্তু'—আরো একটু তলিয়ে দেখতে হবে। যে সর্ষে দিয়ে ভূত ছাড়াতে হবে, সেই সর্ষের মধ্যে গিয়ে ভূত বাসা বাঁধলে ভূত আর ছাড়াবে কে? যে মননশীলতায় ও কর্মিষ্ঠতায় মানুষের মঙ্গল নিহিত—তাই ই যে আজ ভেজালে আ'বিল ও মহা অনিষ্টকর। 'ভাষা'র সংজ্ঞা ছিল তাই, যা' মানুষের মনের ভাবকে প্রকাশ করে। আজ যেন সে-সংজ্ঞা আর নেই, মানুষের মনের ভাব বা চিন্তাকে ভাষা দিয়ে সংগোপন রাখাই এখন ভাষার কাজ। Face is the index of the mind—সে কথাও উল্টে পাল্টে যাচ্ছে—। ভাষার চাতুর্য ও ঐশ্বর্য সেখানে—মনের আসল ভাব যেখানে সম্পূর্ণ অবগুণ্ঠিত। শঠ, ধাপ্পাবাজ, জালিয়াৎ লোকেরা আজ এমন নিষ্কলুষ, অতিভদ্র, সদাপ্রসন্ন এবং সাত্ত্বিকতায়-দীপ্ত মুখমণ্ডল (প্রসাধন প্রভাবে ও মনের জোরে) করে রাখে যাতে হাজার-হাজার লোক প্রবঞ্চিত ও প্রতারিত হচ্ছে অহর্নিশ। —আবার 'ভাষা' যে সকল শব্দ-সম্ভারে গঠিত হয়, সেই 'শব্দ'গুলির অর্থও আজ ভেজালের অপব্যবহারে বিকৃত হয়ে গেছে এবং সেইজন্য তরুণ শিক্ষার্থীদের মনে আজ বিকৃত ভাষার মাধ্যমে বিকৃত ভাবধারা এবং তদনুযায়ী অকল্যাণকর আদর্শ গড়ে উঠছে। মননশীলতার বা চিন্তার বাহন হ'ল ভাষা, আবার ভাষার উপাদান হ'ল শব্দ-নিচয়। শব্দের অর্থ সুনির্দিষ্ট, সুসীমিত এবং সুগঠিত না হলে এবং একটি সুস্পষ্ট, নিটোল অর্থ বহন না করলে ভাষা ঠিক শুদ্ধ অর্থবোধক হবে না এবং চিন্তাও তদনুযায়ী বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন ও ভাসা-ভাসা হতে বাধ্য। মরমী কবির মরমী কণ্ঠে এই মর্মকথাটি তাই ধ্বনিত হয়েছে—'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।' আর ভাবনা অনুযায়ীই ত মানুষের কর্ম অনুষ্ঠিত হয়—সেই অপরিণত, অপরিচ্ছন্ন ভাবনানুসারী কর্মও তেমনি হয়—তার না থাকে স্থির লক্ষ্য, না থাকে সত্যিকারের কল্যাণ আদর্শ। ফলে, ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্বও অস্পষ্টতায়, অপরিচ্ছন্নতায় সংশয়ের দোলায় দুলতে থাকে। অন্ধ নায়কের পক্ষে অন্ধ জনগণকে নেতৃত্ব দিয়ে অপরিসীম দুর্দশার গহ্বরে নিক্ষেপ করা ব্যতীত আর গত্যন্তর থাকে না।

আমরা আজ অগ্রসর পৃথিবীর অধিবাসী। আধুনিক সভ্যতা গর্বে এবং শিক্ষিত মনের উন্নাসিকতায় আমাদের দেহ-মন পরিপূর্ণ। কিন্তু সাম্প্রতিক বিদেশাগত এই civilisation ও education-এর সম্যক্ তাৎপর্য কি আমরা জানি? আর তদনুযায়ী আচার-আচরণ, অভ্যাস-ব্যবহারে কি আমরা আমাদের রুচিকে ও মানসিকতাকে পরিমার্জিত

করেছি? Civil শব্দটা এসেছে Greek *civik* শব্দ থেকে—যার অর্থ হ'ল 'সেবক'—civilisation মানে সেবাপ্রাণতা। যা স্বদেশ, সমাজের কল্যাণানুশাসিত সেবা করে যে মার্জিত-মানস খুশীতে, তৃপ্তিতে, উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে—তদতিরিক্ত অন্য কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশা তাকে পীড়িত বা সঙ্কুচিত করে না, সেই ত সেবক, সেই ত civilized। আর এই দায়-দায়িত্ব ও অধিকারবোধই হ'ল civic right—মঙ্গলসাধনেই তার ষোলআনা প্রাপ্তি—বেশী আর কোন বণিকসুলভ চাহিদা তার নেই। 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—সেই রাজসিক ও সাত্ত্বিক মানসচেতনা কৈ? আজ যেন গণমানস পরিবেশ ও পরিস্থিতির অব্যবস্থিত সংগঠনে কেবলমাত্র তামসিক ক্ষুদ্রতায় ও নীচতায় ভরপুর। সংস্কৃতি ও সভ্যতা তার আত্যন্তিক এই আদিম ও সহজাত চাহিদাকে কি আশানুরূপ উৎকর্ষিত ও মার্জিত করতে পেরেছে? 'বিদ্যা বিনয় দান করে'—এটা যেন একটা বিরাট পরিহাসে পরিণত। বিদ্বান্ অথচ বিনয়ী, সদ্বক্ত—এমনতর মানুষ কদাচিৎ দৃষ্ট হয় এবং মুষ্টিমেয় যারা আছেন তাঁদের সমাজে বা রাষ্ট্রে কোন স্থান নেই। অমর্যাদার অন্ধকার গুহায় থেকে থেকে তাঁদেরও মনে সন্দেহের বিষ সংক্রামিত হচ্ছে—সহজ বিনয় ও শ্রদ্ধাকে তাঁরা চারিত্রিক বা সংস্কারগত দুর্বলতা মনে করে ধিক্কার দিচ্ছেন। মানব সমাজের মঙ্গলপ্রদ সদ্‌গুণগুলি আজ লোকচক্ষে নিন্দিত ও ধিকৃত। পুঁথিগত বিদ্যা, তথাকথিত মৌলিক শিক্ষা বিদ্যার্থীর বা শিক্ষার্থীর হৃদয় মনকে স্পর্শ করে না—মার্জিত বা উন্নীত করা তো দূরের কথা। শিক্ষকের বিদ্যা ও শিক্ষার মান বা পর্যায়ও তো তার বেশী নয়;—তিনি যে শিক্ষা, যে নীতিবিধি বা উপদেশ দান করেন, তার ব্যক্তিগত জীবনে, আচরণ ও অভ্যাসে তিনি সেগুলি পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন না এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালনও করেন না। সুতরাং তার প্রচারিত উপদেশবাণীতে যে তার নিজেরই আস্থা নেই সে কথা স্বতঃই প্রমাণিত ও প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এইরূপে ক্রম-অধঃপতিত ধারায় চলেছে সমগ্র দেশের, এমন কি, সমগ্র বিশ্বের বিদ্যা-দান বা শিক্ষা-দানের প্রহসন; এর বিষময় ফল দিন দিন পুঞ্জীভূত হ'য়ে যে সর্বাত্মক ধ্বংসের মহান সোপান তৈরী হচ্ছে সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে? তথাকথিত শিক্ষিত লোকের সংখ্যা দিন দিন সর্বদেশে হু-হু ক'রে বেড়ে যাচ্ছে—কিন্তু তাতে কি চিত্তের, হৃদয়ের বা মনের কিছুমাত্র মনোরঞ্জন বা অভ্যন্তরীণ উৎকর্ষ হচ্ছে? স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি আজ সেই মনোবৃত্ত্যনুসারিণী, ছন্দানুবর্তিনী, সহধর্মিণী, সহমর্মিণী, অর্ধাঙ্গিনী, পরম মনোরম, একান্ত নিশ্ছিদ্র-নির্ভর, মধুর একাত্মবোধযুক্ত সম্পর্ক আছে? স্বামীর সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, আদর্শে নিষ্ঠাবতী, গৌরবে গৌরবান্বিতা হচ্ছেন কি আজকার স্ত্রীরা—দেহে-মনে-প্রাণে? আছে কি পিতা-পুত্রে, শিক্ষক-ছাত্রে সেই সর্বোত্তম হিতকাম এবং একাত্ম বন্ধনের সম্বন্ধ? ভ্রাতায় ভ্রাতায় সেই রাম-লক্ষ্মণ ভাব আজ আকাশ-কুসুম নয় কি? যে মানুষের ক্ষুদ্র গৃহাভ্যন্তরে এই অবস্থা—যেখানে নাড়ির টান রয়েছে, স্বার্থের এত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে,—তা সত্ত্বেও এমনতর শোচনীয় নিরানন্দময় অবস্থা—তাদের কাছে বৃহত্তর পরিবেশে বিশাল প্রেম আশা করা কি বাতুলতা নয়? যা সামান্য দেখতে পাওয়া যায়—সেখানেও তথাপি, নিগূঢ় কোন হীনস্বার্থসিদ্ধির সূক্ষ্ম কৌশলমাত্র! তাই ত দেশময়, বিশ্বময় এত বিপর্যয়,—এত অশান্তি এত বিশৃঙ্খলা,—সর্বাত্মক ধ্বংসের অনিবার্য ইঙ্গিত। সভ্য পৃথিবীর আজ চূড়ান্ত মহাসঙ্কট। ইউরোপ ও আমেরিকা—পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তৃত ভূ-খণ্ডের তথাকথিত cent per cent শিক্ষিত সমাজে আবার স্ত্রীকে 'অর্ধাঙ্গিনী' বলে খুশী হয়নি। তারা আরো সভ্য, আরো মার্জিত, আরো প্রগতিসম্পন্ন—তারা স্ত্রীকে বলেছেন 'better half' অর্থাৎ উত্তমাঙ্গ। অথচ এই উত্তমাঙ্গের সঙ্গে অধমাঙ্গের divorce অর্থাৎ বিচ্ছেদের বা ছাড়াছাড়ির বা সম্পর্কচ্যুতির দুর্ঘটনা হামেশাই ঘটে। কেন ঘটে? উত্তমাঙ্গের অভিধা দিয়ে যাকে জীবনে গ্রহণ করেছি, সে কি শুধু কথার কথা। তার মধ্যে কি প্রাণ নেই? সে কি মুখের ভাষা? তার মধ্যে কি কোন মনের ভাব, অন্তরের অনুভব নেই? মনের ভাবনা, অন্তরের অনুভূতিকে গোপন করার জন্যই কি গালভরা অভিধানের ছলনাময় অবতারণা? উত্তমাঙ্গে ও অধমাঙ্গে অবিরল অস্ত্রোপচারের অপঘাত-চিহ্ন যেখানে, প্রিয়তমার সঙ্গে প্রিয়তমের প্রীতির সম্পর্ক যেখানে পদ্ম-পত্রে নীরের মত অনিশ্চয়তার কষাঘাতে নিত্য জর্জরিত, ক্ষত-বিক্ষত—সেখানে fruit of pseudo love অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি সেই পঙ্গু দেহের এবং ভাঙা-মনের শীর্ণ অপরিপক্ক শক্তি নিয়ে এসে আর কোন্ সম্পদ্ বা সম্ভাবনা দিয়ে এই ধরাধামকে অভিনন্দিত করতে পারে? এই যৌন বৈজ্ঞানিক সত্যকে জেনে বুঝেও চোখের আড়াল করে রাখলে ত তার অনিবার্য পরিণামের কবল থেকে অব্যাহতি মিলবে না। তাই ত আজ প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার কথা

পৌষিক ইচ্ছায় মৌখিক উক্তিতে যার শোনা যায়—'এ দুনিয়ার লোক ভালবাসিতে জানে না'—ভুলে গেছে 'ভালোবাসা' কাকে বলে। ভালো বাকে বাসি, তার ভালোতেই যে আমার বস-বাস—একথা আজকের মানুষ জানে না, মানে না, অন্তরের অনুরাগে সেই উপলব্ধির অস্তিত্বও বোধ করে না। আমার ভালোবাসার জন সুখে থাক, আনন্দে থাক, জয়ে-যশে শ্রীবৃদ্ধিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠুক—এই দেখে, এই শুনে, এই জেনে আমি অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত হয়েও আনন্দে আরো উচ্ছ্বসিত ও উল্লসিত হয়ে উঠবো—অন্তরে কি আমাদের ভালোবাসার সেই স্বর্ণ-প্রদীপ জ্বলেছে? কঠোর বাস্তববাদী কেউ কেউ হয়ত বলবেন—এ হ'ল স্বর্গীয় ভালোবাসা, স্বর্গেই সম্ভব। কিন্তু সত্যি কি তাই? এমন দুর্ভাগা কে আছেন—পিতার অপত্য স্নেহে ও মাতার বাৎসল্যে এই জাতীয় ভালোবাসার সুস্পষ্ট আভাষ যার ললাটে সিদ্ধতিলক অঙ্কিত করে নি? তারাই কি একদিন রাজনীতিক নেতাদের মনোভাবকে ব্যক্ত করে বলেন নি—দেশের স্বাধীনতা যদি আসে তো আমার নেতৃত্বেই আসুক—নতুবা দেশ ছারখারে যাক? এ-কথার তাৎপর্য কি দেশপ্রেম? আমার ভালোবাসার ধনকে যদি আমি হাতের মুঠোর মধ্যে না পাই তবে তাকে acid buld ছুড়ে গুঁড়ো ক'রে দেব যাতে সে কোনদিন আর জীবনে সুখ, শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্যের মুখও দেখতে না পায়—এই হল আমাদের ভালোবাসার স্বরূপ। অর্থাৎ এটা, ভালোবাসা মোটেই নয়, রিপু-শ্রেষ্ঠ কাম 'ভালোবাসা'র মার্জিত ভদ্র নাম নিয়ে আমাকে, সমাজকে এবং বিশ্বকে প্রতারিত ও কলঙ্কিত করছে। এই জাতীয় ভালোবাসা ছাড়া যদি আর কোন নীতিশাস্ত্র-সম্মত ভালোবাসা মানুষের অন্তরতম অন্তরের বিস্তৃত পরিধির মধ্যেও ধরা না দেয়, তবে সেই নিরুপায়, অসহায়, ক্ষুদ্রশক্তি মানুষের দোষ কোথায়? দোষ তার জন্মের, দোষ তার পরিবারের, দোষ তার সমাজের, দোষ তার রাষ্ট্রের। অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে—ভগবানের রুদ্ররোষ উভয়কেই তৃণসম দহে। তাই ত বলি—ক্ষুদ্র আত্মসুখ, ক্ষণিকের ইন্দ্রিয়সুখের জন্য আমরা ভূমা হ'তে—বিরাট হ'তে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, সঙ্কুচিত ও সংকীর্ণতর হ'তে হ'তে একেবারে মহাশত্রু রিপুপুঞ্জের খপ্পরে পড়ে গেছি। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতি যে-রিপুগুলির উপর ছিল আমাদের সহজ কর্তৃত্ব এবং অনায়াস আধিপত্য—যারা সবদা সন্ত্রস্ত থাকত আমাদের আদেশ পরিপালনের জন্য, সর্বরকমে আমাদের সেবা করবার জন্য, উৎফুল্ল আনন্দ ও বলিষ্ঠ উপভোগের মাধ্যম হবার গৌরবে—আজ হৃতবল, ক্ষীণশক্তি, অকর্মণ্য প্রভুর উপর লাভ করেছে তারাই সার্বভৌম অধিকার, সর্বনাশা প্রাদুর্ভাব। তাই, আজ আমরা দুর্বল কাম, ক্ষুদ্র লোভ, নীচ মাৎসর্যের হস্তে ক্রীড়নক মাত্র। মিথ্যাচার, ভণ্ডামী, দুর্নীতি, ব্যভিচার, ধর্মহীনতা, নির্বিচারতা, নিরানন্দময়তা আজ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র,—এমন কি আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রেও—সর্বত্র রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়ে সমগ্র বিশ্বের পরিস্থিতিকে নিঃশেষে পর্যুদস্ত করার সুনিশ্চিত সঙ্কট-গহ্বরের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। সমস্ত সুধির, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আপন আপন নির্জন, সমাজ-পরিত্যক্ত, অন্ধকার গুহায় বসে আকুলভাবে উদ্‌গ্রীব হয়ে ব্যাকুল প্রশ্ন করছেন—পরিত্রাণের পথ কোথায়?—

পরিত্রাণের পথ নিশ্চয় আছে। সেই পথকে অদম্য উৎসাহ-উদ্যম নিয়ে উন্মুখ, উদগ্র অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে খুঁজে বের করতে হবে এবং সেই পথানুসরণে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে অবিচল নিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। নবজাগ্রত নবীন বাংলার নির্মল-চরিত্র তরুণ-যুবকগণ, রূঢ় বাস্তবের পঙ্কিল সংঘাতে তোমাদের সবুজ মন-প্রাণ এখনও কলুষিত হয়নি, পূর্বপুরুষগণের সাধনা-তপ্ত উষ্ণশোণিত-প্রবাহ তোমাদের সতেজ দেহে শৌর্যে বীর্যে টগ্‌বগ্‌ করছে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির অটল-নিষ্ঠায় ব্রহ্মতেজে হোমবহ্নি শিখার মত তোমরা প্রজ্জ্বলিত। তোমরাই পারবে—সমগ্র মানব সমাজকে এই সব পাপ-পঙ্কিলতা, কাপট্য, মিথ্যাচার এবং নীচ প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রতা থেকে রক্ষা করতে,—তাকে সর্ব-ধ্বংসী মহা-অকল্যাণের দৃঢ় কবল থেকে মুক্ত করতে। প্রতিগৃহে, সমাজে ও রাষ্ট্রে সত্য শিব ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা কর, মানুষকে আবার সহজ, সুস্থ, সাবলীল, আনন্দময় জীবন দান কর, স্নেহ-মমতা, প্রেম-প্রীতি ভালবাসা-শ্রদ্ধা-ভক্তি-মানবতা-উদারতার উৎফুল্ল পুলক হিল্লোলে মানব সমাজ থেকে ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা, মাৎসর্য বিদূরিত কর। শত শত দধিচীর মতো চারিত্র্যে, তিতিক্ষায় মানব-প্রীতি ও লোককল্যাণ মহাযজ্ঞের তপঃ বহ্নিতে দগ্ধ হয়ে মহা-শক্তিধর হয়ে ওঠ—প্রতি গৃহ, প্রতি পল্লী, প্রতি সমাজ, প্রতি রাষ্ট্র তোমাদের জয়-জয়কারে মুখরিত হোক। তোমাদের দেশপ্রেম, ত্যাগ, দুঃখবরণ, উন্নত নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিমল আদর্শ তোমাদের অন্তরকে সর্বদা অনুপ্রাণিত

ও উদ্ভাসিত করে রাখুক। সামান্য টাঁব-ভাড়ার এক পয়সা বৃত্তির জন্য যারা আকাশ-পাতাল তোলপাড় করতে পারে, একমুষ্টি তণ্ডুলের জন্য যারা কুরুক্ষেত্র বাধাতে পারে—এই যৌন সমস্যার সমাধানে তারা নিশ্চয়ই গ্রহগুলিকেও প্রয়োজন হলে কক্ষচ্যুত করতে পারে। তোমাদেরই পূর্ব-সূরিগণ জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য ক'রে ভাবনাহীন চিত্তে 'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল জীবনের জয়গান।' চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করল, বালেশ্বরে সশস্ত্র বৃটিশসৈন্যের সঙ্গে করল সম্মুখ-সমর। কলকাতার রাইটার্স-বিল্ডিংএ, অসমসাহসিক আক্রমণ, আজাদ-হিন্দ-বাহিনীর দেশ-দৃপ্ত বীরত্বপূর্ণ মৃত্যুবরণ এবং আরো সহস্র সহস্র আদর্শপ্রাণ বীর যুবক তাদের বিন্দু বিন্দু শোণিত অকাতরে দান করে তিলতিল করে এগিয়ে গিয়েছে দেশের স্বাধীনতা লাভের স্থির লক্ষ্যে—তারাই মৃত্যুহীন প্রাণ দান ক'রে দিয়ে গেছে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা—এক্ষণে, তোমরা তাদের ঐতিহ্যবাহী উত্তর-সাধক উত্তরাধিকার-সূত্রে দেশবাসীকে দান কর—শান্তিময়, প্রীতি-স্নিগ্ধ স্বাস্থ্য-সুন্দর, আনন্দ-উজ্জ্বল, সাবলীল জীবন। মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দের বাণী—মহাসত্যে ভাস্বর—তিনি লিখেছেন :—

'The Bengali has always led and still leads the higher thought of India, because he has eminently the gifts which are most needed for the new race that has to arise. He has emotion and imagination which is open to the great inspirations, the mighty heart-stirring ideas that move humanity when a great step forward has to be taken. He has the invaluable gift of thinking with the heart..."

(The Brain of India.)

বাঙালীর দৈহিক গঠন দুর্বল, শরীরে পশুবল অপ্রচুর হতে পারে, কিন্তু তার আছে প্রবল ইচ্ছাশক্তি, অসীম মনোবল এবং অবিচলিত আত্ম-বিশ্বাস। আর আছে উন্নত মানস ও সূক্ষ্ম, স্পর্শ-কাতর আত্মমর্যাদাবোধ। সেজন্য তারা ব্যক্তিস্বার্থে কিংবা ক্ষুদ্র দৈনন্দিন ও কূটনৈতিক ব্যাপারে সাফল্য লাভ করতে না পারলেও—বৃহৎ স্বার্থে ও মহৎ আদর্শে একবার বিশ্বাস স্থাপন করে অনুপ্রাণিত হলে তারা বিরাট দানে, বিপুল ত্যাগে, উদার প্রাণে অসাধ্য সাধন করতে পারে—আত্মিক শক্তির নৈষ্ঠিক উদ্বোধনে, ব্রহ্মতেজে তারা দুর্বার, দুর্জয় হয়ে ওঠে,—দুর্নিবার যে-কোন পাশবিক শক্তির পক্ষে দুর্দমনীয়, অপরাজেয়। চৈতন্যদেব হরিসংকীর্তনের দল নিয়ে তদানীন্তন মুসলশক্তিকে পরাভূত করেছিলেন, বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় হয়েছিল সেই অমিতবিক্রম আত্মিক শক্তির বহিঃ প্রকাশ, আজাদ-হিন্দ-ফৌজের দুঃসাহসিক পরাক্রম ও প্রচেষ্টাও বাঙালীর আত্মপ্রত্যয়ের জলন্ত নিদর্শন। তাদের সংগঠিত করা দুষ্কর, পক্ষান্তরে প্রয়োজনের গুরুত্বে, আদর্শের মহত্ত্বে এবং সত্যদ্রষ্টা ঋষি-কল্প, মহানুভব, আদর্শ-নিষ্ঠ, নির্ভীক অধিনায়কের নেতৃত্বে তারা সংহত, সংগঠিত ও উদ্বুদ্ধ হলে, এরাই পারে পৃথিবীটাকে মন্থন ও নিষ্পেষণ করে সমগ্র মানব-সমাজকে সহজ, স্বাভাবিক উজ্জ্বল, শান্তিময় জীবনের আনন্দলোকে পুনর্বসতি দান করতে। তাই উৎকণ্ঠ ভরসায় ও নিঃসীম নিষ্ঠায় আবার আবাহন জানাই বাংলার তরুণ যুবকদের—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্
নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

ওঠ, জাগ, বরেণ্য আচার্যের নিকট তত্ত্ব অবগত হও। সত্যনিষ্ঠ, পরম-বাঞ্ছিত, তত্ত্বজ্ঞ, আচার-পরায়ণ আচার্য এখনও আছেন—রক্ত-মাংস-সম্বল দেহে—পবিত্র প্রেমের মন্দাকিনী বুকে ধারণ করে।

"যে ব্যক্তি প্রেরিত-পুরুষের আজ্ঞা পালন করে, নিশ্চয় সে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে এবং যাহারা অমান্য করে, আমি তোমাকে তাহাদের প্রতি রক্ষক নিযুক্ত করি নাই।"

(কোর-আন, ৪ সুরা নেসা ৮০ম, ২১)।

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

দিন আসে। দিন যায়। দেখতে দেখতে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে ডরোথী পিয়ার্সনের ফটোর দিকে তাকাচ্ছিলাম। ওখানে আর একটি ফটো টাঙানো হয়েছে, পিয়ার্সন সাহেবের ফটো।

মনে পড়ল আঠারোই ডিসেম্বরের কথা। আগে থেকেই চলে গেছলাম সিমেট্রিতে। কর্তব্যে কোথাও ফাঁকি না থাকে। চারটে বেজে দশ মিনিট হতেই দুটো বাতি জেলে দিয়েছি ওঁদের সমাধিক্ষেত্রে। ফুলের মালা দিয়েছি সে স্মৃতিফলকে। মিস্ এ্যাব্রাহাম আমার সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি নিয়ে যেতে রাজী হইনি। এক্ষেত্রে একলাই ভাল।

মালা দুটো দিয়ে সামনের মাটিতে চুপ করে বসেছিলাম। চারদিকের নিস্তব্ধ আবহাওয়া আমাকে আরও স্তব্ধ করে রেখেছিল। গ্রেট লেডী মিসেস্ ডরোথী পিয়ার্সন আজ স্বামীর পাশে শায়িতা। পিয়ার্সন সাহেব হয়তো আনন্দে তাঁকে আলিঙ্গন করছেন। পত্নীর শেষ কামনাও তিনি চরিতার্থ করতে পেরেছেন। মৃত্যুর পরেও তাঁদের উভয়ের সমাধিক্ষেত্রে বাতি জ্বলেছে। অনির্বাণ শিখা।

নির্ধূম বাতির দিকে চেয়ে চেয়ে অনেক কিছুই মনে পড়ছিল। পিয়ার্সন সাহেবের স্মৃতিফলকে ঠিকই কথা লেখা হয়েছে—The friend of man, the friend of truth.

কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না, বাতি নিভে যেতে মনে পড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে দেখি শীতের সন্ধ্যা অনেক আগেই আঁধারে ছেয়ে ফেলেছে সে ক্ষেত্র।

সেদিনই মনে মনে ঠিক করে-ছিলাম বারান্দায় ডরোথী পিয়ার্সন সাহেবের একটা ছবি টাঙাব।

ছবি দুটোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে মনে বেশ শান্তি পাচ্ছিলাম।

হঠাৎ মিস্ এ্যাব্রাহামের কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙল—এক্সকিউজ মিঃ দত্ত, হিয়ার ইজ্ এ্যান্ এনভেলাপ ফর ইউ।

মুখ তুলে মিস্ এ্যাব্রাহামের দিকে তাকালাম— ওঁর হাতে একটি খাম।

হাত বাড়িয়ে খামটা হাতে নিয়ে ঠিকানাটা দেখলাম। নিশ্চয়ই মায়ের চিঠি। বাংলায় বড় বড় ক'রে সেই গোটা গোটা হাতের লেখা। হাতে নিয়ে মনে মনে একটু হাসলাম—মা আমার ঠিক একটির পর একটি চিঠি দিয়ে যাচ্ছেন। আমি যেন না বদলাই—এখানকার কর্তৃপক্ষ যেন আমাকে প্রভাবিত না করে।

চিঠিটা খোলার আগে বেশ ভারী ভারী লাগল। মা এত কি লিখেছেন! পৌষপার্বণে যেতে পারিনি বলে কি তারই নানারকম কৈফিয়ৎ চেয়েছেন। হয়তো তাই হবে।

মিস্ এ্যাব্রাহাম চলে যাবার পর—খামটা খুলে ফেললাম। হ্যাঁ, মায়েরই চিঠি। পড়তে শুরু করলাম। যা ভেবেছি তাই—মা ঠিকই পৌষপার্বণের কথা লিখেছেন! সেই সব নানা কথা—কিন্তু একি—মা যে আমাকে চলে যেতে বলেছেন এখান থেকে। মামা এতদিনে আমার একটা ব্যবস্থা করতে

পেয়েছেন। তাঁর অফিসে যদিও হয়নি তাহলেও তাঁরই এক বন্ধুর অফিসে কাজ ঠিক হয়েছে। মাইনে আপাততঃ ভালই। ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা অনেক।

রুদ্ধনিঃশ্বাসে পড়ে চলছি—মায়ের চিঠি শেষ হবার আগে এক জায়গায় লেখা—আগামী মাসেই আমাকে ওখানে যোগদান করতে হবে। মামা নাকি ব'লে দিয়েছেন ও তারিখে যোগদান না করলে ভবিষ্যতে আর কোনদিন চেষ্টা করবেন না উনি।

মা সত্যই কি শেষ পর্যন্ত আমাকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে ছাড়বেন। এখানকার পরিবেশ আর মানুষগুলো বেশ ভাল লেগে গেছে আমার। কিন্তু মায়ের ওই আদেশ কি ক'রে লঙ্ঘন করি!

মনটা বিষণ্ণ লাগল এ পরিবেশ ছেড়ে যাবার কথা ভেবে। কিন্তু কি করে ছাড়ব! এখানে যে আমি প্রাণের সন্ধান পেয়ে গেছি। এ প্রাণ অতিক্রম করব কি করে!

চেয়ার ছেড়ে চিঠিটা টেবিলে রেখে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। শীত-শেষের উত্তরে হাওয়া বইছে। বাগানে ফুলগুলো অল্প রোদের আলোতে ঝিলমিল করছে। কি নিপুণ ছন্দ!

মিসেস্ ওয়েজারের ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। কিন্তু বলে কি হবে! মায়ের আদেশ যে আরও বড়—সেখানে অন্য কোন যুক্তিতর্কের পিছ-টান কি চলে!

প্রায় দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলাম। মিসেস্ ওয়েজারের কাছে একথা বলতে যেতে পারলাম না। সিঁড়ির পাশে একটা ফুলগাছের টবের কাছে একভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। এরই মধ্যে এত আপন হয়ে গেছে এখানকার মানুষরা—তাদের ছাড়তে মন চাইছে না!

কিন্তু মনকে যে আমার চাওয়াতেই হবে। মাকে খুশী করাই হ'ল আমার সবচেয়ে বড় কর্তব্য—সব চেয়ে আগে করার কাজ। মা না জানি আজ কি খুশীই হয়েছেন! ঘরে ফিরে যাব আমি—মায়ের কাছে। ছোট ভাই-বোনেরা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরবে আমাকে। আব্দার করবে নানান্ জিনিসের। প্রতিশ্রুতি চাইবে আমি যেন আর কোথাও না যাই।

মিস্ এ্যাব্রাহাম যে এর মধ্যে কখন এসে পড়েছেন বুঝতে পারিনি। ওঁর মিষ্টি কণ্ঠস্বরে চমক লাগল—ডিয়ার ইজ ইওর টি।

হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা নিয়ে মিস্ এ্যাব্রাহামের মুখের দিকে তাকালাম। মিস্ প্যাট্রিক আমাকে সকালে দুবার চা দিতেন—মিস্ এ্যাব্রাহামও সে রীতিটি বজায় রেখেছেন।

চায়ের কাপ সরিয়ে রেখে মিস্ এ্যাব্রাহামকে জিজ্ঞেস করলাম—মিস্ প্যাট্রিক কবে আসছেন?

কথাটা বোধ হয় অন্যভাবে নিয়েছিলেন মিস্ এ্যাব্রাহাম। হয়তো মনে করেছেন তাঁর উপস্থিতি আমার ভাল লাগছে না। মিস্ প্যাট্রিকের মত কাজ হয়তো তিনি করতে পারছেন না।

দু' চার মিনিট নীরব থেকে মাথা নামিয়ে শান্ত গলায় বললেন মিস্ এ্যাব্রাহাম—চার তারিখে।

—চার তারিখ। আজ হ'ল ছাব্বিশ। তাহ'লে দেরি রয়েছে তো! আপনি কাইণ্ডলি আজই ওঁকে একটা টেলিগ্রাম করে দিন—উনি যেন বাই থারটিয়েথ্ এখানে অবশ্যই পৌঁছোন।

—ঠিক আছে; আরও ধীরভাবে উত্তর দিয়ে মিস্ এ্যাব্রাহাম চলে যাচ্ছিলেন।

আবার ডাকলাম তাঁকে—মিস্ এ্যাব্রাহাম, আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। নতুন একটা চাকরী পেয়েছি অন্য জায়গায়।

কোন কথা বললেন না মিস্ এ্যাব্রাহাম। স্থিরভাবে একবার তাকিয়ে মৃদু হেসে চলে গেলেন।

উনি চলে যাবার পর ভাবলাম মিসেস্ ওয়েজারকে একবার বলে আসি! আস্তে আস্তে সেই শীর্ণকায় মুখের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম—গুড মর্ণিং। কেমন আছেন?

পাতলা হলুদ-ঘেঁষা চোখের পাতা দুটি খুলে মিসেস্ ওয়েজার শান্তভাবে জবাব দিলেন—গুড মর্ণিং। ফিলিং ভেরি টায়ার্ড!

—ও কিছু না। আস্তে আস্তে ভাল হয়ে যাবেন।

মিসেস্ ওয়েজার একথায় কান না দিয়ে শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন—মিস্ প্যাট্রিক কবে আসবেন?

—ওঁকে আজই টেলিগ্রাম করেছি—বাই থারটিয়েথ্ যেন ফিরতে পারেন। আমি চলে যাব কিনা।

ভেবেছিলাম আমার চলে যাবার সংবাদে মিসেস্ ওয়েজার একটু বিস্মিত হবেন। কিন্তু দেখলাম ওঁর দেহে-মনে কোন ছাপ নেই।

একই কণ্ঠস্বরে শুধু বললেন—দেন ইউ আর লিভিং আস, গোয়েন?

—মনে করছি থারটিফার্স্ট যাব।

মিসেস্ ওয়েজার চলে যাওয়ার কোন কারণ জিজ্ঞেস করলেন না। মনে পড়ল প্রথম দিনের কথাগুলো। সকলেই জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি এখানে থাকতে পারব কিনা।

তবে কি এরা ভেবেছেন আমি

এখানে থাকতে পারছি না? এ পথকে জীবনের একমাত্র পথ বলে মেনে নিতে পারলাম না? কিন্তু, আমি তো সে-জন্য যাচ্ছি না।

মিসেস্ ওয়েজারকে নিজে থেকেই কারণ দেখিয়ে বললাম—একটা ভাল চাকরী পেয়েছি।

—ভেরি গুড, গড ব্লেস্ ইউ।

অবাক্-বিস্ময়ে মিসেস্ ওয়েজারের দিকে তাকালাম। কোন রেখা নেই তাঁর চোখেমুখে। নিজে থেকেই তাই না-বলে পারলাম না—আপনি কি বলেন?

গলাটা একটু পরিষ্কার শোনাল মিসেস্ ওয়েজারের—দ্যাটস্ ইওর পারসোনাল বিজ্‌নেস্। উই কাণ্ট্ ট্যাণ্ড অন ইওর ওয়ে।

জবাব দেবার ভাষা খুঁজে পেলাম না। ওরা কি তবে আমার এ কথাটা এতদিনের মধ্যেও ভোলেননি?

ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম। মিস্ এ্যাব্রাহাম শান্তভাবে হেসে বললেন—ইওর টি ইজ গেটিং কোল্ড।

—ও ইয়েস; নিজের অন্তমনস্কতাটা ঢাকা দেবার জন্য ব্যস্তভাবে চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিলাম।

মাঝখানের কটা দিন আর বেশি ঘোরাঘুরি করিনি। হোমের সকলে জেনে গেছে আমি চলে যাচ্ছি। কই, কেউ তো আমাকে থাকতে বলল না। ওরা কারও পথে বাধা দিতে চায় না। কিন্তু আমাকে বললে যে আমি খুশি হতাম।

হোমে যেন প্রাণের অভাব লাগছিল ক'দিন। গতকাল মিস্ প্যাট্রিক ফিরে আসতে আবার জমজমাট লাগছে।

বাক্সের জিনিসগুলো গুছোতে গুছোতে কাজের কথা মনে পড়ছিল। সিঁড়ি থেকে নেমেই মিস প্যাট্রিক ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন—হোয়াইস্ রং। কারও কিছু বা তা বা তি হয়নি তো?

—না না বাড়াবাড়ি কারও হয়নি। আমি চলে যাব বলে আপনাকে আসতে অনুরোধ জানিয়েছি; এগিয়ে এসে সরাসরি কথাটা বলে ফেললাম মিস্ প্যাট্রিককে।

আনমনে কথাগুলো উচ্চারণ করলেন মিস্ প্যাট্রিক—আপনি চলে যাচ্ছেন? কবে?

—কালই। আমাকে পরশু আমার নতুন চাকরীতে যোগদান করতে হবে।

—ও, ভেরি গুড নিউজ। কনগ্র্যাচুলেশন্‌স্। হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন মিস্ প্যাট্রিক।

আলবার্টও নেমে এসে পিঠে হাত রাখল—কনগ্র্যাচুলেশন্‌স্।

গত রাত্রেই মিস্ প্যাট্রিক আমার বিদায়-সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিলেন। কি কর্মপটু মহিলা! চিরদিন মনে রাখব তাঁকে। ছোট্ট ঘরোয়া সভায় সকলের কাছে আমার শুভকামনা করে তিনি যে দু'চার কথা বললেন—সেগুলিও মনে রাখার মত। বিপ্লব বাবু শুয়ে শুয়েই হাতজোড় করলেন, তারপর বেশ গদগদ কণ্ঠে বললেন—ভুলবেন না স্যার আমাদের! চলে যাচ্ছেন, ভালই করছেন। ইয়ংম্যান মশাই—এখানে এ স্থবির রাজত্বে আপনি কি করতে থাকবেন। বাইরে বেরিয়ে দেখুন—জগৎটা কি ভীষণ এগিয়ে চলেছে। ওদিকে তাকান। ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলুন। আমরা পঙ্গু, আমাদের জন্যে এ প্রাণহীন জগৎটা পড়ে থাক—পরিচালনার জন্যে কেউ না কেউ জুটে যাবেন।

বিপ্লববাবুর তীক্ষ্ণকণ্ঠের জবাবে কিছু বলতে পারিনি। আমার গলার স্বর যেন বুজে এসেছিল আস্তে আস্তে। সভাশেষে পিটার গান গাইল। সেই আওয়াজে আমার জল চোখেমুখে। ওকে চাপড়ে ধন্যবাদ জানিয়ে ফুলের তোড়াটা নিয়ে ওপরে চলে এসেছিলাম। কিন্তু কান্না আমার থামেনি। কোথায় যেন একটা চাপা কান্না বুক ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

বাক্সটা বন্ধ করে পিয়ার্সন সাহেবের ফটোর দিকে তাকালাম। বেশ বলিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে কঠিন কণ্ঠে ওই বলিষ্ঠ প্রতিমূর্তির কাছে বিদায় নেবার ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু চোখে কে যেন লজ্জার বাঁধ দিয়ে দিয়েছে।

—ও: তো, ইউ হ্যাভ ফিনিস্‌ড্ এভরিথিং! ট্রেন তো অনেক দেরি; উজ্জ্বলভাবে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলেন মিস্ প্যাট্রিক—মিসেস্ ওয়েজারের সঙ্গে দেখা করেছেন?

—না এখনই যাচ্ছি; বলে মিস্ প্যাট্রিককে সঙ্গে নিয়ে মিসেস্ ওয়েজারের ঘরের দিকে গেলাম।

সে আশ্চর্য রকমের দুর্বল মহিলা যেন কত শক্তি ফিরে পেয়েছেন। আমার হাতে হাত মিলিয়ে উনি বেশ স্পষ্টভাবে হেসে বললেন—বা-বাই! উই শ্যাল রিমেমবার ইউ!

ইচ্ছে করছিল বলি, আমিও আপনাদের সকলকে মনে রাখব। কিন্তু সে-কথা বলে আর অনুভূতির প্রগাঢ়তা কমাতে চাইলাম না।

বাইরে আলবার্টের গলা শোনা গেল। আলবার্টকে প্রথম দিন দিতে দিতে আসতে দেখলাম। বীরভূম জেলার রাস্তাঘাটে যে-তেজস্বী যুবকের দিন দেওয়ার কথা শুনেছিলাম আজ তাকেই প্রথম দিন দিতে দেখলাম।

আলবার্ট ঘরে ঢোকার আগেই আমরা বেরিয়ে এলাম। আলবার্ট দৃঢ়ভাবে আমার হাতটা ধরে বলল—উইস ইউ লং লাইফ এ্যাণ্ড হ্যাপিনেস!

তিনজনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। একবার হো হো করে হেসে আলবার্ট বলল—হোয়েন শ্যাল ইউ ম্যারী? ডোণ্ট ফরগেট আস। উই শ্যাল গ্রেস দি সেরিমনি; বলে হাসতে হাসতে আলবার্ট মিস্ প্যাট্রিকের দিকে তাকাল।

মিস্ প্যাট্রিকও হো হো করে হেসে উঠলেন।

আমিও ওদের সঙ্গে নিচের হলঘরে এলাম। ওপরে রোগীদের ঘরে যেমনটি দেখে এসেছি এখানেও সেই একই সম্ভাষণ! আপনার শ্রীবৃদ্ধি হোক! আপনি দীর্ঘজীবী হোন!

পিটারের বেড থেকে আরম্ভ করে সকলের বেডেই একবার করে দেখা করলাম। বিপ্লববাবুর কাছে আর একটু দাঁড়াবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু হল না। গণেশ এসে গাড়ি আসার সংবাদ দিল।

দুটো রিক্সায় আমরা উঠে বসলাম। একটাতে আমি, আলবার্ট। আর একটায় মিস্ প্যাট্রিক আর মিস্ এ্যাব্রাহাম। আমার সব জিনিস পত্রও ওদের গাড়িতেই।

রিক্সায় উঠে একবার হোমের দিকে তাকালাম। সিঁড়ির ওপরে সেই ফটো দুটি আবছা দেখা যাচ্ছে। পিয়ার্সন সাহেব আর তাঁর স্ত্রী জয়োথীর ফটো।

হাত তুলে অভিবাদন জানালাম। হোমের চারদিকে বিক্ষিপ্ত নরনারী প্রত্যেকে হাত তুলে সে অভিবাদনের জবাব দিলেন।

রিক্সা চলতে শুরু করল।

মিস্ প্যাট্রিক হেসে বললেন—মিঃ পিয়ার্সন বেঁচে থাকলে কিন্তু এত সহজে যেতে পারতেন না।

মনে মনে সে কথায় সায় না দিয়ে পারলাম না।

রিক্সা দুটো বেশ সমান গতিতেই চলছে। আলবার্ট একটা সিগারেট ধরিয়ে হেসে বলল—আমাদের এখানকার পরিবেশটা আপনার কেমন লাগল? আপনাদের ভাল লাগার মত নয়, না?

—না না তা কেন! আলবার্টের হাতটা এক হাত দিয়ে চেপে বললাম—পরিবেশ আমার খুবই ভাল লেগেছিল। ভাল না লাগারই বা কি আছে! মানুষ শুধু ধর্মে আলাদা, জাতিতে পৃথক—কিন্তু আশা-আকাংখা, মানুষের আধ্যাত্মিক কাঠামো—সে সব তো একই।

আলবার্ট একথার কোনও জবাব না দিয়ে বলল—আমরা কিন্তু আপনার বাড়ি যাব! ম্যারেজ সেরিমনিতে বলবেন আমাদের।

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই যাবেন, যখন খুশি। ম্যারেজ সেরিমনি কি দরকার। যে কোনদিন আসতে পারেন।

আলবার্ট আর কোন কথা না বলে সিগারেটে একটার পর একটা টান দিয়ে যেতে লাগল।

ষ্টেশন খুব দূরে নয়। অল্পক্ষণেই আমরা এসে পৌছলাম। মিস্ প্যাট্রিক আগেই নেমে এসে সমস্ত জিনিসগুলো নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—টিকিটটা কেটে আনি। আপনার ষ্টেশনের নাম কি!

অপ্রস্তুতভাবে বললাম—না না আমি কাটছি।

কিন্তু মিস্ প্যাট্রিক ছাড়বার পাত্রী নন। বাধ্য হয়েই তাই ষ্টেশনের নাম বললাম।

আলবার্ট আর মিস্ এ্যাব্রাহাম আমার জিনিস হাতে নিয়ে প্লাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমি বেশ বিব্রতভাবে ওদের সাহায্য করতে গেছলাম কিন্তু ওঁরা শুনলেন না। আমার নিজস্ব জিনিস বলতে শুধু একটা স্যুটকেশ ছিল—এখানে আসার পর আরও কয়েকটি জিনিস বেড়েছে।

দু' এক মিনিটের মধ্যে মিস্ প্যাট্রিক এসে পৌঁছালেন। হাত বাড়িয়ে একটি টিকিট দিয়ে বললেন—কিপ ইট সেফলি।

টিকিটটা হাতে নিয়ে দেখি ফার্ষ্ট ক্লাশের টিকিট! বেশ সঙ্কোচে বললাম—ফার্ষ্ট ক্লাশের টিকিট কেন! আমি তো থার্ড ক্লাশেই যাই।

—ও ঠিক আছে! মিস্ প্যাট্রিক হো হো করে হেসে বললেন—এখানে থাকার যা অসুবিধে হয়েছে সেগুলো মনে রাখবেন না কিন্তু!

—ও সব কথা বলে লজ্জা দেবেন না। আপনাদের আতিথেয়তা আর ব্যবহার আমি জীবনে ভুলতে পারব না।

হাতে হাত মিলিয়ে মিস্ প্যাট্রিক কৃতজ্ঞতা জানালেন। মিস্ এ্যাব্রাহাম একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন—ওন্‌লি টেন মিনিট্‌স্ মোর।

আবেগে আমার কণ্ঠ যেন রোধ হয়ে আসছিল। কর্মজলে কি কেউ এত গভীরতার আস্বাদ পায়!

আমার সে-মানসিক অবস্থার দশ মিনিটটা যেন দশ সেকেণ্ডের মত কেটে গেল। দূরে চেয়ে দেখি গাড়ী আসছে।

মিস্ প্যাট্রিক জিনিসপত্রগুলো হাতে নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এলেন—। মনে হচ্ছিল ট্রেনটা ছেড়ে দি। জিনিসপত্র নিয়ে আবার ওদের সঙ্গে ফিরে যাই হোমে।

ভাববার সময়ের মধ্যেই গাড়ি এসে দাঁড়াল। ওঁরা তিন জনে শশব্যস্ত-ভাবে একটি প্রথম শ্রেণীর কামরার সামনে এসে জিনিসগুলো এগিয়ে নিয়ে দাঁড়ালেন। কেমন যেন অবসন্নের মত ট্রেনে উঠে পড়লাম—বিপ্লববাবুর কথাগুলো মনে পড়ল—আমাদের ভালবাসেন সেজন্যে যে আপনাকে আমরা ছাড়ব না, বা আপনি যাবেন না তা তো হয় না। ভালবাসা আর মোহ এক জিনিস নয়। বাইরে পৃথিবী কি ভীষণ এগিয়ে চলেছে—আপনিও চলুন সে সঙ্গে। আপনার মায়ের মুখে হাসি ফোটান—সে হাসিও তো হাজার যোগীর মুখে হাসি ফোটানোর সমান। জীবনের বৃহত্তর পরিধিকে বেছে নিন—আমরা আপনার ভালবাসার কথা মনে রাখব।...

ট্রেনের কামরায় স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছি। পাশের জানলা দিয়ে মিস্ এ্যাব্রাহাম ফুলের তোড়াটা এগিয়ে দিলেন—হয়তো মানুষের ধাক্কা থেকে ফুলগুলো বাঁচাবার জন্যে এ প্রচেষ্টা। হাত বাড়িয়ে ফুলগুলো নিতে গিয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকালাম—মিস্ এ্যাব্রাহাম যে এত সুন্দর তাতো এমন দেখিনি। একদৃষ্টিতে গভীরভাবে তাকাবার পর মিস্ এ্যাব্রাহাম শান্ত-ভাবে বললেন—বা-বাই।

চোখের কোণে জল টলমল করছিল আমার। কোনরকমে সামলে নিয়ে অস্ফুটভাবে বললাম—বা-বাই। আলবার্ট, মিস্ প্যাট্রিক হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন। মিস্ এ্যাব্রাহামের দিকে হাত বাড়ালাম। হাতে হাত দিয়েছি মাত্র ট্রেন ছেড়ে দিল। ব্যাকুলভাবে দরজাটা শক্ত করে ধরে হাতটা ছেড়ে দিলাম। ওরা তিনজনে একসঙ্গে হাসতে হাসতে আমার দিকে হাত নাড়ল।

ট্রেনের গতি আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করল। ওদের হাত কিন্তু অনবরত নড়ছে। যতদূর দেখা যায় দেখলাম, তারপর দরজার ধার থেকে সরে এসে সীটে বসলাম। জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে রেখে জানলার দিকে তাকালাম—এখনও ওঁরা হয়তো প্লাটফরম থেকেই নামেন নি!

পিয়ার্সন সাহেবের মুখটা আমার অশ্রুসজল চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেই দিব্য সুন্দর শান্ত মুখশ্রী। গঙ্গার ধার দিয়ে সেই বিলম্বিত পদক্ষেপ।

মিসেস্ ওয়েলার হয়তো এখনও চোখ বুজে শুয়ে আছেন। সেই নিভৃত মুলজিত মরটি মনে পড়ল। একে একে মনে পড়ল—সেই মুখ, সেই চোখ, সেই কণ্ঠ, সেই আশাসবাণী—ওয়াণ্ট এ্যাণ্ড ইট শ্যাল বি গিভ্ন্ ইউ!

চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল হাতের ওপর...। সচকিত হয়ে রুমালে মুছে ফেলে ফুলের তোড়াটা হাতে নিলাম। আবার চোখে জল এল। সেই দু ফোঁটা জলের মাঝখানে মিস্ প্যাট্রিকের মুখটা যেন ভাসছে দেখলাম। সেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে যেন বলছেন—আপনার জন্যে ফুলগুলো এনেছি!

একি, আলবার্টের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি কি আমার কানে এখনও বাজছে—আমাদের ভুলে যাবেন না!

মিস্ এ্যাব্রাহামের ছবি দেখতে পেলাম তোড়ার ফুলের একটি পাপড়িতে—সেই সচকিত সুন্দর দৃষ্টি!

কিন্তু......আর যে আমার ফেরার উপায় নেই।

হু হু করে ট্রেন ছুটে চলেছে।...

জানলা দিয়ে হাওয়া আসছে। প্রথম বসন্তের স্নিগ্ধ হাওয়া।...

সমাপ্ত

"ইহারা সকল গুরুর গুরু, মানুষের ভিতর ভগবানের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। আমরা তাঁহাদের ভিতর দিয়া ব্যতীত অন্য উপায়ে ভগবান্‌কে দেখিতে পারি না। আমরা তাঁহাদিগকে উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারি না, আর কেবল ইঁহাদিগকে আমরা উপাসনা করিতে বাধ্য। এই সকল নররূপধারী ঈশ্বর ব্যতীত ভগবান্‌কে দেখিবার আমাদের আর অন্য কোনও উপায় নাই।"

—স্বামী বিবেকানন্দ।

সুরের আগুন

—অনুবাদক শ্রীঅজিতকুমার রায় চৌধুরী

'কোথা থেকে হে?'

'আর বলো কেনো! বাজার পর্যন্ত যেতে হলো কাগজ কেনার জন্য।'

'বলো কি!'

'বাজারে একটু সস্তায় পাওয়া যায়। তা, চলি হে।'

'আরে, আমি যে একটু আগে তোমার বাড়ির সামনে দিয়ে আসতে আসতে বাজনা শুনতে পেলাম! আমার তো ধারণা হলো তুমি ঘরেই আছো।'

'বোধ হয় মেয়েটাই যন্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। ওর জন্যে দু'দণ্ড বাইরে থাকার উপায় নেই।'

'মেয়েকে তো দেখলাম রাস্তায় খেলছে।'

'কি যে বলো! তা, চলি। সেই থেকে একটা গানের কলি মনের মধ্যে ঘুরছে।'

'ওহোঃ, তার স্বরলিপি তোলার জন্যই বুঝি কাগজ কিনে আনা?'

'ঐ আর কি।'

আর দাঁড়াতে ভরসা পায় না লিওপোল্ড। ছেলে আর মেয়েটা মিলে এতক্ষণে হয়তো যন্ত্রগুলোর সর্বনাশ করে ছেড়েছে। ওঃ, এ যে কি দায়! তাড়াতাড়ি পা চালায় লিওপোল্ড।

'তুই না হলে কে বসেছে বল্?'

'কে আবার, ঐ বিল্টুটা।'

'কি বলছিস্ তুই!'

বিশ্বাস হয় না লিওপোল্ডের। কোনোও সম্ভব নয়। মাত্র তিন বছরের শিশুর পক্ষে বাজনা ধরাই সম্ভব নয়। তবু মেয়ের কথাটা উড়িয়ে দেয় না সে। ছেলেকে ডাকে—

'এই ছুটু, বাজনাটা বাজা তো'—আঙুল দিয়ে ক্লেভিয়ারটা দেখিয়ে দেয় ছেলেকে। ভারিক্কি চালে ঘাড় কাৎ করে ক্লেভিয়ারের কাছে এগিয়ে যায় ছেলেটা, এবং...। বিশ্বাস হয় না লিওপোল্ডের। এ কি করে সম্ভব! অথচ কেমন ওস্তাদের মত আঙুল চালাচ্ছে! স্বরলিপি তোলার চিন্তা উবে যায়। ছেলেকে কোলে তুলে নেয় সে।

এই যে ছেলেটা, মাত্র পাঁচ বছর বয়সে সে দিব্যি বেহালায় ছড় চালাতে শিখেছে! যে শোনে সে-ই অবাক হয়। কেউ কেউ ভাবে এ নেহাতই গাল-গল্প।

(২)

সাত বছর এখনো পার হয়নি। বেহালায় গৎ বাজাবে ছেলেটা। যন্ত্র-সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে ক্লেভিয়ার বাজিয়ে শোনাবে সে। দূরে দাঁড়িয়ে, কেবলমাত্র শুনে বলে দেবে কোন গৎটা বাজানো হচ্ছে, তার নামই বা কি। টিকিট মাত্র...। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের এক সকালে কোন একটি জার্মান দৈনিকে এই ছোট্ট বিজ্ঞাপনটি ছাপা হওয়ায় অনেকেই কোন একটা কসরৎ দেখানোর বিজ্ঞাপন বলে ভুল করলো সেটাকে।

সেই শো-তে, আমিও দর্শকদের মধ্যে ছিলাম। আমার তখন চোদ্দ বছর বয়স। লাইলাক ফুলের রংএর পোষাক-পরা, সেই আশ্চর্য সাত বছরও বয়স নয় যে ছেলেটার সে বাজনার সামনের টুলে গিয়ে বসছে। আশ্চর্য মিষ্টি মুখখানায় সে এক অপূর্ব হাসি। মাথায় টুপি, কোমরে একটা ছোট তলোয়ার...। সব মিলে সে এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য।

বিজ্ঞাপিত সেই অনুষ্ঠানের কথা মনে পড়তো যখন তখন, অনেক কাল পরেও এই কথাগুলোই ভাবতেন বিশ্ববিখ্যাত কবি-নাট্যকার গ্যেটে। মোৎসার্ট-এর প্রথম প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের কথা এভাবেই মনে করতেন তিনি।

উল্ফগ্যাং আমেডিয়াস্ মোৎসার্ট।

বিশ্ববিখ্যাত সুরের যাদুকর, মো ৎ সা র্ট-এর জন্ম ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার অন্তর্গত সলস্‌বার্গে। মাত্র তিন বছর বয়সে বাজনায় হাতেখড়ি।

আদর্শ শিক্ষক, মাঝারি ধরণের বেহালাবাদক, ও অত্যন্ত সাধারণ মানের সুরকার লিওপোল্ড মোৎসার্ট-এর ঘরে মাত্র তিন বছর বয়সে যে শিশু ক্লেভিয়ার বাজিয়ে উঠেছিল, পরবর্তী কালে বিটোফেনের নামের সঙ্গে তার নাম সমভাবে উচ্চারিত হবে, এমন দুরাশা নিশ্চয় করতে পারেনি লিওপোল্ড। তবে ছেলের এই আশ্চর্য ক্ষমতার প্রতি তিনি অনেকটা অর্থ উপার্জনের কথা ভেবেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন ঠিক সময়টিতে।

এখনো সে বর্ণমালাই মুখস্থ করেনি। মাত্র তো ছ'বছর বয়স। অথচ এই বয়সেই কেমন স্বরলিপি বুঝতে পারে! আবার স্বরলিপি তোলবার চেষ্টা! ভাবতে ভাবতে অবাক্ হন লিওপোল্ড।

ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে ছোট্ট বাজনার দল গঠন করে একদিন দেশ-

দেশান্তরের পথে যাত্রা করলেন তিনি।

(৩)

'ছেলেটার কি সাহস!' ভাবে আর অবাক হয় রাজকুমারী। 'আমাকে বলে কিনা বিয়ে করবে। কোথায় রাজপ্রাসাদে বাজনা বাজিয়ে শোনানোর সৌভাগ্যের জন্যে নম্র হবে, তা নয়…। বড্ড ছেলেমানুষ। আমি না ধরলে হয়তো পা পিছলেই যেতো। ধরার জন্যে সে কি কৃতজ্ঞতা জানানোর ঘটা!'

জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালী, হল্যাণ্ড—একের পর এক রাজ্যে বাজনা শোনাতে শোনাতে, অষ্ট্রিয়ার রাজ-পরিবারের সামনে বাজনা বাজানোর সুযোগ পায় খুদে বাদকের দলটি। সেখানেই রাজকুমারী মেরীর জন্যে পা পিছলে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পায় বালক মোৎসার্ট। আর সেই উপকারের প্রত্যুত্তরে বিয়ে করার কথাটা বলে ফেলে সে সরল মনে।

ছেলেটার সাহস দেখে অবাক্ হলেও পরবর্তী কালে বিপ্লবীদের বিচারে গিলোটিনে প্রাণ দেবার পূর্ব মুহূর্তে হয়তো মেরী আঁতোয়ার মনে এক অপূর্ব ইচ্ছার কথা মনে উঠেছিল। হয়তো মনে পড়েছিল একটি বালকের দুঃসাহসকে। ইতিহাস মোৎসার্ট-এর সুরের জগতের পরিবর্তে মেরীকে ফরাসী দেশের রাজনৈতিক জটিলতার জগতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল নির্মম-ভাবে।

ভুলে যাওয়া কোনকালেও ভাগ্যে ঘটেনি ইন্‌ফন্‌নারের। তবে পড়া-শোনায় সে পিছিয়ে থাকেনি। সমস্ত বিষয়গুলোর মধ্যে অঙ্ক প্রবলভাবে আকর্ষণ করতো ইন্‌ফন্‌নার এ্যামেডাস্ মোৎসার্টকে।

অঙ্কের নির্ভুল নিয়মের পথ ধরেই যেন মাত্র পনেরো বছর বয়সে নয়টি সার্থক ঐকতান ও নয়টি গীতি-আলেখ্যের স্রষ্টার দুর্লভ সম্মান লাভ করলো মোৎসার্ট। তার পনেরো থেকে একুশ বছর বয়সের মধ্যেই সুরের জগতে নিজের আসনটি স্থায়ী করে নিলো সে।

অবশ্য অষ্ট্রিয়ার রাজ-পরিবার তার প্রতি কিছুতেই প্রসন্ন হতে পারলো না। যেমন, তার সেই সাফল্যের দিনে অপরাপর সুর-স্রষ্টারা দলাদলির কুৎসিত আবর্তে তার জীবনকে ঠেলে দিয়ে বিশ্ববিশ্রুত সুরকারকে উপবাসে দিনযাপনে প্রায় বাধ্য করে তুলেছিল।

আমরা তাই পরম পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করি যে, একুশ বছর বয়সে তিনি শুধুমাত্র জীবনধারণের জন্য, মামুলি নৃত্যশালায় বাদকের কাজ নিয়েছেন। স্তাঞ্জতীকে বিয়ে করে সে বয়সেই মোৎসার্ট শিশুসন্তান সহ ঘোর সংসারী।

যদিও সুকণ্ঠী ছিল স্তাঞ্জতী, তবু সুর বা ভালোবাসার জন্য নয়, দিদির অন্যায়ের প্রতিবাদে স্বেচ্ছায় কৃতজ্ঞতা জানানোর তাগিদে স্তাঞ্জতী মোৎসার্ট-এর জীবনসঙ্গিনী হয়েএসেছিল একদিন। অথচ স্তাঞ্জতীর বড় বোন আলুইসাকে পেতে চেয়েছিলেন তিনি। ওয়েবার পরিবারের সেই পঞ্চদশীর মুখ চেয়ে প্যারিসের পথে নিজের ভাগ্যকে ফেরানোর জন্য একদিন বেরিয়ে পড়ে-ছিলেন তাই মোৎসার্ট। ভাগ্য ফিরিয়ে ফিরে এলেন তিনি। কিন্তু…। আলুইসা ততদিনে মঞ্চশিল্পীর জীবন নিয়ে তাঁর ধরাছোঁয়ার অনেক বাইরে চলে গেছে।

'আমার কেবলই মনে হতো লোকটা একেবারে সাধারণ।' বিশ্ব-বিশ্রুত সুরকারের প্রতি অবহেলা দেখানোর কথা মনে হলে বেদনাহত হৃদয়ে পরবর্তী জীবনে একথা কতবারই না বলেছে আলুইসা। দিদির অন্যায়ের প্রতিবাদস্বরূপ মোৎসার্ট-এর জীবনে স্ত্রী হয়ে এসেছিল স্তাঞ্জতী। ছোটখাট, মিষ্টিগানের গলার মেয়ে স্তাঞ্জতী ওয়েবার। যার কাছ থেকে আদর্শ গৃহিণীপনা আশা করা বোকামী, যাকে শুধু চঞ্চলতাভরা দিনের সঙ্গিনী হিসেবে পেতে ভালো লাগে, সেই স্তাঞ্জতীকে নিয়ে ভগ্নহৃদয়ে ঘর বাঁধলেন মোৎসার্ট।

ছেলেমেয়েদের অকাল মৃত্যু, স্তাঞ্জতীর চিররুগ্ন শরীর, অর্থের অভাব—এই সমস্ত-কিছুর ছায়া পড়েনি মোৎসার্ট-এর সুরের সংসারে। তাঁর একটি গৎও দুঃখের সুরে নেই। আনন্দ, শুধু কেবল আনন্দই মোৎসার্ট-এর সুরের প্রাণপুরুষ।

(৪)

ভিয়েনার হাঙরের দাঁতের মত অসহ্য শীতের দিনগুলো।

বাজাতে বাজাতে ক্রমশঃ অসাড় হয়ে যেতো আঙুলগুলো। এক টুকরো আগুন জ্বালার আয়োজন নেই ঘরে। একটা কয়লাও নেই।

'ওরা যেন যুগল-নৃত্য করছিল দুজনে। অন্তত একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে যেভাবে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল তাতে তাই-ই মনে হয়।' প্রত্যক্ষদর্শী যুগল-নৃত্য করছে বলে ভাবতে চাইলেও বুঝতে পেরেছিল, সেই নিদারুণ শীতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই একে অন্যকে উত্তপ্ত করবার চেষ্টা করছিল মোৎসার্ট-এর দম্পতি।

কয়েক টুকরো কয়লা পৌঁছে দিয়ে এসেছিল প্রত্যক্ষদর্শী লোকটা। হয়তো সত্যি সত্যি ভিক্ষা করতে হতো তাঁকে, যদি তাঁর সেই সুরবাহা

দিনে একজন উদার ব্যবসায়ীকে তিনি বন্ধু হিসাবে না পেতেন। মোৎসার্ট-এর জীবনীকার মাত্রেই পরম শ্রদ্ধার উচ্চারণ করছে সেই নামটি। পুকবার্গ। বস্তুত পুকবার্গের সাহায্যই তাঁকে ভিক্ষার হাত থেকে রক্ষা করেছিল সেই সময়।

ভিয়েনায় তাঁর ভাগ্যে শীতল অভিনন্দন জুটলেও প্রাগ্-এর মানুষ তাঁকে চিনতে ভুল করলো না। 'দি মেরেজ অব ফিগারো' প্রাগ্-এর প্রাণ-চঞ্চল মানুষের কাছে সুরের সুরধুনীর বার্তা নিয়ে এলো। পথে পথে একটি মাত্র প্রসঙ্গ, কণ্ঠে কণ্ঠে একটিমাত্র সুর, সে সুর মোৎসার্ট-এর 'মেরেজ অব ফিগারো'র। সারা জীবন যত অবহেলা, যত বঞ্চনা জুটেছিল তার সব ব্যথা মুছে দিল প্রাগ্-এর মানুষেরা। তাই নতুন ভাবে, নতুন আশায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি জন্ম দিলেন 'প্রাগ্ সিম্ফনী'র। সৃষ্টি হলো বিখ্যাত গীতিগাথা; 'ডন জিওভানী।'

দুঃখ যতই আসছিল ততই পরিশুদ্ধ হয়ে উঠছিল সুরের আলোয় তাঁর সৃষ্টির জগৎ। বিটোফেনের নবম সিম্ফনীর সাথে আজো সম মর্যাদায় উচ্চারিত হয় মোৎসার্ট-এর নবম সিম্ফনীর নাম।

(৫)

বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ। শরীর রুগ্ন। চারদিকে চরম অনিশ্চয়তা। তবু তার মাঝে রচিত হলো শরীর দেশের আনন্দঘন, মায়ালোকের আশ্চর্য সুর 'দি ম্যাজিক ফ্লুট।'

নিয়মিত অনুষ্ঠানের জন্য কোন মঞ্চ পাওয়া গেল না। মানুষের চরম অবহেলার দিনে এগিয়ে এলেন একজন হৃদয়বান প্রযোজক। নগণ্য একটি অপরিচ্ছন্ন শহরে নিয়মিত অভিনীত হয়ে চললো ম্যাজিক ফ্লুট।

এবারে টনক নড়ল ভিয়েনার।

মোৎসার্টকে অভিনন্দন জানানোর জন্য প্রস্তুত হলো ভিয়েনা এবং ভিয়েনায় তার অনুষ্ঠানের দিন স্থির হয়ে গেলো।

শরীর রুগ্ন। টাইফয়েড আক্রান্ত সুরকার। তাই দলের সঙ্গে তাঁরই যাওয়া হলো না ভিয়েনায়। রোগ-শয্যায় শুয়ে তিনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকলেন অনুষ্ঠানের সন্ধ্যায়। আর ঠিক সময়টিতে প্রলাপের মত ঘড়ির দিকে চোখ রেখে বলতে লাগলেন—

'ঐ তো পর্দা উঠলো। ঐ তো নিশীথরাণি গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করছে। ঐ তো তারা আগুনের ভিতর দিয়ে একটুকু উত্তাপ না লাগিয়েও, একটু না পুড়েও এগিয়ে চলেছে যাদুমাখা বাঁশীর সুরের উৎসে।'

অঝোর বৃষ্টির ধারাবর্ষণের ভিতর দিয়ে একটি শবাধার এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ক্ষণেক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, এখানে-ওখানে বাজ পড়ছিল হঠাৎ। ভিখারী, আত্মহত্যা-কারী ও পলাতকদের কবরের পাশে একটি উন্মুক্ত গর্তে এক সময় নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই শবাধারটি।

বড় অনাদরে, চিরনিদ্রায় মগ্ন উল্‌ফগ্যাং অ্যামেডিয়াস্ মোৎসার্ট। অথচ শতাব্দীর পথ ধরে আজো তাঁর সুর মানুষের সংসারে অমৃত-লোকের আনন্দঘন ধ্বনিতে উচ্চারিত।

জীবনের সমস্ত ব্যথাকে, সমস্ত ব্যর্থতাকে স্বীকার না করে মোৎসার্ট সুরের আগুনের শিখায় মানুষের জন্য আনন্দের অনির্বাণ শিখাটিকে উজ্জ্বল করে গেছেন।

তাঁর জীবন সুরের বর্ম পরে দুঃখের সঙ্গে লড়াই করার আশ্চর্য রূপকাহিনী।

এ্যাকশন

—মোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মৌজা হাসুলিপুর। সাত শত উনসত্তর নম্বর দাগ।

এই নিয়ে মামলা হাইকোর্ট অবধি। কে যায় হটে, কে বেরিয়ে আসে। অবশেষে হাইকোর্ট তার রায় দিল—হাল বিক্রী কবলা অনুযায়ী সাত শত উনসত্তর নম্বর দাগের অধিকারী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রবিজয় রায়চৌধুরী।

হেরে গেলেন ব্রজবল্লভ। অসীম মনোবল আর ঐশ্বরিক শক্তির উপর নির্ভর করে তিনি শেষ কপর্দকটুকু পর্যন্ত সম্বল করে লড়াই করে গেলেন। কিন্তু সে আর কতটুকু!

গতিশীল পৃথিবীর কল্যাণের জন্য যে-সব আইন আছে সেগুলো অর্থের চাপেই চালু হয়। কেবল সত্য, ঈশ্বর, আর মনোবল আইনের সততার মান রক্ষা করতে অক্ষম।

কথাটা ব্রজবল্লভের অনেক আগেই ভাবা উচিত ছিল। ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে শুনন্দা বারবার নিরস্ত করবার চেষ্টা করলেও ব্রজবল্লভের মনের মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাবই ছিল বেশী। কিন্তু এ হাইকোর্টের রায়।

জীর্ণ মন্দিরে রাধামাধবের বিগ্রহ-মূর্তির সামনে শেষবারের মত স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ব্রজবল্লভ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন—আমায় হারিয়ে দিলে দেবতা, সর্বস্বান্ত করে হারিয়ে দিলে! এই প্রথমে মন্দিরের ঘণ্টা বাজলো না। পুরোহিত বিল্বপত্র শুনন্দার আঁচলে তুলে দিলেন না। নিজেরই গোঁয়ার্তুমি-বুদ্ধির ফলে নিঃসম্বল হয়ে ব্রজবল্লভ সাত শত উনসত্তর নম্বর দাগের বাইরে চলে গেলেন।

পরের দিন বীরেন্দ্রবিজয়ের পালা। যে দিন যায়, সে কি আর পুরানো ঢং-এ ফিরে আসে। আসে নতুন রূপে, নতুন তেজে ঐশ্বর্যের সিংহরথে চেপে। যে যত পারো লুটে নাও, ভোগ কর, স্ফূর্তি কর।

ভালমন্দ চিন্তার অতলে যে-জন ডুবে মরে, মাটির বুকে যারা সমান-ভাবে পা ফেলতে জানে না, বীরেন্দ্র-বিজয় তাদের দলে নয়। ভাগ্যকে গড়তে জানেন তিনি। তাই ভাগ্যের দৌলতেই মান-প্রতিপত্তি-খ্যাতি তথা মাটির দখলিকার সবে তিনি অজেয়।

বীরেন্দ্রবিজয় ময়ূরাক্ষী ক্যানেল খোঁড়বার পয়লা নম্বর কন্ট্রাক্টার। তাঁর হাতে বিচিত্ররূপিণী ধরণীর নয়া রূপদানের অনেক ভারী ভারী যন্ত্র। বিজ্ঞানের কি অসীম শক্তি! নিমেষে পাহাড় সমতল হতে পারে, নিমেষে সমতল নদী বনে যেতে পারে। এই শক্তি বীরেন্দ্রবিজয়দের মত লোকদের শক্তিশালী করেছে। তাই তো তারা আজও দুর্জেয়।

পরদিন সাত শত উনসত্তর নম্বর দাগ এই শক্তির দাপটে চমকে চমকে উঠলো। বিরাট আমবাগান ধু-ধু প্রান্তরে পরিণত হল। ট্রাকটারের চালক মন্দির-সমেত রাধামাধবের বিগ্রহমূর্তিকে গুঁড়িয়ে মাটির বুকে মিশিয়ে দিল।

ধীরে ধীরে ইট-সিমেন্ট, লোহা-লক্কর, রাজমিস্ত্রী-কুলি-কামীন এসে গেল। নতুন প্রাসাদের ভিত্ খোঁড়া হ'ল বিরাট এলাকা জুড়ে।

হাসুলিপুর মৌজার বাসিন্দারা সবই দেখলো। দেখলো দিনের আলোর মত সবই স্বচ্ছ। কোথাও কোন বাধা নেই, অবিরাম কাজ চলেছে—এ যেন কাজের প্রসেশন।

কই মাটি তো কাঁপল না? আকাশ তো ফাটল না? যাদের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল ক্রমেই তারা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারলো। হাসুলিপুর মৌজার গরীব মানুষেরা বীরেন্দ্রবিজয়ের প্রা সা দ-নি র্মা ণে গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় পেয়ে ধন্য হ'ল।

দিন আবার ঘুরে গেল।

এখন কেবল বীরেন্দ্রবিজয়ের 'ইন্দ্রভিলা' আধুনিক ঐশ্বর্যসম্ভারে দম্ভ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উন্নতি ও কালচারের যে কোন সোপানের উপর 'ইন্দ্রভিলা', চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম।

গোলমালটা বাধলো অন্যদিক থেকে। পৃথিবীর যে কোন ঘটনার উপর যে কোন ছুত নিয়ে একটু-আধটু গোলমাল বেধেই থাকে। গোলমাল মানে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ। তাই বলে তো সেন্টিমেন্টকে পুষে রেখে অগ্রগতিকে বন্ধ রাখা যায় না!

না, এ-ধরনের চিন্তাধারা কোনদিন বীরেন্দ্রবিজয়কে আচ্ছন্ন করেনি,—জীবনের শুরু থেকে আজও পর্যন্ত।

সুস্মিতা কেন যে মনের শক্তি হারিয়ে বসলো সেইটেই আশ্চর্য। সুস্মিতার মস্তিষ্কে যেন বিকৃতি ধরেছে। সময়ে অসময়ে বার বার বলছেন—ভাল লাগছে না এসব-কিছু। একটা কিছু উপায় কর।

—কি ভাল লাগছে না?

মোজাইক মেঝের উপর বীরেন্দ্র-

বিজয়ের বিরক্তিজমিত শব্দরেখা অসহিষ্ণু হয়ে উঠে।

—এই লক্ষ লক্ষ টাকার অপব্যয়। একটি পরিবারের জন্তে এত কিসের প্রয়োজন? একমাত্র মেয়ে ইন্দ্রাণীর কি দশা হচ্ছে চোখে দেখতে পাচ্ছো? তোমার সখের গাড়ীতে চেপে যখন যা খুশী সে তাই করে বেড়াচ্ছে। এই বয়সে এটা কি ভাল? এটা কি রকম জীবন?

বীরেন্দ্রবিজয় থামতে বাধ্য হয়। ইন্দ্রাণী ক্রমশঃই শাসনের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাকে সংযমের মধ্যে আনা এখন অসম্ভব। তার নিজস্ব মত, নিজস্ব পথ, নিজস্ব গতিবিধি গড়ে উঠেছে। তবুও সুমিতার এই কথাটা একেবারে ফেলে দেবার মত নয়।

সুমিতা আবার বলেন—মেয়ের ইজ্জতে বাপের ইজ্জত। তোমার মাথা হেঁট করে দেবে ইন্দ্রাণী।

বীরেন্দ্রবিজয় চমকে ওঠেন। দীর্ঘ দিন ধরে তিনি অর্থের পিছনে দৌড়-ঝাঁপ করেছেন। হঠাৎ যেন মনে হলো তাঁর একটা সংসার আছে; সে সংসারের কিছু দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্বই সংসারের শান্তি বজায় রাখে। স্বামীর কর্তব্যে অনেকখানি অবহেলা থাকলেও সুমিতা সেটুকু মেনে নিয়েছেন। কিন্তু পিতার কর্তব্যে অবহেলা হলে ইন্দ্রাণীর সেটুকু মেনে নেওয়ার মত ধৈর্য্য নেই।

ইন্দ্রাণী এসে জানায়—বাপি, আমার জন্তে একটা গাড়ী কিনে দাও।

—কেন মা?

—তোমার জন্তে আজকাল সব-সময়েই গাড়ী এনগেজ্ড্ থাকে।

—ওতে আমার অসুবিধা হয়।

—তুমি পায়ে হেঁটে চলতে পারো না?

—ওঃ বাপি, তুমিও দেখছি মায়ের মত হয়ে গেছ। সোসাইটিতে মুখ দেখাব কি করে?

ইন্দ্রাণীর লিপ্ষ্টিকে রাঙা ঠোঁটে বিরক্তির সঞ্চার হয়। বব্-ছাঁট চুল দুলিয়ে সে তখনই অন্ত ঘরে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

এবার বীরেন্দ্রবিজয়ের ভাববার পালা। ইন্দ্রাণীকে যুগোপযোগী মানুষ করে তোলার ত্রুটি রাখেননি তিনি। তবুও প্রচুর অর্থব্যয়ে, আর তার অধীত বিত্তায় একটা যেন কিম্ভূতকিমাকার সৃষ্টি হ'ল, সেটাকে মেনে নিতে সুমিতার কষ্ট হয়। বীরেন্দ্রবিজয়ও……

সুমিতাকে পাশের ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকতে হয়। বাপ ও মেয়ের কথাবার্ত্তা নিজের কানে শোনবার একটা গোপন ইচ্ছা তাঁর প্রবল হয়ে ওঠে।

ইন্দ্রাণী নিজের শোবার ঘরে ঢোকে। বহুমূল্য আসবাবে পূর্ণ আধুনিক রুচি-সম্মত ঘর। আড়াল থেকে সুমিতা লক্ষ্য করেন। তিনি দেখলেন, ইন্দ্রাণী গড্রেজের আলমারী থেকে লাল কাপড়ে মোড়া একটা পুঁথি বার করলো।

ওটা কি?

একটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। কি সর্বনাশ! ইন্দ্রাণীর সৌখীন আল-মারীতে রুদ্রাক্ষের মালা? আর—লাল পাড় গরদের শাড়ি? সযত্নে গরদের শাড়িখানি পরে ইন্দ্রাণী গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলিয়ে নেয়। দু'হাত দিয়ে পুঁথিটি তুলে নিয়ে সে মাথায় ঠেকায়।

ওদিকে সুমিতার অলক্ষ্যে আর একটি ঘটনা ঘটে গেল। এক সুদর্শন যুবক উন্নত ললাটে যেন জয়টীকা নিয়ে বীরেন্দ্রবিজয়ের সামনে এসে দাঁড়ালো, বললো—আমার নাম কেশবনাথ। আমি দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পাশ করবার পর তন্ত্রসাধনা নিয়ে গবেষণা সুরু করেছি। আপনার এই সাত শত উদ্যমভূমি নদর বাগের নৈঋতকোণে একটি পুরোনো বটগাছ আছে যেটিকে আপনি আধুনিক যন্ত্র দিয়ে উড়িয়ে দেননি; ওখানে আমি কিছুদিন ক্যাম্প খাটিয়ে থাকার অনুমতি চাইছি।

বীরেন্দ্রবিজয় অবাক হয়ে শুনছিলেন। কয়েক সেকেণ্ড পরে উত্তর দিলেন—তোমার এই সাধু প্রস্তাবে আমি সম্মত। কিন্তু একটা জলা-জঙ্গলা জায়গা বলেই তো ওটাকে আমার ফেন্সিং-এর বাইরে রেখেছি। তুমি আমার এখানে থেকেই তো গবেষণা চালাতে পারো।

কেশবনাথ উত্তর দিল—মাপ করবেন, গুরুর নিষেধ, আমি অপরের অন্ন গ্রহণ করি না।

কেশবনাথ ঝড়ের গতিতে এসেছিল, আবার বীরেন্দ্রবিজয়ের মনে ঝড় তুলে দিয়ে চলে গেল।

এসব কি? এমন সুন্দর শিক্ষিত যুবক—এই বয়সে গুরুকরণ, তন্ত্রসাধনা নিয়ে গবেষণা, দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষা এ-সবের কি মূল্য থাকতে পারে? ভবিষ্যতের পাথেয় সংগ্রহ হবে কি এই সব দিয়ে? যে-যুগে মেশিনের গায়ে হাতের মুঠোর চাপ দিয়ে আধুনিক রুচিসম্মত জীবন গড়ে তুলতে হবে, যে-যুগে পৃথিবীটাকে একটা পারিবারিক আওতার মধ্যে আনতে হবে, সে-যুগে এ-সব চিন্তাধারা নেহাতই আত্ম-কেন্দ্রিক। ওতে দেশের কল্যাণ নেই, যুগের কল্যাণ নেই—আছে কেবল আত্মসমাহিত নিবৃত্তি।

চিন্তার ছেদ পড়লো সুমিতার আবির্ভাবে। সুমিতা এসেছেন তাড়াতাড়ি ইন্দ্রাণীর আজকের খবর নিয়ে। এসেই ফিস্ ফিস্ করে ইন্দ্রাণীর চমকপ্রদ খবরটি বীরেন্দ্রবিজয়ের কানে পৌঁছে দিলেন।

বীরেন্দ্রবিজয়ের দু'চোখে জাগে বিস্ময়। সেই সঙ্গে যেন উদয় হয় অদূর ভবিষ্যতের একটা প্রবল ইচ্ছার মায়াময় ইঙ্গিত।

সুমিতা বললেন—দেখলে, এ দূষিত জায়গা। তাছাড়া অত পয়সা খরচ করে এ জায়গাটার উপর এত মায়াই বা কেন? এ জায়গা পরিষ্কার করবার সময় সন্ন্যেসী ঠাকুর ঠিকই বলেছিলেন……

বীরেন্দ্রবিজয় উত্তর দিলেন—কিন্তু সন্ন্যেসী ঠাকুর তো সেদিন একথা বলেননি যে, এই জায়গার দৌলতেই একদিন এক আধুনিক সন্ন্যেসী তোমার ঘরের জামাই হয়ে আসবে।

তাঁদের কথাবার্ত্তার মাঝখানে ভৈরবী-বেশে ইন্দ্রাণী এসে উপস্থিত হয়। হাতে তার লাল কাপড়ে মোড়া সেই পুঁথি।

ইন্দ্রাণী বললো—বাপি, এই পুঁথিটা সেদিন কে যেন এক ভদ্রলোক আমার গাড়িতে রেখে চলে গেছে। কন্যার নব তপস্বিনীর রূপসজ্জায় পিতা চিন্তিত হ'লেন, বলেন—তোমার এ বেশ কেন মা?

—ওঃ, বাপি, তোমাদের যে কি হয়েছে! বাইরে বেরোলেই বলো মেম সাহেব সেজেছিস কেন? ঘরে বসে ঈশ্বরের উপাসনা করলেও বলো, এ ভৈরবী বেশ কেন? তবে কি কনে-চন্দন দিয়ে বধূবেশে এবার বিয়ের করতে চাও বাপি?

ইন্দ্রাণীর এই মেজাজটা যেন মাকে উদ্দেশ করেই দেখালো। সে আর দাঁড়ায় না, চলে গেল।

সুমিতা সবই বুঝলেন, নীরব হয়ে থাকেন।

বীরেন্দ্রবিজয় বললেন—এখন যাও, ওকে ফলো করো। দেখ, তোমার সি. আই. ডি.র পাতায় যদি কোন নতুন তথ্যের আবিষ্কার হয়।

রাগে ও দুঃখে সুমিতার গণ্ডদেশ লাল হয়ে ওঠে।

ঠিক এই সময়েই ভৃত্য এসে খবর দিল, কেশববাবু এসেছেন।

বীরেন্দ্রবিজয় সুমিতার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে দেখলেন; তারপর বেশ আগ্রহের সঙ্গেই বললেন—কই সে? ডাকো ডাকো।

ভৃত্য প্রস্থান করলে বীরেন্দ্র-বিজয় সহাস্যে নম্র-স্বরে বললেন—আমি তোমার জামাই সিলেক্ট করে ফেলেছি। সে আসছে।

কেশবনাথ একটী দৈনিক পত্র হাতে নিয়ে ঢুকলো। বললো—আপনার মেয়ে ইন্দ্রাণী দেবী একটি পুঁথি পেয়েছেন বলে পেপারে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। আমিই তার যথার্থ মালিক। আমায় ফেরত দেওয়া হোক।

বীরেন্দ্রবিজয় যথাসম্ভব গম্ভীর-স্বরে উত্তর দিলেন—তার প্রমাণ?

স্বামীর পক্ষে এতখানি অশোভন গাম্ভীর্য্য সুমিতার ভাল লাগলো না। মাতৃসুলভ-কণ্ঠে বলে ফেললেন—তুমি দাঁড়িয়ে কেন বাবা, ব'সো।

লাল কাপড়ে বাঁধা পুঁথিটা টেবিলের উপরেই ছিল। সেই দিকে দৃষ্টি পড়ায় কেশবনাথ বললো—এই যে, এই তো আমার পুঁথি।

মুহূর্তের মধ্যে বীরেন্দ্রবিজয় সেটীকে সরিয়ে নিয়ে ড্রয়ারের মধ্যে রাখলেন। বীরেন্দ্রবিজয়ের অনিচ্ছা বুঝে কেশবনাথ বললে—তা হ'লে দেবেন না?

—না। পুঁথির যথার্থ ইতিহাস না জানলে দিতে বাধ্য নই।

—তবে শুনুন। ওতে ধর্মকাহিনী নেই। সত্যিকারের ইতিহাস লিপি-বদ্ধ আছে। দেব ও অসুরের প্রশস্তি নয়, মানুষের কথা। আপনার এই সাত শত উনসত্তর নম্বর দাগের সময় থেকে কালের পরিবর্তনের ইতিহাস। এক সন্ন্যাসী ঠাকুর বহুকষ্টে সেই ইতি-বৃত্ত সংগ্রহ ক'রে পালকের কলম দিয়ে লিপিবদ্ধ করে গেছেন আগামী যুগের জন্য। শুনবেন সেই সব কথা? ভাল লাগবে কি? ইতিমধ্যেই আমি পুঁথিটা বার-কয়েক পড়ে ফেলেছি।

বীরেন্দ্রবিজয়ের শোনার ইচ্ছা অদম্য হলেও মনে করলেন, এ সময়ে যেন সুমিতার না থাকাই ভাল। কারণ, বিষয়ের উপর কোন গলদ থাকলেও পুরুষ যতখানি শক্ত হতে পারে, মেয়েরা তা পারে না, তারা বরং উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে। স্ত্রীবুদ্ধি সম্বল করে বীরেন্দ্র-বিজয় আজ পর্যন্ত পা ফেলতে অভ্যস্ত হন নি। তাই স্ত্রীকে সরাবার জন্য তাঁকে বললেন—এ-সময় ইন্দ্রাণীকেও ডাকলে ভাল হয়।

সুমিতা তখন মেয়েকে ধরে আনবার জন্য বাইরে গেলেন।

এবার বীরেন্দ্রবিজয় কেশবনাথকে বললেন—বল।

কেশবনাথ উত্তর দিল—সংক্ষেপে বলি। একটুখানি ঘটনাকে বৃহৎ পট-ভূমিকায় বলবার মত হাতে এখন সময় নেই। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, শুধু আপনার এই সাত শত উনসত্তর নম্বর দাগ কেন, লাট ইমাদপুরের বৃহত্তর এলাকা জুড়ে ছিল ভয়ঙ্কর জঙ্গল। এই জঙ্গলে তান্ত্রিকাচার্য্য অঘোরানন্দ তাঁর স্বরচিত একশত আটটি শবদেহের উপর তৈরী মন্ত্রসিদ্ধ আসনে তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে-ছিলেন। এই অঘোরানন্দের মৃত্যুর অনেকদিন পরে দেশের দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতেরা সমস্ত জায়গাটা জুড়ে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। তারা একটা কালীমন্দিরও তৈরী করেছিল এখানে। এখনও শোনা যায় আপনার এই ইন্দ্রভিলার নৈর্ঋতকোণে অবস্থিত ওই বটগাছের তলায় ডাকাতরা সুড়ঙ্গ কেটে একটা

গোপন ধনভাণ্ডারও তৈরী করেছিল। রকম, তখন 'জোর যার মুলুক তার' এই নিয়মে চলছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা নিয়ে জমিদাররা তখনও সমস্তে তাদের আধিপত্যের শিকড় সমূলে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। ডাকাতরাও সুযোগমত ধনীর ধনরত্ন লুঠ করতে পশ্চাৎপদ হতো না—এমনি সময়।

হ্যাঁ, ঠিক এমনি সময় এক ক্ষুদে ভূস্বামী উপানন্দ রায় চৌধুরী ডাকাতদের গোপন সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করে ফেললেন। গোরা সাহেবদের সাহায্য নিয়ে উপানন্দ ডাকাতদের ধনভাণ্ডার জয় করে নিলেন। লুঠের মাল আর একবার লুণ্ঠিত হল। তার সঙ্গে কিছু রক্তারক্তিও হল। সাহেবরা লুটের মালের মোটা অংশ পেয়ে খুশী হয়ে নতুন জরীপ-করা লাট ইমাদপুরের গোটা এলাকার মালিকানা স্বত্ব উপানন্দের উপর ছেড়ে দিল।

উপানন্দের সহধর্মিণী ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা মহিলা। রাধামাধবের নিত্য সেবা করতেন তিনি। গরীব প্রজাদের প্রসাদ বিতরণ করে তবে অন্ন গ্রহণ করতেন। তিনি স্বামীকে বললেন। বললেন—তুমি এই পাপের অর্থে ভূস্বামী হয়েছ। এ টিঁকবে না। এই অর্থে পরকালের কাজ কর। রাধামাধবের মন্দির বানিয়ে দাও।

স্ত্রীর প্রতি একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা ছিল উপানন্দের। তিনি তা-ই করলেন।

রাসপূর্ণিমার দিন অসংখ্য ভক্তরা আসত। বিরাট উৎসব বসতো। সুধাংশু দেবী দু'হাত ভরে ভক্তদের দান করতেন। তখন উপানন্দ দেহ রেখেছেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। রাধামাধবের পুরোহিতের পরামর্শে সুধাংশু দেবী আপন ভগিনীপুত্রকে দত্তক নিলেন।

সুধাংশু দেবীর যখন ওপারের ডাক আসবার সময় হলো তখন তিনি দেখলেন, দত্তক পুত্র শ্রীধর ক্রমশঃ অসংযমী মাতাল এবং দুশ্চরিত্র হয়ে উঠছে। এই সব অসদ্গুণের জন্য একটা ক্রূরতা শ্রীধরের সর্বাঙ্গে ফুটে উঠেছে।

মৃত্যুর পূর্বে সুধাংশু দেবী পুরোহিতকে ডেকে উইল করে গেলেন। রাধামাধবের মন্দির-সহ সমস্ত এস্টেট দেবোত্তর হলো। ভারপ্রাপ্ত পুরোহিত তার রক্ষণাবেক্ষণ করবে। এই পুরোহিত-বংশেরই অধস্তন ব্রজবল্লভকে হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী আপনি হটিয়ে দিয়ে এই সাত শত উনসত্তর নম্বর দাগের অধিকারী হয়েছেন। আপনার পূর্বপুরুষ শ্রীধররায় চৌধুরী যে পাপ অর্জন করেছিল তারই শেষ পরিণতিতে আপনি ট্রাক্টর দিয়ে রাধামাধবের মন্দির গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। অর্থের প্রাচুর্যে ইন্দ্রভিলা বানিয়েছেন।

কিন্তু আমার সাধকগুরু লিখে গেছেন, লাট ইমাদপুরের বাসিন্দারা আপনাকে ক্ষমা করেনি। প্রেমের দেবতা প্রেম দিয়েই আপনাকে জয় করবে। এতদিন যা-কিছু ঘটেছে, আমাদের দর্শনের ভাষায় কতকগুলো কম্প্লেক্সের ধ্বংস হয়েছে মাত্র। তবে এখনও বাকি রয়েছে বড়ো মোহর আপনার ওই বটবৃক্ষের নীচে মাটির তলে পোঁতা আছে। তার উদ্ধার প্রয়োজন।······

বক্তব্য শেষ করে কেশবনাথ ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে যায়।

বীরেন্দ্রবিজয় সম্মোহিতপ্রায় হয়ে শুনছিলেন। কেশবের গতিরোধ করবার মত তাঁর কোন শক্তি ছিল না।

ইন্দ্রাণীকে একরকম বধূবেশে সাজিয়ে নিয়ে সুস্মিতা এলেন অনেক পরে। বীরেন্দ্রবিজয় তখন ওদের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়েছেন।

পরদিন হাসুলিপুর মৌজার বাসিন্দারা দেখলো বুড়ো বটগাছটাকে উপড়ে ফেলার আয়োজন চলেছে। জনপঞ্চাশেক কুলি মমতাহীন জল্লাদের মতই প্রবল বিক্রমে গাঁইতি চালাচ্ছে বটগাছের শিকড় বেয়ে।

······সাত শত উনসত্তর নম্বর দাগের বহুদূরে একটি ছোট্ট ঘরে তখন ইন্দ্রাণী সম্পূর্ণরূপে সুনন্দার বুকে আশ্রয় নিয়েছে।

ইন্দ্রাণী বলছে—কি হবে মা?

সুনন্দা উত্তর দিচ্ছেন—ভয় কি মা! আমার প্রেমের দেবতা প্রেম দিয়েই জয় করবে। তাই তো তোমার সৃষ্টি। কেশবনাথ বললো—আমার সন্ন্যাসী ঠাকুর বলেন, এ হাইকোর্টের রায় নয়, ইতিহাসের ওলটপালট। এটা ইতিহাসের সৃষ্টি। এ তারই এ্যাকশন।

সুনন্দার গৃহে শঙ্খধ্বনি উঠলো।

বুদ্ধি যেখানে অচল

—শ্রীতারবাজ

একটা বড় বুড়ো নিমগাছ। বাঁশের ঠাস্ বুনোনী বেড়া, টিনের চালা-ঘরটায় দুটী দুরন্ত বালক ঘুমিয়ে পড়েছে। খালি গা', হাফ্‌প্যান্ট পরা। সামনে দুরন্ত পদ্মানদীর উত্তাল তরঙ্গমালার একটানা শব্দ। দিনরাত নদীর পাড়ে খেলাধুলা আর নদীর জলে সাধ্যমত জলকেলি ক'রে বর্ষার এই কীর্ত্তি-নাশার ভয়ঙ্কর চেহারাতেও এদের ভয়-ডর নেই। বাইরে অমাবস্যার সূচীভেদ্য অন্ধকার। দু' চারটে শেয়াল শকুনের দূরের চীৎকার আর নদীর একঘেয়ে কলতান শুনতে শুনতে এদের চঞ্চলতা কখন থেমে গেছে কে জানে।

একটু গভীর রাতে একটি বালকের ঘুম ভেঙ্গে গেছে। চিৎ হ'য়ে শু'য়ে পায়ের ধারে বেড়ার দিকে দৃষ্টি পড়তেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছে। কিন্তু সাথে সাথে মিলিয়ে গেছে বেড়ায় সংলগ্ন আলোর মূর্ত্তিখানা। হয়তো দূরাগত ষ্টিমারের সার্চ লাইট পড়েছিল। নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে এলো বালক। কী অন্ধকার! ষ্টিমার তো দূরের কথা একটা জোনোকির মিটমিটে আলোও কোথাও নেই। কেউ টর্চ ফেলেছিল হয়তো। অনেকক্ষণ এদিক্-ওদিক তাকিয়ে দেখলো কেউ কোথাও নেই, কেবল মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার আকাশ আর ঝ'ড়ো হাওয়ার তুমুল তাণ্ডব। দুনিয়াটা যেন ক্ষ্যাপা প্রকৃতির অবাধ দাপাদাপিতে ভরে গেছে। আস্তে ঘরে ঢুকে কবাট লাগিয়ে শুয়ে পড়লো। ঘুম এলো না। পাশে বন্ধুটি কি আরামেই না ঘুমুচ্ছে!

এ কী! আবার সেই আলোর মানুষ!—চতুর্ভুজ মূর্তি!—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী নারায়ণ! কী সুন্দর! নবদূর্ব্বাদলশ্যাম! অধরে কী মধুর হাসি! চোখে কী সুন্দর স্নিগ্ধদৃষ্টি! বালকটী তাকিয়েই আছে—নির্ব্বাক, ভয়হীন বিস্ময়ে। কি করবে সে? চিৎ হ'য়ে শুয়ে বেড়ায় প্রতিফলিত মূর্তিকে দু' হাত জোড় করে প্রণাম করলো। মূর্তির চোখে-মুখে মিষ্টি হাসি। এবার উঠে বসতে গিয়েই আবার অন্ধকার। বাইরে অন্ধকার, ঘরে আরও জমাট অন্ধকার! বড় দুর্ভাবনায় পড়ে গেল। বন্ধু রাখালকে ডেকে তুলবে? না। যদি ভয় পায়, নারায়ণ যদি আর না আসেন? তাই মনের আবেগে আকুল প্রার্থনা জানায়—ওগো তুমি যদি সেই-ই হও, দয়া ক'রে যদি দু'বার এলে,—আর একবার এসো না!—কিন্তু সে আসে কই! অধীর অপেক্ষায় থেকে থেকে বালকটি আবার শু'য়ে পড়ে। সেই বয়সে যতটা বুদ্ধি খাটান চলে—তাই দিয়ে বিচার ক'রে চলেছে—এ আলোময় চতুর্ভুজ মূর্ত্তি কে!—আর পারি না—চোখ বুজতে গিয়েই—আবার এসেছ! যদি তুমি সত্যিই সেই চতুর্ভুজ নারায়ণ, তা' হলে আমার মনের সংশয় মিটাও! তোমার ডান হাতখানা উপরে তোল! অমনি স্মিতহাস্যে মূর্ত্তি উপরের ডান হাতখানা উপরে উঠালো।—আচ্ছা, এবার নামাও।—আমি উঠতে গেলেই তুমি পালিয়ে যাও,—তুমি একটিবার আমার কাছে এসো না!—বেড়া ছেড়ে দু'পা এগিয়ে এসে মূর্ত্তিখানা হাসিমুখে দাঁড়াল! বালকটি বললো—এবার উপরের বাঁ-হাতখানা মাথার উপর তোল! বাঁ-হাত মাথায় উত্তোলিত হল। আমায় আশীর্ব্বাদ ক'র। চার হাত সামনে প্রসারিত করে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি যেন অন্তর দিয়ে আশীর্ব্বাদ জানালো; তারপর অন্তর্হিত হ'ল। অস্ফুট-স্বরে বালকটি বললো—তবু—তবুও বিশ্বাস হয় না, তুমি আর একবার এসো!—অমনি সেই দুর্লভ-সুন্দর জীবন্ত চতুর্ভুজের আবির্ভাব! আমার বিশ্বাস পাকা ক'রে দাও! তুমি এবার তোমার উপরের দু' হাত মাথার উপর রাখ! —চতুর্ভুজ মূর্ত্তি এবার যেন মুক্ত হাসিতে ফেটে পড়তে চায়। মাথা নাড়িয়ে, হাত নাড়িয়ে, মধু ঝরিয়ে, প্রাণ কেড়ে নিয়ে স্পষ্ট যেন বলে গেল,—আর নয়, এবার আসি!—মূর্ত্তিখানা মিলিয়ে গেল।—লাফ দিয়ে উঠে একটানে দরজাটা খুলে বালকটি বাইরে এসে চিৎকার ক'রে বললো—ওগো তুমি কে, তুমি কোথায়, তুমি কেন এসেছিলে!—বাইরে ঘন-ঘোর অন্ধকার, পাগলা বাতাসের অশ্রান্ত কলরোল। সামনে সীমাহীন দুস্তর পদ্মা।—হঠাৎ বন্ধুটি ঘর থেকে চিৎকার করে বললো—রাজা! তুই কোথায়? আমার ভয় লাগছে।—রাজা ঘরে এলো—গম্ভীরস্বরে বললো—"তুই এত ভীতু! এই তো আমি,—বাইরে একটু দাঁড়িয়েছিলাম।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাটি ১৮৯৪ সালের। তখনকার বালক-বন্ধুদের ঐ 'রাজা'টিই আজকের শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র।

স্বাস্থ্য ও সদাচার

—জীবন পূজারী

স্বাস্থ্যকে সুস্থ, সুন্দর ও কর্মঠ করে যদি আমরা রাখতে চাই, তা'হলে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হবে আমাদের আহারের প্রতি। আহারশুদ্ধি থেকেই হয় সত্ত্বশুদ্ধি। স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতিশীল আহার্য গ্রহণ করাই প্রত্যেকের পক্ষে উচিত। সুস্বাদু হইলেও অসঙ্গতিশীল আহার্য স্বাস্থ্যকে ক্ষুণ্ণ করে। যে খাদ্যগুলি শরীরকোষের বিকৃতি সৃষ্টি করে না, সে-খাদ্যই স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। এইদিকে লক্ষ্য রেখেই সব সময় আহার্য গ্রহণ করতে হবে। প্রাক্তন অভ্যাস ও জিহ্বার দ্বারা পরিচালিত হলে চলবে না।

নিরামিষ আহার অর্থাৎ উদ্ভিজ্জাত খাদ্যই সর্বতোভাবে সমীচীন। কারণ তা' আমাদের কোষগুলিকে পরিপোষণ ক'রে জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলে। কিন্তু যাতে তা' অসম্মিলন-দুষ্ট না হয় সেদিকেও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। অসম্মিলন-দুষ্ট খাদ্য ক্ষতিকারক। মাছ মাংসের শারীর-সঙ্গতি যে-বিধানায় বিধায়িত, আমাদের শারীর-কোষগুলি ঠিক তেমনতর নয়। তাই মাছ মাংস আহার্যরূপে সঙ্গতিশীল নয়। আমিষ আহার শারীর-বিধানের সমীচীন সাম্য বজায় রাখে না, শারীর-বিধানকে উত্তেজিত ক'রে তোলে, বিষ-ক্রিয়ার সৃষ্টি করে, এবং তা' স্বাস্থ্যকে তো অসুস্থ করেই, আয়ুকেও সংক্ষিপ্ত করে দেয়। অ তি রি ক্ত আ হা র, অনাহার (রুগ্ন অবস্থা ছাড়া), এবং ক্ষুধাকে জব্দ করে আহারও শরীর-পোষণী নয়। আহার মানেই হচ্ছে—যার দ্বারা শক্তি আহৃত হয় এবং সেই আহার যাতে শারীর-বিধানের সহিত সঙ্গতিশীল হয়, শরীর ও মনের কোন বিক্ষোভের সৃষ্টি না করে, সেই দিকে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। এই ভাবে খাদ্যাখাদ্য বিচার করে যদি চলা না যায়, তাতে দেহ ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি তো হয়ই, তাছাড়া মনের এবং আমাদের সূক্ষ্মবোধগুলির ও পরমায়ুরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়।

অম্-ধাতু মানেই হচ্ছে রোগ। আমিষ খেলেই রোগের সৃষ্টি হয়, তাই নিরামিষ খাদ্যই শ্রেষ্ঠ এবং এতে জীবনীশক্তি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

পঙ্‌ক্তি-ভোজন না করাই ভাল। কোন ক্ষেত্রে যদি করতেই হয়, তা'হলে যাতে অন্যের হাঁচি, কাশি, থুথু, নিঃশ্বাস বা বাতাসের সাথে আমাদের ভিতরে যেতে না পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে ততখানি দূরত্ব অবলম্বন করাই একান্ত বিধেয়।

অন্যের বাসন ব্যবহার না করাই ভাল। করতে হলেও উপযুক্তভাবে পরিশুদ্ধ করে করা উচিত। আর ব্যাধিমুক্ত নিকটগুরুজন ছাড়া কারো এঁটোপাতে না খাওয়া সর্বাংশে শ্রেয়। এগুলির অপলাপে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি।

অন্যের ব্যবহৃত বিছানা, কাপড়, বালিশ ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত নয়। আবার নিজের ব্যবহৃত বিছানা, কাপড়, বালিশ ইত্যাদি অন্যকে ব্যবহারের জন্য না দেওয়া ভাল। যদি দিতেই হয়, তা'হলে উপযুক্তভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেওয়া উচিত এবং তার ব্যবহারের পর পুনরায় উপযুক্তভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নিয়ে ব্যবহার করা উচিত।

আহার্য যেখানে তৈরী হয়, অর্থাৎ আমাদের রান্নাঘরের দিকেও লক্ষ্য রাখা একান্ত অপরিহার্য। রান্নাঘর সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে যাতে রান্নাঘরের আবহাওয়া কোন প্রকারে দূষিত হয়ে উঠতে না পারে। আর যারা রান্না করবে তাদের স্বাস্থ্য যেন সহজ ও ব্যাধিমুক্ত থাকে। সৎ-চিন্তা ও সদাচারপরায়ণ হয়ে রান্নার কাজে যাওয়া উচিত। মানুষের মনের ভাবও আহার্যের মধ্য দিয়ে সংক্রামিত হয়। রান্না করার সময় যে সমস্ত কাপড় চোপড়ের প্রয়োজন, সেগুলি বিশেষভাবে পরিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন এবং ঐগুলি আলাদা করে রাখা দরকার। কারণ কাপড় চোপড়ের মধ্য দিয়েও সংক্রমণের আশঙ্কা খুবই। বাসি কাপড়ে বা বাইরে থেকে এসে সেই জামা-কাপড়ে রান্নাঘরে ঢোকা কখনও উচিত নয়। এই বিষয়গুলির সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অধিকাংশের কোন খেয়াল নেই। মায়েদের মধ্যে অনেককে দেখেছি, রান্না করার সময় সব চাইতে ময়লা কাপড় চোপড় পরেই রান্নাঘরে ঢোকেন—নিত্য সেগুলি কাচারও কোন বালাই নেই। অথচ একটু বেড়াতে বেরুবার সময় পরিষ্কার ও ইস্ত্রী করা জামা কাপড় না হলেই মেজাজ বিগড়ে যায়। বাইরের সম্বন্ধে আমরা যতখানি সচেতন, ঘরের ব্যাপারে যেখানে আমাদের জীবন নি র্ভ র করছে সে-সম্বন্ধে যদি এতটুকুও সচেতন থাকতাম তা'হলে যে কত বিপাকের হাত থেকে রক্ষা পেতাম তার ইয়ত্তা নেই। এগুলি কিন্তু অভাববশতঃ নয়, স্বভাববশতঃ—জীবন সম্পর্কে উদাসীনতার জন্য। দেখেছি, রান্নাঘরে একদিকে রান্না করা

হচ্ছে, খাওয়া দাওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে ছেলেমেয়ে হেগে রেখেছে—তা সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার করারও সময় নেই। আরও কত কি! অনেক জায়গায় দেখেছি—সব চাইতে অপরিষ্কার ঘর যদি থাকে—তা' রান্নাঘর। পুরুষদের মধ্যেও যত লেখাপড়াই জানুক—অনেককে দেখেছি—বাইরে থেকে ঘুরে এসে হাতপা না ধুয়ে, জামা-কাপড় না ছেড়ে এমন কি বাইরে থেকে আসা জুতো পায়েই দিব্যি খেতে বসে গেছে। এ সব কি আর্থিক অভাবের জন্য? অনেক মায়েদের দেখেছি, ছেলেমেয়েকে শৌচকর্ম করিয়ে সেই হাত কোন রকমে একটু জল দিয়ে ধুয়ে আবার সেই হাতেই রান্না করছে এবং অন্যদের খেতে দিচ্ছে। তাই রোগ-বালাই আমাদের হামেশাই লেগে থাকবে না কেন?—ক্ষীণ ও দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী আমরা হবো না তো হবে কারা? এ-সব ব্যাপারে সরকারই বা কি করবেন?

রান্না করার সময় হাঁচি, কাশি, হাইতোলা, কথা বলাও ভাল নহে। রান্না করতে করতে যদি বাইরে যেতে হয়, তাহলে হাত, পা, মুখ, নাক, চোখ ভালো করে ধুয়ে আবার রান্না ঘরে ঢোকা উচিত। জীবাণু-নাশক পদার্থের দ্বারা রান্নাঘর পরি-শোধিত রাখা সব সময়ই কর্ত্তব্য। রান্না করার পূর্বে বা রক্ষিত বস্তু স্পর্শ করার পূর্বে ভাল করে হাত ধুয়ে নেওয়া দরকার। রান্না করতে করতে কিছু মুখেও দিতে নেই। একটু ব্যাধির লক্ষণ দেখা দিলেই রান্নাঘরে এবং রান্নার কাজে ও পরিবেশনে যাওয়া কোন মতেই সমীচীন নহে।

স্বাস্থ্য ও পরমায়ুর ব্যাপারে বিহার অর্থাৎ যৌনসংস্রব সম্বন্ধেও সংযমী হওয়া প্রয়োজন। এই সংযমের অভাবে নিজেরা তো দিন দিন ক্ষিন্ন হতে থাকবোই, তাছাড়া সন্তানসন্ততি যা' হবে তাও ক্ষিন্ন ও দুর্বল হয়েই জন্মাবে।

সুস্বাস্থ্য ও পরমায়ুর অধিকারী হতে হলে, জীবনকে শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে উপভোগ করতে হলে যে সদাচারগুলি প্রত্যেকেরই নিত্য পরিপালন করে চলা উচিত, সে-সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে আলোচনা করা হল মাত্র। এ সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে জানতে হলে 'স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র' বইখানি সকলেরই পাঠ করা অবশ্যকর্তব্য। এই বইখানি সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, পোঃ সৎসঙ্গ, এস. পি. (বিহার) হইতে প্রকাশিত।

আমরা প্রত্যেকেই বেঁচে থাকতে চাই এবং তা' সুস্থভাবে ও সুদীর্ঘকাল ধরে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের অভ্যাস ব্যবহার, চালচলন, এমন করে ফেলেছি যে আমরা মূলতঃ যা চাই, তার পরিপন্থী হয়েই চলি। আমরা যেন মতিচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি। এই মতিচ্ছন্নতার প্রধানতম কারণ, আমরা ইষ্টহীন হয়ে পড়েছি—কেন্দ্র বলে আমাদের জীবনে কিছুই নাই। এই বিকেন্দ্রিকতা থেকে রেহাই পেতে গেলে আমাদিগকে সুকেন্দ্রিক হতে হবে। এই সুকেন্দ্রিক হবার ব্যবস্থা আমাদের নিজেদেরই করতে হবে। এর জন্য সরকার বা অন্য কারও উপর নির্ভর করার কিছুই নেই।

> "প্রাচীন রীতিসমূহ অযথা ভাঙ্গিয়া সমাজ বা দেশের উন্নতি করা যায় না। সর্ব্বকালে সর্ব্বদিনে উন্নতিলাভ constructive process-এর দ্বারা অর্থাৎ প্রাচীন রীতি প্রভৃতিকে নূতনভাবে পরি-বর্ত্তিত করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের ধর্ম্মপ্রচারক মাত্রেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে এইরূপ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।"
>
> —স্বামী বিবেকানন্দ।

ভারতের পরমাণু-বোমা প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তা

ভারত পরমাণু-বোমা তৈরী করবে কি না, এ নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছে। নেহরুজীর আমল হতেই এই ব্যাপারে যথেষ্ট টালবাহানা চলছে। যাঁরা সরকারী নীতির অনুসারী অর্থাৎ ক্ষমতাসীন কংগ্রেসী দল তাঁদের মত, ভারত এখন আণবিক শক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ, পুরাপুরি যোগ্যতা থাকলেও ভারতের পক্ষে এই বিপর্যয়কর চরম অস্ত্রটা নির্মাণ করা এখন সমীচীন হবে না, প্রয়োজনও হবে না। কিন্তু বিপক্ষ দল, বিশেষতঃ বহু চিন্তাশীল জননায়ক তাতে সন্তুষ্ট থাকতে রাজী নন। তাঁদের দাবী, দেশের দুর্ধর্ষ শত্রুও এই অস্ত্রে শক্তিশালী চীন যখন সমস্ত বিপদাশঙ্কা নিয়ে শিয়রে সমুপস্থিত তখন এই পরম নিশ্চেষ্টতা অপরিণামদর্শিতার কারণ হবে।

নিউক্লিয়ার অস্ত্রের নির্মাণ, প্রসার ও পরীক্ষায় নেহরুজী সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তাঁর নীতিবোধ ও মানবতা-ধর্ম বাস্তবধর্মী হতে পারেনি। রাশিয়া, আমেরিকা ও ব্রিটেন যখন এই ভয়ঙ্কর অস্ত্রটির বিস্তার ও পরীক্ষা বন্ধ করবার সঙ্কল্প নিয়ে চুক্তি করেছিল তখন ভারত তাতে সর্বাধিক আগ্রহ নিয়ে স্বাক্ষর দিয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই শক্তির অনধিকারী আরও কয়েকটী রাষ্ট্র স্বাক্ষর করেছিল। নেহরুজীও নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

তারপর চীন যখন তার প্রথম পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ ঘটাল তখনই হয় বিভ্রান্তির সূচনা। চীনের সঙ্কল্প কেউ রোধ করতে পারেনি। তখন ভারত স্থির করে নিয়েছিল, চীন তার উপর এই অস্ত্রটির প্রয়োগ করবে না, বিশেষ করে তার যখন নিউক্লিয়ার অস্ত্র মজুত নেই। এছাড়া, চীন প্রয়োগ করতে সাহসীও হবে না, কারণ নিউক্লিয়ার অস্ত্রের শক্তিতে রাশিয়া ও আমেরিকা বহুগুণে শক্তিধর, পৃথিবীতে এমন অঘটন ঘটতে তারা দেবে না। তবুও এই যুক্তিতে ভারত-সরকার বেশীদিন আস্থা রাখতে পারেননি—তখনই 'নিউক্লিয়ার ছত্রে'র প্রয়োজনীয়তার প্রশ্ন আসে। কিন্তু সেখানেও বিপত্তি। এই ছত্র ধরবার গ্যারান্টি রাশিয়া ও পশ্চিমী শক্তিবর্গের কাছে চাওয়া যেতে পারে বটে, কিন্তু তাতে জোটনিরপেক্ষতার নীতি ব্যাহত হতে পারে। কারণ এরূপ একটা কিছু করা সামরিক চুক্তিরই সামিল। লালবাহাদুর শাস্ত্রীজী যখন প্রথম লণ্ডনে যান তখনও এই নিউক্লিয়ার ছত্র-সম্বন্ধে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছিল এবং সেই আলোচনাও সফল হয়নি এই জোটনিরপেক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে। অতঃপর ভারত-সরকার ভেবে নিয়েছিলেন, পশ্চিমী শক্তিবর্গ ও রাশিয়া একযোগে একটি নিউক্লিয়ার ছত্রের ব্যবস্থা করবে, কিন্তু রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সেরূপ কোন আগ্রহ দেখা দেয়নি। শুধু এইটুকু জানা গেছে যে, আণবিক অস্ত্রসজ্জিত ব্রিটিশ পোলারিস্ সাবমেরিন আরব সাগর, ভারত মহাসাগর ও অন্য দক্ষিণ-পূর্ব সামুদ্রিক দরিয়ায় বিচরণ করে বেড়াবে।

সম্প্রতি চীন তার তৃতীয় আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষায় বিপুল শক্তিসম্পন্ন হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটাবার পর ভারত-সরকার যথেষ্ট বিচলিত হয়েছেন। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এই অস্ত্র-নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন, তবে অদূর ভবিষ্যতে তৈরী করবার ব্যবস্থা হবে কি না সে-বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। পররাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং বলেছেন, পরমাণবিক শক্তিধারী মহা-শক্তিরা অর্থাৎ রাশিয়া ও আমেরিকা এবং সঙ্গে ব্রিটিশ ও ফ্রান্স যদি আণবিক আক্রমণ থেকে রক্ষাব্যবস্থার গ্যারান্টি দেয় তা হলেই যারা এই অস্ত্র তৈরী করেনি তারা নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

ভারতের সরকারী রাষ্ট্রনায়কদের এই ভ্রান্তিবিলাস কেন? এই সমস্ত রাষ্ট্র যে ভারত আক্রান্ত হলেই সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে তার কোন নিশ্চয়তা আছে কি? বিশেষতঃ ইঙ্গ-মার্কিন আন্তরিকতার পরিচয় আমরা বিশেষভাবেই জানি। নিতান্ত প্রয়োজনের মুহূর্তে যে আমেরিকা ধরকষাকষি ও ওজর-আপত্তির ধুয়া তুলবে না, তারই বা ভরসা কোথায়? চীনের লক্ষ্য দক্ষিণপূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি। ভারতকে যথেষ্ট শক্তিশালী হতে না দিয়ে সে তাকে তাঁবেদার করতে চায়। প্রয়োজন হলে

যে সে নিউক্লিয়ার অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারে সে-বিষয়ে দ্বিমত হওয়াও যায় না। রাশিয়ার সঙ্গে যে তার মান-অভিমানের পালা চিরকাল চলবে তারও নিশ্চয়তা নাই। আণবিক অস্ত্রে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি মনে-প্রাণে কখনই চাইবে না যে, অন্য দেশ আণবিক অস্ত্র তৈরী করুক, বিশেষভাবে ভারত যেন সেরূপ শক্তির অধিকারী না হয়।

আসল কথা, ভারত আণবিক অস্ত্র তৈরী করতে দ্বিধাগ্রস্ত এইজন্য যে তার অর্থনৈতিক সামর্থ্য যথেষ্ট সীমিত হয়ে পড়েছে। এক একটী বোমা প্রস্তুত করা যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ। যোজনা-বিস্তার, নানা প্রকল্প-রচনা, বাণিজ্যিক অসাম্য এবং নানা দুর্গতি ও বিপর্যয়ের মধ্যে তার অর্থনৈতিক সঙ্গতি সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। তার উপর আছে রাজনৈতিক দুর্বলতা ও শাসনযন্ত্রের অক্ষমতা। এখন আমাদের এমন নেতৃত্বের প্রয়োজন যে নেতৃত্বের মানসিক শক্তি অদম্য, যাঁর সুদৃঢ় সঙ্কল্প আত্মবিশ্বাসে অটল, মহিমান্বিত চারিত্র্যগুণে যিনি সর্বসাধারণের শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন, কর্মে ও ধর্মে যিনি ন্যায়নিষ্ঠ, দূরদর্শিতার পরাকাষ্ঠায় যিনি জাতিকে স্থির লক্ষ্যপথে পরিচালিত করতে পারবেন। জাতি যখন বিপন্ন কিংবা তার বিপদের পথ যখন প্রস্তুত হচ্ছে তখন স্বার্থান্বেষী রাষ্ট্রগুলির কাছে মাথা বিকিয়ে এত যোজনা-বিস্তারের মতাপটা আমরা বুঝি না। সর্বনাশের পথ যখন প্রশস্ত হয়ে আসছে তখন শুধু আত্মপ্রসাদের চক্কানিনাদে পরমুখাপেক্ষী হবার কোন অর্থ নাই। ভারতকে আণবিক অস্ত্র তৈরী করতেই হবে। সকল দিক দিয়েই চীনকে মোকাবিলা করবার সামর্থ্য তাকে আনতে হবে। শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে পাকিস্তান তার কাছে সামান্য হতে পারে, কিন্তু অসামান্য চীনকে প্রতিরোধ করতে হলে তাকেও আণবিক অস্ত্রে সজ্জিত হতে হবে,—এছাড়া অন্য পথ নাই।

ভারত-মার্কিন সাহায্য-চুক্তি

২৭এ মে নয়াদিল্লীতে পি-এল ৪৮০ অনুযায়ী নবতম শর্তে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তিটীর ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে; এটী পৃথিবীর বৃহত্তম খাদ্য-সাহায্য চুক্তি। এই চুক্তি অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে যে পণ্য সরবরাহ করবে তার মূল্য ১৫০ কোটি টাকা। বিদেশে এত বেশী খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব এর আগে আমেরিকা কখনও গ্রহণ করেনি। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সাম্প্রতিক আমেরিকা সফরকালে প্রেসিডেণ্ট জনসন তাঁকে যে জরুরী খাদ্য সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিলেন এটী তারই ফল।

আমেরিকার পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত শ্রীচেস্টার বোল্‌স্ এবং ভারতের পক্ষে স্বাক্ষর করেছেন অর্থ-বিভাগের যুগ্মসচিব শ্রী এ. টি. বাখাওয়ালে। এতদুপলক্ষে মার্কিন কৃষিমন্ত্রী শ্রীঅর্ভিল ফ্রীম্যান ওয়াশিংটনে এক বিবৃতিতে বলেছেন, মার্কিন সরকার কর্তৃক অতিরিক্ত খাদ্য-সরবরাহের এই চুক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর সাহায্যকারী দেশগুলির সাহায্যের প্রতিশ্রুতির ফলে ভারতের পক্ষে পরবর্তী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সঙ্কট উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হবে। চুক্তি-অনুযায়ী ভারতকে দেওয়া হবে ২৭.৫ লক্ষ টন গম, ৭.৫ লক্ষ টন মিলো বা ভুট্টা, ভারতের শ্বেতসার শিল্পের জন্য ২ লক্ষ টন ভুট্টা, ৩৫ হাজার টন সয়াবীন, ২০ লক্ষ পাউণ্ড তামাক ও ৭ লক্ষ গাঁট তুলা। ফলে চলতি রাজস্ব বৎসরে অর্থাৎ এই বৎসরের জুলাই হতে পরবর্তী বৎসরের জুন পর্যন্ত আমেরিকা ভারতে মোট এক কোটী টন খাদ্যশস্য সরবরাহ করবে। বর্তমানে ভারত আমেরিকা থেকে প্রতি মাসে ১০ লক্ষ টন করে খাদ্যশস্য পাচ্ছে। এই পণ্যের মূল্য ভারতকে টাকায় পরিশোধ করতে হবে; তা হতে আমেরিকা ভারতকে তিন-চতুর্থাংশ দীর্ঘমেয়াদী ঋণ-বাবদ দেবে এবং সেই অর্থ উভয় দেশের সম্মতিক্রমে ভারতের উন্নয়ন-প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হবে। এই শিল্পোদ্যোগে সহায়ক মার্কিন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি আবার শতকরা ৫ টাকা ঋণ পাবে এবং অবশিষ্ট শতকরা ২০্ টাকা মার্কিন সরকারের ব্যবহারের জন্য পৃথক থাকবে।

এ-পর্যন্ত অন্যান্য দেশ হতে যে-সমস্ত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে আর্জেন্টিনা দেবে ৫ হাজার টন গম, কানাডা দেবে ১০ লক্ষ টন গম, অস্ট্রেলিয়া দেবে ১ লক্ষ টন গম ও গ্রীস দেবে ৫ হাজার টন গম। ইতালী, জাপান ও ভেটিকান তাদের প্রতিশ্রুত চাল ইতোমধ্যেই পাঠিয়েছে। ব্রেজিল চাল পরে পাঠাবে।

ভারতকে প্রভূত দায় ও ঋণভার ঘাড়ে নিতে হলো বটে, তবে এই সাহায্যে তার সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষাশঙ্কা দূর হবে বলে মনে হয়।

রাষ্ট্রসঙ্ঘে দুরভিসন্ধি

একথা সর্বজনবিদিত যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ মূলতঃ ইঙ্গ-মার্কিন-চক্রের বশীভূত—একপ্রকার তাদেরই স্বার্থে ও ইচ্ছায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কাশ্মীর নিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের অভিযোগ অনেক দিনের এবং সেটীকে একটী সমস্যায় পরিণত করে জট পাকাবার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন-চক্রের কলাকৌশলের পরিচয় অসাধারণ। আক্রান্ত ও আক্রমণকারীকে তারা সমান পর্যায়ে এনেছে—

পর-রাজ্যাংশ দখলকারী এবং যার অঞ্চল অধিকৃত হয়েছে তাকে সমভাবে বিচার করবার কন্দী করে অনেক জল ঘোলা করেছে। কোন দিক দিয়ে আসল সত্যটী প্রকাশিত হয়ে পড়লে তাদের তৎপরতার সীমা-পরিসীমা থাকে না—সেটীকে চাপা দিতে পারলেই তারা নিশ্চিন্ত।

এই রাষ্ট্রপুঞ্জের বর্ষপঞ্জী সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। সীমানা নির্দেশ করে তাতে ভারতের যে মানচিত্র দেখানো হয়েছে তাতে জম্মু ও কাশ্মীর সম্পূর্ণ বাদ পড়েছে। এটী গূঢ় উদ্দেশ্য-প্রণোদিত সন্দেহ নাই। এই বিষয়টী বিগত ১৭ই মে শিক্ষামন্ত্রী শ্রী চাগলা লোকসভায় উপস্থাপিত করেছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের এই আচরণে সংসদ-সদস্যগণের মধ্যে যুগপৎ বিস্ময় ও ক্রোধের সঞ্চার হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের বহু বিরুদ্ধ আচরণের পরিচয় আমরা পেয়েছি। একমাত্র সোভিয়েতের ভেটো না থাকলে ভারতকে হয়তো এতদিন বহু ক্ষতি ও মর্যাদাহানির সম্মুখীন হতে হতো। এমন কি, গত পাকিস্তানী আক্রমণের সময় আমাদের এই তথাকথিত বন্ধুরাষ্ট্রগুলি সত্যকে চাপা দেবার অনেক কসরৎ দেখিয়েছিল। তবুও আমরা এদের বিশ্বাস করি, হয়তো অনেক ব্যাপারে এদের উপর নির্ভর করতে হয় বলে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক অকর্মণ্যতাও অস্বীকার করবার নয়। চীন যখন চুপি চুপি হিমালয় এলাকায় ভারত-সীমান্তে প্রবেশ করে ঘাটি বসাবার পরিকল্পনা করেছিল এবং ভারতের সীমানার কয়েকটি স্থান চীনের অন্তর্ভুক্ত দেখিয়ে নব-মানচিত্রে প্রচার করেছিল, তখন প্রতিবাদ মাত্র করে নেহরুজী শ্রীচু-এন্-লাইএর প্রবঞ্চনায় ভুলেছিলেন। চীনা প্রধান মন্ত্রী বলেছিলেন, এ-সমস্ত ভুলচুক শুধরে নেওয়া হবে এবং নেহরুজীও তাই যথেষ্ট মনে করেছিলেন। কাশ্মীরের মানচিত্রে রাষ্ট্রসঙ্ঘের দুরভিসন্ধিও নাকি নূতন নয়, পাঁচ বছর আগে ১৯৬১ সালেও এ ব্যাপারে ভারত-সরকার রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। প্রতিবাদ করেছিলেন ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের পররাষ্ট্র-মন্ত্রক ও কূটনীতিকদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগের চাপে পড়ে।

একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম বৃহৎ রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী ও ক্ষতিকর এরূপ অপচেষ্টা বন্ধ করবার কি কোন উপায় নাই। পররাষ্ট্র-দপ্তর ও কূটনীতিকদের যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। নিশ্চেষ্ট বসে থেকে শুধু প্রতিবাদ জানালেই যখন কোন ফল হয় না, তখন তাঁদের অন্য চিন্তা করা উচিত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ-বিষয়ে আন্দোলনের পথ আছে—নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা যায়।

গায়নার স্বাধীনতা

প্রায় সার্ধ তিন শত বৎসর পরাধীনতার পর গত ২৬এ মে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রিটিশ গায়না স্বাধীনতা লাভ করেছে। এখন হতে 'ব্রিটিশ' শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু 'গায়না' নামেই এই রাজ্য বিশ্বরাষ্ট্র-সমাজে স্বীকৃত পাবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘে সম্ভবতঃ শীঘ্রই সে ১১৮তম সদস্য হবে। রাষ্ট্রের আয়তন ৮৩,০০০ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৪,৩৮,০৫০।

১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে ডাচ ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম এই অঞ্চলটীর পত্তন করেছিল। তাদের প্রায় দু'শ বছর আধিপত্যের পর ১৭৯৬ সালে তা ব্রিটিশের হাতে আসে। ১৮০২ সালে ডাচরা আবার তা দখল করে। আবার এক বছরের মধ্যেই অঞ্চলটী ব্রিটিশ অধিকারে আসে। সেই সময় হতেই ব্রিটিশের অধীনে থেকে এটী ব্রিটিশ গায়না নামে পরিচিত হয়ে আসছিল। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ গায়নার প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়। তখন সেখানে অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়েছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটীমাত্র দল টিঁকে আছে সেটী ডাঃ চেদি জগনের পিপলস্ প্রোগ্রেসিভ পার্টি। অধিবাসীরা প্রধানতঃই ভারতীয় ও নিগ্রো-জাতীয়। তাদের শতকরা ৩০ ভাগ অসামরিক এবং ৭০ ভাগ সামরিক। অধিবাসীদের মধ্যে বহু চীনাও আছে। অধিকাংশই খ্রীষ্টধর্মী; হিন্দু ও মুসলমানও আছে। ডাঃ জগন একজন ভারতীয় - যুক্তরাষ্ট্র হতে সম্মানের সাথে স্নাতক ও দন্ত-চিকিৎসক হয়ে এসে তিনি প্রধান নেতা হয়ে ওঠেন। ১৯৫৭ হতে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬১ সালে গায়না স্বায়ত্তশাসন পেয়েছিল, কিন্তু ১৯৬৪-র ডিসেম্বরে দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে ব্রিটিশ সৈন্যের হস্তক্ষেপে শান্তিস্থাপনের পর, তিনি এই পদ হতে অপসারিত হন এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মিঃ ফোর্বস্ বার্নহাম কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এর আগে এই সংসদেই সংবিধান তৈরী হয়েছিল। ১৯৬৫ সালের নভেম্বরে লণ্ডনের সম্মেলনে গায়নাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেবার সিদ্ধান্ত হয়।

প্রায় একশ' বছর আগে থেকে ভারতীয়রা দলে দলে এখানে এসে বসতিস্থাপন করতে থাকে। তাদের চাষের কাজে আত্মনিয়োগের ফলে ১৯০৫ সালের মধ্যে গায়না খাদ্যে স্বয়ংভর হয়ে অন্যান্য দেশে চাল রপ্তানী করতে সমর্থ হয়। চিনিও একটি প্রধান উৎপন্ন বস্তু। রাজধানী জর্জটাউনের স্কুল-কলেজ ও কারিগরী শিক্ষায়তনগুলিতে বহু ভারতীয়, এমন কি বাঙালীও রয়েছেন। অধিবাসীরা প্রধানতঃই ভারতীয় ও নিগ্রো-জাতীয়, চীনা প্রভৃতি

অন্য জাতীয়ও আছে। ধর্মে অধিকাংশ খ্রীষ্টান, হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যাও কম নয়। সুদূর লাতিন আমেরিকায় এই দেশটিতে ভারতীয়েরা ভারত-সংস্কৃতি ও ভাবধারা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। এখানকার টেগোর সোসাইটীর বেশ নাম আছে।

নবীন স্বাধীন রাষ্ট্র গায়নাকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান

ভারতে নিউক্লিয়ার গবেষণার পথিকৃৎ এবং আণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ও কেন্দ্রীয় আণব শক্তি বিভাগের সেক্রেটারী ডঃ হোমি ভাবার গত জানুয়ারী মাসে বিমান-দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পর এতদিন তাঁর পদ শূন্য ছিল। সেই শূন্য স্থানে কেন্দ্রীয় সরকার আমেদাবাদের ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরীর অধিকর্তা ডঃ বিক্রম সরাভাইকে অধিষ্ঠিত করবার সিদ্ধান্ত করেছেন।

ভারত-সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি। বৈজ্ঞানিক ডঃ সরাভাই-এর বর্তমান বয়স মাত্র ৪২ বৎসর। কিন্তু ইতোমধ্যেই তাঁর কৃতিত্ব যথেষ্ট। এম. এস্‌সি. ডিগ্রী লাভ করবার পর তিনি বাঙ্গালোরের সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় বিজ্ঞান-মন্দিরে গবেষণা শুরু করেন, আর তাঁর শিক্ষক পরামর্শদাতা ছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ সি. ভি. রমন। বৈজ্ঞানিক সন্ধানী সরাভাই মহাজাগতিক রশ্মির রহস্য উদ্ঘাটনে ব্রতী হন। মহাকাশে এই রহস্যপূর্ণ রশ্মির উৎস কোথায় এবং কেনই বা নিরন্তর তার হ্রাসবৃদ্ধি হচ্ছে তা নিয়ে তাঁর অনুসন্ধানের সীমা নাই। পৃথিবীর নানা দেশের অসংখ্য বৈজ্ঞানিক পত্রে তাঁর গবেষণা স্বীকৃতিলাভ করেছে এবং সেই গবেষণার তথ্য-পরিবেশন করবার জন্য বহু আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন।

আণবিক শক্তির গবেষণা ও তার সাংগঠনিক ক্ষেত্রে ডঃ সরাভাইকে অনেক কাজ করতে হবে। শুধু ট্রম্বের আণবিক শক্তির পরিচালন নয়—রাজস্থানে কানাডীয় পরিকল্পনায় যে দ্বিতীয় নিউক্লিয়ার প্লান্ট প্রতিষ্ঠার কাজ চলেছে এবং মাদ্রাজের কল্পকম-এ ফরাসী সরকারের সাহায্যে যে আণব কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে সেগুলির জন্য তাঁকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে—তাঁর কৃতিত্বের নজীর সেগুলিতে সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। ডঃ ভাবাকে যেমন সময়ে সময়ে নানাবিধ হতে বাধার সম্মুখীন হতে হতো, তাও হয়ত তাঁকে অতিক্রম করতে হবে। হয়তো শীঘ্রই এমন অবস্থার উদ্ভব হতে পারে যখন অবিলম্বে আণবিক বোমা প্রস্তুতের প্রয়োজন দেখা দেবে।

কিন্তু আণব বোমা প্রস্তুতের ব্যাপারে ১লা জুন বোম্বাইএ সাংবাদিক বৈঠকে প্রদত্ত ডঃ সরাভাইএর প্রথম বিবৃতিতে আমরা হতাশ হয়েছি। ডঃ ভাবা বলেছিলেন, ভারত নিউক্লিয়ার অস্ত্র নির্মাণ করতে পারে, সে সামর্থ্য ভারতের হয়েছে। ডঃ সরাভাই বলেছেন, ভারত তার বৈষয়িক ও শিল্পগত সামর্থ্য রীতিমত বাড়াতে না পারলে, অন্ততঃ চীনের তুলনায় আণব শক্তি প্রতিষ্ঠা করা তার সম্ভব নয়। শুধু বোমা তৈরী করে কিছু লাভ হবে না। আণব বোমা তৈরী করলেই তো হবে না, তা নিক্ষেপ করবার সামর্থ্যও চাই। আমাদের প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক যন্ত্র-সরঞ্জাম নাই—পরমাণু শক্তি হওয়ার মত অত্যাবশ্যক সামর্থ্যও আমাদের হয়নি। পরমাণু শক্তির প্রয়োজনে ধাপে ধাপে এগোলে চলবে না, অবিলম্বেই সর্বপ্রযত্নে, সামগ্রিকভাবে ও সর্বশক্তি প্রয়োগ করে কাজ করতে হবে। এই বিশেষ প্রশ্নটির সমাধান অল্পদিনের মধ্যেই হওয়া বিবেচ্য। তবে বোমা তৈরী করা বা না করবার বিবেচনা কেন্দ্রীয় সরকারই করবেন। মানব-সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক এই পরমাণু-যুদ্ধে যৌথ নিরাপত্তার ব্যবস্থাই শ্রেয়ঃ।

সামর্থ্যের বহ্বারম্ভ যা এতদিন শোনা গেছে সত্যই কি তার কিছু মূল্য নাই? আমরা তা হলে কোন্ পথে?

একথাও এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, যে-সকল বিষয় দেশের নিরাপত্তা-ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত সে-সব বিষয়ে প্রকাশ্যে যদি কিছু বলতেই হয় তবে সব দিকে লক্ষ্য রেখে, যথেষ্ট বিবেচনা করেই তা বলা সমীচীন।

"জাল ভক্তি মোটা অহঙ্কার যুক্ত, আসল ভক্তি অহঙ্কার মুক্ত অর্থাৎ খুব পাতলা অহঙ্কার যুক্ত। জাল-ভক্তি-যুক্ত মানুষ উপদেশ নিতে পারে না, উপদেষ্টারূপে উপদেশ দিতেই পারে, তাই কেহ উপদেশ দিলে মুখে চটার লক্ষণ, বিরক্তির লক্ষণ, সঙ্গ পরিহারের চেষ্টা ইত্যাদি লক্ষণ প্রায়ই প্রকাশ পায়।"

—শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র।

বিশ্ববার্তা

—শ্রীসুজিৎকুমার ঘোষ

পৃথিবীর জনসংখ্যা ও আন্তর্জাতিক ধনবৈষম্য

বর্তমান কালে পৃথিবীর জনসংখ্যা যেরূপ অস্বাভাবিক ও আতঙ্কজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছে তা খুবই উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত মহাযুদ্ধের আগে যে জনসংখ্যা ২০০ কোটির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল আজ তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৩৪ কোটিতে—তার মধ্যে ধনী ও উন্নত দেশগুলির লোকসংখ্যা ১২০ কোটি ও অনুন্নত নির্ধন দেশগুলির লোকসংখ্যা ২১৪ কোটি, অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশ দরিদ্র এবং এক-তৃতীয়াংশ সম্পৎশালী।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে পৃথিবীর স্বল্পবিত্ত দেশগুলির জনগণের বাৎসরিক জনপ্রতি গড় আয় ২৫০ ডলারেরও কম, আবার অনগ্রসর দেশে তা ১২০ ডলারের বেশী নয়। অপরপক্ষে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ১৯ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের জনপ্রতি গড় আয় ৩০০০ ডলার। পৃথিবীর যত-কিছু সোনা কয়েকটা দেশের হাতেই অত্যধিক মজুত হচ্ছে। সেদিক দিয়ে ভারতের মজুত সোনা ক্রমেই কমছে। ১৯৫১ সালে ভারতের মজুত সোনা ছিল ১৯৪ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার মূল্যের; ১৯৬১ সালে তা ৬৭ কোটি ডলারে নেমে এসেছিল। এই একই সময়ে পশ্চিম জার্মানীর মজুত সোনা ৪৫'৫ কোটি ডলার হতে ৬৭৩'৭ কোটি ডলারে বৃদ্ধি পায়।

এরূপ বিরাট ধনবৈষম্য বিশ্বের বিবিধ জাতির মধ্যে শান্তিরক্ষার পরিপন্থী। এজন্য ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘে স্থির হয়েছিল, যে-সমস্ত দেশ উন্নয়ন-কামী তাদের বৈষয়িক সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন। পরে ১৯৬০ সালে পরলোক-গত প্রধানমন্ত্রী নেহেরুজীর প্রস্তাবক্রমে একটা দশ বৎসরের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশগুলিকে সাহায্য করবার জন্য পরলোকগত প্রেসিডেন্ট কেনেডি এই দশকের নামকরণ করেছিলেন 'উন্নয়ন দশক'। ১৯৬৪ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন-সম্মেলনে স্থির হয়, উন্নতিশীল দেশ-গুলিকে শুধু বৈষয়িক সাহায্য দিয়ে নয়, বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে তাদের উন্নতিতে সাহায্য করতে হবে। কিন্তু তার পর এই নূতন ব্যবস্থা দু'বছর চললেও সুফল লাভ করেনি।

উন্নয়ন দশক-এর লক্ষ্য ছিল, উন্নতিকামী দেশগুলির ৫ শতাংশ হারে বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি হবে, কিন্তু ১৯৫০ সাল থেকে জাতীয় উৎপাদন-বৃদ্ধির হার অনেকটা বাড়লেও ১৯৬৪ সালে তা নেমে গিয়ে একটা হতাশাব্যঞ্জক অবস্থায় পৌঁছল। জনসংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধি এ-সমস্ত উদ্যোগ অনেকটা বানচাল করেছে। এভাবে অনগ্রসর দেশগুলির বর্তমান জনপ্রতি ১২০ ডলার বাৎসরিক গড় আয় ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে ১৭০ ডলারে পৌঁছাবে বলেও মনে হয় না। সুতরাং অনুন্নত দেশগুলির জীবনধারণের মানও বৃদ্ধি পাবে না। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান অগ্রগতি বজায় থাকলে সেখানকার জনপ্রতি বাৎসরিক গড় আয় ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে ৩০০০ ডলার থেকে বেড়ে ৪৫০০ ডলারে গিয়ে দাঁড়াবে, সেখানে দরিদ্র দেশগুলিতে ততদিনে জনপ্রতি গড় আয় ৫০ ডলারও বাড়বে কিনা সন্দেহ। সুতরাং উন্নত দেশগুলি মানবতার প্রশ্নে খুব বেশী সাহায্যের ব্যবস্থায় এগিয়ে না এলে উন্নয়ন দশকের সমাধি হবে। দুনিয়ার বাজারে অনেক অনুন্নত দেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াতে পারেনি। ঘানা যখন স্বাধীন হয় তখন তার মজুত সোনা ছিল ২০ কোটি পাউণ্ড স্টার্লিং এবং তার কোকোর দাম ছিল টন-প্রতি ৩৫২ পাউণ্ড স্টার্লিং। এখন তার কোকোর দাম টন-প্রতি ১০০ পাউণ্ড স্টার্লিং-এর নীচে এবং তার মজুত সোনাও নিঃশেষ হয়ে গেছে। ১৯৫০ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে অনুন্নত দেশগুলির রপ্তানী বাণিজ্যের আয় বৎসরে গড়ে মাত্র ৩'৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া তাদের ঋণের বোঝা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপার্জিত মুদ্রার দশ-শতাংশই এখন সুদ দিতে ও মূলধনের অংশ পরিশোধ করতে ব্যয় হয়ে যায়। বর্তমানে তাদের ছ'শ কোটি ডলার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হচ্ছে। বর্তমান অবস্থায় চললে, আগামী ১৫ বছরে যত বৈদেশিক মূলধন আমদানী হবে তার সবটাই সুদ ও লভ্যাংশ দিতেই চলে যাবে।

এই অর্থনৈতিক বৈষম্যের সমীক্ষা বিশ্ব ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ শ্রীউড্‌স্ করেছেন। তাঁর চিন্তাশীল দূরদর্শিতা প্রণিধান-যোগ্য। তাঁর মতে, উন্নত দেশগুলি মানবিকতার প্রশ্নে অনুন্নত দেশগুলিকে সাহায্য করতে বিশেষ আগ্রহী নয়। তা না হলে বর্তমান জটিল অবস্থার সৃষ্টি হতো না এবং উন্নয়ন দশকও একটা নিষ্ফল হতো বলে মনে হয় না।

এই উন্নয়ন দশকের পরিপ্রেক্ষিতে নয়াদিল্লীতে বিগত ২২এ মার্চ হতে ৪ঠা এপ্রিল ১৪ দিন ধরে রাষ্ট্রসঙ্ঘের শাখা সংস্থা 'ইকাফে' (ECAFE) বা Economic Commission for Asia and Far East-এর অধিবেশন হয়ে গেছে। এশিয়ার ঊনিশটী দেশ এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড এই সংস্থার সদস্য। এই সম্মেলনে বহু গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যা ও অনুন্নত দেশগুলির রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসারের ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। অধি-বেশনের পূর্বাহ্নে বলা হয়েছিল ইকাফে অঞ্চলের উন্নত ও উন্নতিকামী দেশ-গুলির জনপ্রতি আয়ের হারের পার্থক্য বেড়েই চলেছে। আবার দেখা গেল, এই অঞ্চলের জাপানের জাতীয় আয়, ব্রিটেনের যেখানে ২'৬ ও যুক্তরাষ্ট্রের ৩'১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, সেখানে ৯'১ শতাংশ হারে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন কি ফরমোজা, থাইল্যাণ্ড ও ফিলিপাইনের মোট জাতীয় আয় ৫'৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধির দিকে। কিন্তু জনপ্রতি আয়ের গড় হিসাবে দেখা গেছে, জাপান ও ফরমোজা ছাড়া অন্য দেশগুলির জনপ্রতি আয়বৃদ্ধির হার ৩'৪ শতাংশের বেশী নয়; সিংহলের ০'৭, ইন্দোনেশিয়ার ১'১, পাকিস্তানের ১'২, মালয়েশিয়ার ১'২, ভারতের ১'৫ ও কাম্বোডিয়ার ২ শতাংশ মাত্র। অধিকাংশ দেশই দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে এই জাতীয় আয়বৃদ্ধির সমতা রক্ষা করতে পারেনি। তাদের পক্ষে শিল্পোন্নত দেশগুলির সমান স্তরে আসা দুঃসাধ্য ব্যাপার। ভারত যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, সেইভাবে গিয়ে শুধু নিউজিল্যাণ্ডের জনপ্রতি আয়ের সমকক্ষ হতে তার ২০৫ বৎসর লেগে যাবে।

সুতরাং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের যে কিরূপ হতাশাজনক দুরবস্থা তা সহজেই অনুমেয়। সম্মেলনে এটুকু প্রকাশ পেয়েছে যে, 'ইকাফে' অঞ্চলে যেরূপ বিপুল হারে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে তা অব্যাহত থাকলে, পৃথিবীর সম্পদ ও শক্তিসামর্থ্যের উপর ভীষণ চাপ পড়তে বাধ্য। এই অবস্থায় ব্যাধি ও অভাবই যে সহজে দূর হতে পারে না তা নয়, উন্নত ও উন্নতিকামী দেশ-গুলির মধ্যে ধনবৈষম্য দূর করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

সম্মেলনে স্থির হয়েছে, পৃথিবীর জাতিগুলির মধ্যে এই বিরাট ধনবৈষম্য যথাসম্ভব কমিয়ে আনবার জন্য রাষ্ট্র-সঙ্ঘের উদ্যোগে ১৯৬৭ সালে পুনরায় দ্বিতীয় বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠান করবার প্রস্তাব হয়েছে। প্রস্তাবটী এনেছে 'ইকাফে'র সদস্য ভারত সমেত পনেরটী রাষ্ট্র।

বর্তমানে দাস-ব্যবসায়

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে জানা গেছে, দাস-ব্যবসায় এখনও পৃথিবী হতে নিশ্চিহ্ন হয়নি। আফ্রিকায় এই ব্যবসায়ে য়ুরোপীয়েরা বহু কুকীর্তির নজীর রেখে গেছে। প্রত্যক্ষ-ভাবে না হলেও এখনও গোপনে এই কলঙ্কপূর্ণ ব্যবসাটী চলেছে। এই ঘৃণ্য ব্যবসাটীর একটা বড় ঘাঁটি আফ্রিকার কেনিয়ারাজ্যে। এখানে একটী ব্যবসায়ী দলের হদিশ পাওয়া গেছে; তারা আম্বণ্য কিদি অঞ্চলে ঘাঁটি করে, ছোট গরীব ছেলেদের নানা কৌশলে ও প্রলোভনের সাহায্যে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাসে পরিণত করে। তাদের জাহাজে করে চার শ' মাইল দূরবর্তী টান্‌জানিয়ার অরণ্য-প্রদেশে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের দিনে বারো হতে চোদ্দ ঘন্টা কাঠ-চেরাইএর কাজ করতে বাধ্য করা হয়; খেতে দেওয়া হয় শুধু দিনে একবার কিছু ভুট্টা ও সয়াবীন, থাকতে দেওয়া হয় ওখানকার বড় বড় ঘাসে তৈরী কুঁড়ে ঘরে। তাদের বেতন নাই, মাত্র বৎসরে দু'একটা ছেঁড়া পোশাক দেওয়া হয়। খুব কড়া প্রহরায় তারা থাকে, সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি হলে অতি নির্দয়ভাবে তাদের প্রহার করা হয়—তাদের দুঃখদুর্দশার সীমা-পরিসীমা নাই। মার খেয়ে খেয়ে সব সময়েই এদের গায়ে টাটকা ক্ষতের চিহ্ন থাকে। এই অত্যাচার শ্বেতাঙ্গদের রচিত ইতিহাসকেও ছাপিয়ে গেছে।

প্রকাশ যে, এই বিশ্রী ব্যাপারে টান্‌জানিয়ার প্রেসিডেণ্ট জুলিয়াস নায়েরে ও কেনিয়ার প্রেসিডেণ্ট জোমো কেনিয়াট্টা খুবই বিব্রত হয়েছেন। এই গোপন দাস-ব্যবসায়ী-দের খুঁজে বার করবার জন্য আদেশ জারী হয়েছে। এ পর্যন্ত ধরাও পড়েছে সাতজন ব্যবসায়ী। কিন্তু এদের নাকি চরম শাস্তি দেওয়া যাবে না, কারণ ছেলেগুলিকে চুরি করে বিক্রী করবার পক্ষে এদের উপর অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি। এরা জোর করে খাটিয়েছে ও ঠিকমত মাইনে দেয়নি, এইটুকুই নাকি এদের অপরাধ বলে সাব্যস্ত হয়েছে। এজন্য শাস্তির ব্যবস্থা সামান্যই হবে—বড়-জোর দু'এক বছর কারাবাস বা কিছু অর্থদণ্ড। তবুও এই ব্যবসা বন্ধ করবার আয়োজন হয়নি।

ভারতেও বিভিন্ন স্থানে প্রায়ই ছেলেধরার উপদ্রবের খবর পাওয়া যায়। পথে-ঘাটে প্রায়ই ছেলেরা নানা কৌশলে অপহৃত হয়—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের আর হদিশ পাওয়া যায় না। কলিকাতায় এরূপ ব্যাপার প্রায়ই ঘটে। এই ছেলেধরাদের আড্ডা বা ঘাঁটিগুলি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি—সরকার তাদের শায়েস্তা করবার জন্য যথাযথ তৎপর হয়নি।

—শ্রীখেলোয়াড়
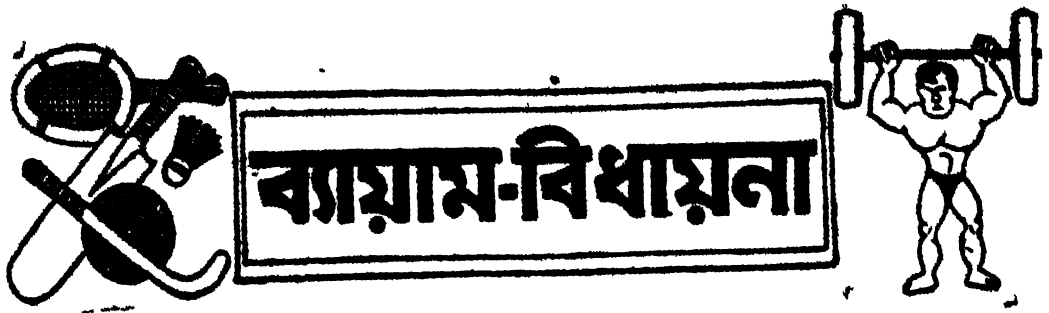
ক্যাসিয়াস ক্লে'র সম্বর্ধনা

এককালে রাজা-মহারাজারা যখন দেশজয় করে ঘরে ফিরতেন তখন তাঁদের রাজধানীর মানুষ রাজপথের দুধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে বিজয়ী রাজার মাথায় ফুল ছুঁড়ে দিত। এখন রাজা-মহারাজার কাল গেছে। গণতন্ত্রের নিগড়ে তাঁরা বন্দী। তাই বিজয়ী খেলোয়াড়, দেশনেতা, কবি-সাহিত্যিক আর অভিনেতা-অভিনেত্রীরা রাজসম্মান লাভ করে থাকেন।

বিশ্ব হেভী ওয়েট মুষ্টিযুদ্ধে হেনরী কুপারকে হারিয়ে ক্যাসিয়াস ক্লে গত ২৯শে মে যখন কায়রোতে পৌঁছলেন তখন সেখানকার মানুষ তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানিয়েছেন। সোনী লিস্টনকে প্রথমবার পরাজিত করে ক্যাসিয়াস ক্লে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মুসলমান নাম মহম্মদ আলী। আরব ও আফ্রিকার ইসলাম পরিষদ্ তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ক্লে'র কায়রো পরিদর্শন উপলক্ষে পরিষদ্ এক ভোজসভার ব্যবস্থা করেন। সেখানে ইংরাজীতে প্রার্থনার রেকর্ড তাঁকে উপহার দেওয়া হয় এবং একজন মুসলীম বীর হিসাবে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়।

ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

ওল্ড ট্র্যাফোর্ড মাঠে ২রা জুন থেকে পাঁচদিনব্যাপী ইংলণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের টেস্ট ক্রিকেটের উদ্বোধন হয়েছে। ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল বিশ্ববিজয়ী। ১৯৬৩ সাল থেকে তাদের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে। ইংলণ্ডকে সে বছর টেস্ট সিরিজে পরাজিত করে রবার লাভ করেছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল। তারপর গত বছর অস্ট্রেলিয়া দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর করতে গিয়েছিল এবং টেস্ট পর্যায়ে হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

গারফিল্ড সোবার্সের নেতৃত্বাধীন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল সব দিক দিয়ে শক্তিশালী। ব্যাটসম্যান হিসাবে কনরাড হান্ট, সেমিল বুচার, কানহাই এবং অধিনায়ক নিজে খুবই কুশলী এবং শক্তিধর। বোলিংয়ে হল, গিবস এবং গ্রীফিথের জুড়ি মেলা ভার। আর সোবার্স নিজে স্পিন এবং ফাস্ট বোলিংয়ে সিদ্ধহস্ত।

ইংলণ্ড দলের ব্যাটিংয়ের সব কিছু নির্ভর করছে ব্যারিংটন এবং কাউড্রের উপর। নূতন সংযুক্ত হয়েছেন ওপনার মিলবার্ণ। এ ছাড়া আছেন পার্কস এবং অধিনায়ক স্মিথ নিজে। এই ব্যাটিং শক্তি নিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে নামা রীতিমত সাহসিকতার লক্ষণ। বোলিংয়ে ইংলণ্ডের ভরসা ফ্রেড টিটমাস এবং ডেভিড এ্যালেন। আরও কয়েকজন বোলার দলে স্থান পেয়েছেন, তবে তাঁদের বোলিং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বোলারদের খুব বেশী বেগ দিতে পারবে না। কাজেই সমালোচকরা ভবিষ্যদ্বাণী করছিলেন যে, মারাত্মকভাবে আক্রমণ করে খেলতে না পারলে ইংলণ্ড দল প্রথম টেস্টে সুবিধা করতে পারবে না।

আর চলুন মাঠে। প্রথম ব্যাট করতে নামল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল। গোড়াপত্তন করতে নামলেন হান্ট আর ম্যাকমরিস। ৩৮ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল তিনটি উইকেট হারাল। আর দু'টি উইকেট পেলেন নূতন বোলার হিগস। কানহাই শূন্য রানে প্যাভেলিয়নে ফিরলেন। এই তিনজন ব্যাটসম্যানের মধ্যে বুচার পিটিয়ে খেলে ৪৪ রান করলেন। পরের ব্যাটসম্যান সেমুর নার্স পিটিয়ে খেলতে লাগলেন। তখনও ওপনার কনরাড হান্ট ছিলেন অপরাজিত। তিনি ১৩৫ রান করে হিগসের বলে আউট হলেন। খেলার চেহারা বদলে দিলেন গারফিল্ড সোবার্স। উইকেটের চতুর্দিকে মেরে তিনি ইংলণ্ডের

বোলারদের শায়েস্তা করতে দ্বিধা করলেন না। সেমুর নার্স ৪৯ রাণ করে আউট হলেন। এবার দ্রুত পিটিয়ে রাণ কুড়িয়ে নিতে লাগলেন অধিনায়ক সোবার্স। তাঁর সঙ্গে সাহায্যের হাত বাড়ালেন চার্লি গ্রিফিথ। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সংখ্যক রাণ করে সোবার্স আউট হলেন। তাঁর রাণ হল ১৬১। বোলার গ্রিফিথ কুড়োলেন ৩০ রাণ। আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসে মোট রাণ হল ৪৮৪। ফ্রেড টিটমাস ৮৩ রাণের বিনিময়ে ৫টি উইকেট লাভ করলেন। আর ডেভিড এ্যালেন পেলেন ২টি উইকেট।

প্রথম ইনিংসের গোড়া থেকেই ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানরা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বোলারদের বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলেন না। ল্যান্স গিবস্ আর চার্লি গ্রিফিথ মারাত্মক বোলিং শুরু করলেন। দলের মোট ৫০ রাণ হওয়ার আগেই মিলবার্ণ, রাসেল, ব্যারিংটন, কাউড্রে আর অধিনায়ক স্মিথ আউট হলেন। জিম পার্কস এবং ডেভিড এ্যালেন কিছুটা খেলবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। মাত্র ১৬৭ রাণে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হল। গিবস মাত্র ৩৭ রাণে ৫টি এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নূতন বোলার হলফোর্ড মাত্র ৩৪ রাণে ৩টি উইকেট লাভ করলেন। প্রথম ইনিংসের খেলায় ৩১৭ রাণ পিছিয়ে থাকার জন্য ইংলণ্ডকে ফলো অন করতে হল। দ্বিতীয় ইনিংসে গোড়া থেকে ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানরা সতর্ক হয়ে বল মারতে লাগলেন। পরাজয়ের আকৃতি ওঁদের চোখের সামনে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। দলের ৫৩ রাণের মাথায় আউট হলেন রাসেল। ব্যারিংটন আর মিলবার্ণ খুব সতর্ক হয়ে খেলতে লাগলেন। কিন্তু জুটি ভাঙল হলফোর্ডের বলে। ব্যক্তিগত ৩০ রাণ করে ব্যারিংটন আউট হলেন। ইংলণ্ডের টেষ্ট দলে নবাগত নটিংহামের ব্যাটসম্যান কলিন মিলবার্ণ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে ভাল খেলছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ৯৪ রাণ করে মিলবার্ণ গিবসের বলে আউট হলেন। কলিন কাউড্রে কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ভাঙন রোধ করতে পারেন নি। তিনি ৫২ রাণ করে আউট হন। ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় তৃতীয় দিনে মাত্র ২৭৭ রাণে। সুতরাং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ১ ইনিংস ও ৪০ রাণে বিজয়ী হল। ল্যান্স গিবসের মারাত্মক বোলিং ইংলণ্ড দলকে বিপর্যস্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

ময়দানে ফুটবল

কলকাতা ময়দানে প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের খেলা এখন জমাট বেঁধেছে। খেলাগুলোর মধ্যে প্রাণ-চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। এ-সপ্তাহে দু'টি বড় খেলা ছিল—ইষ্টবেঙ্গল বনাম বি-এন-আর দল এবং মোহনবাগান বনাম মহমেডান স্পোর্টিং দল। বি-এন-আর দলের আর সে আগের দিন নেই। এখন পড়তি অবস্থা। অরুণ ঘোষ এবং আপ্পালা রাজুর খেলা অনেক পড়ে গেছে। এখন ভরসা শুধু এন্টনি ও রাজেন্দ্রমোহন। বি-এন-আর-এর ডিফেন্স খুবই দুর্বল। এদিক দিয়ে বিচার করলে ইষ্টবেঙ্গল দল খুব শক্তিশালী। অনেক নূতন খেলোয়াড় দলে যোগ দিয়েছেন। ফলে ইষ্টবেঙ্গল দল খুব সহজে বি-এন-আর দলকে ২—০ গোলে হারিয়ে দিল। দু'খানা গোলই দিলেন ইষ্টবেঙ্গল দলের উঠতি সেন্টার-ইনার পরিমল দে।

এ-বছরের প্রথম চ্যারিটি ম্যাচ খেলা হল মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং দলের মধ্যে—শনিবার ৪ঠা জুন। দু'টি দলই খুব শক্তিশালী। তাই স্বাভাবিকভাবেই খুব ভাল খেলা হল। খেলার মধ্যে সারাক্ষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবটুকু বজায় ছিল। বৃষ্টি হওয়ায় মাঠ ছিল ভিজা। তুলনামূলক বিচারে মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বল নিয়ে ছুটছিলেন। চুণী গোস্বামী ছিলেন আক্রমণের মূল উৎস। আর তিনিই করলেন প্রথম গোল। মহমেডান স্পোর্টিং দলের সারমাদ খাঁ চোখ জুড়ানো খেলা খেলছিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই লগুনেল হেড করে গোল শোধ করলেন। খেলা জমে উঠল। বিরতির কিছুক্ষণ আগে অসীম মৌলিক সুন্দর পেসিংয়ের সাহায্যে মোহনবাগানের পক্ষে দ্বিতীয় গোল করলেন। দিনের সবচেয়ে দর্শনীয় গোলটি করেন আউট সাইট অশোক চ্যাটার্জি। ঠিক সময় ঠিকমত সট নিয়ে তৃতীয় গোলটি করেন। দলের পক্ষে শেষ গোলটি করেন চুণী গোস্বামী। এত গোলে পিছিয়ে থাকা সত্ত্বেও মহমেডান দল নিরুৎসাহ হয়নি। শেষ সময়ে সারমাদ খাঁ দলের পক্ষে আর একখানা গোল দিলেন। প্রথম চ্যারিটি ম্যাচে মোহনবাগান দল ৪—২ গোলে প্রবল প্রতিপক্ষ মহমেডান স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করল।

ময়দানে এখনও দু'টি দল পরাজয়ের আস্বাদ লাভ করে নি। সে দু'টি দল হচ্ছে—মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল দল। এরা প্রত্যেকেই সাতটি করে খেলায় যোগ দিয়ে চৌদ্দটি পয়েন্ট লাভ করেছে।

অভিনয় উৎসারণী

দর্শকের দৃষ্টিতে "নায়ক"

—সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "নায়ক" ছবি সম্পর্কে দর্শকদের কাছ থেকে আমরা বহু চিঠিপত্র পেয়েছি। স্থানাভাবে সে সব ছাপা সম্ভব নয়। বর্তমান সংখ্যায় একজন দর্শকের সুচিন্তিত অভিমত তুলে ধরা হ'ল।—'সম'।]

নায়ক, সাধারণের কল্পলোকের আরাধ্য। রুপালী পর্দায় প্রতিফলিত 'নায়ক' সাধারণের মনোরাজ্যে কল্পলোকের বাসিন্দা, মানুষের সাধারণ সুখদুঃখ, সমস্যা-সঙ্কটের ধরাছোঁয়ার বাইরে। দর্শকের চোখে তারা ভাগ্যবান, দেবতুল্য। চেহারার জলুসে ও খ্যাতির পরিমাপে তারা সাধারণের আদর্শস্থানীয়।

কিন্তু তাদেরও আছে সঙ্কট, আছে সমস্যা। অর্থাগমে বৃহস্পতি, কিন্তু দর্শকসাধারণ তাদের শনি। চেহারার জলুস ও দর্শকের রুচির সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলতে পারাই খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ, studio-র মধ্যমণি; আবার পর পর কয়েকটি ছবি flop করলেই 'পপাত ধরণীতলে'। চিত্রজগতের এই আলো-আঁধারের পরিচয় কিছুটা নায়কের অনুভূতি, কিছুটা খণ্ডবিচ্ছিন্ন চিত্রসংবাদের মাধ্যমে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে চিত্রায়িত করেছেন বিশ্ব-বরেণ্য পরিচালক সত্যজিৎ রায়।

পরিচালক, কাহিনীর স্থান ও পাত্র পাত্রীদের ভেস্টিবিউল ট্রেনের কয়েকটি কামরার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। নায়ক চলেছেন দিল্লীতে সঙ্গীত-নাটক-একাডেমীর পুরস্কার নেবার জন্য। গাড়ীর অন্যান্য সহযাত্রীদের autograph নেবার তাগিদ এবং অসীম কৌতূহলই তার খ্যাতির পরিমাপ। Dining car-এ 'আধুনিকা' পত্রিকার সম্পাদিকাও এগিয়ে আসেন, তার পত্রিকার জন্য চাই একটি সাক্ষাৎকার। নায়ক প্রথমে এড়িয়ে যান কিন্তু অন্তরের তাগিদে নিজের অজান্তেই ফেলে আসা অতীতের জড়ানো গ্রন্থি এক একটি করে খুলতে থাকে তরুণী সাংবাদিকের কাছে। কাহিনীর এই অংশে নায়কের স্বপ্ন ও বেশ কয়েকটি flash back-এর সাহায্যে চিত্রজগতের সমস্যার কয়েকটি দিক দেখানো হয়েছে। গন্তব্যস্থল যতই নিকটতর হয়, নায়ক নিজের এক অভাব বোধ করেন—মনটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে। বিদায় নিতে যান পত্রিকা সাংবাদিকার কাছে। সাক্ষাৎকারের বিবরণটি ছিঁড়ে ফেলেন সাংবাদিকা। মন থেকে লিখবে বলে নয়, মনে রেখে দেবে বলে।

দিল্লী এসে পড়ে। নায়ক হারিয়ে যায় অসংখ্য গুণমুগ্ধ ভক্তের ভীড়ে। ওরই মধ্যে একবার দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে ফিরে তাকায় তরুণী সাংবাদিকের চলার পথের দিকে।

'নায়ক' নিটোল গল্প নয়। ছকে বাঁধা কাহিনীর মত সাধারণ সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ও বিরহ মিলনের রূপকথা ফেঁদে দর্শকের অন্তর জয় করে নেবার প্রচেষ্টা নয়। নায়ক দর্শন,—নায়ক: চিত্রজগতের X-ray! কখনও নায়কের নিজস্ব অনুভূতি কখনও বা কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার একত্রীকরণে একটি সফল পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবির experiment এদেশে বোধ হয় এই-ই প্রথম। ঘটনা বিচ্ছিন্ন হলেও অর্থবহ। এক একটি ঘটনার তাৎপর্য্য চিত্রজগতের বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশই নায়কের সংঘাত। ঘটনার নিপুণ বিন্যাসে কিছু কিছু সামাজিক চিত্রও ধরা পড়েছে পরিচালকের lens-এ।

নাটকের সংলাপ সীমিত কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত, প্রকাশভঙ্গী বিশেষ অর্থবহ।

অভিনয় নায়কের এক প্রধান সম্পদ। উত্তমকুমারের নায়ক অরিন্দম মুখার্জী ছবিতে প্রাণ সঞ্চার করেছে। দর্শকসাধারণ তাকে অনেক দিন ভুলতে পারবেন না। বলতে কি, উত্তমকুমারের অসাধারণ অভিনয়-

নৈপুণ্যে ছবিটি কোন কোন ক্ষেত্রে একঘেয়েমির হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। 'আধুনিকা' সম্পাদিকা শর্মিলা ঠাকুর শান্ত রুচিশীলা। পুরু ফ্রেমের চশমা তার মধ্যে সম্পাদিকার গাম্ভীর্য আরোপ করেছে। সুমিতা সান্যাল স্বল্প আবির্ভাবে দর্শকের মনে রেখাপাত করবে। ৺বীরেশ্বর সেন, ভারতী দেবী, রণজিৎ সেন, কামু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অভিনেতাবৃন্দও প্রশংসার দাবী রাখেন।

ছবির সামগ্রিক আঙ্গিক ও প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যের জন্য music, শিল্প-নির্দেশনা ও ক্যামেরার কাজ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছবির অভিনব Title, টাকার পাহাড়ে দাঁড়িয়ে নায়ক এবং ঐ টাকার স্তূপে ডুবে যাবার মুখে বাঁচবার জন্য তার প্রাণপাত প্রচেষ্টা।

সত্যজিৎ-সহকারীদের "চিড়িয়াখানা"

সত্যজিৎ রায় ইউনিটের চারজন সহকারী গড়ে তুলেছেন তাঁর প্রোডাকসন। "নায়ক" ছবনামের অন্তরালে এরা প্রখ্যাত সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্য উপন্যাস "চিড়িয়াখানা" চিত্রায়িত করবেন। ছবির চিত্রনাট্য রচনা, সুরসংযোজনা এবং প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্বে রয়েছেন সত্যজিৎ রায়। বিভিন্ন চরিত্রে যে সব শিল্পী রূপদান করবেন বলে আশা করা যায়, তাঁরা হলেন উত্তমকুমার, জহর গাঙ্গুলী, সুশীল মজুমদার, শৈলেন মুখার্জী, প্রসাদ মুখার্জী, বঙ্কিম ঘোষ, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলোৎপল দত্ত প্রভৃতি। মহিলা শিল্পী যাঁরা অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের মধ্যে কণিকা মজুমদার অন্যতমা। আগামী ২২শে ও ২৩শে জুন নিউথিয়েটার্স স্টুডিওতে উত্তমকুমার ও জহর গাঙ্গুলীকে নিয়ে প্রথম দুদিনের চিত্রগ্রহণ তারিখ স্থিরীকৃত হয়েছে। আলোচ্য ছবির আলোকচিত্র গ্রহণ, শিল্প নির্দেশনা এবং প্রোডাকসন কন্ট্রোলাররূপে থাকবেন যথাক্রমে সৌমেন্দু রায়, বংশী চন্দ্রগুপ্ত এবং অনিল চৌধুরী। শ্রীরায়ের যে চারজন সহকারী এ-ছবির প্রযোজনা ও পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন তাঁরা হলেন দুলাল দত্ত, কাশীনাথ বসু, রমেশ সেন ও অমিয় সান্যাল।

সাপ্তাহিকী

২৮ মে

কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করেছেন, শীঘ্রই উপযুক্ত বেতনে একটি কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা সংস্থা খোলা হবে।

কোহিমার নিকটবর্তী চিয়েচামা গ্রামে একটা উপ-নির্বাচন কেন্দ্রে সশস্ত্র বৈরী নাগারা গুলিবর্ষণদ্বারা অতর্কিত আক্রমণ করে। রক্ষীবাহিনীর পাল্টা আক্রমণে শেষ পর্যন্ত তারা পলায়নে বাধ্য হয়।

বোম্বাই হতে ১০০ মাইল দূরে মাহাদ এ ট্রাক্টর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা শ্রমিকবাহী ট্রেলর ৪০০ ফিট নীচে পড়ে যাওয়ায় ১৮ জন নিহত ও ২৭ জন আহত হয়েছে।

হাজারীবাগে অত্যধিক তাপপ্রবাহে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রকাশ।

নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ২৬তম বার্ষিক অধিবেশনে যোজনামন্ত্রী শ্রীঅশোক মেহতা মন্তব্য করেছেন যে, উন্নয়নকালে দেশে মূল্য বৃদ্ধি অপরিহার্য।

কিউবা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতিতে কিউবার সশস্ত্র বাহিনীকে প্রস্তুত থাকবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২৯ মে

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে বেরুবাড়ি ও পূর্বপাকিস্তানের সীমান্ত হিলিতে সীমানা চিহ্নিতকরণের কাজ ১লা জুন শুরু হবে বলে প্রকাশ।

পাঞ্জাব সীমান্তে বড় রকমের পাক সমরসজ্জা হচ্ছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য আক্রমণের মোকাবিলার জন্য কিউবায় দেশব্যাপী সমরপ্রস্তুতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাশিয়া এ-ব্যাপারে কিউবাকে সাহায্য করবে বলে জানিয়েছে।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের হুয়ে শহরের একটি প্যাগোডায় যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ও সামরিক সরকারের প্রতি প্রতিবাদ জানিয়ে আবার দু'জন বৌদ্ধ ভিক্ষুণী অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েছে।

যুগোস্লাভিয়া হতে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে, চীনের দু'জন প্রথম সারির নেতা পদচ্যুত হয়েছেন।

৩০ মে

চন্দ্রে দ্বীয় অবতরণের জন্য আমেরিকার নূতন মহাকাশ-যান আজ প্রেরিত হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার এটা চন্দ্রে পৌঁছবে।

দক্ষিণ ভিয়েতনামে, আমেরিকা ও ভিয়েতনাম সামরিক সরকারের প্রতি প্রতিবাদস্বরূপ আরো তিনজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আত্মাহুতি দিয়েছেন।

আজ রাতে দেরাদুনের তেহ্‌রী হতে ১৩ মাইল দূরে একটা বাস-দুর্ঘটনায় ৩৮ জন যাত্রী নিহত হয়েছে।

ত্রিপুরা সীমান্তে পাক সেনাবাহিনী সমাবেশ হয়েছে বলে প্রকাশ।

কঙ্গো-সরকারের বিরুদ্ধে একটা সামরিক অভ্যুত্থান নিষ্ফল হয়েছে বলে প্রকাশ।

নাইজেরিয়ায় সামরিক সরকারের বিরোধী জনতার মধ্যে অন্তর্কলহে ৩৫ জন নিহত ও বহু শত লোক আহত হয়েছে।

মাদ্রাজের ভণ্টুরে অগ্নিকাণ্ডে ন্যূনাধিক ৫০০ কুটির ও ২০০ পাকাবাড়ী ভস্মীভূত হয়েছে। কোন জীবনহানির সংবাদ পাওয়া যায়নি। এছাড়া মসলীপত্তনের নিকটবর্তী বহু স্থানে আগুনে বহু শত গৃহ ভস্মীভূত হয়েছে।

৩১ মে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. কম. পার্ট ওয়ান নূতন নিয়মে কমার্শিয়াল এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ল পত্রের পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র নিয়ে বিক্ষোভের ফলে কলিকাতার ১৬টির মধ্যে ১২টি ও মেদিনীপুরের একটি কেন্দ্রে পরীক্ষা পণ্ড হয়ে যায়।

নূতন পাঞ্জাবী সুবা ও হরিয়ানার সীমানা নির্ধারণের জন্য নিয়োজিত সীমানা কমিশন স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট পেশ করেছেন।

চট্টগ্রামে চীনা-গেরিলাদের সদর-ঘাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে প্রকাশ।

গোয়ায় চার হাজার সরকারী কর্মচারী ধর্মঘট করায় সেখানকার জীবনযাত্রা অচল হয়ে যায়।

রাজনৈতিক সঙ্কট মোচনের জন্য দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার ও বৌদ্ধ নেতাদের মধ্যে বৈঠক বিফল হয়েছে বলে প্রকাশ।

১ জুন

ভারতের সর্ববৃহৎ কাগজকল টিটাগড় পেপার মিলস্-এর ২নং মিলে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে খুব ক্ষতি হয়েছে।

৬ই এপ্রিল হতে ১৫ই মে'র হিসাবে দেখা যায়, কলিকাতা ও নিকটবর্তী এলাকার বাহির হতে প্রায় এক লক্ষ লোক আসায় রেশনিং ব্যবস্থার উপর প্রবল চাপ পড়েছে।

ব্যাঙ্কের সংবাদ, পৌনে তিন বছর পরস্পর বৈরী-ভাবাপন্ন থাকবার পর ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া শান্তিপূর্ণ বন্ধুত্ব সম্পর্কে আসতে সম্মত হয়েছে।

পাকিস্থানে যাতায়াতের জন্য ভারত-সরকার ভারত-পাক পাসপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

ভারতকে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের জন্য আমেরিকা ২৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ঋণ দেবে বলে নয়াদিল্লীতে একটী চুক্তি হয়েছে।

২ জুন

আমেরিকার মহাকাশযান 'সার্ভেয়র' আজ সাফল্যের সঙ্গে স্বচ্ছন্দভাবে চাঁদে নেমেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে প্রচুর চিত্র ও তথ্য পৃথিবীতে পাঠাতে আরম্ভ করেছে।

একটী সরকারী ইস্তাহারে চীনের বিরুদ্ধে তিব্বতী জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ভারত প্রত্যক্ষ সমর্থন জানিয়েছে।

মাদ্রাজের এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, এক মাসে ভারতে যত দুর্ঘটনা ও বিস্ফোরণ ঘটেছে তার পিছনে নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য ও দলবিশেষের হাত আছে।

আসাম-সরকারের খণ্ডজাতীয়দের প্রতি নীতির পরিপ্রেক্ষিতে সেখানকার মন্ত্রীসভা ও কংগ্রেসী দলের মধ্যে গুরুতর মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে।

৩ জুন

'সার্ভেয়র'-এর চন্দ্রে অবতরণের পর আমেরিকা আজ নৌবাহিনীর লেঃ কমাণ্ডার শ্রী ইউজেন এ সার্নান ও বিমানবাহিনীর লেঃ কর্ণেল টমাস পি. স্ট্যাফোর্ড-কে নিয়ে মহাকাশযান 'জেমিনী-৯' মহাকাশে উৎক্ষেপণ করেছে। মহাকাশচারীরা একটী আজেনা উপগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ভিত্তিতে কাজ করবেন এবং সার্নান বাহিরে এসে মহাশূন্যে পদচারণা করবেন। জানা গেছে, আজেনার সঙ্গে মিলন সম্ভব হয়েছে।

নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্ এর সংবাদে প্রকাশ, প্রতিরক্ষার ব্যয় কমিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য আমেরিকা ভারতকে ক্রমবর্ধিত চাপ দিচ্ছে।

আজ কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে।

প্রেসিডেণ্ট সোয়েকার্নো আজ ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার মধ্যে ব্যাঙ্ককের শান্তিচুক্তি স্থগিত রেখেছেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং আজ লণ্ডনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীউইলসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

ভিয়েতনাম-যুদ্ধের জন্য এই বৎসরেই আমেরিকা দশ লক্ষ বোমা সরবরাহ করবে বলে স্থির করেছে।

অনিবার্য কারণবশতঃ 'তারাপীঠে' ও 'পুষ্পবনে' এবার প্রকাশ করা সম্ভব হল না।

—সম্পাদক

শ্রীবীরেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক ১৩৮।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯, স্মৃতি প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক ৪০, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ হইতে প্রকাশিত।

Regd. No. C 410.
Phone : 35-4297

DHRITI [illegible]
Price 50 Paise